শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২০শ বর্ষ, ২০শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩২০ সাল, ১৮৩৫ শকাব্দাঃ।

আর্য্যপথ।

প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন, সংসারে কোনও বস্তুই স্বভাবতঃ একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর নয়। দেশ, কাল ও পাত্রের পার্থক্য অনুসারে, বস্তুর হিতকারিতা ও অহিতকারিতা প্রকাশ পায়। সাময়িক ব্যবস্থার বা প্রয়োগের বিভিন্নতায় একই বস্তু, বিভিন্ন সময়ে হিতকর ও অহিতকর হইয়া থাকে। একদিন যাহা উপকারী, অপরদিন তাহাই অপকারী হইয়া দাঁড়ায়। যে সুশীতল জল, নিদাঘ-তাপক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের প্রাণে শান্তির স্নিগ্ধধারা বহাইয়া দেয়, তাহাই শীতবাতভীত শিশির-সঙ্কুচিত প্রাণের কাছে ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় ভীষণ বলিয়া বোধ হয়। ঘর্ম্মক্লিষ্ট ব্যক্তি, যে অগ্নিজ্বালা হইতে দশহস্ত দূরে সরিয়া যাইতে চায়, সেই অগ্নিজ্বালাই আলিঙ্গন করিবার জন্য শীতার্ত্ত জনের প্রাণ লালায়িত। সুস্থ শরীরে যে বিন্দুমাত্র বিষ, বিনাশের দিকে লইয়া যায়, সেই বিষবিন্দুই কফপ্রকোপক্রান্ত বিকারগ্রস্ত রোগীর দেহে নবজীবনের সঞ্চার করে। যে ঘৃত শাস্ত্রে আয়ুঃস্বরূপে কীর্ত্তিত, (বেদ বলেন—আয়ুর্বৈ ঘৃতম্) যে ঘৃত, স্বস্থ জনের দ্বারা সেবিত হইলে, বলবীর্য্য, স্মৃতিধৃতি, প্রজ্ঞা-প্রসাদ বৃদ্ধি করে, তাহাই জীর্ণজ্বরাক্রান্ত উদরাময়গ্রস্ত রুগ্নজনের দ্বারা সেবিত হইলে শমন-ভবন-গমনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। যে দুগ্ধ, পীত হইলে সুস্থশরীরের সর্ব্ববিধ-সমুন্নতি-সাধনে সমর্থ, তাহাই অবস্থা-বিশেষে সামজ্বরে প্রযুক্ত হইলে বিপজ্জনক বিকারের পার্শ্বচরের ন্যায় শঙ্কার কারণ হইয়া থাকে। ফলতঃ সংসারে কিছুই নিরাবিল উৎকৃষ্ট বা খাঁটি অপকৃষ্ট নাই। আ'জ যাহা অপকৃষ্ট বোধ হইতেছে, কা'ল হয়ত তাহাই উৎকৃষ্ট বোধ হইবে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, উপকারী অপকারী, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট প্রভৃতি

বিষয়ে ধারণার মূলে, মাত্র দেশকাল-পাত্রানুসারী আপেক্ষিক জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্যবহার ভেদই ইহাদের প্রাণের রহস্য। ব্যবহার-দোষে অমৃতও বিষক্রিয়া করে, আবার ব্যবহারগুণে বিষও অমৃতের ন্যায় উপকারী রূপে প্রতীত হয়। সংসারে শুধু নিন্দনীয়, বা শুধু বন্দনীয়, কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না।

ভারতের প্রাচীন আচার্য্যগণ এই রহস্য সুন্দর-রূপে উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। তাঁহারা সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই উৎকর্ষ ও অপকর্ষের দুইটি ভিন্ন ভাব দেখিবার সুযোগ রাখিয়া গিয়াছেন এবং সকলের মধ্য হইতে উত্তম ভাবটুকু গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা 'খনি' হইতে 'মণি' লইতে বলিয়াছেন, 'দুকূল' হইতে 'স্ত্রীরত্ন' লইতে বলিয়াছেন। নাহা [illegible] লইতে বলেন নাই। তাঁহারা বুঝাইয়া গিয়াছেন, যাহা সাধারণতঃ 'মন্দ' বলিয়া লোকে মনে করে, তাহার মধ্যেও ভাল'র একটা দিক্ আছে, ঐ দিকটা গ্রহণ করিলে মন্দ আর মন্দ থাকে না; ভালই হইয়া দাঁড়ায়।

সাধারণ-দৃষ্টিতে কামসেবা জঘন্য কর্ম্ম। কিন্তু ঋষিগণ উহাতে কল্যাণকর অংশের সমাবেশ দেখিয়াছেন। প্রতিদিনই শতশত ত্যাগী, বিরাগী, সংযমী, সন্ন্যাসী, কামভোগকে নরকভোগের ন্যায় মনে করিতেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন, আর শতশত প্রবৃত্তির দাস কামী মানব, উহাকে স্বর্গসুখভোগ-সদৃশ মনে করিয়া সানন্দে সেবা করিতেছে। কিন্তু, ঐ সকল কামী মানুষও সময়ে সময়ে ঐ ব্যাপারকে ঘৃণ্য ও বীভৎস বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, উহা ঘৃণ্য জঘন্যও বটে, আবার পবিত্রও বটে। উহার মধ্যেই নরক-যাত্রার উপকরণ বিদ্যমান, আবার উহাতেই উদ্ধারের—স্বর্গপ্রাপ্তির সামগ্রীসম্ভারও সঞ্চিত আছে। আর্য্য ঋষিগণ, উহার মঙ্গলপ্রসূ ভাবটীকে গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন, আর নিরয়প্রদ পাশব ভাবটীকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

অতিপ্রাচীন কালে বৈদিকযুগেও এই রহস্যের বিশ্লেষণ সাধিত হইয়াছিল। ভারতীয় ঋষিগণ, দৈনন্দিন সমস্ত কার্য্যেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে পান, ভোজন, উপগমন প্রভৃতি জীব-স্বভাবসুলভ প্রবৃত্তিময় কর্ম্মগুলিতেও ধর্ম্মের অন্তঃসলিল স্রোত বিদ্যমান আছে। ভোজনে ধর্ম্মও আছে, আবার অধর্ম্মও আছে। উপগমন—অবস্থাবিশেষে, ভাববিশেষে ধর্ম্ম কর্ম্ম, আবার অবস্থাভেদে—ভাবভেদে নরকের দ্বার উদ্‌ঘটিত করে। প্রাচীন যুগের এই ধারণার প্রমাণ, আমরা উপনিষদেই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই, পত্নীসম্ভোগ এক মহাযজ্ঞ। শাস্ত্র, জগতের সকল প্রকারের মঙ্গলের মূলে 'যজ্ঞ' দর্শন করিয়াছেন। যজ্ঞই লোক-রক্ষার নিদান এবং প্রকারান্তরে লোকশিক্ষারও হেতু। পত্নী-সম্ভোগে সৃষ্টির নিদানতত্ত্ব নিহিত। সুতরাং উহা পবিত্রভাবে সাধিত হইলে যে বিশ্বমঙ্গলের সংসূচক, তাহাতে সংশয় কোথায়? স্রষ্টা প্রজাপতি স্বয়ং এই পুণ্য-যজ্ঞের আদর্শ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের জীব

যদি তাহারই অনুসরণ করে, তবে পদস্খলনের শঙ্কা নাই।

উপনিষদ্ বলিতেছেন—"এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোরস অপামোষধয়ো রসঃ ওষধীনাং পুষ্পানি রসঃ পুষ্পানাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ। স হ প্রজাপতিরীক্ষাঞ্চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি। সস্ত্রিয়ং সসৃজে তাং সৃষ্ট্বা অধ উপাস্তে তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণং আত্মন এব সমুদপারয়ত্তেনৈনামভ্যসৃজৎ" পৃথিবী সর্ব্বভূতের রস বা সার-স্বরূপ, জল পৃথিবীর রস স্বরূপ, জলের রস বা সার ওষধিগণ, ওষধিগণের রস পুষ্প, পুষ্পের রস ফল, ফলের রস পুরুষ, পুরুষের রস রেতঃ বা শুক্র। স্রষ্টা প্রজাপতি চিন্তা করিলেন, "যখন সর্ব্বভূতের সারভূত পদার্থ রেতঃ, তখন এই রেতের প্রতিষ্ঠা স্থির করিব।" এইরূপ ঈক্ষণের পর তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে সেই স্ত্রীকে অধোভাগে স্থাপন করিয়া সম্ভোগ করিলেন। জীবগণ, প্রজাপতিকৃত নীতির অনুসরণ করিয়াই স্ত্রীকে অধোভাগেস্থাপন করিয়া সম্ভোগ করিয়া থাকে। প্রজাপতি, প্রকৃষ্টগতিযুক্ত সোমাভিষবের উপযুক্ত উপল-সদৃশ কঠিন স্বীয় জননেন্দ্রিয়কে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে প্রেরণ করিয়া রেতঃপাতাদিরূপ সম্ভোগযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

এখানে দেখিলাম—স্রষ্টা, সর্ব্বভূতসার শুক্রের যোগ্য প্রতিষ্ঠা আবিষ্কার করিয়া সম্ভোগযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

অতঃপর উপনিষদ্ বলিতেছেন "তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিঃ চর্ম্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ স যাবান্ হবৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি।" অর্থাৎ রমণীর উপস্থদেশ যজ্ঞবেদী-স্থানীয়, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পার্শ্বদ্বয়স্থিত দৃঢ় চর্ম্মখণ্ডদ্বয় সোমাভিষবণযোগ্য অধিষবণ-ফলকদ্বয় সদৃশ, মধ্যে সমিদ্ধ অগ্নি বিদ্যমান আছে; যে ব্যক্তি এই পূত যজ্ঞদৃষ্টিতে মৈথুনকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করেন।

এখানে আমরা দেখিলাম—কামযজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞের ন্যায় ফলপ্রদ ও পবিত্র। তবে পবিত্র ভাব থাকা চাই। যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য যে সৃষ্টিরক্ষা, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবেনা; উহাই এতত্ত্বের ভিত্তি।

যে পতি "পত্নী আমাকে আগ্রহাতিশয্য সহকারে কামনা করুক" এই বাসনা করেন, তিনি যেরূপে এই কামযজ্ঞ নিষ্পাদন করিবেন, তাহা উপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা—"স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি তস্যামর্থং নিধায় মুখেন মুখং সন্ধায় উপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেৎ "অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবতি হৃদয়াদধিজায়সে। স ত্বমঙ্গকষায়োঽসি দিগ্ধবিদ্ধামিব মাদয়েমামমূং ময়ীতি।" অর্থাৎ পতি, পত্নীতে স্বীয় জননেন্দ্রিয়ের প্রয়োগ করিয়া, স্ত্রীর মুখে মুখ দিয়া, তাহার উপস্থ-স্থানে হস্তাবমর্ষণ পূর্ব্বক 'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বীর্য্যকে প্রার্থনা জানাইবেন। মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে রেতঃ! তুমি আমার সমস্ত অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, বিশেষতঃ হৃদয় হইতে অধিজাত, তুমি সর্ব্বাঙ্গের সাররস স্বরূপ, তুমি আমার এই পত্নীকে বিষাক্ত-শরবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তা করিয়া দাও।

এখানে আমরা দেখিলাম, পতি, পত্নীকে

নিজের প্রতি অত্যধিক অনুরাগিণী করিবার জন্য কামযজ্ঞের এক বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান-সম্পাদনে ব্যস্ত। পতি-পত্নীর পরস্পর অনুরাগ বর্দ্ধিত না হইলে প্রীতিকর সম্ভোগের সম্ভাবনা থাকেনা। পক্ষান্তরে মনোমদ মিলন না ঘটিলে, সুসন্তানলাভের প্রত্যাশাও ঘটেনা। কাজেই পত্নীর প্রীতিবর্দ্ধক কামযজ্ঞানুষ্ঠানের অবতারণা।

উপনিষদে গর্ভাধানের উপযুক্ত কামযজ্ঞের অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। যথা—অথ যামিচ্ছেদ্দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায় অপাণ্যা অভিপ্রাণ্যাৎ ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামীতি গর্ভিণ্যেব ভবতি। অর্থাৎ পতি, যে পত্নীর গর্ভাধান ইচ্ছা করিবেন, সেই স্ত্রীর গুপ্ত ইন্দ্রিয়ে নিজ গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের যোজনা করিয়া, মুখে মুখ দিয়া, নিজ ইন্দ্রিয়দ্বারা পত্নীর ইন্দ্রিয় হইতে রেত-গ্রহণ ভাবনা করিয়া, তাহা গর্ভাধান-যোগ্য মনে করিয়া, নিজ রেতের সহিত ঐ পত্নীর ইন্দ্রিয়স্থানে নিঃক্ষেপ করিবেন ও চিন্তা করিবেন—"হে পত্নি! আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তোমার ইন্দ্রিয় হইতে রেত গ্রহণ করিয়াছি।" এইরূপ ক্রিয়ার ফলে পত্নী গর্ভিণী হইবেন।

এখানে আমরা দেখিলাম—কামযজ্ঞের প্রক্রিয়াদ্বারা সন্তানোৎপাদনের সুকৌশল আবিষ্কার করিতে গিয়া উপনিষদের ঋষি, প্রকারান্তরে "সন্তানোৎপাদনই কামযজ্ঞের অনুষ্ঠানের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য" ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন। পুত্রোৎপাদনের অনুকূল কামযজ্ঞই পবিত্র, এখানকার তাৎপর্য্যই এইরূপ।

অতঃপর বিভিন্ন রূপ-গুণ-সম্পন্ন সন্তানকামনায় আনুষঙ্গিক আয়োজনের বা নিয়মপালনের বিভিন্ন প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিতেছেন—স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতাং ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ। অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রোমে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদাবনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ। অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রোমে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বৈ বেদান্ অনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি ওদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ। অথ য ইচ্ছেদ্ দুহিতামে পণ্ডিতা জায়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ। অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রোমে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা। অর্থাৎ যিনি ইচ্ছা করেন যে, পত্নীর গর্ভে শুক্লবর্ণ শতবর্ষজীবী একবেদবিৎ সন্তান জন্মগ্রহণ করুক, তিনি পত্নীর দ্বারা স্থালীপাক-বিধানে ক্ষীরান্ন পাক করাইবেন, পরে ঘৃতযুক্ত করিয়া উভয়ে ভোজন করিবেন, তাহা হইলে উক্তরূপ পুত্র-জননে সমর্থ হইবেন। যিনি ইচ্ছা করেন, কপিল পিঙ্গল শতবর্ষজীবী দ্বিবেদবিৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, তিনি পত্নীর দ্বারা স্থালীপাক-বিধানে দধ্যন্ন (দধিপক্ক চরু) পাক করাইবেন ও পরে ঘৃতযুক্ত করিয়া উভয়ে ভোজন করিলে, উক্তরূপ পুত্র-জননে সমর্থ হইবেন। যিনি ইচ্ছা করেন, পত্নীর গর্ভে শ্যামবর্ণ লোহিত-নয়ন শতবর্ষজীবী ত্রিবেদী

পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, তিনি পত্নীর দ্বারা স্থালী-পাক-বিধানে কেবল জল দ্বারা পক্ব অন্ন রন্ধন করাইবেন, পরে ঘৃত সংযুক্ত করিয়া উভয়ে ভোজন করিবেন, তাহা হইলে উক্ত-রূপ-পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইবেন। যিনি ইচ্ছা করিবেন, বিদুষী শতজীবিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করুক, তিনি পত্নীর দ্বারা কৃষরান্ন পাক করাইবেন উহা ঘৃতযুক্ত করিয়া উভয়ে ভোজন করিবেন, তাহা হইলে উক্ত রূপ কন্যা উৎপাদন করিতে পারিবেন। যিনি ইচ্ছা করেন, পণ্ডিত, প্রখ্যাত, প্রগল্ভ, রমণীয় বাক্যের বক্তা, চতুর্ব্বেদবিৎ, শতজীবী পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, তিনি পত্নীর দ্বারা উক্ষার (গর্ভাধান-সমর্থ বৃষের) মাংস, অথবা ঋষভের (উক্ষা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বৃষের নাম ঋষভ) মাংস দিয়া অন্ন (পলান্ন) প্রস্তুত করাইবেন, পরে ঘৃত সংযুক্ত করিয়া উভয়ে ভক্ষণ করিবেন ; তাহা হইলে উক্তরূপ পুত্র উৎ-পাদন করিতে সমর্থ হইবেন।

এখানে পতি, স্থালীপাক-বিধানে ক্ষীরান্ন, দধ্যন্ন, পলান্ন প্রভৃতি দ্বারা হোমাদি সমাপন করিয়া, নিজে শেষ অন্ন ভোজন করিয়া, ভোজনাবশিষ্ট ক্ষীরান্ন পলান্ন প্রভৃতি পত্নীকে প্রদান করিবেন, এইরূপ বিধান স্পষ্টরূপে উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে।

ইহার পর উপনিষদ্ বলিতেছেন "অথৈনা-মভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সংরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয়ে ইতি অথাস্যা ঊরূ বিহাপয়তি বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী ইতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায় ত্রিরেণামনুলোমামনুমার্ষ্টি বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে, গর্ভং ধেহি সিনীবালী গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে, গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবৌ আধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাং নির্মন্থতামশ্বিনৌ। তংতে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে। যথাগ্নিগর্ভা পৃথিবী যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসাবিতি। অর্থাৎ অপত্য-কামনায় পূর্ব্বোক্তরূপ অন্নাদি-পাক ও ভোজন করিয়া, পরে যথাসময়ে পতি, পত্নীকে আলিঙ্গন করিবেন এবং মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্রের তাৎপর্য্য—হে পত্নি! আমি প্রাণ স্বরূপ, তুমি বাক্য স্বরূপ, বাক্য প্রাণের অধীন, সেই বাক্য-রূপ তুমি, প্রাণ-রূপ আমার অধীন,—সেই তুমি বাক্যরূপা ও আমি প্রাণরূপ। আমি সাম ও তুমি ঋক্-স্বরূপা, আমি দ্যুলোকরূপ ও তুমি পৃথিবীরূপা। এস, আমরা সঙ্গত হই, বীর্য্যবান্ পুত্র পাইবার জন্য, পরস্পর রেতোধারণক্রিয়ায় অবহিত হই। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে পতি, পত্নীর উরুদ্বয়কে বিশ্লিষ্ট করি-বেন। বলিবেন "হে দ্যুলোক ও পৃথিবী-স্বরূপ উরুদ্বয়! তোমরা বিশ্লিষ্ট হও।" অন-ন্তর পত্নীর গুপ্তইন্দ্রিয়ে স্বীয় জননেন্দ্রিয় অর্পণ এবং মুখে মুখ নিবেশ করিয়া তিনবার মন্ত্র পড়িয়া তাহার শরীর মস্তকের দিক্ হইতে নিম্নদিকে অনুলোমক্রমে অনুমার্জ্জন করি-বেন। মন্ত্রের অর্থ যথা,—হে পত্নি! সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, তোমার যোনি-যন্ত্রকে পুত্রোৎপাদনের যোগ্য করুন্; তেজস্বী ত্বষ্টা, তোমার রূপ, দর্শনযোগ্য করুন্। প্রজাপতি, পতি-(আমি) রূপে তোমার ইন্দ্রিয়ে রেতঃসেক করুন্।

তেজস্বী সূর্য্য ও চন্দ্রমা, তোমার গর্ভ ধারণ করুন্। অশ্বিনীকুমার দ্বয়, জ্যোতির্ম্ময়ী অরণী দ্বারা পূর্ব্বে তোমার যে গর্ভ নির্ম্মথন করিয়াছিলেন, সেইরূপ গর্ভ, দশম মাসে প্রসবের জন্য তোমার উদরে নিহিত করিতেছি। যেমন পৃথিবী অগ্নিগর্ভা, যেমন সূর্য্যের দ্বারা দ্যৌ (দ্যুলোক) গর্ভবতী হয়, যেমন বায়ু হইতে দিকের গর্ভ হয়, সেইরূপ আমি তোমাতে গর্ভাধান করি।

এখানে দেখিলাম, পতি নিজে দেবশক্তিময় সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া পত্নীতে দেবশক্তির অধিষ্ঠান কল্পনা করিতেছেন এবং দৈব-নিয়মেই সন্তান-উৎপাদনে ব্রতী হইতেছেন। তাৎপর্য্যতঃ বলা যায়, এখানে কেবল লোকরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার আয়োজনই স্পষ্ট দেখিতেছি। ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা-সম্পাদনের সংবাদ পাইতেছি না প্রজাপতি যে পবিত্র জগতের হিতকারক যজ্ঞের সূচনা করেন, হিন্দুগৃহস্থ সেই পবিত্রতা ও জগন্মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সম্ভোগযজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। পশুধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হিন্দুর অভিপ্রেত নয়। হিন্দু কামকে জগতের হিতকর পবিত্র পদার্থ মনে করেন, কদাচ ইহাতে পশুভাব আরোপ করিতে প্রস্তুত হন না।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে, কেবল পুত্রোৎপত্তি-নিমিত্ত কামযজ্ঞের অনুষ্ঠান দোষাবহ নয়। ভগবান্ এই কামকে নিজবিভূতি বলিয়াছেন। গীতার সেই মহামন্ত্র "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!" অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত কাম—বিহিত বিবাহিত পত্নীতে পুত্রোৎপাদনের অনুকূল ভাবে অনুষ্ঠিত কামযজ্ঞ, ভগবানেরই বিভূতি। ব্যবহারভেদে প্রয়োগ-পার্থক্যে ভালও মন্দ হয়, মন্দও ভাল হয়। কাম বিশ্বের মূলে, কামের উপর বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, এ কাম যোগ্যভাবে প্রযুক্ত; আবার কাম নরকের পথ প্রশস্ত করে, কামে পতন প্রতিষ্ঠিত, সে কাম অযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত। এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইলেই বিপদ্ বাড়িয়া যায়। কামের দোষ নাই, দোষ প্রয়োগের, একথা মনে রাখিলে কামযজ্ঞের অধিকার কেবল মাত্র পুত্রোৎপাদনের অধিকারেই পর্য্যবসিত হয়।" প্রজাপতিও সেই পথই দেখাইয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রও সন্তানোৎপাদনের জন্য ঋতুকালে পত্নীসম্ভোগের ব্যবস্থা দিয়া কাম-সেবার পবিত্র অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্ধারণ "আর্য্যপথ" নামে অভিহিত হইতে পারে। এই আর্য্যপথ হইতে এক অঙ্গুলী দূরে সরিয়া গেলেই নরককুণ্ডে পতিত হইতে হইবে। হিন্দু গৃহস্থ, এই আর্য্যপথে পদচারণা করিতেই অভ্যস্ত; ইহার বাহিরে পশুত্বের রাজ্যে তিনি কদাচ গমন করেন না। ওঁ শান্তি।

শ্রী—

শাস্ত্র।

(দ্বিতীয় অংশ)

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন—বিধি-বাক্যের অতীত, মনের অতীত; জ্ঞান-অজ্ঞানের অতীত,—সেই ব্রহ্ম, শব্দপ্রমাণগম্য হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম অবিধেয়। শ্রুতি হইতেই জানিতে পারি "কে কাহাকে কিরূপে জানিবে?" "কঃ কেন বিজানীয়াৎ", বাস্তবিক যদি

আমরা সাকার উপাসনা ত্যাগ করিয়া, নিরাকার ব্রহ্ম লক্ষ্যে আসিয়া পড়ি, তাহাতেও শাস্ত্র-মাহাত্ম্য লুপ্ত হয় না। পরমার্থ-সিন্ধু-সঙ্গমে যাইবার শাস্ত্রই তরী। বেদান্ত-মতে শাস্ত্র আত্মজ্ঞান উৎপন্ন করে না, শাস্ত্র, অবিদ্যা-কল্পিত ভেদ-নিবৃত্তিই করে। ব্রহ্মস্বরূপ বুঝাইয়া দিতে শাস্ত্র অপারগ হইলেও মায়া-কল্পিত ভেদ-দৃষ্টিত অপনয়ন করিতে পারে! তাহা হইলে অবিদ্যা-কল্পিত সংসারিত্ব-নিবর্ত্তনে শাস্ত্রই সক্ষম! আর এই ভেদ-নিবৃত্তি হইলেই স্বপ্রকাশ আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়; অজ্ঞান সমূলে ধ্বংস পাইলেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আপনিই ফুটিয়া উঠে। অবিদ্যা-কল্পিত-ভেদ-নিবৃত্তি শাস্ত্র দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানও শাস্ত্র দ্বারা একপ্রকার সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন স্বরূপতঃ ব্রহ্মজ্ঞান, ক্রিয়ার মত মানবের ইচ্ছাধীন নহে—মোট কথা, পুরুষ-নিষ্পাদ্য নহে। স্ব স্বরূপে—প্রত্যগাত্মরূপে জ্ঞানীর হৃদয়ে প্রতিভাত হয় মাত্র। কাব্যের রস বুঝাইতে যাইয়া আলঙ্কারিকেরা এই ব্রহ্মজ্ঞানকে স্বানুভববেদ্য অলৌকিক চমৎকারিত্বময় ভাব-পদার্থরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। সেই ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ শাস্ত্র বুঝাইতে পারেনা। তবে "ইহা ব্রহ্ম নহে" "উহা ব্রহ্ম নহে"—এই প্রকারে "যাবৎ দৃশ্যমান বস্তুই ব্রহ্ম নহে"—শাস্ত্র ইহাই বুঝাইয়া দেয়।

যে দিক্ দিয়াই দেখ, শাস্ত্রই জীবের সর্ব্ব বিষয়ের অবলম্বন। কেবল পরমার্থ বলিয়া নহে, সংসারের যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষালাভ, শাস্ত্র দ্বারাই হয়। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানবগণ যে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন, শাস্ত্র দ্বারা আমরা সেই সেই জ্ঞানের সহিত পরিচিত হই। শাস্ত্র, অতীত বর্ত্তমানের দর্পণ। শাস্ত্র কল্পতরু,—অর্থী যাহা চাইবে তাহাই পাইবে। শাস্ত্র, কামদুঘা ধেনুঃ—। এই শাস্ত্র-কামধেনু হইতে কত জ্ঞানামৃত ধারা ক্ষরিত হইয়া অনাদি কাল হইতে মানবগণকে তৃপ্ত করিতেছে! এ অমৃত নিঃশেষ হয় না।

সংহিতা-শাস্ত্রে রাজনীতি, রাজনিয়ম গার্হস্থ্যবিধান, সমাজ-তত্ত্ব, কর্ত্তব্যবিচার—প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বুঝান আছে। ইহা ঠিক পরমার্থশাস্ত্র নহে। পরমতত্ত্বজ্ঞান ইহার উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্র বলিতেই কেবল যে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বুঝিবে—তাহা নহে। সম্পত্তির অধিকারি-বিচার, ব্যবহারতত্ত্ব, অশৌচব্যবস্থা, ছাত্রকর্ত্তব্য, দাম্পত্যবিধান, পিতা-পুত্র-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য—এ সকলই সংহিতায় বিশেষ ভাবে বুঝান আছে। প্রকৃত পক্ষে সংসার-যাত্রার পক্ষে সংহিতাই প্রয়োজনীয়। ইহাই প্রকৃত পক্ষে দেশ রক্ষা ও শাসন করিয়া আসিতেছে। রঘুনন্দনীয় স্মৃতি, সংহিতারই একপ্রকার ব্যাখ্যা। শাস্ত্রাতিরিক্ত কোন মত নব্য স্মৃতিতে স্থান পায় নাই—এই হেতুবাদে ইহার প্রামাণ্য।

পুরাণ—আখ্যায়িকাচ্ছলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বচয় ইহাতে প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বড়ই উপকারক।

পুরাণের পর দর্শন। তাবৎ-টীকা-সম্বলিত আধুনিক বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতিই দর্শনপদ-বাচ্য। এ স্থলে মাত্র ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়সূত্র, সাংখ্যসূত্র বা

যোগসূত্র বুঝিতে হইবে না। মানবের মধ্যে যাহারা শ্রদ্ধালু, বিশ্বাসী, তাঁহারা উপনিষৎ ও পুরাণ ভাগবত দ্বারা আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তর্ক-প্রবণ—তাঁহারা সরল প্রাণময় উপদেশে তৃপ্ত হইলেও একেবারে সন্দেহ-শূন্য হয়েন না। তাঁহাদের বুঝাইতে হইলে যুক্তি-নিবদ্ধ তর্কের অবতারণা আবশ্যক। সন্দিগ্ধের সন্দেহ-নিরাস তর্কদ্বারা নিষ্পাদ্য। আর প্রতিবাদী যেখানে প্রবল; চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ যখন শাস্ত্রের উপর সবলে আঘাত করিতে বদ্ধহস্ত—তখনই তর্ক যুক্তিময় দর্শনের বিশেষ আবশ্যকতা। শঙ্কর-ভাষ্য প্রভৃতি দর্শনই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে ও করিতে পারে। তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে। শাস্ত্র-প্রতিকূল তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কোন্ তর্ক প্রতিকূল, ইহা বুঝিতে হইলে তর্কেরই আবশ্যক। শ্রুত্যনুসারি তর্কই মনন। "ন তর্কেন মতিরাপনেয়া" ইহা কেবল তর্ক। 'তর্ক' বলিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি ঘটপটময় আধুনিক ন্যায়-শাস্ত্রকে তর্ক বলিতেছি। দর্শন জগতে যদি কেহ প্রকৃত তার্কিক জন্মিয়া থাকেন, তবে সে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য। অতএব এই দর্শন এই তর্ক—প্রভৃতিকে আমরা শাস্ত্র বলিয়া থাকি। কারণ এ সমস্ত পরমার্থ-তত্ত্বেরই উপযোগী। বেদ-সংহিতা পুরাণ তন্ত্র—প্রভৃতি সমস্তই কালে কালে রচিত। কালানুযায়ী অধিকারিভেদ অনুসারেই ইহা প্রণীত। তবে এক্ষণে সংহিতা-পুরাণের মতগুলি আধুনিক যুগে সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী কিনা, কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কার্য্য কিনা—এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। "শাস্ত্রমত যে কালভেদেও অপরিবর্ত্তনীয়"—ইহা পূজ্যপাদ আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উত্তরপাড়া—সম্মিলনে সুস্পষ্টই বুঝাইয়াছেন। তবে ইহাও অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, কাল, আপনি আপনার সুবিধা অনুসারে হিতকর মতগুলিকে সংস্কার করিয়া লইবে। তবে ইহাতে কাহারও হাত দিতে যাওয়া দাম্ভিকতা হয়।

চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি—এই গুলি আধুনিক শাস্ত্র। যদিও ইহার মত, শাস্ত্রমত ব্যতীত অন্য নহে—তথাপি ঋষি-প্রণীত নহে বা সনাতন আচার-পদ্ধতির অনুকূল নহে—এই সকল কারণে এগুলি সর্ব্বসম্মত শাস্ত্র-সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই। তবে বৈষ্ণবের পক্ষে ইহা অমূল্য শাস্ত্র।

আমাদের সমস্ত ক্রিয়াপদ্ধতি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট। আমাদের আহার বিহার শয়ন—প্রাত্যহিক যাবৎ ব্যাপারের মধ্যে শাস্ত্র-প্রভাব বিদ্যমান। কোন মত শাস্ত্রোক্ত না হইলে হিন্দু মানেন না। কারণ হিন্দুরা চিরদিন বাহ্য শরীরাদি-ভোগ-বিতৃষ্ণ, পরমার্থ-লাভের জন্য ব্যাকুল। অবশ্য বর্ত্তমানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রোক্ত—"ইহা করিলে তোমার শরীর অসুস্থ হইবে," কথা হিন্দু শুনিবে না। কাজেই শাস্ত্র দ্বারাও এগুলি নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক—তজ্জন্য যাবতীয় বিধিগুলি শাস্ত্র-মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে গেলে অনেক

সময় গোলোক ধাঁধাঁয় পড়িতে হয়। তাহা শাস্ত্রের দোষ নহে, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার দোষ। এরূপ সংশয় স্থলে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" মহাজন-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন বিধেয়। তবে এমনও হয়, কোন কোনও পথ, সংস্কার-অনুযায়ী আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে। যদি বুঝা যায়—বর্ত্তমানে সে পথে চলা সর্ব্বদা অসম্ভব বা উপকারী নহে,—এরূপ ক্ষেত্রে কালোচিত মহাপুরুষোক্ত কোন কোন পথ বা প্রণালী সনাতন আচারপদ্ধতি হইতে একটু ভিন্ন রূপ হইলেও গ্রাহ্য। কিন্তু তাহা বলিয়া বুদ্ধিপ্রতিভাবান্ যে কেহ আপন মতানুযায়ী ঐরূপ ভিন্ন প্রকার পথ দেখাইলেন, আর সেই পথে সকলকে চলিতে হইবে, ইহা কেমন কথা?

যাঁহারা রক্ষণশীল অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সম্প্রদায়—তাঁহারা সনাতন-পদ্ধতি হইতে ভিন্নরূপ একটুও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কারণ তাঁহারা বলেন, পথ কে দেখাইবে? যিনি দেখাইবেন, তিনি সর্ব্বজনপূজ্য মহাপুরুষ হওয়া চাই। এরূপ মহাপুরুষকৃত সংস্কার অবশ্য মানিব।

আর একটী দল আছেন, যাঁহারা শাস্ত্র মানিতে প্রস্তুত নহেন; শাস্ত্রের নিয়ম তাঁহাদের নিকট বন্ধন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে চলাই অভীষ্ট মনে করেন। তাঁহাদের উপর হিন্দুর কোন সহানুভূতি নাই বা থাকিতে পারেনা। আমরা চাই, সকলে শাস্ত্র-নিয়ম পালন করুক, তবে যদি কোন নিয়ম অমনঃপূত হয়—তবে তাহা সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে পরিশোধিত করা হউক্। আর যদি প্রকৃত শঙ্করাদিবৎ কোন মহাপুরুষ জন্মেন—আবার যদি "পরিত্রাণায় সাধূনাং" ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন, তবেই শাস্ত্র-নিয়মের সংস্কারের সম্ভাবনা। নিউটনের কোন তত্ত্ব ভ্রান্তিপূর্ণ—ইহা যতক্ষণ ঐরূপ কোন মহাত্মা আসিয়া না বুঝাইবেন, ততদিন নিউটনমতই গ্রহণীয়; শাস্ত্র-নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের এই কথা।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

নিরালম্বোপনিষৎ।

নমঃ শিবায় গুরবে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
নিষ্প্রপঞ্চায় শান্তায় নিরালম্বায় তেজসে।
নিরালম্বং সমাশ্রিত্য সালম্বং বিজহাতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ কৈবল্যং পদমশ্নুতে।
এষামজ্ঞানজন্তূনাং সমস্তারিষ্টশান্তয়ে। যদ্ যদ্ বোদ্ধব্যমখিলং তদাশঙ্ক্য ব্রবীম্যহম্। ১

কিং ব্রহ্ম, ক ঈশ্বরঃ, কো জীবঃ, কা প্রকৃতিঃ, কঃ পরমাত্মা, কো ব্রহ্মা, কো বিষ্ণুঃ, কো রুদ্রঃ, ক ইন্দ্রঃ, কঃ শমনঃ, কঃ সূর্য্যঃ, কশ্চন্দ্রঃ, কে সুরাঃ, কে অসুরাঃ, কে পিশাচাঃ, কে মনুষ্যাঃ, কাঃ স্ত্রিয়ঃ, কে পশ্বাদয়ঃ, কিং স্থাবরম্, কে ব্রাহ্মণাদয়ঃ, কা জাতিঃ, কিং কর্ম্ম, কিমকর্ম্ম, কিং জ্ঞানং, কিমজ্ঞানম্, কিং সুখম্, কিং দুঃখং, কঃ স্বর্গঃ, কো নরকঃ, কো বন্ধঃ, কো মোক্ষঃ, ক উপাস্যঃ, কঃ শিষ্যঃ, কো বিদ্বান্, কো মূঢ়ঃ, কিমাসুরম্, কিং তপঃ,

কিং পরমং পদম্, কিং গ্রাহ্যং, কিমগ্রাহ্যম্, কঃ সন্ন্যাসীত্যাশঙ্ক্যাহ। ২

ব্রহ্মেতি সহোবাচ। মহদহঙ্কার-পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশত্বেন বৃহদ্রূপেণাণ্ডকোশেন কর্ম্মজ্ঞানার্থরূপতয়া ভাসমানমদ্বিতীয়মখিলোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎ সকলশক্ত্যুপবৃংহিতমনাদ্যনন্তং শুদ্ধং শিবং শান্তং নির্গুণমিত্যাদিবাচ্যমনির্ব্বাচ্যং চৈতন্যং ব্রহ্মেতি। ৩

ঈশ্বরইতি চ। ব্রহ্মৈব স্বশক্তিং প্রকৃত্যভিধেয়ামাশ্রিত্য লোকান্ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্যান্তর্যামিত্বেন ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধীন্দ্রিয়নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরঃ। ৪

জীব ইতি চ। নামরূপ দ্বারা স্থূলোহহমিতি মিথ্যাধ্যাসবশাজ্জীবঃ। সোহয়মেকোহপি দেহারম্ভক-ভেদাদ্বহুবিধঃ। ৫

প্রকৃতির্ইতি চ। ব্রহ্মণঃ সকাশান্নানাবিচিত্র-জগন্নির্ম্মাণসামর্থ্যবুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ। ৬

পরমাত্মেতি চ। দেহাদেঃ পরতরত্বাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা। স ব্রহ্মা, স বিষ্ণুঃ, স রুদ্রঃ, স ইন্দ্রঃ, স শমনঃ, স সূর্য্যঃ, স চন্দ্রঃ, তে সুরাঃ, তে অসুরাঃ, তে পিশাচাঃ, তে মনুষ্যাঃ, তাঃ স্ত্রিয়ঃ, তে পশ্বাদয়ঃ, তৎ স্থাবরং, তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ৭

জাতিরিতি চ। ন চর্ম্মণো ন রক্তস্য ন মাংসস্য নচাস্থিনঃ। ন জাতিরাত্মনো জাতিঃ ব্যবহার-প্রকল্পিতা। ৮

কর্ম্মেতি চ। ক্রিয়মাণেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মাণ্যহং করোমীত্যধ্যাত্মনিষ্ঠতয়া কৃতং কর্ম্মৈব কর্ম্ম। ৯

অকর্ম্মেতি চ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যহঙ্কারবত্তয়া বন্ধরূপং জন্মাদিকারণং নিত্যনৈমিত্তিকযাগব্রততপোদানাদিষু ফলাভিসন্ধানং যৎ তদকর্ম্ম। ১০

জ্ঞানমিতি চ। দেহেন্দ্রিয়নিগ্রহসদ্গুরূপাসনশ্রবণমনন-নিদিধ্যাসনৈর্যদ্ যদ্ দৃগ্দৃশ্য-স্বরূপং সর্ব্বান্তরস্থং সর্ব্বসমং ঘটপটাদিপদার্থেষ্বিবাবিকারং বিকারেষু চৈতন্যং বিনা কিঞ্চিন্নাস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানম্। ১১

অজ্ঞানমিতি চ। রজ্জৌ সর্পভ্রান্তিরিব অদ্বিতীয়ে সর্ব্বানুস্যূতে সর্ব্বময়ে ব্রহ্মণি দেবতির্য্যঙ্নরস্থাবর—স্ত্রীপুরুষবর্ণাশ্রম—বন্ধমোক্ষোপাধি নানাত্মকভেদ-কল্পিতং জ্ঞানমজ্ঞানম্। ১২

সচ্চিদানন্দস্বরূপং জ্ঞাত্বানন্দরূপা যা স্থিতিঃ সৈব সুখম্। দুঃখমিতি চ। অনাত্মরূপবিষয়-সংকল্প এব দুঃখং। ১৩

স্বর্গ ইতি চ। সৎসংসর্গঃ স্বর্গঃ। ১৪

নরক ইতি চ। অসৎসংসারবিষয়জনসংসর্গ এব নরকঃ। ১৫

বন্ধ ইতি চ। অনাদ্যবিদ্যাবাসনয়া জাতোহহমিত্যাদিসংকল্পো বন্ধঃ। পিতৃমাতৃ-সহোদর-দারাপত্য-গৃহারাম-ক্ষেত্রমমতা-সংসারাচরণ-সংকল্পো বন্ধঃ। কর্ত্তৃত্বাদ্যহঙ্কার-সংকল্পো বন্ধঃ। অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যাশাসিদ্ধ-সংকল্পো বন্ধঃ। দেবমনুষ্যাদ্যুপাসনাকাম-সংকল্পো বন্ধঃ। যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগসংকল্পো বন্ধঃ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকর্ম্ম-সংকল্পো বন্ধঃ। আজ্ঞাভয়সংশয়াত্মগুণসংকল্পো বন্ধঃ। যাগব্রততপোদানবিধি-বিজ্ঞানসংভবো বন্ধঃ।

কেবলমোক্ষাপেক্ষা-সংকল্পো বন্ধঃ। সংকল্পমাত্রসম্ভবো বন্ধঃ। ১৬

মোক্ষ ইতি চ। নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্য-সংসার-সুখদুঃখবিষয়--সমস্তক্ষেত্রমমতা-বন্ধক্ষয়ো মোক্ষঃ। ১৭

উপাস্য ইতি চ। সর্ব্বশরীরস্থচৈতন্য-ব্রহ্মপ্রাপকো গুরুরুপাস্যঃ। ১৮

শিষ্য ইতি চ। বিদ্যাধ্বস্তপ্রপঞ্চাবগাহিতজ্ঞানাবশিষ্টং ব্রহ্মৈব শিষ্যঃ। ১৯

বিদ্বানিতি চ। সর্ব্বান্তরস্থস্বসম্বিদ্রূপবিৎ বিদ্বান্। ২০

মূঢ় ইতি চ। কর্ত্তৃত্বাদ্যহঙ্কার-ভাবারূঢ়ো মূঢ়ঃ। ২১

আসুরমিতি চ। ব্রহ্মবিষ্ণীশানেন্দ্রাদীনামৈশ্বর্য্যকামনয়া নিরশন-জপাগ্নিহোত্রাদিষন্তরাত্মানং সন্তাপয়তি চাত্যুগ্ররাগদ্বেষবিহিংসাদম্ভাদ্যপেক্ষিতং তপ আসুরম্। ২২

তপ ইতি চ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যপরোক্ষজ্ঞানাগ্নিনা ব্রহ্মাদ্যৈশ্বর্য্যাশাসিদ্ধ-সংকল্প-বীজসন্তাপং তপঃ। ২৩

পরমং পদমিতি চ। প্রাণেন্দ্রিয়াদ্যন্তঃ-করণগুণাদেঃ পরতরং সচ্চিদানন্দং অভয়ং নিত্যমুক্তব্রহ্মস্থানং পরমং পদম্। ২৪

গ্রাহ্যমিতি চ। দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদ-রহিত-চিন্মাত্রস্বরূপং গ্রাহ্যম্। ২৫

অগ্রাহ্যমিতি চ। স্বস্বরূপব্যতিরিক্ত-মায়াময়বুদ্ধীন্দ্রিয়গোচর——জগৎসত্যত্বচিন্তনমগ্রাহ্যম্। ২৬

সন্ন্যাসীতি চ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ভূত্বা ব্রহ্মিষ্ঠং শরণমুপগম্য তত্ত্বমসি সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি মহাবাক্যার্থানুভবজ্ঞানাদ্ ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি নিশ্চিত্য নির্ব্বিকল্পসমাধিনা স্বতন্ত্রোযতিশ্চরতি স সন্ন্যাসী স মুক্তঃ স পূজ্যঃ স যোগী স পরমহংসঃ সোঽবধূতঃ স ব্রাহ্মণ ইতি নিরালম্বোপনিষদং যোঽধীতে গুর্ব্বনুগ্রহতঃ সোঽগ্নিপূতোভবতি স বায়ুপূতোভবতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে, পুনর্ণাভিজায়তে পুনর্ণাভিজায়তে ইত্যুপনিষৎ। ২৭

ইতি নিরালম্বোপনিষৎ সমাপ্তা।

নিরালম্বোপনিষদের বঙ্গানুবাদ।

সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি প্রপঞ্চাতীত শান্ত মঙ্গলময় জ্যোতিঃস্বরূপ নিরালম্ব গুরুতত্ত্বকে নমস্কার করি। যিনি নিরালম্বকে আশ্রয় করিয়া সালম্বকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী, তিনিই কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন। অজ্ঞানী জনগণের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল-বিনাশের জন্য যাহা কিছু জানিবার বুঝিবার আছে, সে সমস্তই এখানে বর্ণিত হইতেছে। ১

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও পরমাত্মা কিরূপ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, শমন, সূর্য্য চন্দ্র ইহাদের স্বরূপ কি? কাহারা, সুর, অসুর, পিশাচ ও মনুষ্য? কাহারা স্ত্রী? কাহারা পশু পক্ষী প্রভৃতি? স্থাবর কাহাকে বলা যায়? ব্রাহ্মণ প্রভৃতির স্বরূপ কি? জাতি কাহাকে বলে? কর্ম্ম কি, আর অকর্ম্মই বা কি? জ্ঞান কি, অজ্ঞানই বা কি? সুখই বা কি, দুঃখই বা কি? স্বর্গ কি, নরকই বা কি? বন্ধ কাহাকে বলে? মোক্ষই বা কি? উপাস্য কে? শিষ্যই বা কে? বিদ্বান্

কাহাকে বলে? মূঢ়ই বা কাহাকে বলে? আসুর কাহাকে বলা যায়? তপ কি? পরমপদ কাহার নাম? গ্রাহ্য কি, আর অগ্রাহ্যই বা কি? সন্ন্যাসীই বা কে? ২

মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহঙ্কার, ভূমি, জল, তেজ, বাতাস ও আকাশ স্বরূপে, বৃহদাকারে ব্রহ্মাণ্ডরূপে কর্ম্মজ্ঞান-নিষ্পত্তির জন্য ভাসমান অদ্বিতীয় সর্ব্বোপাধিমুক্ত সর্ব্বশক্তিময়, অনাদি অনন্ত শিব শান্ত নির্গুণ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা লক্ষিত-রূপে বর্ণিত, বস্তুতঃ অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যতত্ত্বই ব্রহ্ম।৩

ব্রহ্মই প্রকৃতি-নাম্নী স্বীয়শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামি-রূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদির বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বর নামে কথিত হন। ৪

ঐ ব্রহ্মই বহু নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া 'আমি স্থূল' 'আমি কৃশ' ইত্যাদি মিথ্যা-জ্ঞান আশ্রয় করিয়া জীব নামে অভিহিত হন। জীব বস্তুতঃ এক হইলেও দেহ-ভেদে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ৫

ব্রহ্মসান্নিধ্যবশে বিচিত্র-বিশ্বনির্ম্মাণ-শক্তি-বুদ্ধিস্বরূপ ব্রহ্মশক্তিই প্রকৃতি। ৬

দেহাদি হইতে পরবর্ত্তী তত্ত্ব বলিয়া ঐ ব্রহ্মই পরমাত্মা নামে গীত হইয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, শমন, সূর্য্য, চন্দ্র, সুর, অসুর, পিশাচ, মনুষ্য, স্ত্রী, পশু, পক্ষী, স্থাবর, প্রভৃতি, ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এসমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সেই একমাত্র পদার্থই যথার্থ, নানা বা বহু কিছুই নয়। ৭

জাতি' চর্ম্মের নয়, রক্তের নয়, মাংসের নয়, অস্থির নয়, আত্মারও নয়, জাতি, কেবল ব্যবহারিক-ভাবে (ব্যবহারিক জীবের জন্য) কল্পিত হয় মাত্র। ৮

ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকলকে "আমিই করিতেছি" এই ভাবে আত্মনিষ্ঠরূপে কল্পনা করাই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব। ৯

আত্মাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমান বশতঃ নিত্য, নৈমিত্তিক, যাগ ব্রত তপস্যা দান প্রভৃতিতে যে বন্ধ স্বরূপ জন্মাদির হেতুভূত ফলাভিসন্ধান, তাহাই অকর্ম্ম। ১০

দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম-সাধন, সদ্‌গুরুর উপাসনা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদির দ্বারা দর্শন ও দৃশ্যের যাহা স্বরূপ-তত্ত্ব, যাহা সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজমান, যাহা সর্ব্বসম, যাহা ঘটপটাদি বিকারসমূহের অবিকৃত ভাবে অবস্থিত, সেই একমাত্র চৈতন্যতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নাই এইরূপ অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারই 'জ্ঞান' বলিয়া কথিত হয়। ১১

রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্ব্বময় সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মপদার্থে, দেব, মনুষ্য, তির্য্যগ্ জীব, স্থাবর প্রভৃতি জীব-শ্রেণীগত ভেদ, স্ত্রী, পুরুষ, ইত্যাদি লিঙ্গভেদ, বর্ণ আশ্রম প্রভৃতি অধিকারভেদ, বন্ধ মোক্ষ প্রভৃতি ভাবভেদ ইত্যাদি নানাত্মক ভেদ-জ্ঞানই অজ্ঞান। ১২

সচ্চিদানন্দ-(নিত্যজ্ঞান সুখ) স্বরূপকে জানিয়া আনন্দরূপে অবস্থানই সুখ। অনাত্ম-স্বরূপ বিষয়-সংকল্পই দুঃখ—অর্থাৎ আত্ম-ব্যতিরিক্তরূপে বিষয়ের অনুধ্যানই দুঃখ। ১৩

সৎসংসর্গই স্বর্গ। ১৪

অনিত্যসংসার-বিষয়-জনসংসর্গই নরক।১৫

অনাদি অজ্ঞান-বাসনা-বশে 'আমি জাত' ইত্যাদি মনে করা বন্ধ। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, উদ্যান, ক্ষেত্র প্রভৃতিতে মমতা স্থাপন পূর্ব্বক সংসার-ব্যবহারের সংকল্প বন্ধ। 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাদি অভিমান-সংকল্প বন্ধ। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব এই অষ্টসিদ্ধি লাভের সংকল্পও বন্ধ। দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতির উপাসনা-কামনার সংকল্পও বন্ধ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগের সংকল্পও বন্ধ। বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠানের সংকল্পও বন্ধ। আজ্ঞা, ভয় ও সংশয় ইত্যাদিকে 'আত্মার গুণ' বলিয়া মনে করাও বন্ধ। যাগ, ব্রত, তপ, দান ইত্যাদি বিষয়ক বিধি-বিজ্ঞান হইতে যে সংকল্প উপস্থিত হয়, তাহাও বন্ধ। কেবল-মাত্র মোক্ষের অপেক্ষা করার সংকল্পও বন্ধ। (অধিক কি,) সংকল্প হইতেই বন্ধের আবির্ভাব হয়। (সংকল্প-বিসর্জ্জন দিতে পারিলে বন্ধের বিনাশ ঘটে।) ১৬

নিত্যানিত্যবস্তুবিচার অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য অপর সমস্ত অনিত্য এই ধারণার ফলে অনিত্য-সংসার-সুখ-দুঃখের বিষয় সমূহে মমতাবন্ধন বিনষ্ট হয়, ঐ মমতাবন্ধক্ষয়কেই মোক্ষ বলা যায়। ১৭

বিশ্ব-শরীরে বিরাজমান চিদ্রূপ ব্রহ্মকে যাঁহার কৃপায় পাওয়া যায়, সেই গুরুই উপাস্য। ১৮

বিদ্যা বা জ্ঞান দ্বারা সংসার-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব স্থিরীকৃত হইলে সচ্চিৎ স্বরূপে অবশিষ্ট যে ব্রহ্ম তিনিই শিষ্য। ১৯

সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ ব্রহ্মকে যিনি চিদ্রূপ আত্মস্বরূপে অনুভব করেন, তিনিই বিদ্বান্। ২০

যে ব্যক্তি নিজেকে "কর্ত্তা ভোক্তা" প্রভৃতি মনে করে, সে-ই মূঢ়। ২১

ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ ও শিবপদ প্রভৃতি পাইবার জন্য অনশন, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা যাহারা অন্তরাত্মাকে সন্তাপ দেয়, তাহাদের সেই তীব্র রাগ, দ্বেষ, হিংসা, দম্ভ প্রভৃতি-প্রসূত তপকে 'আসুর' তপ বলা যায়। ২২

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ব্রহ্মাদিপদ-লাভের সংকল্প-বীজকে তপ্ত করার নামই তপ। ২৩

প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের গুণাদির পরবর্ত্তী নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ ভয়শূন্য নিত্য-মুক্ত ব্রহ্মপদই পরমপদ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৪

যাহা দেশকাল প্রভৃতির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, এইরূপ যে চিন্মাত্র তত্ত্ব, তাহাই গ্রাহ্য। ২৫

আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন, মায়িক বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের গোচর এই জগতের সত্যত্ব-চিন্তনই অগ্রাহ্য। ২৬

যে যতি, (সংযতচিত্ত মহাত্মা) সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কারশূন্য ও মমতাবিহীন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণ লইয়া 'তত্ত্বমসি' (সেই তুমি হও) 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (এ সমস্তই ব্রহ্ম) "নেহ

নানাস্তি কিঞ্চন" (এখানে কিছু নানা নাই) ইত্যাদি মহাবাক্যের রহস্য অনুভব করিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধির সাহায্যে স্বতন্ত্র স্বাধীন বা সঙ্গশূন্য হইয়া ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই মুক্ত, তিনিই জ্ঞ, তিনিই যোগী, তিনিই পরমহংস, তিনিই অবধূত, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। এই নিরালম্বোপনিষৎ, গুরুকৃপায় যিনি অধ্যয়ন করিতে পারেন, তিনি অগ্নিপূত হন, বায়ুপূত হন, তিনি পুনরাবর্ত্তন করেন না, তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ২৮

নিরালম্বোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ !

হিন্দু সমাজে সাহাজাতি।*

সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের চরণে—প্রণাম করি। তাঁহার আশীর্ব্বাদে যেন অদ্যকার সভার কার্য্যে সফলতা লাভ করি।

সাহাজাতির উন্নতিকল্পে আপনারা যে সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে সভাপতিপদে বরণ করায়, আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি জানিনা, এই সভার সভাপতির আসন-গ্রহণে আমার কিরূপ উপযোগিতা এবং অধিকার আছে! তবে আপনারা যখন আমাকে মনোনীত করিয়াছেন, তখন আমি এই পদগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি নাই। কারণ, এই সভার উদ্দেশ্য কেবল যে আমার আত্ম-প্রীতিকর তাহা নহে, ইহাতে এই বিপুল সাহাজাতির ভবিষ্যদুন্নতিবীজ নিহিত রহিয়াছে।

বঙ্গদেশে সাহাজাতির লোক-সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যতদূর আমার স্মরণ হয়, সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে সাহাজাতির লোক-সংখ্যা ছয় লক্ষেরও অধিক এবং এই যশোহর জেলায়ই তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশসহস্র।

আপনারা স্বজাতির উন্নতির জন্য যদি সমবেত ভাবে চেষ্টা করেন, তবে উহা যে কেন নিষ্ফল হইবে, তাহা বলিতে পারিনা। সমগ্র ভারতবর্ষে পারসীকজাতি, এক লক্ষেরও কম, কিন্তু তেত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও পরোপকার-বৃত্তি দ্বারা তাঁহারা নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গণ্য, মান্য ও পূজার্হ হইতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই বিরাট্ হিন্দুসমাজ-দেহ বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। সাহাজাতিও অন্যান্য জাতির ন্যায় এই সমাজ-দেহের একটী অঙ্গ। দেহ সুস্থ রাখিতে গেলে, যেমন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, সমাজ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। দেহের কোনও অঙ্গে যদি একটী সামান্য বিস্ফোটক হয়, তবে সমস্ত দেহই সেই যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়; কিন্তু অন্যান্য অঙ্গের এই যন্ত্রণাবোধের মূলে মস্তিষ্কে অবাধ অবিকৃত ক্রিয়ার আবশ্যক। মস্তিষ্ক বিকৃত

---

* পুরুলিয়া সাহাসমিতিতে সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি বাহাদুরের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ হইতে সঙ্কলিত।

হইলে এক অঙ্গের বেদনা, অন্য অঙ্গের অনুভবে আসেনা। মস্তিষ্কই সমগ্র দেহের নিয়ন্তা বা নেতা। মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং অপর অপর অঙ্গের কার্য্যের সহায়তা করে ও তাহাদের অসুবিধা দূর করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না থাকিলে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরা পরস্পরের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতে পারেনা। দেহ তখন সম্রাট্শূন্য হয়। সমাজদেহে যখন সম্রাটের অভাব হয়, তখনই সামাজিক অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাজকতা উপস্থিত হইলে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, পরস্পরের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া কেবল স্বীয় স্বীয় স্বার্থের পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং অচিরে সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরার্থে উদাসীন ব্যক্তি বা সমাজ, কখনও স্বীয় স্বার্থ-সংরক্ষণে সমর্থ হয় না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে রাজাই ধর্ম্ম—সমাজ সকলেরই কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজা, ধর্ম্ম ও সমাজের রাজা নহেন। তিনি বিদেশীয় ও অন্য-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রকৃতিবর্গের সামাজিক আচার-ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। হিন্দু-সমাজের অধিপতি যখন হিন্দু রাজা ছিলেন, তখন সমাজের কোনও বিভাগের কোনও অসুবিধা উপস্থিত হইলে রাজা, মস্তিষ্কের ন্যায় অন্যান্য বিভাগকে উদ্বোধিত করিতেন, সকলের সমবেত-চেষ্টায় সেই অসুবিধা দূরীকৃত হইত। হিন্দু রাজা না থাকাতে সে সুবিধাটি আর নাই। বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী রাজাকে আমরা সমাজের অধিনেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অসম্মত, রাজাও ঐ পদ-গ্রহণে অনিচ্ছুক। অনেকে মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ঐ পদ গ্রহণ করিয়া সমাজের অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিতে পারেন, কিন্তু ইঁহারা ভাবেন না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের একার্য্য সম্পন্ন করিবার শক্তি কোথায়? আজ যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কোনও ব্যবস্থা প্রচার করেন, কেহ সেই ব্যবস্থায় অবজ্ঞা করিলে, তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা কোথা হইতে হইবে? ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য দণ্ডের বিধান আবশ্যক। দণ্ডের অভাব হইলে কোনও নূতন ব্যবস্থাই প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছাড়িয়া দিলে সমাজে এমন কোন্ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় আছে—যাহার আদেশ সকলে মানিতে বাধ্য?

তবে কি হিন্দুসমাজের কোনও আশা নাই? চিরকালই কি হিন্দুসমাজে এইরূপ অরাজকতা থাকিবে? প্রকৃতির নিয়মই এই যে, যেখানে রোগ দৃষ্ট হয়, সেখানে রোগনাশক ঔষধও দৃষ্ট হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, হিন্দুসমাজ-দেহ যে রোগে এখন অভিভূত, সেই রোগের ঔষধও অতি সত্বরই আবিষ্কৃত হইবে। রোগের ঔষধ—ঐশীশক্তিসম্পন্ন কোনও মহাপুরুষ, যিনি আবির্ভূত হইয়া হিন্দুসমাজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিরক্ষণের ভার গ্রহণ করিবেন।

যে পর্য্যন্ত সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব

না হইবে, ততদিন হিন্দুসমাজের সমবেত-চেষ্টা সম্ভাবপর নহে। কিন্তু ততদিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির স্বীয় স্বীয় ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা আত্মসংরক্ষণের উপায় অবলম্বন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

একটী বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখুন্। এ দেশে থাকিয়া বহুব্যক্তি অখাদ্য ভক্ষণ করা সত্ত্বেও সমাজচ্যুত হইতেছেন না। কিন্তু কেহ যদি নিরামিষাশী হইয়াও বিলাত গমন করেন, তবে তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল বা আফ্রিকাখণ্ডে গেলেও সমাজচ্যুত হইতে হয় না, কিন্তু ইউরোপখণ্ডে গমন করিলেই সমাজচ্যুত হইতে হয়! যে সমুদয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিলাত-গমনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহারাও কতক পরিমাণে সমাজে গ্লানিভোগ করিতেছেন। সুতরাং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কেবল কতকগুলি "কাষ্টম্" বা দেশাচার দ্বারা শাসিত। এই দেশাচার-পরিবর্ত্তনের সামর্থ্য কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বর্ত্তমানে দেখা যায় না। যাঁহারা এই দেশাচারের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করেন, তাঁহারা একটী উপসমাজে বা শ্রেণীতে পরিণত হন। নববিধি-প্রবর্ত্তক-দিগের হস্তে দণ্ডের ক্ষমতা না থাকিলে সে বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর।

আপনাদের যে সমাজ, এ সমাজে অনেক ধনবান্, বিদ্বান্ ও পরোপকারী ব্যক্তি আছেন। আপনাদের মধ্যে কেহ কোটিপতি না থাকুন, অনেক লক্ষপতির সংবাদ আমি জানি। আপনাদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র, তাহারাও শান্ত সুশীল ও সদাচার-সম্পন্ন। ইহা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণেরা আপনাদের জল-গ্রহণ করেন না, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। আজ যদি বঙ্গের সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বলেন যে, আপনাদের জল গ্রহণে কোন বাধা নাই, তাহা হইলেই কি সমগ্র হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সেই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া আপনাদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে? আমার ত বোধ হয়, এরূপ আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ যদি বঙ্গের সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা সৎশূদ্র বলিয়া পাঁতি দেন, তাহা হইলে কি আপনাদের জল, সমাজে গ্রহণীয় হইবে? বিগত অভিজ্ঞতা, "না" শব্দের দ্বারাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ, সাহা জাতিকে বৈশ্য-জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পাঁতি দেওয়া সত্ত্বেও সাহা জাতি, আজিও অনাচরণীয় জাতির মধ্যে পরিগণিত।

একথা বলা যায় না যে, যে সমুদয় উচ্চবর্ণ আপনাদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ করেন না, তাঁহারা বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়াই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। হিন্দুসমাজের উচ্চ—নিম্ন সমস্ত জাতিই দেশাচারের অধীন। এই দেশাচারই সমস্ত সমাজের হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। জলৌকা যেমন শরীরের রক্ত শোষণ করে, দেশাচারও তদ্রূপ হিন্দুসমাজের জীবনী-শক্তি লুপ্তপ্রায় করিয়াছে। উচ্চ জাতিরাও তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় সমাজের অসুবিধা

উহাতে সংগত হইয়াছে, কারণ ইন্দ্রিয়-নানাত্বের সিদ্ধি হইলেই তদ্ভিন্ন প্রকৃত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্বের সিদ্ধি হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে মহর্ষিসূত্রের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "যে পদার্থ-সিদ্ধি ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না—সেই পূর্ব্বোক্ত পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত"। আবার "কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না" এই শেষ—ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে তিনি প্রখ্যাত প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের বৌদ্ধাধিকার—(আত্মতত্ত্ব-বিবেক) গ্রন্থের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার স্বব্যাখ্যা-সমর্থনের জন্য সেস্থানের দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখন সেই কথা গুলি বলিব। উদয়নাচার্য্য তাঁহার আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে বৌদ্ধদার্শনিকদিগের ক্ষণভঙ্গবাদনিরাস প্রস্তাবে, প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঘট-পটাদির স্থূলত্ব সিদ্ধি করিয়াই বলিয়াছেন "সোঽয়মধিকরণসিদ্ধান্ত-ন্যায়েন স্থূলত্ব-সিদ্ধৌ ক্ষণভঙ্গভঙ্গঃ"। বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ, বস্তু মাত্রকেই ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং"। এই ক্ষণিক বলিতে একমাত্রক্ষণস্থায়ী।

বস্তু যেক্ষণে উৎপন্ন হয় কেবল সেই ক্ষণমাত্রেই তাহার স্থিতি, তাহার পরক্ষণেই বস্তুর বিনাশ হয়; সেই নাশক্ষণেই আবার তজ্জাতীয় অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়; তাই ঐ প্রতিক্ষণোৎপন্ন বস্তুবিনাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিনা। ঘটী—যন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর বস্তু মাত্রেই এই উৎপত্তি-বিনাশ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। ইহারই নাম ক্ষণভঙ্গ-বাদ। এখানে ভঙ্গ শব্দের অর্থ নাশ। "ক্ষণভঙ্গ" অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই বস্তুর নাশ। দার্শনিক ভাষায় ক্ষণভঙ্গের অর্থ "ক্ষণিকত্ব"। উদয়নের "ক্ষণভঙ্গভঙ্গ" কথার অর্থ ক্ষণি-কত্বের অভাব। তিনি বলিয়াছেন বস্তুমাত্রই ঐরূপ "ক্ষণিক" হইতে পারেনা। বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে তখন জন্য-বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে। প্রতিক্ষণেই বস্তুর বিনাশের সামগ্রী ঘটিতে পারেনা। সুতরাং ঘট-পটাদি বস্তুর ক্ষণিকত্বাভাব বা স্থিরত্বই সিদ্ধান্ত। এই ক্ষণভঙ্গভঙ্গ বা স্থিরত্বকে উদয়নাচার্য্য "অধিকরণ সিদ্ধান্ত" বলিয়াছেন। কেননা ঐ স্থিরত্ব সিদ্ধান্তকে আশ্রয় না করিলে ঘট-ঘটাদি বস্তুতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা। ঘট-ঘটাদি বস্তুতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ সকলেই করিতেছেন, ঐ সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষকে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারেনা। ঘট-ঘটাদি বস্তু ঐরূপ "ক্ষণিক" হইলে তাহাতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ একেবারেই সম্ভব হয় না। কারণ যে ঘটে আমি স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ করিব, তাহাতে আমার চক্ষুঃসংযোগ চাই। সেই ঘট উৎপন্ন হইলে পরে তাহাতে আমার চক্ষুঃসংযোগ হইতে পারে। তাহার পূর্ব্বে বা তাহার উৎপত্তিক্ষণে তাহাতে আমার চক্ষুঃসংযোগ কখনই হইতে পারেনা। কারণ ঐঘট-চক্ষুঃসংযোগে ঘট কারণ। আবার চক্ষুঃ-সংযোগ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কারণ। ঐ সব কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থগুলি কখনই একক্ষণে হইতে পারেনা। কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকিলে তাহা কারণই হয় না। তাহা হইলে দেখুন, ঐ ঘটে স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ করিতে

অন্ততঃ ঐ ঘটের ত্রিক্ষণস্থায়িত্ব চাই। প্রথম ঘট উৎপন্ন হইবে, পরক্ষণে তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ হইবে, তাহার পরক্ষণে ঘটে স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ হইবে। একঘটে চক্ষুঃসংযোগ স্বীকার করিলেও তাহার দ্বারা অন্য ঘটের স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা। চক্ষুঃসংযোগের পরক্ষণে "ক্ষণিক" বলিয়া সে ঘট থাকিবে না, সুতরাং সে ঘটে স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অতএব ঘটের ক্ষণিকত্ব কখনই স্বীকার করা যায় না। ঘটাদি বস্তুর স্থিরত্বই সিদ্ধান্ত। এই স্থিরত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে ঘটাদি বস্তুতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। এমন কি তাহা হইলে ঘটাদিতে ঐ স্থূলত্ব কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না। কেননা অনুমান করিতে হইলেও লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব হেতু করিয়া স্থূলত্বের অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষণিক পদার্থে পূর্ব্বোক্ত-যুক্তিতে সেই প্রত্যক্ষই অসম্ভব। ফলতঃ বৌদ্ধদার্শনিকগণ "ক্ষণভঙ্গ-ভঙ্গ" অর্থাৎ হিন্দুদার্শনিকদিগের "স্থিরত্ব-সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন প্রমাণেই ঘটঘটাদির স্থূলত্ব-সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না—ইহাই উদয়নাচার্য্যের মনের ভাব।

উদয়নাচার্য্যের ঐ গ্রন্থ ব্যাখ্যায় দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়বার্ত্তিকের পাঠ লিখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকর লিখিয়াছেন "তত্রচ বাক্যার্থসিদ্ধৌ তদনুষঙ্গী যোঽসঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ" ইহার অর্থ বুঝা যায় যে বাক্যার্থসিদ্ধি হইলে তাহার আনুষঙ্গিক যাহা যাহা সিদ্ধ হইবে তাহারা অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। রঘুনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "যেন কেনাপি প্রমাণেন বাক্যার্থসিদ্ধৌ যোঽন্যার্থঃ সিধ্যতি স তথা।" অর্থাৎ বার্ত্তিকের "বাক্যার্থ-সিদ্ধৌ" এইকথার অর্থ তিনি বলিয়াছেন "যে কোন প্রমাণে বাক্যার্থসিদ্ধি হইলে"। তাৎপর্য্যটীকাকার "বাক্যার্থ" কথার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, রঘুনাথ তাহা উপলক্ষণ অর্থাৎ একটা প্রদর্শন মাত্র—বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন প্রমাণের দ্বারা বাক্যার্থসিদ্ধি হইলে তদ্ভিন্ন যে পদার্থ সিদ্ধ হইবে, তাহাই অধিকরণ সিদ্ধান্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, উদয়নের পাঠ ও রঘুনাথের ব্যাখ্যা দেখিয়া শেষে ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ-সিদ্ধি ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না, তাহাই "অধিকরণ-সিদ্ধান্ত"। আমরাও নব্যন্যায়ের যুগে এই নবীনের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিলাম। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, নবদ্বীপের চূড়া কাণভট্ট রঘুনাথেরও পরবর্ত্তী—এবং তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া পণ্ডিত, সুতরাং তাহার প্রতি আমাদের পক্ষপাত স্বাভাবিক। তবে অনেক স্থানে আমরা প্রাচীন উদ্যোতকর ও টীকাকার মিশ্র মহোদয়ের শ্রীচরণে শরণ লইয়াছি। সূক্ষ্মদর্শী প্রশ্ন করিবেন, এখানে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় তাঁহার উদাহৃত ইন্দ্রিয়নানাত্ব "অধিকরণ-সিদ্ধান্ত" হয় কৈ?

ইন্দ্রিয়নানাত্ব সকল মতেই অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতমের প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে ("দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থ-গ্রহণাৎ") আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব-সিদ্ধিতে ইন্দ্রিয়নানাত্ব সিদ্ধান্ত আবশ্যক বটে; ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব না থাকিলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় একমাত্র হইলে তাঁহার ঐ যুক্তি খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়-নানাত্ব

ব্যতীত কোন প্রমাণেই আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা বিশ্বনাথ কি করিয়া বলিলেন? মহর্ষি গোতমের ঐ অনুমান ভিন্ন আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব বিষয়ে আর কি কোনই প্রমাণ নাই? শ্রুতি ও কি আত্মার ঐ তত্ত্ব কথায় নীরব? তাহা বলিতে পারিনা। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু"। "ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সুব্যক্ত রহিয়াছে, এবং অন্য শ্রুতিতেও "আত্মা ইন্দ্রিয় নহে" এ তত্ত্বের ঘোষণা আছে। সূক্ষ্মদর্শীর প্রশ্নের উত্তরে বৃত্তিকারের ঐ গ্রন্থ-সন্দর্ভের কল্পিত ব্যাখ্যাভেদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। বৃত্তিকারের পক্ষ-সমর্থন করিতে আমি এখন বলিতে চাই যে, ইন্দ্রিয়নানাত্ব ব্যতীত আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না ইহা বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন এবং তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া "ইন্দ্রিয়নানাত্ব"কে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত বলিতে কিছু মাত্র সংকুচিত হন নাই।

বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্রুতির কল্পনা গুলি যুক্তি-মূলক। ইন্দ্রিয়নানাত্ব ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত নহে। অন্য প্রমাণে ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব সিদ্ধই আছে। শ্রুতি "ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ" বলিয়া বহুবচনের দ্বারা সেই সিদ্ধ নানাত্বেরই প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গুলি শরীরকে বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অসংযত মনঃ ইন্দ্রিয়ের ঐ আকর্ষণে প্রতিপদে প্রধান সহায়। সংযত মনঃ ঐ আকর্ষণে বাধা দেয়। ইহাই ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত বা প্রতিপাদ্য। তাই শ্রুতি, শরীরকে রথরূপে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ঐ শরীর-রথের আকর্ষক অশ্বরূপে, এবং মনকে তাহার প্রগ্রহরূপে কল্পনা করিয়াছেন। মূলকথা এখানে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের ঐ স্বরূপই প্রকৃত বা প্রস্তুত। আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন না হইলে শ্রুতি ইন্দ্রিয়ের ঐ স্বরূপ অর্থাৎ শরীররথে অশ্বরূপতা বলিতে পারিতেন না। সুতরাং আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব মহর্ষির সূত্রানুসারে ("যৎসিদ্ধাবন্যপ্রকরণ-সিদ্ধিঃ") ঐ শ্রুতিতেও অধিকরণ-সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিপাদিত। কারণ আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব-সিদ্ধি ব্যতীত শ্রুতিও তাঁহার ঐ প্রকৃত সিদ্ধ করিতে পারেন না। আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব যুক্তির দ্বারা অর্থাৎ গোতমোক্ত অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ আছে। তাহাতে আবার ইন্দ্রিয়নানাত্ব সিদ্ধান্ত আবশ্যক, কারণ ইন্দ্রিয়নানাত্ব সিদ্ধান্ত ব্যতীত ঐরূপ অনুমানে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধান্তে ইন্দ্রিয়নানাত্ব অধিকরণসিদ্ধান্ত। ফলতঃ আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব সাক্ষাৎ শ্রুতি-সিদ্ধ নহে। উহা যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়াই শ্রুতির সিদ্ধান্তরূপে নিশ্চিত। যুক্তির দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব বুঝিতে হইলে তাহাতে ইন্দ্রিয়নানাত্ব-সিদ্ধি চাই। তাই ইন্দ্রিয়নানাত্ব অধিকরণসিদ্ধান্ত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। বলিতে পারেন, শ্রুতিতে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত রহিয়াছে। উহা যুক্তিনিরপেক্ষ শব্দ-প্রমাণেই নিশ্চিত। সুতরাং উহার সিদ্ধিতে ইন্দ্রিয়নানাত্ব-সিদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই। একথায় বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতির দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হয় না। কারণ শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়াত্মবাদেরও আভাস

আছে। "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ব্রূয়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুতি পাঠ করিয়া কোন চার্ব্বাকবিশেষ, ইন্দ্রিয়ই আত্মা—ইহা বেদ-সিদ্ধান্ত বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় না থাকিলে শরীর চলেনা। আমি কাণ, আমি বধির, এইরূপ অনুভবও চিরসিদ্ধ, সুতরাং ইন্দ্রিয়ই আত্মা। শ্রুতির সহিত উক্ত যুক্তির উপন্যাস করিয়া কোন চার্ব্বাক ইন্দ্রিয়াত্মবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন এখন শাস্ত্রার্থ-সন্দেহে শাস্ত্রাবিরুদ্ধ যুক্তিই আশ্রয়ণীয়া। ঐ যুক্তির দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হওয়ায়, আত্মা ইন্দ্রিয়-ভিন্ন, ইহাই বেদার্থ বলিয় নিশ্চয় করা যাইতেছে। বস্তুতঃ এইরূপ অনেক স্থানেই বেদার্থ নির্ণয় করিতে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বেদে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের আভাস যেখানে আছে, সেসব স্থানেই যুক্তির দ্বারা তাৎপর্য্যনির্ণয় করিতে হয়। বেদে আত্মাকে কোন স্থানে দেহ, কোন স্থানে প্রাণ, কোন স্থানে ইন্দ্রিয়, কোন স্থানে মন বলা হইয়াছে। আবার ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও বলা হইয়াছে। এখন যুক্তির সাহায্যে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নচেৎ বেদ হইতে তত্ত্বনির্ণয়ের আশা নাই। যুক্তির দ্বারা, আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বেদে ঐ ভাবে আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা বলা হইয়াছে, উহা স্থূলারুন্ধতী-ন্যায়ে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অরুন্ধতী-প্রদর্শন স্থলে যেমন একেবারে প্রথমতঃই উহার প্রদর্শন অসম্ভব-বোধে প্রথমে এক একটী অন্য তারা দেখান হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব নিরাকরণ দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর উপদেশ করাই বেদের তাৎপর্য্য। মূল কথা, আত্মা ইন্দ্রিয়ভিন্ন—এসিদ্ধান্ত প্রথমতঃ যুক্তির দ্বারা না বুঝিতে পারিলে বেদ-প্রমাণের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্তের নিশ্চয় করা যায় না। যদি আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব, যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে মহর্ষি গোতমের প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত যুক্তি (অনুমান) অথবা ঐরূপ অন্য যুক্তি আবশ্যক হইবেই। তাহার দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধি করিতে ইন্দ্রিয়নানাত্বসিদ্ধিও আবশ্যক হইবে। তাই ইন্দ্রিয়নানাত্বসিদ্ধি ব্যতীত আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না—বুঝিয়া, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, ঐরূপ ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়নানাত্বকে অধিকরণসিদ্ধান্ত রূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়নানাত্ব, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি সকলের মতেই অধিকরণসিদ্ধান্ত। তবে ভাষ্যকার বলিয়াছেন "আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব-সিদ্ধিতে যাহা যাহা আনুষঙ্গিক অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সে গুলি সবই অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব, ইন্দ্রিয়ের নিয়তবিষয়ত্ব, জ্ঞানসাধনত্ব প্রভৃতি সবই ঐ স্থানে অধিকরণ সিদ্ধান্ত; কারণ ঐ সব গুলি ব্যতীত আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না" বৃত্তিকার সংক্ষেপে এক ইন্দ্রিয়-নানাত্বের কথাই বলিয়াছেন। এখানেও সর্ব্বতন্ত্র ও প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্তের ন্যায় মহর্ষি, নিশ্চিত শাস্ত্রার্থকেই অধিকরণ-সিদ্ধান্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রার্থনিশ্চয়কে অধি-করণসিদ্ধান্ত বলেন নাই। সুধী পাঠক-গণ এবিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

ভূষণ তর্কবাগীশ।

শিবাষ্টক।

(শঙ্করকৃত)

(১)

তুমি প্রভু! ঈশ, তুমি হে অনীশ
মহিমার নাহি পার,
তুমি নির্গুণ, গুণময় পুন,
আভরণ ফণী-হার।
অতি দুর্জ্জয় দৈত্যনিচয়
পরাজিলে রণ করি;
মঙ্গলভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

(২)

গিরি রাজ-সুতা বামতনু-যুতা,
মরি কি মাধুরী তায়—
রজত-ভূধর জিনি' কলেবর,
হেরিতে নয়ন ধায়।
অন্তর-তল কর নির্ম্মল
পঙ্কিল পাপ হরি;
মঙ্গল-ভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

(৩)

তব শির' পরে চন্দ্র বিহরে,
রজত-কিরণ ঝরে;
কটি-তটে ভাল দোলে গজ-ছাল
মন্থর গতি-ভরে।
পিঙ্গল জট করে লটপট
গঙ্গা-লহরে মরি!
মি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

(৪)

শুভ্র বৃষভ ভবন-বিভব,
আদি গুরু অবনীর;
বিভূতি-ভূষিত তব তনু সিত,
বিষপানে রক্ত ধরী!
ত্রিশূল বিষাণ, পিনাক মহান্,
বরাভয় করে ধরি';
মঙ্গল-ভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

(৫)

ও চারু বদন ধরে ত্রিনয়ন
উজ্জ্বল কিরণময়,
আনন-কমলে নিয়ত নিকলে
কোটি-ভানু-করচয়।
চন্দ্রিকা জালে মণ্ডিত ভালে
উথলে আলোক মরি!
মঙ্গল-ভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

(৬)

মত্ত বারণ- মকর-কেতন-
গরব হরণ কর;
করির চরম বিলাস-করম,
পরম পুরুষবর।
লটপট দোলে হাড়-মালা গলে,
সমাধি-মগন মরি!
মঙ্গল-ভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

(৭)

তুমি প্রমথেশ ওহে হৃদয়েশ!
ভকত-চিত্ত-হর,
শক্তি-যুগল চরণ কমল
মধু রত মধুকর।

যে ভজে তোমারে ভব-ভয় তারে
বাঁধিতে না পারে মরি !
মঙ্গল-ভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

(৮)

বিশ্ব উদয় -পালন বিলয়
লীলা তব লীলাময় !
ত্রিগুণ কারণ কর তা' সাধন,
তুমি হে করুণালয়।
সাধুর আলয় তোমার হৃদয়,
প্রাণপ্রিয় তব হরি ;
মঙ্গল-ভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

রায় চৌধুরী এম্. এ বি, এল্।

হিন্দুর আধুনিক কর্ম্ম।

প্রথম প্রস্তাব।

কোন পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন,—

"I slept and dreamt that life was beauty.
I woke and found that life was duty."

আমি এতদিন মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, জীবন যেন একটা সৌন্দর্য্যময়, বিলাসিতার সুখ-সাগরে নিমজ্জিত, যেন, জীবনে কোন কর্ম্ম নাই, কোন কর্ত্তব্য নাই—জীবন কেবল সুখ-পূর্ণ। এখন আমি জাগিয়াছি, আমার মোহনিদ্রা বিবেকের তীব্র-মধুর তিরস্কারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; এখন আমি দেখিতেছি জীবন—কর্ত্তব্যপূর্ণ।

আমারাও তদ্রূপ এতদিন মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, এখন জাগিয়াছি, এখন দেখিতেছি, কর্ত্তব্যের গুরুভারে আমাদের জীবনতরী ডুবু ডুবু। এই কর্ত্তব্যই "কর্ম্ম" নামে অভিহিত এবং ইহা প্রতিপালন করাই আমাদের ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য একার্থবোধক, অতএব আমি ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যকে "কর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াই আমার হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই কর্ম্ম অনাদি অনন্ত এবং অসীম। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর-সমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

কোন দর্শনকার বলেন "কর্ম্মই ব্রহ্ম"। যাহা হউক, কর্ম্ম যদি ব্রহ্ম হয়, কর্ম্মে যদি ঈশ্বর সত্তাই বর্ত্তমান থাকেন, অথবা কর্ম্মের যদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ দেখি, আমরা কতদিন,—কত যুগ যুগান্তর, কত শতাব্দী হইতে এই ঈশ্বরের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত ! কতকাল আমরা কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অধর্ম্মের কুটিল পথে ভ্রমণ করিতেছি ! কতকাল আমরা জীবন থাকিতেও জীবন্মৃতাবস্থায় জীবিত ! তাই বলিতেছিলাম, এখন জাগিয়াছি—এখন দেখিতেছি, কর্ত্তব্যের গুরুভারে আমাদের জীবন-তরী ডুবু ডুবু।

যখন বৌদ্ধধর্ম্মের কৃষ্ণমেঘে হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাচ্ছন্ন, যখন ধর্ম্মের উদ্ধার—আশা বিলুপ্তপ্রায়, যখন সমস্ত হিন্দু নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরপর অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, তখন ধর্ম্ম অনাদৃত হইয়া আর এক মহাত্মার আশ্রিত হইল, সে

মহাপুরুষ—শঙ্করাচার্য্য। যাঁহার জ্ঞানের জ্যোতিতে বৌদ্ধমেঘ কাটিল, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার সাধিত হইল। আমাদের অতীত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কথার আলোচনা করিলে এইরূপ কর্ম্মিদিগের শত সহস্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, যে দেশের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ কর্ম্মিদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, যে জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ আজীবন স্বীয় কর্ম্ম, সযত্নে সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছেন, সেই দেশের অধিবাসিগণ—সেই জাতির বংশধরগণ আজ কর্ম্মের লক্ষণ পর্য্যন্তও বিদিত নহে। তাই, আজ যদি প্রত্যেক সন্তানের কোমল হৃদয়ে স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-চিন্তা অল্প অল্প প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে আশা করা যায়, যখন কর্ম্মবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছে তখন কালে ঐ কর্ম্মবৃক্ষে মুক্তিফল এক দিন না এক দিন ফলিবেই ফলিবে।

কর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন পাশ্চাত্য কর্ম্মী বলিয়াছেন,—"The greatest happiness in life to consist the performance of duties." কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই জীবনে মহৎ সুখ। কর্ম্মকে একবার আপনার বলিয়া ডাকিলে, সে আমাদিগকে হাত বাড়াইয়া ক্রোড়ে টানিয়া লইবে। ফলে, কর্ম্মকে আমরা যত কঠিন বিবেচনা করি, তত কঠিন নহে—কর্ম্ম সহজসাধ্য। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন,—

"ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ"॥

ইজ্যা—যজ্ঞাদি, অধ্যয়ন—বেদপাঠাদি, দান, তপঃ—ব্রতোপবাসাদি, সত্য—সত্যবাদিতা, ধৃতি—ধৈর্য্য, ক্ষমা এবং অলোভ এইগুলিই ধর্ম্ম বা কর্ম্মের মার্গ। সুতরাং এইগুলির অনুষ্ঠান করিলেই সম্যক্ ধর্ম্ম বা কর্ম্ম করা হইবে। এই ইজ্যা অর্থে যজ্ঞ। যজ্ঞের প্রকাশক বেদ। সুতরাং বেদকে বুঝিতে পারিলেই যজ্ঞের মর্ম্ম বোঝা যাইবে। মীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি বলেন, বেদ নিত্য, অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় এবং বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে এই দেখিতে পাই, বেদ—শব্দময় আবার শব্দ—নিত্য, ব্রহ্ম। সুতরাং বেদও ব্রহ্ম এবং নিত্য। যাহা হউক, বেদ দ্বারা যজ্ঞ বুঝিতে যাওয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞানসাপেক্ষ। তবে সাধারণ-বুদ্ধিতে এই দেখিতে পাই, বেদ জীবের হিতার্থে ধর্ম্মের বা কর্ম্মের প্রতিপাদন করেন। বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ, এই পঞ্চপ্রকার বেদদ্বারা যজ্ঞের বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, তৎসংসৃষ্ট নিষেধ ও অর্থবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন, বিধিবেদ বলেন—"স্বর্গকামো যজেত"। স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। মন্ত্রভাগে—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি মন্ত্র গ্রথিত হইয়াছে। নামধেয়ে—অগ্নিহোত্র, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞনামের পরিচয় লিপীবদ্ধ হইয়াছে। নিষেধভাগে—"মা দিবা স্বাপ্সীঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মচারীর পক্ষে দিবাভাগে নিদ্রা নিষিদ্ধ হইল। অর্থবাদ—"আদিত্যো যূপঃ" এই বাক্য; সূর্য্য কখন যূপ হইতে পারে না সুতরাং অর্থবাদে ইহাই বলিতেছে যে, সূর্য্য যূপের মত উজ্জ্বল। নিত্য বেদ এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া যজ্ঞের সরল পথ আবিষ্কার করিয়াছে। এখন আমরা বেদ দ্বারা যজ্ঞের

এই অর্থ বুঝিতে পারি যে, উক্ত পঞ্চ প্রকার বেদোক্ত বিধি-ভাগের বিধানানুসারে, মন্ত্র-ভাগের মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, অর্থবাদ মন্ত্রের মর্ম্মানুভব করিয়া, নিষেধোক্ত নিষেধ মানিয়া দেবোদ্দেশে দ্রব্য অর্পণ করাই নামধেয়-বেদোক্ত অশ্বমেধাদি নামক যজ্ঞ।

আবার আর এক দিকে দেখিতে পাই শঙ্করাচার্য্য শ্রুতির প্রমাণে "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" যজ্ঞই বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবান্ স্থির করিয়াছেন এবং গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

ইহা দ্বারাও এই প্রমাণীকৃত হয় যে যজ্ঞ ব্রহ্মময় অর্থাৎ যজ্ঞই ব্রহ্ম। সুতরাং ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রুতির বিধানানুসারে ভগবৎ প্রীত্যর্থে আমরা যাহা কিছু করি, তৎ সমস্তই যজ্ঞ এবং তদ্ ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কর্ম্ম সংসারের বন্ধন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"

আবার অন্য স্থলে আমরা দেখিতে পাই উত্তরমীমাংসায় জ্ঞানবাদিরা বলেন,—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" অমরত্ব-লাভের উপায় কর্ম্ম নহে, সন্তান নহে, ধন নহে; কেবল ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক যজ্ঞের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, যজ্ঞের মূল—ত্যাগ। ভগবানে আত্মত্যাগ না করিলে অমরত্ব বা সিদ্ধি লাভ করা যায় না। যজ্ঞের অপর নাম যাগ। দর্শনকার বিচার নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"মন্ত্রময়ো দেবতোদ্দেশ্যকদ্রব্যত্যাগো যাগঃ"। ইহা দ্বারাও এই প্রমাণীকৃত হয় যে যজ্ঞ—ত্যাগাত্মক। যাহা হউক্, যজ্ঞ যদি ত্যাগাত্মক হয়, তাহা হইলে বেদোক্ত যজ্ঞের অগ্নি, হবি স্রুক্ স্রুবাদির দরকার হয় না। "যাহা কিছু করি তৎ সমস্তই ভগবানের, আমার কিছুই নহে" এই বিশ্বাসকে মনে স্থান দিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ সহকারে কর্ম্ম করিলেই প্রকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

"ঋষি-যজ্ঞং দেব-যজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বথা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপযেৎ॥"

ঋষিযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ—হোমাদি, ভূতযজ্ঞ—ভূতবলি, নৃযজ্ঞ—অতিথি-সৎকারাদি, পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধাদি। এই পঞ্চ প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া মনু যজ্ঞের ক্রম এবং সরল পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি, এই যজ্ঞ সহকারেই মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট-কামধুক্॥"

তাই সাগ্নিক আর্য্য ঋষিগণ নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। আজ কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে সাগ্নিকতা নাই। সে যাগোপকরণের সম্পূর্ণ অভাব। সে জ্ঞান নাই, হৃদয়ে সে দীপ্ত ধর্ম্ম-ভাব নাই সুতরাং যজ্ঞের সত্তাও লুপ্তপ্রায়। এই নবযুগে পতিত যজ্ঞের উদ্ধার সাধন করিতে যে কত কাল গত হইবে—কে বলিতে পারে, অথবা উদ্ধার সাধিত হইবে কিনা তাহাই

উহাতে সংগত হইয়াছে, কারণ ইন্দ্রিয়নানাত্বের সিদ্ধি হইলেই তদ্ভিন্ন প্রকৃত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্বের সিদ্ধি হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে মহর্ষিসূত্রের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "যে পদার্থসিদ্ধি ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না—সেই পূর্ব্বোক্ত পদার্থই অধি- । আবার "কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না" এই শেষ—ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে তিনি প্রখ্যাত প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের বৌদ্ধাধিকার—(আত্মতত্ত্ববিবেক) গ্রন্থের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার স্বব্যাখ্যা-সমর্থনের জন্য সেস্থানের দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখন সেই কথা গুলি বলিব। উদয়নাচার্য্য তাঁহার আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে বৌদ্ধদার্শনিকদিগের ক্ষণভঙ্গবাদনিরাস প্রস্তাবে, প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঘট-পটাদির স্থূলত্ব সিদ্ধি করিয়াই বলিয়াছেন "সোঽয়মধিকরণসিদ্ধান্তন্যায়েন স্থূলত্ব-সিদ্ধৌ ক্ষণভঙ্গভঙ্গঃ"। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ, বস্তু মাত্রকেই ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং"। এই ক্ষণিক বলিতে একমাত্রক্ষণস্থায়ী।

বস্তু যেক্ষণে উৎপন্ন হয় কেবল সেই ক্ষণমাত্রই তাহার স্থিতি, তাহার পরক্ষণেই বস্তুর বিনাশ হয়; সেই নাশক্ষণেই আবার তজ্জাতীয় অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়; তাই ঐ প্রতিক্ষণোৎপন্ন বস্তুবিনাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিনা। ঘটী—যন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর বস্তু মাত্রেই এই উৎপত্তি-বিনাশ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। ইহারই নাম ক্ষণভঙ্গবাদ। এখানে ভঙ্গ শব্দের অর্থ নাশ। "ক্ষণভঙ্গ" অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই বস্তুর নাশ। দার্শনিক ভাষায় ক্ষণভঙ্গের অর্থ "ক্ষণিকত্ব"। উদয়নের "ক্ষণভঙ্গভঙ্গ" কথার অর্থ ক্ষণিকত্বের অভাব। তিনি বলিয়াছেন বস্তুমাত্রই ঐরূপ "ক্ষণিক" হইতে পারেনা। বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে তখন জন্য বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে। প্রতিক্ষণেই বস্তুর বিনাশের সামগ্রী ঘটিতে পারেনা। সুতরাং ঘট পটাদি বস্তুর ক্ষণিকত্বাভাব বা স্থিরত্বই সিদ্ধান্ত। এই ক্ষণভঙ্গভঙ্গ বা স্থিরত্বকে উদয়নাচার্য্য "অধিকরণ সিদ্ধান্ত" বলিয়াছেন। কেননা ঐ স্থিরত্ব সিদ্ধান্তকে আশ্রয় না করিলে ঘট-ঘটাদি বস্তুতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা। ঘট-ঘটাদি বস্তুতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ সকলেই করিতেছেন, ঐ সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষকে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারেনা। ঘট ঘটাদি বস্তু ঐরূপ "ক্ষণিক" হইলে তাহাতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ একেবারেই সম্ভব হয় না। কারণ যে ঘটে আমি স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ করিব, তাহাতে আমার চক্ষুঃসংযোগ চাই। সেই ঘট উৎপন্ন হইলে পরে তাহাতে আমার চক্ষুঃসংযোগ হইতে পারে। তাহার পূর্ব্বে বা তাহার উৎপত্তিক্ষণে তাহাতে আমার চক্ষুঃসংযোগ কখনই হইতে পারেনা। কারণ ঐঘট-চক্ষুঃসংযোগে ঘট কারণ। আবার চক্ষুঃসংযোগ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কারণ। ঐ সব কার্য্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থগুলি কখনই একক্ষণে হইতে পারেনা। কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকিলে তাহা কারণই হয় না। তাহা হইলে দেখুন, ঐ ঘটে স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ করিতে

অন্ততঃ ঐ ঘটের ত্রিক্ষণস্থায়িত্ব চাই। প্রথম ঘট উৎপন্ন হইবে, পরক্ষণে তাহাতে চক্ষুঃ-সংযোগ হইবে, তাহার পরক্ষণে ঘটে স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ হইবে। একঘটে চক্ষুঃসংযোগ স্বীকার করিলেও তাহার দ্বারা অন্য ঘটের স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা। চক্ষুঃসংযোগের পরক্ষণে "ক্ষণিক" বলিয়া সে ঘট থাকিবে না, সুতরাং সে ঘটে স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অতএব ঘটের ক্ষণিকত্ব কখনই স্বীকার করা যায় না। ঘটাদি বস্তুর স্থিরত্বই সিদ্ধান্ত। এই স্থিরত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে ঘটাদি বস্তুতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। এমন কি তাহা হইলে ঘটাদিতে ঐ স্থূলত্ব কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না। কেননা অনুমান করিতে হইলেও লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব হেতু করিয়া স্থূলত্বের অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষণিক পদার্থে পূর্ব্বোক্ত-যুক্তিতে সেই প্রত্যক্ষই অসম্ভব। ফলতঃ বৌদ্ধদার্শনিকগণ "ক্ষণভঙ্গ-ভঙ্গ" অর্থাৎ হিন্দুদার্শনিকদিগের "স্থিরত্ব-সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন প্রমাণেই ঘটঘটাদির স্থূলত্ব-সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না—ইহাই উদয়নাচার্য্যের মনের ভাব।

উদয়নাচার্য্যের ঐ গ্রন্থ ব্যাখ্যায় দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়বার্ত্তিকের পাঠ লিখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকর লিখিয়াছেন "তত্রচ বাক্যার্থসিদ্ধৌ তদনুষঙ্গী যোঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ" ইহার অর্থ বুঝা যায় যে বাক্যার্থসিদ্ধি হইলে তাহার আনুষঙ্গিক যাহা যাহা সিদ্ধ হইবে তাহারা অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। রঘুনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "যেন কেনাপি প্রমাণেন বাক্যার্থসিদ্ধৌ যোঽন্যার্থঃ সিধ্যতি স তথা" অর্থাৎ বার্ত্তিকের "বাক্যার্থ-সিদ্ধৌ" একথার অর্থ তিনি বলিয়াছেন "যে কোন প্রমাণে বাক্যার্থসিদ্ধি হইলে"। তাৎপর্য্যটীকাকার "বাক্যার্থ" কথার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, রঘুনাথ তাহা উপলক্ষণ অর্থাৎ একটা প্রদর্শন মাত্র—বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন প্রমাণের দ্বারা বাক্যার্থসিদ্ধি হইলে তদ্ভিন্ন যে পদার্থ সিদ্ধ হইবে, তাহাই অধিকরণ সিদ্ধান্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, উদয়নের পাঠ ও রঘুনাথের ব্যাখ্যা দেখিয়া শেষে ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ-সিদ্ধি ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না, তাহাই "অধিকরণ-সিদ্ধান্ত"। আমরাও নব্যন্যায়ের যুগে এই নবীনের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিলাম। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, নবদ্বীপের চূড়া কাণভট্ট রঘুনাথেরও পরবর্ত্তী,—এবং তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া পণ্ডিত, সুতরাং তাহার প্রতি আমাদের পক্ষপাত স্বাভাবিক। তবে অনেক স্থানে আমরা প্রাচীন উদ্যোতকর ও টীকাকার মিশ্র মহোদয়ের শ্রীচরণে শরণ লইয়াছি। সূক্ষ্মদর্শী প্রশ্ন করিবেন, এখানে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় তাঁহার উদাহৃত ইন্দ্রিয়নানাত্ব "অধিকরণ-সিদ্ধান্ত" হয় কৈ?

ইন্দ্রিয়নানাত্ব সকল মতেই অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতমের প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে ("দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থ-গ্রহণাৎ") আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব-সিদ্ধিতে ইন্দ্রিয়নানাত্ব সিদ্ধান্ত আবশ্যক বটে; ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব না থাকিলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় একমাত্র হইলে তাঁহার ঐ যুক্তি খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়-নানাত্ব

ব্যতীত কোন প্রমাণেই আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা বিশ্বনাথ কি করিয়া বলিলেন? মহর্ষি গোতমের ঐ অনুমান ভিন্ন আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব বিষয়ে আর কি কোনই প্রমাণ নাই? শ্রুতি ও কি আত্মার ঐ তত্ত্ব কথায় নীরব? তাহা বলিতে পারিনা। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু"। "ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সুব্যক্ত রহিয়াছে, এবং অন্য শ্রুতিতেও "আত্মা ইন্দ্রিয় নহে" এ তত্ত্বের ঘোষণা আছে। সূক্ষ্মদর্শীর প্রশ্নের উত্তরে বৃত্তিকারের ঐ গ্রন্থ-সন্দর্ভের কল্পিত ব্যাখ্যাভেদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। বৃত্তিকারের পক্ষ-সমর্থন করিতে আমি এখন বলিতে চাই যে, ইন্দ্রিয়নানাত্ব ব্যতীত আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না ইহা বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন এবং তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া "ইন্দ্রিয়নানাত্ব"কে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত বলিতে কিছু মাত্র সংকুচিত হন নাই।

বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্রুতির কল্পনা গুলি যুক্তি-মূলক। ইন্দ্রিয়নানাত্ব ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত নহে। অন্য প্রমাণে ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব সিদ্ধই আছে। শ্রুতি "ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ" বলিয়া বহুবচনের দ্বারা সেই সিদ্ধ নানাত্বেরই প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গুলি শরীরকে বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অসংযত মনঃ ইন্দ্রিয়ের ঐ আকর্ষণে প্রতিপদে প্রধান সহায়। সংযত মনঃ ঐ আকর্ষণে বাধা দেয়। ইহাই ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত বা প্রতিপাদ্য। তাই শ্রুতি, শরীরকে রথরূপে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ঐ শরীর-রথের আকর্ষক অশ্বরূপে, এবং মনকে তাহার প্রগ্রহরূপে কল্পনা করিয়াছেন। মূলকথা এখানে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের ঐ স্বরূপই প্রকৃত বা প্রস্তুত। আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন না হইলে শ্রুতি ইন্দ্রিয়ের ঐ স্বরূপ অর্থাৎ শরীররথে অশ্বরূপতা বলিতে পারিতেন না। সুতরাং আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব মহর্ষির সূত্রানুসারে ("যৎসিদ্ধাবন্যপ্রকরণ-সিদ্ধিঃ") ঐ শ্রুতিতেও অধিকরণ-সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিপাদিত। কারণ আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব-সিদ্ধি ব্যতীত শ্রুতিও তাঁহার ঐ প্রকৃত সিদ্ধি করিতে পারেন না। আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব, যুক্তির দ্বারা অর্থাৎ গোতমোক্ত অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ আছে। তাহাতে আবার ইন্দ্রিয়নানাত্ব সিদ্ধান্ত আবশ্যক, কারণ ইন্দ্রিয়নানাত্ব সিদ্ধান্ত ব্যতীত ঐরূপ অনুমানে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধান্তে ইন্দ্রিয়নানাত্ব অধিকরণসিদ্ধান্ত। ফলতঃ আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব সাক্ষাৎ শ্রুতি-সিদ্ধ নহে। উহা যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়াই শ্রুতির সিদ্ধান্তরূপে নিশ্চিত। যুক্তির দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব বুঝিতে হইলে তাহাতে ইন্দ্রিয়নানাত্ব-সিদ্ধি চাই। তাই ইন্দ্রিয়নানাত্ব অধিকরণসিদ্ধান্ত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। বলিতে পারেন, শ্রুতিতে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত রহিয়াছে। উহা যুক্তিনিরপেক্ষ শব্দ-প্রমাণেই নিশ্চিত। সুতরাং উহার সিদ্ধিতে ইন্দ্রিয়নানাত্ব-সিদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই। একথায় বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতির দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হয় না। কারণ শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়াত্মবাদেরও আভাস

আছে। "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ব্রূয়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুতি পাঠ করিয়া কোন চার্ব্বাকবিশেষ, ইন্দ্রিয়ই আত্মা—ইহা বেদ-সিদ্ধান্ত বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় না থাকিলে শরীর চলেনা। আমি কাণ, আমি বধির, এইরূপ অনুভবও চিরসিদ্ধ, সুতরাং ইন্দ্রিয়ই আত্মা। শ্রুতির সহিত উক্ত যুক্তির উপন্যাস করিয়া কোন চার্ব্বাক ইন্দ্রিয়াত্মবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন এখন শাস্ত্রার্থ-সন্দেহে শাস্ত্রাবিরুদ্ধ যুক্তিই আশ্রয়ণীয়া। ঐ যুক্তির দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হওয়ায়, আত্মা ইন্দ্রিয়-ভিন্ন, ইহাই বেদার্থ বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতেছে। বস্তুতঃ এইরূপ অনেক স্থানেই বেদার্থ নির্ণয় করিতে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বেদে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের আভাস যেখানে আছে, সেসব স্থানেই যুক্তির দ্বারা তাৎপর্য্যনির্ণয় করিতে হয়। বেদে আত্মাকে কোন স্থানে দেহ, কোন স্থানে প্রাণ, কোন স্থানে ইন্দ্রিয়, কোন স্থানে মন বলা হইয়াছে। আবার ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও বলা হইয়াছে। এখন যুক্তির সাহায্যে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নচেৎ বেদ হইতে তত্ত্বনির্ণয়ের আশা নাই। যুক্তির দ্বারা, আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বেদে ঐ ভাবে আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা বলা হইয়াছে, উহা স্থূলারুন্ধতী-ন্যায়ে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অরুন্ধতী-প্রদর্শন স্থলে যেমন একেবারে প্রথমতঃই উহার প্রদর্শন অসম্ভব-বোধে প্রথমে এক একটী অন্য তারা দেখান হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব নিরাকরণ দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর উপদেশ করাই বেদের তাৎপর্য্য। মূল কথা, আত্মা ইন্দ্রিয়ভিন্ন—এসিদ্ধান্ত প্রথমতঃ যুক্তির দ্বারা না বুঝিতে পারিলে বেদ-প্রমাণের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্তের নিশ্চয় করা যায় না। যদি আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব, যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে মহর্ষি গোতমের প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত যুক্তি (অনুমান) অথবা ঐরূপ অন্য যুক্তি আবশ্যক হইবেই। তাহার দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধি করিতে ইন্দ্রিয়নানাত্বসিদ্ধিও আবশ্যক হইবে। তাই ইন্দ্রিয়নানাত্বসিদ্ধি ব্যতীত আত্মার ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না—বুঝিয়া, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, ঐরূপ ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়নানাত্বকে অধিকরণসিদ্ধান্ত রূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়নানাত্ব, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি সকলের মতেই অধিকরণসিদ্ধান্ত। তবে ভাষ্যকার বলিয়াছেন "আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব-সিদ্ধিতে যাহা যাহা আনুষঙ্গিক অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সে গুলি সবই অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব, ইন্দ্রি-য়ের নিয়তবিষয়ত্ব, জ্ঞানসাধনত্ব প্রভৃতি সবই ঐ স্থানে অধিকরণ সিদ্ধান্ত; কারণ ঐ সব গুলি ব্যতীত আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না" বৃত্তিকার সংক্ষেপে এক ইন্দ্রিয়-নানাত্বের কথাই বলিয়াছেন। এখানেও সর্ব্বতন্ত্র ও প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্তের ন্যায় মহর্ষি, নিশ্চিত শাস্ত্রার্থকেই অধিকরণ-সিদ্ধান্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রার্থনিশ্চয়কে অধি-করণসিদ্ধান্ত বলেন নাই। সুধী পাঠক-গণ এবিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

শিবাষ্টক।

(শঙ্করকৃত)

(১)

তুমি প্রভু! ঈশ,   তুমি হে অনীশ
    মহিমার নাহি পার,
তুমি নির্গুণ,   গুণময় পুন,
    আভরণ ফণী-হার।
অতি দুর্জ্জয়   দৈত্যনিচয়
    পরাজিলে রণ করি;
মঙ্গলভূমি-   সুর-তরু তুমি,
    তোমারে প্রণাম করি।

(২)

গিরি রাজ-সুতা   বামতনু-যুতা,
    মরি কি মাধুরী তায়—
রজত-ভূধর   জিনি' কলেবর,
    হেরিতে নয়ন ধায়।
অন্তর-তল   কর নির্ম্মল
    পঙ্কিল পাপ হরি;
মঙ্গল-ভূমি-   সুর-তরু তুমি,
    তোমারে প্রণাম করি।

(৩)

তব শির' পরে   চন্দ্র বিহরে,
    রজত-কিরণ ঝরে;
কটি-তটে ভাল   দোলে গজ-ছাল
    মন্থর গতি-ভরে।
পিঙ্গল জট   করে লটপট
    গঙ্গা-লহরে মরি!
মঙ্গল-ভূমি-   সুর-তরু তুমি,
    তোমারে প্রণাম করি।

(৪)

শুভ্র বৃষভ   ভবন-বিভব,
    আদি গুরু অবনীর;
বিভূতি-ভূষিত   তব তনু সিত
    বিষপানে রত ধরী!
ত্রিশূল বিষাণ   পিনাক মহান্,
    বরাভয় করে ধরি';
মঙ্গল ভূমি-   সুর-তরু তুমি,
    তোমারে প্রণাম করি।

(৫)

ও চারু বদন   ধরে ত্রিনয়ন
    উজল কিরণময়,
আনন-কমলে   নিয়ত নিকলে
    কোটি-ভানু-করচয়।
চন্দ্রিকা জালে   মণ্ডিত ভালে
    উথলে আলোক মরি!
মঙ্গল-ভূমি-   সুর-তরু তুমি,
    তোমারে প্রণাম করি।

(৬)

মত্ত বারণ-   মকর-কেতন-
    গরব হরণ কর;
করির চরম   বিলাস-করম,
    পরম পুরুষবর।
লটপট দোলে   হাড়-মালা গলে,
    সমাধি-মগন মরি!
মঙ্গল-ভূমি-   সুর তরু তুমি,
    তোমারে প্রণাম করি।

(৭)

তুমি প্রমথেশ   ওহে হৃদয়েশ!
    ভকত-চিত্ত-হর,
শক্তি যুগল   চরণ কমল
    মধু রত মধুকর।

যে ভজে তোমারে' ভব-ভয় তারে
বাঁধিতে না পারে মরি!
মঙ্গল-ভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

(৮)

বিশ্ব-উদয় -পালন-বিলয়
লীলা তব লীলাময়!
ত্রিগুণ কারণ কর তা' সাধন,
তুমি হে করুণালয়।
সাধুর আলয় তোমার হৃদয়,
প্রাণ-প্রিয় তব হরি;
মঙ্গল-ভূমি- সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্. এ বি, এল্।

হিন্দুর আধুনিক কর্ম্ম।

প্রথম প্রস্তাব।

কোন পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন,—

"I slept and dreamt that life was beauty,
I woke and found that life was duty,"

আমি এতদিন মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, জীবন যেন একটা সৌন্দর্য্যময়, বিলাসিতার সুখ-সাগরে নিমজ্জিত, যেন, জীবনে কোন কর্ম্ম নাই, কোন কর্ত্তব্য নাই—জীবন কেবল সুখ-পূর্ণ। এখন আমি জাগিয়াছি, আমার মোহনিদ্রা বিবেকের তীব্র-মধুর তিরস্কারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন আমি দেখিতেছি জীবন—কর্ত্তব্যপূর্ণ।

আমারাও তদ্রূপ এতদিন মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, এখন জাগিয়াছি, এখন দেখিতেছি, কর্ত্তব্যের গুরুভারে আমাদের জীবনতরী ডুবু ডুবু। এই কর্ত্তব্যই "কর্ম্ম" নামে অভিহিত এবং ইহা প্রতিপালন করাই আমাদের ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য একার্থবোধক, অতএব আমি ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যকে "কর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াই আমার হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই কর্ম্ম অনাদি অনন্ত এবং অসীম। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন;—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর-সমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

কোন দর্শনকার বলেন "কর্ম্মই ব্রহ্ম"। যাহা হউক, কর্ম্ম যদি ব্রহ্ম হয়, কর্ম্মে যদি ঈশ্বর সত্তাই বর্ত্তমান থাকেন, অথবা কর্ম্মের যদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ দেখি, আমরা কতদিন,—কত যুগ যুগান্তর, কত শতাব্দী হইতে এই ঈশ্বরের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত! কতকাল আমরা কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অধর্ম্মের কুটিল পথে ভ্রমণ করিতেছি! কতকাল আমরা জীবন থাকিতেও জীবন্মৃতাবস্থায় জীবিত! তাই বলিতেছিলাম, এখন জাগিয়াছি—এখন দেখিতেছি, কর্ত্তব্যের গুরুভারে আমাদের জীবন-তরী ডুবু ডুবু।

যখন বৌদ্ধধর্ম্মের কৃষ্ণমেঘে হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাচ্ছন্ন, যখন ধর্ম্মের উদ্ধার—আশা বিলুপ্ত প্রায়, যখন সমস্ত হিন্দু নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরপর অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, তখন ধর্ম্ম অনাদৃত হইয়া আর এক মহাত্মার আশ্রিত হইল, সে

মহাপুরুষ—শঙ্করাচার্য্য। যাঁহার জ্ঞানের জ্যোতিতে বৌদ্ধমেঘ কাটিল, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার সাধিত হইল। আমাদের অতীত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কথার আলোচনা করিলে এইরূপ কর্ম্মিদিগের শত সহস্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, যে দেশের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ কর্ম্মিদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, যে জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ আজীবন স্বীয় কর্ম্ম, সযত্নে সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছেন, সেই দেশের অধিবাসিগণ—সেই জাতির বংশধরগণ আজ কর্ম্মের লক্ষণ পর্য্যন্তও বিদিত নহে। তাই, আজ যদি প্রত্যেক সন্তানের কোমল হৃদয়ে স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-চিন্তা অল্প অল্প প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে আশা করা যায়, যখন কর্ম্মবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছে তখন কালে ঐ কর্ম্মবৃক্ষে মুক্তিফল এক দিন না এক দিন ফলিবেই ফলিবে।

কর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন পাশ্চাত্য কর্ম্মী বলিয়াছেন,—"The greatest happiness in life to consist the performance of duties." কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই জীবনে মহৎ সুখ। কর্ম্মকে একবার আপনার বলিয়া ডাকিলে, সে আমাদিগকে হাত বাড়াইয়া ক্রোড়ে টানিয়া লইবে। ফলে, কর্ম্মকে আমরা যত কঠিন বিবেচনা করি, তত কঠিন নহে—কর্ম্ম সহজসাধ্য। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন,—

"ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ" ॥

ইজ্যা—যজ্ঞাদি, অধ্যয়ন—বেদপাঠাদি, দান, তপঃ—ব্রতোপবাসাদি, সত্য—সত্যবাদিতা, ধৃতি—ধৈর্য্য, ক্ষমা এবং অলোভ এইগুলিই ধর্ম্ম বা কর্ম্মের মার্গ। সুতরাং এই গুলির অনুষ্ঠান করিলেই সম্যক্ ধর্ম্ম বা কর্ম্ম করা হইবে। এই ইজ্যা অর্থে যজ্ঞ। যজ্ঞের প্রকাশক বেদ। সুতরাং বেদকে বুঝিতে পারিলেই যজ্ঞের মর্ম্ম বোঝা যাইবে। মীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি বলেন, বেদ নিত্য, অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় এবং বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে এই দেখিতে পাই, বেদ—শব্দময় আবার শব্দ—নিত্য, ব্রহ্ম। সুতরাং বেদও ব্রহ্ম এবং নিত্য। যাহা হউক, বেদ দ্বারা যজ্ঞ বুঝিতে যাওয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞানসাপেক্ষ। তবে সাধারণ-বুদ্ধিতে এই দেখিতে পাই, বেদ জীবের হিতার্থে ধর্ম্মের বা কর্ম্মের প্রতিপাদন করেন। বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ, এই পঞ্চপ্রকার বেদদ্বারা যজ্ঞের বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, তৎসংসৃষ্ট নিষেধ ও অর্থবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন, বিধিবেদ বলেন—"স্বর্গকামো যজেত"। স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। মন্ত্রভাগে—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি মন্ত্র গ্রথিত হইয়াছে। নামধেয়ে—অগ্নিহোত্র, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞনামের পরিচয় লিপীবদ্ধ হইয়াছে। নিষেধভাগে—"মা দিবা স্বাপ্সীঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মচারীর পক্ষে দিবাভাগে নিদ্রা নিষিদ্ধ হইল। অর্থবাদ—"আদিত্যো যূপঃ" এই বাক্য ; সূর্য্য কখন যূপ হইতে পারে না সুতরাং অর্থবাদে ইহাই বলিতেছে যে, সূর্য্য যূপের মত উজ্জ্বল। নিত্য বেদ এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া যজ্ঞের সরল পথ আবিষ্কার করিয়াছে। এখন আমরা বেদ দ্বারা যজ্ঞের

এই অর্থ বুঝিতে পারি যে, উক্ত পঞ্চ প্রকার বেদোক্ত বিধিভাগের বিধানানুসারে, মন্ত্রভাগের মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, অর্থবাদ মন্ত্রের মর্ম্মানুভব করিয়া, নিষেধোক্ত নিষেধ মানিয়া দেবোদ্দেশে দ্রব্য অর্পণ করাই নামধেয়-বেদোক্ত অশ্বমেধাদি নামক যজ্ঞ।

আবার আর এক দিকে দেখিতে পাই শঙ্করাচার্য্য শ্রুতির প্রমাণে "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" যজ্ঞই বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবান্ স্থির করিয়াছেন এবং গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—
"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

ইহা দ্বারাও এই প্রমাণীকৃত হয় যে যজ্ঞ ব্রহ্মময় অর্থাৎ যজ্ঞই ব্রহ্ম। সুতরাং ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রুতির বিধানানুসারে ভগবৎ প্রীত্যর্থে আমরা যাহা কিছু করি, তৎ সমস্তই যজ্ঞ এবং তদ্ ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কর্ম্ম সংসারের বন্ধন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—
"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"

আবার অন্য স্থলে আমরা দেখিতে পাই উত্তরমীমাংসায় জ্ঞানবাদিরা বলেন,—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" অমরত্ব-লাভের উপায় কর্ম্ম নহে, সন্তান নহে, ধন নহে; কেবল ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক যজ্ঞের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, যজ্ঞের মূল—ত্যাগ। ভগবানে আত্মত্যাগ না করিলে অমরত্ব বা সিদ্ধি লাভ করা যায় না। যজ্ঞের অপর নাম যাগ। দর্শনকার বিচার নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"মন্ত্রময়ো দেবতোদ্দেশ্যকদ্রব্যত্যাগো যাগঃ"। ইহা দ্বারাও এই প্রমাণীকৃত হয় যে যজ্ঞ—ত্যাগাত্মক। যাহা হউক, যজ্ঞ যদি ত্যাগাত্মক হয়, তাহা হইলে বেদোক্ত যজ্ঞের অগ্নি, হবি শ্রুক্ স্রুবাদির দরকার হয় না। "যাহা কিছু করি তৎ সমস্তই ভগবানের, আমার কিছুই নহে" এই বিশ্বাসকে মনে স্থান দিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ সহকারে কর্ম্ম করিলেই প্রকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে। মনু বলিয়াছেন,—
"ঋষি-যজ্ঞং দেব-যজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বথা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥"

ঋষিযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ—হোমাদি, ভূতযজ্ঞ—ভূতবলি, নৃযজ্ঞ—অতিথি-সৎকারাদি, পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধাদি। এই পঞ্চ প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া মনু যজ্ঞের ক্রম এবং সরল পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি, এই যজ্ঞ সহকারেই মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—
"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট-কামধুক্॥"

তাই সাগ্নিক আর্য্য ঋষিগণ নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। আজ কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে সাগ্নিকতা নাই। সে যাগোপকরণের সম্পূর্ণ অভাব। সে জ্ঞান নাই, হৃদয়ে সে দীপ্ত ধর্ম্ম-ভাব নাই সুতরাং যজ্ঞের সত্তাও লুপ্তপ্রায়। এই নবযুগে পতিত যজ্ঞের উদ্ধার সাধন করিতে যে কত কাল গত হইবে—কে বলিতে পারে, অথবা উদ্ধার সাধিত হইবে কিনা তাহাই

বা কে জানে? তবে যদি যজ্ঞের অর্থ "ত্যাগ" স্বীকার করিয়া কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে, এই যজ্ঞের উদ্ধার বিষয়ে কতকটা আশা করা যায়। এখন আমরা দেখিতে পাই, যজ্ঞের একটী উপায় উন্মুক্ত রহিয়াছে। সে উপায়—নিয়ম মত বেদোক্ত বিধানে, সদাচার্য্য কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া নিত্য সন্ধ্যা-তর্পণাদি এবং সাধ্যানুসারে মনু-কথিত পঞ্চপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা।

সন্ধ্যোপাসনই যজ্ঞ নামে অভিহিত। সন্ধ্যার প্রাতরাচমনে,—"ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং কায়েন মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং মুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি" এই মন্ত্রে "জুহোমি" পদের দ্বারাই সন্ধ্যার হোমাত্মক যজ্ঞত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে। এই পদের অর্থ ত্যাগ। সুতরাং সন্ধ্যা—ত্যাগাত্মক যজ্ঞ। যদি সন্ধ্যাকে বুঝিতে চাও, তবে কল্পনার নয়ন উন্মীলন কর, দেখিতে পাইবে,—

এই বাস্তব জগতের বহির্ভাগে আমাদের বাহ্য দৃষ্টির অতীত, কাল্পনিক জগতের মাঝখানে এক বিশাল বিস্তৃত সমুদ্র বিদ্যমান। সে সমুদ্র, সংসার-সমুদ্র গভীর, অতলস্পর্শ আপনার মনে আপনি চঞ্চল! সংসার কখন কুটিল বায়ুর হিল্লোলে সুখের লহর তুলিয়া আপনি হাসিতেছে, পরকে হাসাইতেছে, কখন আপনি কাঁদিতেছে, পরকে কাঁদাইতেছে, আবার কখন নিজে হাসিতেছে পরকে কাঁদাইতেছে, কখন পরকে হাসাইতেছে নিজে কাঁদিতেছে। এই সমুদ্রের জলরাশির নাম—কর্ম্ম। এই কর্ম্মরাশি অনন্ত অসীম, অপরিমেয়। এই কর্ম্ম, কখন পাপের আবর্ত্তে মানব-জীবন-তরীগুলিকে স্বগর্ভে টানিতেছে, কখন পুণ্যের মৃদুল মধুর হিল্লোলে তাহাদিগকে নাচাইতেছে। কখন নিম্নগামী হইয়া বিষম স্রোতে পরিণত হইতেছে। কখন ধর্ম্মের আভাস পাইয়া নির্ম্মল, কখন অধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া কর্দ্দমাক্ত। এই সমুদ্রের দুইটী বেলা ভূমি—উভয় সন্ধ্যা বেলা, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা। আমরা আমাদের জীবন-তরীগুলিকে রাত্রির শেষে, দিবার প্রাগ্‌ভাগে এই প্রাতঃসন্ধ্যা-বেলা হইতে সংসারসমুদ্রের কর্ম্মরাশির উপর ভাসাইয়া দেই। জীবন-তরী ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গের উপর পুণ্য-পবনের মধুর হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে হেলিতে দুলিতে ক্রমে কালের সঙ্গে অপর বেলাভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই প্রাতঃসন্ধ্যায় আমরা যে ভগবানের উপাসনা করি, তাহাই—প্রাতঃসন্ধ্যা। আমাদের জীবন-তরীর নাবিক দুই জন,—জ্ঞান ও বিবেক। পাপের গভীর ভীষণ আবর্ত্তের ভয়ে, কাম-ক্রোধাদি ছয় দল জলদস্যুর ভয়ে ভীত হইয়া নাবিকদ্বয় সারি গাহিতে গাহিতে নৌকা বাহিয়া যায়। কখন জ্ঞান-মাঝি গাহে;—

"মহিম্নঃ পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী।
স্তুতি র্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ॥"
ইত্যাদি।

দশেন্দ্রিয়ের দশ খানি দাঁড় বাহিতে বাহিতে জ্ঞান-মাঝি গাহে ;—

"অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-।
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি ॥"
ইত্যাদি।

আবার কখন মন হা'লের নিকট হইতে বিবেক গাহে ;—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

আমরা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ভাবী অজ্ঞেয় বিপদাশঙ্কায় ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা-বেলা হইতে যখন আমাদের জীবন-তরী কর্ম্মরাশির উপর ভাসাইয়া দেই, নৌকা যখন চলিতে থাকে, তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে নৌকা যখন চলিতে থাকে, স্নিগ্ধ-সলিলশীকরবাহি-পবিত্র পবনহিল্লোলে হেলিতে দুলিতে খেলিতে খেলিতে আমাদের জীবন-তরী যখন চলিতে থাকে, তখন আমরা দেখিতে পাই ; সমুদ্রের মাঝখানে ঐ জীবন-তরীখানি ছয় দল দস্যু আসিয়া লুটিয়া লইয়া গেল। দস্যু-ভয়ে নাবিকদ্বয় জলে ঝাঁপ দিল, হা'লে জল পাইল না। তরীখানি ভাসিতে ভাসিতে পাপের আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। আবার কোথায়ও দেখিতে পাই, তরীখানি প্রবল কর্ম্মস্রোতে পড়িয়া তীরবেগে যাইতে যাইতে হঠাৎ সম্মুখে এক বাধা পাইয়া ভাঙ্গিয়া আটখানা হইয়া গেল। এই সমস্ত ভীতিপ্রদ ঘটনা গুলি অবলোকন করিয়া আমাদের মনে ভয় হয়। তাই, আমরা তখন ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করি। এই প্রার্থনা—মধ্যাহ্নসন্ধ্যা। আবার সান্ধ্য গগনের রক্তিম আভায় অতুলনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে যখন আমাদের জীবন-তরী সায়ংসন্ধ্যা-বেলায় উপনীত হয়, যখন ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভরে ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হয়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনা করি। এই উপাসনা সায়ংসন্ধ্যা। আমাদের জীবন-তরী এইরূপে সংসার-সমুদ্রে কর্ম্মরাশির উপর খেয়া দেয়। এই খেয়া— অনন্ত কালের জন্য।

সন্ধ্যাকে বুঝিতে হইলে, এইরূপেই বুঝিতে হইবে। ইহাই প্রকৃষ্ট লক্ষণ। সন্ধ্যার মূল গায়ত্রী, সুতরাং দেবমাতা গায়ত্রীর উপাসনা করাই সন্ধ্যা করা। প্রাণায়ামাদি দ্বারা শরীর ও মন পবিত্র হয়, ইন্দ্রিয় দমিত হয়। তখন এই নশ্বর দেহ স্বর্গবৎ প্রতীয়মান হয়, সুতরাং যাঁহার উপাসনা করি, মন ইন্দ্রিয় এবং দেহ পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে অনায়াসেই হৃদয়ে ধারণা করা যাইতে পারে। পবিত্র মন—সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পবিত্র সন্ধ্যা-কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই হিন্দুর আধুনিক কর্ম্ম।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

তীর্থযাত্রা।

পুষ্করযাত্রা।

২৪শে চৈত্র শনিবার। আমরা পূর্ব্ব-রাত্রে প্রভাসের পাণ্ডার গৃহে আহারাদি করিয়া ভৈরবাল রেলষ্টেসেনে আসিয়াছিলাম। রাত্রি এগারটার পর প্রভাস হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। প্রাতে ৬ঘটিকার সময়ে যাত্রীট্রেণ আমাদিগকে লইয়া জেটলসর অভিমুখে চলিল। আমরা একেবারে ঢোলার টিকিট লইয়াছিলাম; এখান হইতে ঢোলার ভাড়া ২৶০। আমরা পুনরায় রৈবতক পর্ব্বতের পশ্চিম দিক্‌দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলাম। বেলা ১১॥০ টার সময়ে জেটলসরে গাড়ি পরিবর্ত্তন করিয়া, বৈকালে ৪ ঘটিকার সময়ে ঢোলায় পৌছিলাম। জেটলসরেই মাধ্যাহ্নিক আহারাদি করা হয়। ঢোলায় হইতে বৃন্দাবনের ষ্টেসেন-মাষ্টারকে একটী টেলিগ্রাফ পাঠাই। বৃন্দাবনের ষ্টেসেনমাষ্টারের ঠিকানায়, আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে পত্র আসিবার কথা আছে। এজন্য পূর্ব্বেই তাঁহাকে সংবাদ দিয়া বলিলাম। এখান হইতে আমরা মেশানা (Meshana) জংসনের টিকিট লইলাম; এখান হইতে তথাকার ভাড়া ২৴০। রাত্রি ১০ টার সময়ে ট্রেণ ছাড়িল। আমাদের গাড়িতে অন্য লোক না থাকায় বেশ আরামে নিশাযাপন করিলাম।

২৫শে চৈত্র, রবিবার—প্রাতে ৬-১৮ মিনিটে ভিরামগাম (Viramgam) জংসনে ট্রেণ পৌছিলে দেখিলাম, প্লাটফরমে সারি দিয়া ৫০ জন পুলিশ দণ্ডায়মান, তাহাদের চাপরাসে N. P. লেখা রহিয়াছে। গাড়ি দাঁড়াইবা মাত্র তাহারা যাত্রিগণের সমুদায় গাঁটরি পেটরা প্রভৃতি খুলিয়া দেখিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণের ঘাগরাও দেখিতে ছাড়িলনা। আমাদের কোন উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই, কারণ এই দেশীয় যাত্রিগণের গাঁটরি পেটরা দেখাই উঁহাদের উদ্দেশ্য; তাহাদের গাঁটরি বা পেটরার মধ্যে নূতন বা মূল্যবান্‌ দ্রব্যাদি যাহা পাইল, তাহার একটী করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লইল। তাহাতে যাত্রীর নাম-ধাম গন্তব্য স্থান ও সেই সকল দ্রব্য কোথায় কি উপায়ে প্রাপ্ত, তাহাও লেখা হইল। দ্বারকা যাইবার সময়ে এ পথে এরূপ কোন উৎপাত দেখি নাই। বেলা ৯॥০ টার সময়ে মেশানা জংসনে গাড়ি পৌছিলে, আমরা গাড়ি হইতে নামিয় ওভার্‌ব্রিজ্‌ পার হইয়া বাহিরে যাইতেছি, এমন সময়ে ষ্টেসেনের মধ্যে একজন পুলিশ আমাদের গাটরি দেখিতে চাহিল। আমি বিনা-বাক্যব্যয়ে গাঁটরি খুলিয়া দেখাইলাম। গাঁটরি খুলিতেই এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা বাহির হইয়া পড়িল। তৎপরে কয়েক খানি পুস্তক দেখিয়াই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল। আমরা নিকটবর্ত্তী এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এখানে কোন বিস্তীর্ণ জলাশয় নাই; কূপজলেই এখানকার লোকের একমাত্র নির্ভর। কূপটী ধর্ম্মশালা হইতে একটু দূরে। ধর্ম্মশালার সম্মুখেই একটী টিউব্‌ ওয়েল (Tube well) আছে, উহার জল অনেকেই লইয়া যাইতেছে, কিন্তু

তাহা হইলে জল লইতে হইলে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইবে, কারণ সর্ব্বদাই দুই তিনজন লোক জল লইবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। ধর্ম্মশালা হইতে কিছু দূরে বাজার—হাট আছে, কিন্তু আমরা বাজারে যাই নাই। কারণ, একেত অনেক বেলায় এখানে পৌঁছিয়াছি, তারপর টিউব্ ওয়েল হইতে জল লইয়া স্নানাদি করিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। তার পর বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া রন্ধন করিয়া আহার করিতে অপরাহ্ন হইয়া প'ড়বে, তজ্জন্য নিকটের একখানি মুদির দোকান হইতে চাউল, ঘৃত, কলাইদাউল, কিছু মিষ্ট ও লবণ লইলাম এবং সিদ্ধ-পক্ক অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিলাম। আহার-কালে দেখা গেল যে, কলাই-দাউল ভালরূপ সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক্ অদ্যকার আহার এইরূপেই নির্ব্বাহিত হইল। দ্বিপ্রহরে আমরা একটু বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যা ৭-১১ মিনিটের ট্রেণে আমরা এখান হইতে আজমীর যাত্রা করিলাম। আজমীরের ভাড়া ২॥৶০। পথে রাত্রে আবুরোড ষ্টেশনে গাড়ি পৌঁছিলে ডাক্তার আসিয়া আমাদের প্লেগ-পরীক্ষা করিয়া গেলেন।

এইবার আমরা বিশ্ববিদিত রাজপুতানা বা রাজস্থানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, আমাদের বামে যোধপুর বা মাড়বার রাজ্য, দক্ষিণে উদয়পুর বা মেওয়ার রাজ্য। পর্ব্বতময় মরুভূমির মধ্য দিয়া, আরাবল্লি পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া, এই রেলপথ গিয়াছে। এক্ষণে রাত্রিকাল, তজ্জন্য আরাবল্লি পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য ভাল রূপ দেখিতে পাইলাম না। রাজপুতানার মধ্যে পুষ্কর ভিন্ন অন্য পৌরাণিক তীর্থ স্থান না থাকিলেও, ঐতিহাসিক চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান গুলি—বাপ্পা, বাদল, ভীমসিংহ, ও প্রতাপের লীলাভূমি—দেখিয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত বাসনা ছিল, কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভীষ্ম উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞাং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাং দেবলোকে মনস্বিনীং।
কৈকেয়ী সুমনা নাম শাণ্ডিলীং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ৩০৪
কেন বৃত্তেন কল্যাণি সমাচারেণ কেন বা।
বিধূয় সর্ব্বপাপানি দেবলোকং ত্বমাগতা ॥ ৩০৫
হুতাশন-শিখেব ত্বং জ্বলমানা স্বতেজসা।
সুতা তারাধিপস্যেব প্রভয়া দিবমাগতা ॥ ৩০৬
অরজাংসি চ বস্ত্রাণি ধারয়ন্তী গতক্লমা।
বিমানস্থা শুভা ভাসি সহস্রগুণমোজসা ॥ ৩০৭
ন ত্বমল্পেন তপসা দানেন নিয়মেন বা।
ইমং লোকমনুপ্রাপ্তা ত্বং হি তত্ত্বং বদস্ব মে ॥ ৩০৮

ভীষ্ম কহিয়াছিলেন, সুমনা-নাম্নী কেকয়রাজতনয়া, দেবলোকে সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা মনস্বিনী শাণ্ডিলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে কল্যাণি! তুমি কিরূপ চরিত্র এবং কিরূপ আচারদ্বারা দেবলোকে আগমন করিয়াছ? তুমি হুতাশন-শিখার ন্যায় স্বীয় তেজ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতেছ এবং তারাধিপ-তনয়ার ন্যায় নিজ প্রভার দ্বারা দ্যুলোকে আগমন

করিয়াছ; ক্লান্তিহীন হইয়া রজোবিহীন বসন ধারণ করিয়াছ। হে শুভে! তুমি বিমানে থাকিয়া স্বীয় তেজ দ্বারা সহস্রগুণ শোভা পাইতেছ। তুমি অল্প তপস্যা, দান ও নিয়ম দ্বারা এ লোকে আগমন কর নাই; অতএব তুমি আমার নিকট যথার্থ করিয়া বল। ৩০৪ ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮।

ইতি পৃষ্টা সুমনয়া মধুরং চারুহাসিনী।
শাণ্ডিলী নিভৃতং বাক্যং সুমনামিদমব্রবীৎ ॥৩০৯

চারুহাসিনী শাণ্ডিলী, সুমনা কর্ত্তৃক মধুরভাবে এইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া, তাঁহাকে নিভৃতে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩০৯

নাহং কাষায়-বসনা নাপি বল্কল-ধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা ॥ ৩১০
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবম্ ॥ ৩১১

আমি কষায়-বসনা অথবা বল্কলধারিণী মুণ্ডা অথবা জটিলা হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হই নাই। আমি অপ্রমত্তা হইয়া থাকিতাম, কদাচ পতিকে অহিত ও পরুষ বাক্য বলি নাই। ৩১০, ৩১১।

দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাং চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূ-শ্বশুর-বর্ত্তিনী ॥ ৩১২

দেবতাগণ, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজায় সর্ব্বদা সাবধানা থাকিতাম ও শ্বশ্রূ এবং শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতে সতত নিযুক্তা থাকিতাম।৩১২

পৈশুন্যে ন প্রবর্ত্তামি ন মমৈতন্মনোগতম্।
অদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ ॥৩১৩

পৈশুন্য-যুক্ত কার্য্যে কখন প্রবৃত্তা হইতাম না এবং উহা আমার মনোমতও নহে। দ্বারদেশে কখন অবস্থান করিতাম না এবং বহুক্ষণ কাহারও সহিত আলাপ করিতাম না। ৩১৩

অসদ্বা হসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা ॥ ৩১৪

কোন অসৎ কর্ম্ম, হাস্য, অথবা কার্য্য দ্বারা অহিত, কিম্বা রহস্য অথবা অরহস্য কোন বিষয়েই সর্ব্বথা প্রবৃত্তা হইতাম না। ৩১৪

কার্য্যার্থে নির্গতং চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতম্।
আসনেনোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা ॥৩১৫
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎ সর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং ॥ ৩১৬

পতি, কার্য্যার্থে নির্গত হইয়া পরে গৃহে আগমন করিলে, তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া সমাহিতা হইয়া পূজা করিতাম। পতি যে অন্ন উৎকৃষ্ট না জানিতেন, এবং যাহার প্রশংসা না করিতেন, তাদৃশ ভক্ষ্য কিম্বা লেহ্য বস্তু আমি পরিত্যাগ করিতাম। ৩১৫, ৩১৬।

কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেব তু।
প্রাতরুত্থায় তৎ সর্ব্বং কারয়ামি করোমি চ ॥৩১৭

কুটুম্বের জন্য যাহা কিছু আনীত হইত এবং যাহা কিছু কর্ত্তব্য থাকিত, প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্বয়ং তৎসমুদয় নির্ব্বাহ করিতাম এবং অন্য দ্বারা নির্ব্বাহ করাইতাম। ৩১৭

প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেনচিৎ।
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা ॥ ৩১৮

কোন কার্য্যবশতঃ আমার পতি যদি বিদেশে যাইতেন, তাহা হইলে আমি সেই সময়ে মঙ্গল-সূত্র ধারণ করিয়া সংযতা হইয়া থাকিতাম। ৩১৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শোকের কথা। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরলোক-লাভ ঘটিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র লাল বিদেশীয় শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হইয়াও বঙ্গজননীর পূজা-পরিচর্য্যায় প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছিলেন। হাস্যরসের কবিতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নাটকে তিনি উচ্চমঞ্চের অধিকারী, সমালোচনায় তিনি নির্ভীক, দেশভক্তি ও তেজস্বিতাপূর্ণ ভাবপ্রবণ গানে এবং কবিতায় তিনি পুষ্পমাল্যের যোগ্য ছিলেন। তাঁহার অকালপ্রয়াণে বঙ্গসাহিত্যের সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

নবনিয়ম। যোধপুর রাজ্যে ঘোষিত হইয়াছে যে, রাজ্যস্থ প্রত্যেক সন্ন্যাসীর নাম রেজেষ্ট্রী করা হইবে, আর ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তি সন্ন্যাসীর চেলা হইয়া গৃহত্যাগ করিতে পারিবে না। নিয়মের মূল্য আছে বৈ কি?

শিখার ব্যাখ্যা। চীনদেশের লোকেরা সম্প্রতি শিখাচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহার ফল নাকি ভাল হইতেছে না। পত্রান্তরে প্রকাশ, তীক্ষ্ণধী শিখাধারী লোকও শিখাচ্ছেদের পর ক্রমে স্থূলধী হইতে চলিয়াছে। জর্ম্মাণীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডাঃ বুড্‌বার্গ বলেন, "শিখাধারণে মস্তিষ্কে শোণিত-প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে মস্তিষ্কের পুষ্টি হয়।" শিখাধারীরা বুদ্ধিমান্ হয়? কালধর্ম্মে ভারতের (গোষ্পদাকার) পুষ্ট শিখা এখন সূত্রাকারে অবশিষ্ট ও ক্লিষ্ট, আবার অনেক ক্ষেত্রে বিনষ্টও হইয়াছে! বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ডাঃ বুডবার্গের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন কি?

সুসংবাদ। যশোহর সহরে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিবে। শুনিতেছি, সহরের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান। এই চতুষ্পাঠীতে নাকি ছাত্রগণকে জমিদারী-সেরেস্তার কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইবে, আর অবস্থাবিশেষে আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিবে। সংবাদে ভাবিবার অনেক আছে। দেখা যাউক্ কি হয়!

কুষ্ঠাশ্রমের কথা। বৈদ্যনাথ দেওঘরের 'রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের' ১৯১২ ইংরেজী-বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠে বুঝা গেল, আলোচ্য বর্ষে ইহার কার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এই বর্ষে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নানাস্থান হইতে প্রায় ৭৭ জন নূতন কুষ্ঠরোগী উক্ত আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। নূতন পুরাতনে মোট ১৩৭ জন এ বৎসরে স্থান পাইয়াছে। কুষ্ঠাশ্রমের জন্য প্রতি বর্ষে বহু অর্থের প্রয়োজন। সাময়িক দান, নিয়মিত চাঁদা প্রভৃতির দ্বারাই কুষ্ঠাশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। কুষ্ঠগ্রস্ত হতভাগ্যগণের প্রতি দেশের দানশৌণ্ড নরনারীর হৃদয় সদয় হইলে সহজেই এই কল্যাণকর

অনুষ্ঠান দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। আশাকরি, দেশের সহৃদয় মহাশয়গণ, কুষ্ঠাশ্রমের কথা স্মরণ রাখিবেন। কুষ্ঠাশ্রমের বর্ত্তমান সম্পাদক, দেওঘরের প্রথিতমানা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন মহাশয় (হিন্দুপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে) সম্প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

স্নেহাস্পদেষু

কয়েক মাস পূর্ব্বে আধঘণ্টা আন্দাজ তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া ও তোমার প্রণীত পুস্তকের অনেকস্থান শুনিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা পত্রে লিখিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের সাধারণ তথাকথিত শিক্ষিত লোক হাকিম, উকীল, ডাক্তারদের মাপ হয় কার কত টাকা আছে, কার কখানা মোটরকার্ আছে, কেমন অট্টালিকা আছে, তাই দিয়া। কার কত জ্ঞান, কার কত জ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্তি, কার কত সত্য-ধর্ম্মভাব, এবং সেই সত্যধর্ম্মভাব প্রচার করিতে কে কত যত্নশীল, তাদ্দ্বারা আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের পরিমাপ হয় না। আমাদের দেশে বড় চিকিৎসক বলিলে কি বুঝায়? বুঝায় এই যে, কার কত প্রাক্‌টিস, কে কত টাকা উপার্জ্জন করে, কার বাড়ীখানা কত বড়? এই সব সামান্য বিষয় দ্বারা চিকিৎসকের বড়ত্ব মাপ হয়। বড়র জ্ঞানের পরিচয়, বিদ্যার পরিচয়, তাঁর চিকিৎসাপ্রণালীর পরিচয়, তাঁর সমসাময়িক লোক বড় জানিতে পারেনা, ভবিষ্যৎ বংশত তাঁদের নাম উপন্যাসের মত শুনে মাত্র। তোমার মত, ধর্ম্ম ও জ্ঞানকে নিজস্বধন না করিয়া, সমসাময়িক ও ভবিষ্যদ্ বংশের উপকারের জন্য কয়জন শিক্ষিত লোক, নিয়োগ করিতে চেষ্টা করেন?

তোমার লিখিত পরিব্রাজকস্কন্ধখানি আমার এত ভাল লাগিয়াছে, যে আমার ইচ্ছা হয়, আমাদের দেশের প্রত্যেক যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ উহা পাঠ করেন এবং পাঠ করিয়া উহা জীবনে পালন করার জন্য চেষ্টা করেন। কি কুৎসিত ভাবে আমাদের দেশের লোকেরা ঐ চারিটী বিষয়ের পরিচালনা করেন, তাহা তুমিঃ অবশ্যই সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছ, অন্যথা কখন এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি অমন বিষদভাবে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে না। এই সব বিষয় আমাদের দ্বারা অতি কুৎসিত ভাবে পরিচালিত হয়, তাই আমাদের দেশে এত অকালমৃত্যু, এত শিশুমৃত্যু, এত স্ত্রীরোগ এবং এত কুৎসিত রোগ। ধর্ম্মের খোসা লইয়া আমরা মারামারি করি, অথচ প্রকৃত ধর্ম্মভাব আমাদের প্রাণে নাই, তাই আমরা এত নীচ, এত দরিদ্র, পরপদানত ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।

তোমার "আমিষের প্রসার" পূর্ব্বে একবার পড়িয়াছিলাম। আবার পড়িয়া বহু শিক্ষা লাভ করিলাম। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে অনেক সাধনার প্রয়োজন; সে শিক্ষা আমাদের নাই বলিয়া আমাদের এত দুর্দ্দশা।

ভগবান্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং যে মহৎ ব্রত লইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছ তাহা পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করুক, এই প্রার্থনা করি। দেশের বড় শোচনীয় অবস্থা। এমন সময় তোমার মত মহাত্মাদের প্রাণপাত না করিলে আর দেশের উপায় নাই। ধর্ম্মশূন্য মনুষ্য, নীচ হইতে ক্রমে নীচতা প্রাপ্ত হইতেছে আর দেশ পাপে পূর্ণ হইতেছে।

মহাত্মা যোগেন্দ্রবাবুর প্রিয় কুষ্ঠাশ্রমের কাজ, আ'জ কা'ল আমার ক্ষুদ্র হস্তে। সাহিত্যক্ষেত্রে মাইকেলের জীবন-চরিত যেমন তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি, কর্ম্মক্ষেত্রে বৈদ্যনাথ রাজকুমারী-কুষ্ঠাশ্রমও তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি। সেকাজ তাঁর নিজের হাতে থাকিলে যে শুভ ফল হইত, আমার দ্বারা তার শতাংশের কমও হ'চ্ছেনা। তুমি

বিশ্বপ্রেমিক; তাই তোমার জন্য একখণ্ড গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠাই। তুমি পাঠ করিয়া তোমার দেশ-বিখ্যাত কাগজে একটু সমালোচনা করিবা এবং দরিদ্র উপায়হীন কুষ্ঠরোগীদের উপর যাতে দেশের লোকের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পার তা একটু করিবা। বলা বাহুল্য যে, ভিক্ষা দ্বারাই আশ্রমের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীহরিচরণ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সনাতন ধর্ম্ম। ১৯১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য এক পয়সা। "সনাতন ধর্ম্ম" সংগ্রহ-পুস্তক, ইহাতে বঙ্গানুবাদ সহিত তিনখানি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথম ঈশোপনিষৎ, দ্বিতীয় মোহমুদ্গর, তৃতীয় শ্রীশিক্ষাষ্টক। মোহমুদ্গর শঙ্করের তত্ত্বোপদেশ আর শ্রীশিক্ষাষ্টক চৈতন্যদেবের উপদেশসার। এক পয়সা মূল্যে এরূপ সারগর্ভ গ্রন্থ বিতরণ করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়, হিন্দুসাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ এরূপ ভাবে স্বল্প মূল্যে প্রচারিত হইলে, আপামর সাধারণ উহার মর্ম্মগ্রহের সুযোগ পাইবে, তাহার ফল সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। আশা করি, হিন্দুসমাজ সনাতন ধর্ম্মের সমাদর করিবেন।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য। শ্রীদীননাথ বসু প্রণীত। মূল্য এক আনা। বর্ত্তমানে বঙ্গপল্লীর দুর্দ্দশা সর্ব্বসম্মত। পল্লীতে পানীয় জল নাই, মুক্ত বাতাস নাই, সুস্থ লোক নাই; দূষিতজলপূর্ণ পল্বল, জঙ্গল, ও আবর্জ্জনায় পল্লীর সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ। ফলে রোগের অবধি নাই, মৃত্যুসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবু প্রতিগ্রামে 'স্বাস্থ্যসমিতি'-স্থাপনের দ্বারা এই অনিষ্টের প্রতীকার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। স্বাস্থ্যসমিতি, অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক পুষ্করিণী-শোধন, জঙ্গল কাটান, ডোবা ভরাট্ করিয়া দেওয়া, জল-প্রণালী-স্থাপন, জঞ্জাল সরান, গো-চারণ ভূমিরক্ষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করিলে পল্লীর ভাব ফিরিতে পারে। আমরা মনে করি, বর্ত্তমানে এই সকল কার্য্য "শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কর্ম্ম" বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। গৃহস্থগণ ধর্ম্মোৎসবাদিতে যে ব্যয় করেন, তাহার কিয়দংশ এ কার্য্যে দিলে উৎসবের সার্থকতা ঘটিবে। গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ।

মৃত্যু-রহস্য। পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত ও ভারতীয় স্বাধীন আর্য্যমিশন কর্ত্তৃক দ্রোণাশ্রম হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত, ডিমাই ১২ পেজী ৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পুস্তক। পরিব্রাজক মহাশয় দেখাইয়াছেন 'মৃত্যু ভয়ের নয়'। হিন্দু চিরদিনই একথা জানে ও মানে। ধার্ম্মিকের মৃত্যুতে ভয় নাই। মৃত্যু অমৃতত্বের পথের বিশ্রামাগার মাত্র। সাংসারিকের ও ভয়ের কারণ নাই। যাঁহারা মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। আজও জগতে যাঁহারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই শীর্ষস্থানে। ভীষ্ম, রাম, যুধিষ্ঠির, কুমারীল, শঙ্কর প্রভৃতি মৃত্যুকে ভয় করেন নাই। বস্তুতঃ হিন্দুশাস্ত্রে বলেন, আত্মার মরণ নাই, মরণ-ভয়ের মূল অজ্ঞান। এগ্রন্থ পড়িলে অনেকে উপকৃত হইবেন। আমরা গ্রন্থখানি, সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। ছাপা কাগজ ভাল নয়, মুদ্রাকরপ্রমাদও প্রচুর। এ সকল বিশেষ ক্ষতিকরও নয়, কারণ বিনা মূল্যেই পাওয়া যায়। গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের পাত্র।

বিজ্ঞাপন।

যশোহর সুরকী এণ্ড অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড।

১৮৮২ সালের কোম্পানীর আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত।

রেজেষ্ট্রীকৃত কার্য্যালয়—কাপুড়িয়াপটী, যশোহর।

মুলধন ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য প্রতি অংশ ৫৲ টাকা হিসাবে ১০০০০ অংশে বিভক্ত।

অংশের মূল্য সমুদয় আবেদন পত্রের সহিত এককালীন দিতে হইবে এবং যশোহর ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বরাবর অথবা অত্র কোম্পানীর সেক্রেটারী বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নামে কোম্পানীর কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

গত অক্টোবর মাসে কোম্পানী স্থাপিত হইয়া রীতিমত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে অনেক টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সেয়ার-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ সত্বর আবেদন না করিলে পরে সেয়ার না পাইতে পারেন।

আবেদনপত্রের ফরম ইত্যাদি কোম্পানির রেজেষ্ট্রীকৃত কার্য্যালয় যশোহর কাপুড়িয়াপটীতে অথবা যশোহর ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কে পাওয়া যাইবে।

মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে যতদূর জানা যায়, তাহাতে অত্র কোম্পানীতে শতকরা ২৫ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়; সুতরাং অত্র কোম্পানী প্রথমবর্ষেই যে শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা হারে ডিভিডেণ্ট দিতে সক্ষম হইবেন, এরূপ আশা করা যায়, পরে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি এম,এ, বি,এল, উকীল, সেক্রেটারী।
শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী, উকীল ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ব্যাঙ্কার—যশোহর ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্।

হিন্দু পত্রিকার ক্রোড়পত্র।

বিধবা-বিবাহ-সমালোচনা।

অর্থাৎ

হিন্দু-বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র, যুক্তি ও বিজ্ঞানের অননুমোদিত বিধায় তন্নিষেধ-বিষয়ক প্রস্তাব।

গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতা শ্যামবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহোদয়ের মন্তব্যের সারাংশ ;—

"ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয়-কৃত বিধবা-বিবাহ-সমালোচনা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তিনি বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল শাস্ত্র-যুক্তি-তর্কের উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে গুলি সমীচীন বলিয়া মনে হইল। বিধবা-বিবাহ কদাচ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে ও যুক্তিসিদ্ধও নহে। এ বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তের কোন অংশে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হইল না। তাঁহার পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় দেশের যে মহোপকার সাধিত হইয়াছে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত পণ্ডিতবর প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের মন্তব্যের সারাংশ।

"শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত "বিধবাবিবাহসমালোচনা" পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। গ্রন্থকার অশেষ পরিশ্রম ও নিপুণতার সহিত যেরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য বিদ্বৎ-সমাজের বিশেষ প্রশংসার্হ। শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত নিচয় তিনি এ বিষয়ে প্রকাশ করিয়াছেন তৎসমুদয় সুসঙ্গতই হইয়াছে। উপসংহারে গ্রন্থকার যুক্তি তর্কের সাহায্যে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সদুদ্দেশ্যের জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। × × ×। আমি এই পুস্তক খানি বিধবাবিবাহের সপক্ষ বিপক্ষ, উভয়কেই পড়িতে অনুরোধ করি।" ইত্যাদি।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, দেশপূজ্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Kt. C. I. E. মহোদয়ের মন্তব্যের সারাংশ।

"বিধবাবিবাহসমালোচনা।" The book contains much learning and thought. Regarding the conclution arrived at, there is some diversity of opinion, as there must be on controvertial matters like those delt with in the book. But the book is well worthy of study by our social reformers.

হিন্দু-পত্রিকার ক্রোড় পত্র।

প্রধান ২ সংবাদ-পত্রের সমালোচনার সারাংশ ;—

"যাহাদের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আলোচনায় কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগ আছে, তাঁহাদের সকলেরই মিত্র মহাশয়ের লিখিত পুস্তক খানি পাঠ করা উচিত।" হিতবাদী ১৬ই ভাদ্র ১৩১৮।

× × × গ্রন্থকার আপনার মত-সমর্থনের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিধবার পুরুষান্তর-প্রয়োগ-পক্ষপাতীর অপগ্রাহ্য হইতে পারে না। সেই পক্ষপাতীদিগের মতগুলি একে একে এই গ্রন্থে খণ্ডিত হইয়াছে। সোজা কথায় সোজা ভাষায় যুক্তির এমন প্রয়োগ আজ কাল প্রায়ই দেখা যায় না।" বঙ্গবাসী ৩০ আষাঢ় ১৩১৮।

"এই গ্রন্থকারের গবেষণা ও শ্রমের পরিচয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকৃষ্টরূপ প্রকট। গ্রন্থকার পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারদিগের মত আলোচনা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে তাঁহাদিগের প্রতিকূল মত পোষণ করিয়াও তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান করিতে ত্রুটী করেন নাই। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বাবুর শাস্ত্র-সেবা-সংবাদে আমরা পরম পুলকিত। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে এই গ্রন্থের আদর হইবে। × × × শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বাবুর পুস্তক খানি সারবান্ই হইয়াছে। ইত্যাদি হিন্দু পত্রিকা-চৈত্র ১৩১৮।

এই পুস্তক সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি, মজুমদার লাইব্রারি ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৷৹ আনা।

দুইখানি অভিনব পুস্তক।

হিন্দুপত্রিকা-সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি কর্ত্তৃক প্রণীত।

১। পল্লীস্বাস্থ্য।—এই পুস্তকে বঙ্গপল্লীর অস্বাস্থ্যের কারণ, এবং তন্নিরাকরণের উপায় আলোচিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি, বিস্তৃতির বিবরণ—এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের গবেষণার সারমর্ম্ম, এবং এই সকল রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আত্মরক্ষার-উপায় উপদেশ, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে নানা উপদেশ এবং ম্যালেরিয়া-প্রতীকারের পরীক্ষিত উপায়সমূহের বিবৃতি এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ম্যালেরিয়া-পূর্ণ স্থানের ম্যালেরিয়াক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই পুস্তকের উপদেশ অনুসারে চলিলে, ম্যালেরিয়া হইতে নিস্তার পাইতে পারিবেন আর যাহারা ম্যালেরিয়াক্রান্ত নহেন, তাঁহারাও ইহার উপদেশ পালন করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইবেন না। দেশের জনসাধারণ এই পুস্তকের উপদেশ লইয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে বদ্ধপরিকর হউন্। চারি আনা ব্যয়ে অমূল্য জীবন-রক্ষা, লাভজনক নহে কি? মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

২। উপবাস।—কিরূপে উপবাস অভ্যাস করিয়া আরোগ্যময় দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় এবং আহারের ব্যয় বাঁচাইয়া ধনসঞ্চয় করা যায়, এই পুস্তকে সেই উপায় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপবাসের দ্বারা স্বাস্থ্যহানি ত হইবেই না, বরঞ্চ সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হওয়া যাইবে। এ পুস্তক এই দরিদ্রদেশের পক্ষে পরম উপকারী, সন্দেহ নাই। মূল্য /৹ এক আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—হিন্দু-পত্রিকা কার্য্যালয় যশোহর
ম্যানেজার, হিন্দু-পত্রিকা,

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২০শ বর্ষ, ২০শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩২০ সাল, ১৮৩৫ শকাব্দাঃ।

"বউ কথা কও"

(১)

পাখি,
বসি তরু শিরে,
যবে গাও তুমি,
"বউ কথা কও",
জাগে হৃদে কত
অতীতের স্মৃতি,
কত সুখ-দুঃখ,
বেদনা-উল্লাস,
বিরহ মিলন।
আত্মহারা হ'য়ে
শুনি তব গান,—
পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।

(২)

পাখি,
শুনি তব গান
"বউ কথা কও"
জাগে মনে মম
বর-বধূ হ'য়ে—
খেলিতাম যবে,
বালক বালিকা,
বর-বধূ খেলা;
গুণ্ঠনে ঢাকিয়া
বালিকা-বদন,
গাহিতাম যবে
কর-তালি দিয়া,
"বউ কথা কও"।
অভিনয় দেখি
গুরুজন সবে,
হাসিতেন কত,
হাসিতাম মোরা;

পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।
(৩)
পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"
যৌবনের স্মৃতি,
পুনঃ জাগে মনে।
মনে হয় যেন
নবোঢ়া বধূকে,
"প্রিয়ে কথা কও,"
"প্রিয়ে কথা কও,"
সাদরে সম্ভাষি,
আবেশে হিয়ার
মিলাইয়া হিয়া
দ্বৈত-ভাব ভুলি
এক হ'য়ে যাই,—
পাখি,
যবে গাও তুমি,
"বউ কথা কও"।
(৪)
পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"
জাগে মম মনে—
ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা
নবীনা প্রেয়সী,
আনন-কমল
আবরি ঝটিতি,
সুনীল গুণ্ঠনে,
জলধর যেন,
ঢাকিল চন্দ্রমা,
লজ্জাবতী প্রায়,
ঢলিয়া পড়িত,
বিষাদ-আঁধারে
ঢাকি মম হৃদি,—
পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।
(৫)
পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"
মনে জাগে মোর—
প্রেয়সী আমার,
প্রেমিক-সেবায়
সুতীব্র সাধনে,
ভক্তের সাধনে
দেবতা যেমন,
মুদিত হৃদয়ে,
ঢালিয়া অমৃত
কর্ণের বিবরে,
হাসি আধ আধ
বীণার ঝঙ্কারে
ঝঙ্কারি বলিত—
"কি কহিব আমি"?
স্বরগ তখন
তুচ্ছ জ্ঞান হ'ত,
সে হাসির কাছে,—
অমিয়-জড়িত
বীণাবিনিন্দিত
সে স্বরের কাছে,—
পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।

(৬)

পাখি,

যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"
জাগে মম মনে—
যৌবন উতরি
প্রৌঢ় কালে যবে,
অভিমান-বশে
ভামিনী আমার,
রোষ-কষায়িত
সুতীক্ষ্ণ লোচনে,
মৌনব্রত ধরি,
ভ্রুকুটিভঙ্গীতে
হানিত হৃদয়ে
পঞ্চপঞ্চ শর,—

পাখি,

যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।

(৭)

পাখি,

যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও,"
মনে পড়ে মোর—
স্তব-স্তুতি শুনি,
দেবতা যেমতি,
তুষ্টা সর্ব্বকালে,
তুষ্টা বর্ষীয়সী,
হাসি মুখে পুনঃ
সম্ভাষিত ভক্তে।
হৃদয়ে উঠিত
জোয়ার আমার,
শশিমুখ হেরি
সাগরের প্রায়,—

পাখি,

যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।

(৮)

যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও,"
মনে হয় মম—
তব সঙ্গে পুনঃ
গাই দিবানিশি
"বউ কথা কও"।
কিন্তু হায়! কোথা
মম প্রিয়বধূ?
বহু দিন এবে
চলি গেছে প্রিয়া,
ত্যজি এ অধমে।
ছিঁড়ে গেছে মম
হৃদয়ের তন্ত্রী।
তবু সাধ মনে
ছিন্ন-তার যোগে
প্রিয়ার উদ্দেশে
সদা গাই গান
"বউ কথা কও",—

পাখি,

যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।

(৯)

পাখি,

যবে গাও তুমি,
"বউ কথা কও"
তোমার বিরহে
দুঃখিত অন্তর।

তোমার বিরহে
নাহিক মিলন !
অহর্নিশ তুমি
অনশনে থাকি,
প্রখর তপন
অশনি-ঝটিকা,
ঘন বরিষণ,
সদা তুচ্ছ করি
পঞ্চতপা প্রায়,
মন্ত্রের সাধনে
শরীর-পতন,
করিছ বিহগ !
বিন্দুমাত্র দয়া
নাহিক তোমার
প্রিয়ার হৃদয়ে !
কহেনা সে কথা,
দেয় না সে সাড়া
হাসে না সে কভু,
তোমার কথায় !

পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।

(১০)

পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও,"
মনে হয় মোর—
তব সন্নিধানে
প্রেমের ভজন
শিখি একমনে।
তুমি এক রতি
প্রিয়া ভিন্ন নাহি
অন্য কোন ধ্যান,
অন্য কোন জ্ঞান;
প্রেমে দৃঢ়ব্রত,
প্রেমে সমাধিস্থ;
প্রেম উপাসক,—
তুমি ধরাতলে
প্রেম অবতার;
কামশূন্য প্রেম
শিখাও আমারে,
বিশ্বজন-প্রেম
শিখাও আমারে।
নমি আমি পাখি,
তোমার চরণে।

পাখি,
যবে গাও তুমি
"বউ কথা কও"।

"ভূমার" স্বরূপ।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

দেবর্ষি নারদ কর্ম্মবিৎ হইয়াও যখন আত্মজ্ঞানী হইতে পারিলেন না; তখন তাঁহার মনে বড়ই অনুশোচনা আসিল। সাধনাপূত অন্তঃকরণের আকুলতা কখন বৈফল্য প্রসব করেনা—কাজেই নারদ, ভগবান্ মহাজ্ঞানী সনৎকুমারের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন "ভগবন্! অজ্ঞান-শোক-সাগর-পারের উপায় করুন।" তখন শিষ্যকে মুমুক্ষু শ্রদ্ধালু দেখিয়া, সনৎকুমার, উপদেষ্টা গুরুর আসনে বসিলেন।—

সনৎ। 'নাম' অধ্যয়ন কর। অধ্যয়ন

তদর্থজ্ঞান। নামই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে নামের উপাসনা কর! "নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্ব"—যেমন লোকে বিষ্ণু-বুদ্ধিতে প্রতিমা উপাসনা করে। এ গুলি প্রতীকোপাসনা। স্বরূপ না পাইয়া অভিমুখীভূত কোন আলম্বনে ব্রহ্মোপাসনার নামই প্রতীকোপাসনা। ইহাতে সর্ব্ববিধ কামনার পূরণ হইবে।"

নারদ। নাম হইতে শ্রেষ্ঠ কি? "কিং নাম্নোঽস্তি ভূয়ঃ?"

সনৎ। "বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী।"—নাম হইতে বাক্য শ্রেষ্ঠ। কার্য্য হইতে কারণ শ্রেষ্ঠ, অতএব নাম হইতে বাক্য শ্রেষ্ঠ। বাক্য ইন্দ্রিয়, আর এই বাগিন্দ্রিয়ই বর্ণের অভিব্যঞ্জক বলিয়া নামের কারণ—এইজন্য বাক্যই শ্রেষ্ঠ। অতএব বাক্যোপাসনাই কর! "বাক্যং ঋগ্বেদাদি" ঋগ্বেদাদিই বাক্য।

নারদ। বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ কি?

সনৎ। বিবক্ষাবুদ্ধি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ, ব্যাপক বলিয়া বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব মনের উপাসনাই বিধেয়—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্ব।"

নারদ। মন হইতে শ্রেষ্ঠ কি?

সনৎ। সংকল্প। কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্য-বিষয়-বিভাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের সমর্থনই সংকল্প।

নারদ। সংকল্প হইতে শ্রেষ্ঠ কি?

সনৎ। চিত্ত। অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের প্রযোজন-সামর্থ্যই চিত্ত। এই চিত্ত, চেতনাখ্য বৃত্তি।

নারদ। "চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তি",—চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ আছে কি?

সনৎ। "ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ঃ";—চিত্ত হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান একাগ্রতা। শাস্ত্রোক্ত দেবতাদি আলম্বনে যে চিন্তা-প্রবাহ, তাহারই নাম ধ্যান। "প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং।" ধ্যানের মাহাত্ম্যে যোগীগণ ঈশরত্ব লাভ করেন। জ্ঞানী, ধ্যানের দ্বারা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হন।—"ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীব অন্তরীক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌঃ ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাঃ যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে তস্য যথা-কামচারো ভবতি।" পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ যেন ধ্যানমগ্ন, দেব মনুষ্যাদি সকলেই ধ্যানমগ্ন। অতএব ধ্যানকেই ব্রহ্ম-জ্ঞানে উপাসনা কর!

নারদ। ধ্যান হইতে আর শ্রেষ্ঠ কি?

সনৎ। "বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ঃ।" ধ্যান হইতে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রার্থ-বিষয়ক জ্ঞানই বিজ্ঞান। এই জ্ঞানই ধ্যানের কারণ, তাই বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা। আর বিজ্ঞানের দ্বারাই লোক, ঋগ্বেদাদি জানিয়া থাকে; বিজ্ঞানের দ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়-ক্ষমতা, সাধু-অসাধু-বিবেক জন্মে। অতএব—"বিজ্ঞানমুপাস্ব"—বিজ্ঞানের উপাসনা কর!

নারদ। "বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।" বিজ্ঞান হইতে যদি কিছু শ্রেষ্ঠ থাকেত বলুন!!

সনৎ। 'বল'। বিজ্ঞেয় বস্তুতে মনের যে প্রতিভানসামর্থ্য তাহাই বল। সেই সামর্থ্য, অন্নাদি-জনিত। "বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে" অতএব বলই শ্রেষ্ঠ। বলহীন সর্ব্বদাই পরিভূত "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ";—এ বল, কেবল

শারীর-সামর্থ্য নহে! তবে শারীর-সামর্থ্যও এ বলের অন্তর্গত।

নারদ। বল হইতে শ্রেষ্ঠ কি?

সনৎ। অন্ন। কারণ বল, অন্নাদি-জনিত।

নারদ। অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কি?

সনৎ। জল। জলই অন্নের কারণ, তজ্জন্যই জল শ্রেষ্ঠ। এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরীক্ষ, ইহা জল হইতে উৎপন্ন। জল অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তি। জলই জগদাত্মক জানিও। "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" অতএব ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে জলের উপাসনা করিলেই কামনা-সিদ্ধি।

নারদ। জল প্রথম সৃষ্ট—তবে জল হইতে শ্রেষ্ঠ কি আছে?

সনৎ। "তেজো বাবাদ্ভ্যোভূয়ঃ" জল হইতে তেজ শ্রেষ্ঠ। "তেজসঃ আপঃ" তেজ হইতে জলের সৃষ্টি। তেজ তরল হইয়া জলাকারে পরিণত হয়। তবে যে মনুতে "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" বলা হইয়াছে, আবার এস্থলে তেজ হইতে জলের সৃষ্টি বলা হইল, ইহা বিরুদ্ধার্থক নহে। "অপএব সসর্জ্জাদৌ"সে অপ্—কারণ-বারি, অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের তরল অবস্থাই "অপ্" শব্দবাচ্য। পঞ্চীকৃত জল—যাহা আমাদের পেয়—তাহা এ—অপ্ শব্দে বুঝিবে না।

নারদ। তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ কি? তেজসোবাব ভূয়োঽস্তীতি?

সনৎ। আকাশ।* আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োঃ তেজঃ, তেজসঃ আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। তেজের কারণ বায়ু, বায়ুর কারণ আকাশ—এই আকাশকেই "ব্রহ্ম" বলিয়া জানিও। অতএব আকাশের উপাসনা কর। "যদেষ আকাশো ন স্যাৎ" আকাশের ব্রহ্মরূপতা স্বীকৃতই আছে।

প্রশ্নোত্তর চলিতে থাকিল। ক্রমে আকাশের কারণ রূপে 'স্মরণ' নির্দ্দিষ্ট হইল। কারণ স্মৃর্ত্তা, স্মরণ করিলে তবে আকাশাদি সার্থক; স্মরণ না হইলে আকাশাদি থাকিয়াও না থাকার মত। যদি স্মৃতি-লোপই ঘটে, তবে আকাশাদির সত্তাই থাকেনা। তাহার পর স্মৃতির কারণ রূপে 'আশা' নির্দ্ধারিত হইল। অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্খাই আশা। আশা, তৃষ্ণার কারণ। আশা বশতই অন্তঃকরণ, স্মরণ করে। আশা আছে, তাই বেদ-পাঠে স্পৃহা, কর্ম্ম-ফলে আসক্তি। অতএব স্মরণ হইতেই আকাশাদি। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আশারসনাবদ্ধ হইয়াই চক্রাবৎ ঘূর্ণায়মাণ হইতেছে।

নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে। সূত্র যেমন মণিগণকে গ্রথিত ও বিধৃত রাখে, প্রাণও তদ্রূপ নাম-রূপাত্মক যাবৎ পদার্থকেই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। হিরণ্যগর্ভ, প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা। "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" (কৌষীতকী উপনিষৎ) প্রাণই পরমেশ্বরোপাধিক; এই প্রাণই সমষ্ট্যাত্মক হইয়া পুরাণে "ব্রহ্মা" নামে অভিহিত। "প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং" "প্রাণে হস্তমেতি"—প্রলয়কালে চরাচর ব্রহ্মাত্মক-মহত্তত্ত্বে লীন হইয়া থাকে।

"প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণায় দদাতি প্রাণঃ পিতা, প্রাণো মাতা, প্রাণঃ ভ্রাতা,

* তেজের সহিত বায়ুর অন্তর্ভাব করিয়া, পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

প্রাণঃ স্বসা, প্রাণঃ আচার্য্যঃ, প্রাণো ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত জগতের প্রাণই সর্ব্বস্ব। প্রাণই সর্ব্বেশ্বরময়, অতএব হে নারদ, সেই প্রাণের উপাসনা কর! আকাঙ্খার পূরণ হইবে। এ প্রাণ মুখ্য।

নারদ প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেন। প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ কি? ইহা আর জিজ্ঞাসা করিলেন না। সনৎকুমার দেখিলেন—শিষ্য নারদ মুক্তিকামী। এই যে প্রাণ-বিজ্ঞান ইহা অনৃত; কারণ ইহারও বিকার ও বিনাশ আছে। সনৎকুমার বুঝিলেন যে, এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানে তুষ্ট হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া শিষ্য প্রতারিত হইতেছে—কাজেই শিষ্য-মঙ্গলা-কাঙ্খী ভগবান্ সনৎকুমার, শিষ্যকে মিথ্যা-বিজ্ঞান হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনিই বলিলেন—"দেখ"—

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" প্রাণেরও উৎপত্তি আছে। প্রাণোপাসনায় নামাদি-উপাসনা অপেক্ষা সিদ্ধি অধিক। সুতরাং তুমি সত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, অতএব সত্য জিজ্ঞাসা কর"!

নারদ বুঝিতে পারিলেন,—"বিকারজাত পদার্থমাত্রেই অনৃত।" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং"। নাম-রূপাত্মক পদার্থমাত্রই সত্য নহে, অতএব সত্যই ব্রহ্ম।

তখন সনৎকুমার বলিলেন—"সত্য ব্রহ্ম নহে, সত্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত রহেন মাত্র; "সত্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং"। তবে ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া প্রাণকে সত্য বা সত্যকে ব্রহ্ম বলা যায়—

"প্রাণো বৈ সত্যং। সত্যং বৈ ব্রহ্ম"।

আবার নারদ ও সনৎকুমারের প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। সত্য হইতে সত্যজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কারণ, সত্যকথনের প্রতি সত্যজ্ঞান কারণ। আবার সত্যবিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হইল—"মতি"। মতি—মনন তর্ক, মন্তব্য বিষয়। মতির পর শ্রদ্ধা শ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধা—আস্তিক্য-বুদ্ধি (গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস)। আস্তিক্য বুদ্ধি না জন্মিলে মতি বা মনন হইবে কোথা হইতে? মতি না হইলে সত্যজ্ঞান হয় না; সত্যজ্ঞান না থাকিলে সত্য বলা চলেনা।

শ্রদ্ধার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা! নিষ্ঠা—ব্রহ্মবিজ্ঞাননিমিত্তক তৎপরতা। গুরুশুশ্রূষাদিই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা হইতে শ্রেষ্ঠ—কৃতি। কৃতি—ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদন। ইন্দ্রিয়সংযম, বা চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদনে নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠা না জন্মিলে শ্রদ্ধা হয় না। নিষ্ঠা না থাকিলে যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য নিষ্ফল।

সকলকার মূলে সুখেচ্ছা। সুখেচ্ছা-জন্যই মানবের বেদপাঠাদি। সুখান্বেষণই মানবের সাধনা। সেই সুখ প্রায়শ বৈষয়িক। বৈষয়িক সুখ আকাঙ্খার বিষয় নহে, তজ্জন্য ভগবান্ সনৎকুমার বলিলেন, "সুখংত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যং"। শিষ্য নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন "সুখং বাব ভগবো বিজিজ্ঞাসে"—প্রকৃত সুখই জানিতে চাই!

সনৎকুমার তখন বুঝিতে পারিলেন, এইবার শিষ্য যথার্থ প্রশ্ন করিয়াছে; উত্তরে বলিলেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং

নাল্পে সুখমস্তি; ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।”

নারদ। সেই ভূমাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

সনৎ। বহু শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয় করিয়া ‘ভূমা’ শব্দ নিষ্পন্ন। যাহা মহান্, নিরতিশয়, বহু ও বৃহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন, তাহাই ভূমা। ভূমা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। বিষয়ের সুখ—ক্ষণিক, দুঃখ-মিশ্র; সে সুখ—অল্প, তাহা ভূমা নহে। “ভূমৈব সুখং”—ভূমাই প্রকৃত সুখ। “নাল্পে সুখমস্তি” অল্পে সুখ নাই। অল্পে কেহ সন্তুষ্ট হয় না; অল্পে তৃষ্ণা মেটে না। তৃষ্ণাই দুঃখের বীজ। দুঃখের বীজ সত্ত্বে সুখ কি? এই কারণে অল্পে সুখ নাই। “ভূমা”-সুখে তৃষ্ণাদি দুঃখ-বীজ থাকার সম্ভাবনা নাই।

নারদ। সে ভূমা পদার্থটি কি?

সনৎ। অগ্রে ভূমার মূলতত্ত্বটি বোঝ, তবে পদার্থ বুঝিবে!

“যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছৃণোতি, অন্যদ্বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। স ভূমা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি”।

যে তত্ত্ব-বিচারে পৃথক্ কোন দ্রষ্টব্য থাকে না, অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বব্যতিরিক্ত কোন দৃশ্য বস্তু, ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখিবার থাকে না, শুনিবার বা জানিবার থাকে না—তাহাই ভূমা। যদি অন্য কিছু দেখিবারই থাকে, তবে ত দ্বৈতই রহিল। অদ্বৈত যখন ভূমা, তখন দ্বৈত থাকিবে কেন?

নারদ। অন্য কিছু দেখিবার থাকে না—তাহা হইলে আত্মাকে ত দেখিতে হইবে! যেমন গৃহে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; বুঝিতে হইবে, অন্য কোন দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শনাভাব মাত্র সূচিত হইতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে শুন্তাদি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা নহে। তাহা হইলে অন্য কোন প্রসিদ্ধ বস্তুর দর্শনাভাব—ইহাই কি অর্থ?

সনৎ। না! এরূপ অর্থ নহে! অন্য কোন বস্তু দেখা যাইতেছেনা, কিন্তু আত্মাকে দেখা যাইতেছে—এরূপ অর্থ করিলে অদ্বৈতের হানি, দ্বৈতের উপপত্তি হয়; সংসার-নিবৃত্তির চিরকালের জন্য অসম্ভাব ঘটে।

নারদ। বুঝিলাম না।

সনৎ। “একত্বদর্শীর ভেদ কোথায়! “কঃ কেন কিং পশ্যতি” কে কাহাকে কি জন্য দেখিবে? “কঃ কেন কং বিজানাতি” কে কাহাকে জানিবে? কর্ত্তা, করণ ও ক্রিয়াদি ভেদজ্ঞান হইতেই সংসার। যেখানে কর্ত্তা, করণ, ক্রিয়াদি ভেদজ্ঞান থাকে, সে স্থলে একত্ব-জ্ঞান জন্মে না। ভূমা-সুখে যদি কর্ত্তা, করণ, ক্রিয়াদি-ভেদই থাকে, তবে ত আত্মাকে দেখিতেছেনা—এরূপ জ্ঞানই হইবে! আপনা হইতে বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্বজ্ঞান থাকিলে সে জ্ঞান অদ্বৈত-জ্ঞান হইবে না। “ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং” “তত্ত্বমসি” এ সকল শ্রুতি যে ব্যাহত হইয়া পড়িবে!

“ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য” “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ”। তবেই বোঝ, দেখিবার কিছুই থাকে না।

দেখিবার কিছু থাকে—এই বোধই ভেদ-জ্ঞান। এই ভেদজ্ঞান থাকিবে, অথচ আবার ব্রহ্মাত্মকত্ব-জ্ঞান হইবে,—ইহা সম্ভব নহে। মোট কথা, অবিদ্যাবস্থায় অন্যদর্শনাদি ঘটা স্বাভাবিক বলিয়াই ভূমা-স্বরূপ-বিচারে সর্ব্ববিধ দর্শনাভাবের কথা বলা হইল। অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপাদি-জ্ঞানই অবিদ্যাকার্য্য। অবিদ্যা কাটিলে পরে নামরূপাদি-জ্ঞান থাকেনা। কাজেই তখন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব-বোধ জন্মে না। সেই সময়েই "ব্রহ্মৈবেদং—সর্ব্বং"—"তত্ত্বমসি"। "তদন্যং, যত্রান্যৎ পশ্যতি"—যে স্থলে অন্য দেখিবার থাকে তাহাই মর্ত্ত্য মরণ-স্বভাব। "যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং"।

নারদ। "স কস্মিন্ ভগবঃ—প্রতিষ্ঠিতঃ" সেই ভূমা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত? ভূমার—আশ্রয় কে?

সনৎ। ভূমা স্বমহত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভূমা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ। কিন্তু নারদ, আপনাতে আপনি অবস্থিত—এ কথার অর্থ, কাহাতেও অবস্থিত নহে; ভূমার আশ্রয় নাই। ভূমা কাহাতেও প্রতিষ্ঠিত নহে। তবে কাহাতে প্রতিষ্ঠিত—ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—তাই বলিলাম স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ। বুঝিলে, ভূমা মুখ্য প্রাণও হইতে পারে না।

নারদ। এই ভূমাকে প্রথম আমি মুখ্য প্রাণ ভাবিয়াছিলাম, কারণ সুষুপ্তাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল প্রাণগ্রস্ত থাকায় দর্শনাদি-ব্যবহার নিবৃত্তি পায়—এই "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইহা প্রাণের লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। মনে করিবার চারিটী কারণ ছিল। ১ম, সুষুপ্তি অবস্থায় শ্রুতি আছে "ন শৃণোতি ন পশ্যতি" ২য়, সুষুপ্তি অবস্থায় সুখ, ব্রহ্মানন্দের অনুরূপ; "অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি অথ যদেতৎ অস্মিন্ শরীরে সুখং ভবতি" সুষুপ্তি অবস্থায় সুখ শ্রবণ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট। ৩য়, প্রাণোবা অমৃতং।—প্রাণই অমৃত। ৪র্থ, প্রাণ শব্দ আত্মপর্য্যায়ে উক্ত আছে—"যথা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং"।

সনৎ। প্রাণ ভূমা নহে। পরমাত্মা ব্রহ্মই ভূমা। তুমি প্রশ্ন করিলে না বলিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছিলে। প্রাণ শব্দে কোন কোন স্থলে আত্মা বিবক্ষিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রাণের আত্মত্ব মুখ্যাবৃত্তি-গম্য নহে। "তমেব ভগবন্ শোকস্য পারং গময়তি" প্রাণবিজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় না। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" আত্মজ্ঞান ব্যতীত মায়াপাশ-ছেদনের অন্য উপায় নাই। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ—কেন কং পশ্যেৎ" এই শ্রুতিতে স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে—"যাঁহার "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" এই জ্ঞান আছে, তাঁহারই "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" হইতে পারে। সুষুপ্তাবস্থায় যে সুখ—তাহা ভূমা-সুখের কণিকা-তুল্য—অর্থাৎ যদি কোন সুখের সহিত ব্রহ্মানন্দ বা ভূমাসুখ কিঞ্চিন্মাত্র তুলিত হইতে পারে, ত তাহা সুষুপ্তাবস্থার সুখ। সর্ব্বগতত্ব স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা সর্ব্বাত্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম পরমাত্মার সম্ভব; প্রাণে সম্ভব নহে।

নারদ। ভূমা—আত্মা বা ব্রহ্ম। আত্মা নির্দ্ধর্ম্মক, তবে এই সর্ব্বগতত্বাদি ধর্ম্ম, পরমাত্মার বা কি প্রকারে সম্ভব?

সনৎ। ঔপাধিক ধর্ম্ম। প্রাণে ঔপাধিক সর্ব্বগতত্বাদি ধর্ম্মেরও ত সম্ভাবনা নাই। আর যদি প্রাণে সর্ব্বগতত্বাদি ধর্ম্ম কল্পিত থাকে, তবে সে স্থলে আত্মারই ঔপাধিক ধর্ম্ম প্রাণে আরোপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এই ভূমা আত্মা বা ব্রহ্ম। ইহা মহান্ অপরিচ্ছিন্ন, বৃহৎ ও পরিপূর্ণ। আর ভূমানন্দ বা ভূমাসুখ—অদ্বিতীয়, তৃষ্ণাদি-দুঃখবীজশূন্য—অতএব সম্পূর্ণ ও নিত্য। ইহাই অমৃত, ইহাই মোক্ষসুখ। অতএব বৎস, "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

উপাসনা।

(৪) রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণ-প্রণালী।

V.

"অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্দেবায়া-নিবেদিতম্।" যে ভক্ষ্য দ্রব্য, দেবতাকে নিবেদন করা হয় না, তাহা বিষ্ঠা, আর পেয় দ্রব্য নিবেদিত না হইলে মূত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি, নিজ ইষ্ট-দেবতাকে সমর্পণ করার উপায়, শাস্ত্র এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; নিজের যাবতীয় ভক্ষ্য দ্রব্য তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ-জ্ঞানে পরমভক্তি সহকারে গ্রহণ করিবে, ইহাই রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সমর্পণ-প্রণালী। সাধক কোন দ্রব্য তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন গ্রহণ করেন না; যাহা কিছু রসনেন্দ্রিয়ের উপভোগ্য নিজের প্রিয় দ্রব্য আছে, তাহা অতি যত্ন সহকারে ও পবিত্র ভাবে আহরণ পূর্ব্বক নিজ ইষ্ট-দেবতার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া অতি দীন ভাবে আত্মনিবেদন করিয়া বলেন "প্রভু আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর"। পরে লব্ধ প্রসাদ দ্রব্য, অতি ভক্তি-ভাবে নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের তৃপ্তি-সাধন করেন। সাধক, নিজের জন্য কিছুই করেন না, সমস্তই তাঁহার ইষ্টদেবতার তৃপ্তির জন্য করিয়া থাকেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

গীতা ৩ অঃ ১৩ শ্লোক।

যাঁহারা দেবযজ্ঞাদি-সমাপনান্তে তদবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই সাধুগণ, সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন, আর দুরাত্মগণ নিজের উদর-পূর্ত্তিমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি করে, তাহারা পাপই ভোজন করে। তাৎপর্য্যার্থ এই, যে মানব অহং-ভাবাপন্ন হইয়া আহার করে, সে ঐ আহার-ক্রিয়ার সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং তাহার অহং-ভাব (অভিমান) আরও পরিপুষ্ট হয় সুতরাং সে পাপ ভোজন করে।

রসনেন্দ্রিয়ের ভোগ্য দ্রব্য ইষ্টদেবে সমর্পণপূর্ব্বক ভোগ করিলে, সাধক, বিষয়ে বদ্ধ হন না। তিনি প্রসাদ-জ্ঞানে ভোগ করায় তাঁহার ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, বিষয়ে আসক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে, অবশেষে তিনি মোক্ষমুক্ত

সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত-আসক্তি-শূন্য হইয়া পড়েন। কিন্তু নিজের যাহা প্রিয়তম বস্তু, যদ্দ্বারা নিজে আসক্ত হন, সেই প্রকার ভোগ্য বস্তুই তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। নিজের বেলায় ক্ষীর, সর, নবনীত, আর তাঁহার বেলায় মনুষ্যের অখাদ্য দ্রব্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে চলিবে না; তদ্দ্বারা রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সমর্পণ হইবে না বরং আত্মা, আরও পঙ্কিল হইয়া পড়িবে।

শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

যাহা সকলের প্রিয় বস্তু ও যাহা নিজের প্রিয়তম, তাহা আমাকে নিবেদন করিবে। তাহাতে, অনন্ত ফল হইয়া থাকে।

নাভক্ষ্যং দদ্যাৎ নৈবেদ্যং

যাহা নিজের ভক্ষ্য নহে, তাহা ইষ্টদেবকে নিবেদন করিবে না।

নিজ ইষ্টদেবকে ভক্ষ্য-দ্রব্য-সমর্পণকালে নিজের ভাব পরিশুদ্ধ থাকা আবশ্যক। ইহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমর্পণকালেই আবশ্যক। ভাব ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না।

"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"

তিনি সাধকের যে সরল দীনভাব, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি তোমার-আমার আলোচা'লের জন্য লালায়িত নহেন! তিনি চাহেন, তোমার-আমার ভাব ও অনুরাগ! তাঁহার কিছুরই অভাব নাই সত্য, কিন্তু যিনি ভক্ত, তিনি নিজ ইষ্টদেবের অভাব আছে কিনা—তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কেন? যেমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির অনুগত প্রজা, নিজ পরিশ্রমলব্ধ অতি সামান্য উপঢৌকন উপস্থিত করিয়া নিজে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহার প্রভু সে সকল জিনিষ চাহেন কিনা, তৎপ্রতি দৃষ্টি করে না; সেইরূপ আমার যাহা প্রিয়, সমস্তই আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিব এবং আমি কোন দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া নিজে গ্রহণ করিব না; তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন; আমার হৃদয়ের অনুরাগ, তাঁহার প্রতি সমর্পিত হইলে, তদ্দ্বারা আমার ফল-লাভের তারতম্য হইবে না। যাঁহার অন্তরে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তিনি যাহা কিছু ভাল বাসেন সমস্তই ইষ্টদেবতার চরণে সমর্পণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন কেন? আহার সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য তিনি পরার্থে—নিজ ইষ্টদেবতার জন্য নিয়োগ করেন এবং তৎসহ যাহাতে আহার-শুদ্ধি হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন; কারণ আহারশুদ্ধি ব্যতীত সাধন ভজন কিছুই হয় না, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদিত সত্য।

আহার-শুদ্ধ্যা নৃপতে! চিত্তশুদ্ধিস্তু জায়তে।
শুদ্ধে চিত্তে প্রকাশঃ স্যাদ্ধর্ম্মস্য নৃপসত্তম।

দেবী-ভাগবত ৬।১১।৫০

হে নৃপসত্তম! আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্তে সাত্ত্বিকভাব আসে। চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহাতে ধর্ম্ম, পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, তাহা আলোচনা করিলেই আহারশুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মের কিরূপে উন্নতি হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভারতীয় ধর্ম্ম, কোন

কাল্পনিক পদার্থ নহে। যাহা আছে বলিয়া মনুষ্য, 'মনুষ্য' নামে অভিহিত হয়; যাহা না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, তাহাই আর্য্যশাস্ত্রানুসারে মনুষ্যের ধর্ম্ম। "ধৃঙ" অবস্থানে এই ধাতুর উত্তর "মন্" প্রত্যয় দ্বারা 'ধর্ম্ম'পদ সাধিত হইয়াছে। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, মনুষ্যের ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব। মহর্ষি মনু, মনুষ্যের প্রধান দশটী ধর্ম্ম এই প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-
নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।

(১) ধৃতি—অর্থাৎ ধারণা করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি। কোন একটীমাত্র বিষয় দেখিয়া বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-নিবৃত্তি হয় না। দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তাদৃশী গতি, কিঞ্চিৎ কালের জন্য নিরোধ করিলে, ঐ দর্শন বা শ্রবণ-ক্রিয়াজনিত একটী সংস্কার বা মনোমধ্যে যে একটী রেখা অঙ্কিত হয় অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনর্ব্বার স্মৃতি-রূপে মনে উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তির নাম ধৃতি। (২) ক্ষমা—কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকারে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায়। (৩) দম—শোক-তাপাদি দ্বারা কোন প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়। (৪) অস্তেয়—অবিধিপূর্ব্বক পরস্ব-গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়। (৫) শৌচ—শরীর ও চিত্তের নির্ম্মল-ভাব রূপ শক্তি। (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়। (৭) ধী-শক্তি—শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব-নিশ্চয়-শক্তি। (৮) বিদ্যা—যে শক্তি দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়। এইটী সর্ব্বোচ্চ পরম ধর্ম্ম। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্" যোগ দ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরমধর্ম্ম। এই ধর্ম্মটীর স্ফুরণ হইলেই মনুষ্যের উন্নতির চরমাবস্থা হয়, মনুষ্য কৃতকার্য্য হয়। এজন্য এইটীই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। (৯) সত্য—কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা। (১০) অক্রোধ—যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে নিরোধ করা যায়। (পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত) ইহা ভিন্ন বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি আরও কতকগুলি ধর্ম্ম আছে।

যে আহারের দ্বারা এই সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির পুষ্টিলাভ হয় এবং ঈর্ষ্যা, অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি অধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়, তাহাই শাস্ত্র-বিহিত। আহার-সংযম না হইলে সাধন ভজন কিছুই হয় না, এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে আহার সম্বন্ধে এত বিধি-নিষেধ। উৰ্দ্ধবীর্য্য

দ্রব্য ভক্ষণে রজ ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায় এবং নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সুতরাং ঐরূপ দ্রব্য সম্যক্ পরিহার করিতে হইবে। যাহা সত্ত্বগুণের বিরোধী, তাহা কদাচ সেবনীয় নহে; এজন্য যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

পলাণ্ডুং বিড়্ বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রাম-কুক্কুটম্।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥

পেঁয়াজ, গ্রাম্য শূকর, বেঙের ছাতী, গ্রাম্য কুক্কুট, রসুন, গাঁজর এই সমস্ত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের কামোদ্দীপক ও তমোগুণবর্দ্ধক শক্তি অত্যন্ত বেশী এবং তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ বিশেষ-ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ভগবান্ মনুও পঞ্চমাধ্যায়ে এই কথাই বলিয়াছেন—

ছত্রাকং বিড়্ বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম-কুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥
মনু ৫।১৯

ছত্রাক (বেঙের ছাতী) গ্রাম্য শূকর, রসুন, গ্রাম্য কুক্কুট, পেঁয়াজ, গাঁজর এই সকল বুদ্ধিপূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া খাইলে দ্বিজাতিরা পতিত হন।

মনু প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ বৈধ ও অবৈধ মাংস নির্দ্দেশ করিয়া, পরিশেষে সর্ব্বপ্রকার মাংস-ভক্ষণ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥
মনু ৫ অঃ ৪৯ শ্লোক।

শুক্র-শোণিত দ্বারা মাংসের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহা ঘৃণিত এবং বধ-বন্ধন নিষ্ঠুর হৃদয়ের কর্ম্ম, ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধুরা বিহিত মাংসেরও ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অবৈধ মাংসের কথা আর কি বলিব?

প্রকৃত পক্ষে আহার বিষয় আর্য্যগণের এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম কুসংস্কার-জাত নহে; এই সকল নিয়ম আধ্যাত্মিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা অধ্যাত্ম-রাজ্যের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন; কোন্ দ্রব্য আহার করিলে অধ্যাত্মশক্তি নষ্ট হয়—তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞানসম্মত; যাহা স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ ধর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি-কারক, তাহাই তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দেহখানি, বিশুদ্ধ ইস্পাত-নির্ম্মিত অস্ত্রের ন্যায় পরিষ্কার নির্ম্মল অথচ দৃঢ় ও কষ্ট-সহিষ্ণু, তাহাই সাধনার উপযুক্ত যন্ত্র। এই দেহখানিকে পরিষ্কৃত করিয়া সাধনোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করিতে হইলে, ইহার উপাদানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্নের দ্বারা আমাদের দেহ প্রতিনিয়ত গঠিত হইতেছে। অদ্ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা। আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহাই অন্ন; এজন্য আমাদের স্থূল দেহটীকে অন্নময়কোষ বলে। যাহার শরীরের যেরূপ উপাদান, তাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-বৃত্তিগুলিও তদনুরূপ হইবে। অন্ন কারণ, শরীর কার্য্য; এই দেহ অন্নেরই রূপান্তর মাত্র। অন্নের অনুরূপ শরীরের শৌর্য্যবীর্য্য

রূপ-লাবণ্যাদি জন্মিয়া থাকে এবং মানসিক প্রবৃত্তি ও আহারের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায়। সাত্বিক আহার করিলে সাত্বিক সৌম্যপ্রকৃতি হয়, আর উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য আহার করিলে স্বভাব উগ্র উদ্ধত হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যে, যত প্রকার শৌচ (পবিত্রতা) আছে তন্মধ্যে অন্নের পবিত্রতাই শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা। যে ব্যক্তি অন্নের দ্বারা পবিত্র, তিনি যথার্থ পবিত্র, নচেৎ কেবল স্নান বা মৃত্তিকা দ্বারা গাত্র-মার্জ্জন করিলেই যে পবিত্র হয় তাহা নহে। এজন্য আহার সম্বন্ধে আর্য্যগণ এত সাবধান ছিলেন। দেশভেদে ও অবস্থাদিভেদে খাদ্যাখাদ্যের ব্যতিক্রম অপরিহার্য্য। যেদেশে যাহার জন্ম, তাহার পক্ষে সেই দেশজাত ও তথাকার চিরপ্রচলিত খাদ্য দ্রব্যই হিতকর। বিদেশীয় খাদ্য তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। শীতপ্রধান দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যের অনুকূল চা, মদ্য, মাংস, বসা প্রভৃতি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপকারী এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যবহার্য্য শীতল বস্তু, শীতপ্রধান দেশে অপকারী।

কতকগুলি বস্তু সকল সময় অপকারী নহে, কিন্তু সময়-বিশেষে অপকার করে। যথা রাত্রিতে দধিভোজন, প্রতিপদাদি-তিথিতে কুষ্মাণ্ডাদি-ভোজন। কতকগুলি বস্তু, অন্য বস্তুর সংযোগে অপকারী, যেমন দুগ্ধ ও মৎস্য, মৎস্য ও ঘৃত ইত্যাদি। আর্য্যগণ এই সকল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শাস্ত্রে ইহার বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আজ কাল "কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ" প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থহানি হয়,—একথা অনেকেই হাস্যাস্পদ পদ মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে আর্য্যগণ তিথি ও সময়-বিশেষে যে সকল বস্তু শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিজনক, তাহা নিষেধ করিয়া, ভয় দেখাইবার জন্য নানাপ্রকার গুরুতর অনিষ্ট-ফল, তাহার সহিত যোজনা করিয়া দিয়াছেন। যেমন কোন শিশুর জ্বর হইলে পিতা পুত্রকে নিমের কাথ খাওয়াইবার জন্য "চিনি দিব, লাড়ু দিব" বলিয়া প্রলোভন-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন; পুত্র পিতার বাক্যে নিম্বের কাথ খায়, কিন্তু পিতা যে বস্তু দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা পায় না। পিতার উদ্দেশ্য জ্বর আরোগ্য হওয়া, চিনি, লাড়ু দেওয়া নহে, শিশু তাহা বুঝিতে পারে না।

ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক ভাবে অপকারিতা বুঝাইলে, কি জানি আমরা, সামান্য অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া, তাঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করি, ইহা মনে করিয়া "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" কার্য্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উৎপাদনের জন্য নানাপ্রকার অনিষ্ট-বর্ণনা করিয়াছেন; ইহার নাম অর্থবাদ। তিথির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, ইহা অনেকেই পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও একাদশীতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অন্যান্য তিথির সামান্য পরিবর্ত্তন আমাদের লক্ষ্যে আসে না বটে কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, তাহা সমস্ত বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং কোন্ তিথিতে ও কোন্ সময়ে কোন বস্তু ব্যবহার করা

অকল্যাণ-কর, তাহা তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঋষিদিগের প্রচারিত সমস্ত সত্যই একে একে পাশ্চাত্য মনীষীগণ উপলব্ধি করিতেছেন। কালে তিথ্যাদির বিধি-নিষেধের বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি যে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যত প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রসনেন্দ্রিয়ের কার্য্য, মানুষের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া আহার সম্বন্ধে আর্য্যগণ সমস্ত প্রকার তথ্য আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ সেন।

কলিসন্তারণোপনিষৎ।

ওঁ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম, কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি ।১

স হোবাচ ব্রহ্মা, সাধু পৃষ্টোঽস্মি, সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণ-মাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি ।২

নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ, তন্নাম কিমিতি ।৩

স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ, "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনং। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ।৪

ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণবিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি ।৫

পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ, ভগবন্ কোঽস্য বিধিরিতি ।৬

তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাম্ সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি ।৭

যদাস্য ষোড়শীকস্য সার্দ্ধত্রিকোটীর্জপতি, তদা ব্রহ্মহত্যাং তরতি, বীরহত্যাং, স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি। পিতৃদেবমনুষ্যানামপকারাৎ পূতো ভবতি। সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগপাপাৎ সদ্যঃ শুচিতামাপ্নুয়াৎ। সদ্যোমুচ্যতে সদ্যোমুচ্যত ইত্যুপনিষৎ। ওঁ শান্তিঃ।

ইতি কলিসন্তারণোপনিষৎ সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ।

দ্বাপর-যুগের অন্তে দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কি উপায়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াও কলির প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব, কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করুন্ ।১

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। সর্ব্ববেদের রহস্য-স্বরূপ পরমগোপনীয় কলিসন্তারণোপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগবান্ আদিপুরুষ নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেই কলিকাল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় ।২

নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানের সেই নাম কি ?৩

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" এই

ষোলশড়-নামাত্মক তারকব্রহ্মনাম-মহামন্ত্র কলি-কলুষনাশের একমাত্র ঔষধ। ইহা অপেক্ষা কলিসন্তরণের অপর শ্রেষ্ঠ উপায়, সমগ্র বেদ বিশ্লেষণ করিয়াও দেখা যায় নাই।৪

ষোড়শকলাসম্পন্ন জীব-পুরুষের অবিদ্যা-রূপ আবরণ বিনাশ করিতে এই ষোড়শ-নামাত্মক তারকব্রহ্ম-নামমন্ত্রই সমর্থ। এই নামের বলে জীবের অবিদ্যাবরণ অপসারিত হইলে, মেঘমুক্ত সৌরকররাজীর ন্যায় জীবের আত্মপ্রকাশ প্রকটিত হয়।৫

পুনরায় নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই নামমন্ত্র-সাধনের বিধান কিরূপ?৬

ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ইহার নির্দ্দিষ্ট বিধান নাই। সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায়—শুচি অশুচি যে ভাবেই হউক্, ব্রাহ্মণ, যদি এই নামমন্ত্র পাঠ করেন, তবে তিনি সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন।৭

এই ষোড়শনামাত্মক মহামন্ত্র যে কেহ, সাড়ে তিন কোটি বার জপ করিবেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা, বীরহত্যা, স্বুবর্ণস্তেয় প্রভৃতি গুরুতর পাপে পাপী হইলেও অচিরে উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পূত হইবেন। যাঁহারা পিতৃপুরুষ, দেবতা ও মনুষ্য-সমাজের অপকারক, তাঁহারাও এই নামমাহাত্ম্যে পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবেন। এই নাম-মহামন্ত্রের সাধক, সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ মহা-দোষে দোষী হইলেও নাম-বলে দোষ হইতে উদ্ধার পাইয়া শুচিতা প্রাপ্ত হইবেন। তিনি সদ্য মুক্ত হইবেন—সদ্য মুক্ত হইবেন। ওঁ শান্তিঃ।

কলিসন্তারণোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রী——স্মৃতিতীর্থঃ।

ন্যায়দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩১ সূত্র। অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষ-পরীক্ষণমভ্যুপগম-সিদ্ধান্তঃ”।

ব্যাখ্যা। “অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ” অপরীক্ষিতস্য সাক্ষাদসূত্রিতস্য অভ্যুপগমাৎ স্বীকারাৎ (স্বীকার-জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ) “তদ্বিশেষ-পরীক্ষণং” তদ্বিশেষধর্ম্মকথনং “অভ্যুপগম-সিদ্ধান্তঃ”।—

তাৎপর্য্যানুবাদ। যে পদার্থ সূত্রে সাক্ষাৎ উপনিবদ্ধ হয় নাই কিন্তু তাহার স্বীকার-জ্ঞাপক বিশেষপরীক্ষা সূত্রে আছে—তাহার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। ঐ বিশেষ-পরীক্ষার দ্বারা বুঝা যায়, ঐ পদার্থ সূত্রকারের স্বীকৃত।

টীকা। অধিকরণ-সিদ্ধান্তের পরে এবার চতুর্থ অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলিতেছেন। এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহা সূত্রে সাক্ষাৎ বর্ণিত হয় না, কিন্তু সূত্রকার ঐপদার্থের কোন বিশেষপরীক্ষা করিয়া থাকেন—অর্থাৎ তাহার বিশেষধর্ম্ম, যুক্তির দ্বারা প্রকাশ করেন। তাহাতে বুঝা যায়, সূত্র-কারের সূত্রে সাক্ষাৎ বর্ণিত না হইলেও উহা তাঁহার স্বীকৃতসিদ্ধান্ত। যেমন মহর্ষি গোতমের মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব। মহর্ষি তাঁহার কোন সূত্রেই সাক্ষাৎ মনের ইন্দ্রিয়ত্বের বর্ণন করেন নাই, কিন্তু মনঃপরীক্ষাকালে মনের এমন সব বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার স্বীকৃত, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। এইরূপ সিদ্ধান্তকেই

অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলে। মহর্ষি, এই সূত্রের দ্বারা সেই "অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের" স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে "অপরীক্ষিত" শব্দের অর্থ—যাহা সূত্রে সাক্ষাৎ উপনিবদ্ধ নহে। "অভ্যুপগম" শব্দের অর্থ স্বীকার। "অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ" এই স্থানে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ—জ্ঞাপকত্ব। তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা গেল, অপরীক্ষিত অর্থাৎ যাহা সূত্রে সাক্ষাৎ উপনিবদ্ধ নহে তাহার স্বীকার-জ্ঞাপক। তাহার পরে আছে "তদ্বিশেষ-পরীক্ষা" তাহার অর্থ, সেই পদার্থের বিশেষ-ধর্ম্ম—কথন। তাহা হইলে সূত্রবাক্যের স্থূল অর্থ হইল, অপরীক্ষিতের স্বীকার-জ্ঞাপক যে তদ্বিশেষ-ধর্ম্মকথন—তাহাই অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভাষ্যকার পক্ষিলস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার মতে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত অন্যরূপ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এবং তাৎপর্য্য-টীকাকার মিশ্রমহোদয়ের গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহাদের ব্যাখ্যা ও উদাহরণই এখানে অবলম্বন করিয়াছেন। তবে মিশ্রমহোদয় সূত্রের পঞ্চমী বিভক্তি 'হেত্বর্থে প্রযুক্ত' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন "অভ্যুপগমাদিতি জ্ঞাপকত্বে পঞ্চমী"। বিশ্বনাথের মতে এখানে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপকত্ব। মিশ্রমহোদয়ও বলিয়াছেন "তস্মাদ্বিশেষপরীক্ষণাজ্ জ্ঞায়তেঽসূত্রিতমভ্যুপগতং সূত্রকারেণ"। মূল কথা, বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা নূতন নহে। উদ্দ্যোতকর ও টীকাকার মিশ্রমহোদয়ের ব্যাখ্যাই বিশ্বনাথ গ্রহণ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন "অপরীক্ষিতোঽসূত্রিতঃ"। অপরীক্ষিত বলিলে "অসূত্রিত" অর্থাৎ সূত্রে উপনিবদ্ধ নহে এমন অর্থ কেন বুঝি? তাই সেখানে টীকাকার মিশ্রমহোদয় লিখিয়াছেন "সূত্রিতস্য প্রায়েণ পরীক্ষাসম্বন্ধাৎ"। অর্থাৎ যাহা সূত্রে উপনিবদ্ধ হইয়া থাকে, সূত্রকার কর্ত্তৃক প্রায়ই সে গুলি পরীক্ষিত হইয়া থাকে। মনের ভাব—"অপরীক্ষিত" অর্থাৎ যাহার সামান্য পরীক্ষা নাই। সুতরাং সূত্রে যাহা সাক্ষাৎ বর্ণিত হয় নাই, ইহা, উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে। বার্ত্তিককার সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "অপরীক্ষিতোঽসূত্রিত ইতি যোঽর্থঃসূত্রেষু নোপনিবদ্ধঃ শাস্ত্রে চাভ্যুপগতঃ-সোঽয়মভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি। যথা নৈয়ায়িকানাং মনইন্দ্রিয়মিতি।" বার্ত্তিককার স্পষ্টই বলিয়াছেন, যাহা সূত্রে উপনিবদ্ধ নহে কিন্তু মূল শাস্ত্রে স্বীকৃত, তাহাই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। টীকাকার মিশ্রমহোদয়েরও কথা ঐ। বহুসম্মত ব্যাখ্যা বলিয়া আমরা সূত্র-ব্যাখ্যায় এই মতই অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের কথা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিব না, তাই এখন ভাষ্যের কথা বলিব। ভাষ্যকার বলেন "অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ" ইহার অর্থ—যে কোন পদার্থকে পরীক্ষা না করিয়া স্বীকার করিয়া। বিচারকর্ত্তা অনেক সময়ে নিজ-বুদ্ধির আতিশয্য-খ্যাপনের ইচ্ছায় এবং পর বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা-বশতঃ নিজের অসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াই তাহার বিশেষ-পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যেমন একজন বলিলেন, শব্দ দ্রব্যপদার্থ; অপর ব্যক্তি বলিলেন, তাহা নহে, শব্দ গুণ-পদার্থ। দুইজনে বিচার চলিতে লাগিল। শেষে দ্বিতীয় ব্যক্তি, প্রতিপক্ষকে নিজ-মতে

অসিদ্ধান্ত হইলেও বলিয়া বসিলেন "অস্তু দ্রব্যং শব্দঃ সতুনিত্যোহ্ থানিত্যঃ"। অর্থাৎ মানিলাম, শব্দ দ্রব্যপদার্থ কিন্তু ঐদ্রব্যাত্মক শব্দ নিত্য—অথবা অনিত্য। এখানে শব্দের দ্রব্যত্ব পরীক্ষা না করিয়াই মানিয়া লইয়া, তাহার বিশেষ অর্থাৎ নিত্যত্বাদির পরীক্ষা হইতেছে, তাই বিচারস্থলে ঐ ভাবে স্বীকৃত-সিদ্ধান্তই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা, সূত্রপাঠ করিয়া সরলভাবে বুঝা যায়। "অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ" ইহার দ্বারা যাহা সূত্রে সাক্ষাৎ বর্ণিত হয় নাই তাহার স্বীকার-জ্ঞাপক বা স্বীকার-হেতুক এইরূপ অর্থ, সূত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা হয় না। অপরীক্ষিত শব্দের "অসূত্রিত" অর্থ কষ্টকল্পনামূলক, ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত। বস্তুতঃ আমরা বিচারগ্রন্থের টীকাকারগণের টীকার অনেক স্থানেই "অভ্যুপগম্য ইদমুচ্যতে" "ইত্যাভ্যুপগমবাদঃ" "অভ্যুপগম-প্রৌঢ়িবাদাভ্যাং" ইত্যাদি কথা পাইয়া থাকি। অর্থাৎ যেখানে যে কোন কারণে কোন পদার্থের পরীক্ষা না করিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার বিশেষ-পরীক্ষা হয়, সেখানে "অভ্যুপমবাদ" কথাটার ব্যবহার, আমরা খুবই দেখি। ভাষ্যকার বলেন, নিজ বুদ্ধির আতিশয্য-জ্ঞাপনেচ্ছা ও পরবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞাবশতঃই ঐরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছেন (২৬ সূত্রে) অভ্যুপগম-সংস্থিতিরনবধারিতার্থপরিগ্রহঃ—তদ্বিশেষ—পরীক্ষণায়াভ্যুপগম-সিদ্ধান্তঃ"। অর্থাৎ বিশেষ-পরীক্ষার জন্য অপরীক্ষিত অর্থাৎ অনবধারিত পদার্থের গ্রহণ অভ্যুগপমসিদ্ধান্ত। মহর্ষি-সূত্রানুসারে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সরলও যথাশ্রুত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উদ্দ্যোতকর, ন্যায়বার্ত্তিকে এব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন। টীকাকার মিশ্রমহোদয়ও ভাষ্যের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাহা শাস্ত্রে অস্বীকৃত, তাহা সিদ্ধান্ত, ইহা ব্যাখ্যা করা যায় না। পরাবজ্ঞার জন্য তাহা মানা যায় না। পরাবজ্ঞা উচিত নহে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতিই "অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত।" এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাই সূত্রের ব্যাখ্যা। পরম প্রাচীন ভাষ্যকারের মনের ভাব আমরা বুঝিয়াছি যে, সকল সিদ্ধান্তই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত নহে। "প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত"ও অনেক আছে। মহর্ষিও তাহা বলিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত-ভেদ আছে বলিয়াই বাদ-জল্প-বিতণ্ডার প্রবৃত্তি হইতেছে। নচেৎ বিচারেরই কোন প্রয়োজন ছিলনা। মহর্ষি যদি বিচারের জন্যই সিদ্ধান্তের ভেদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ—ইহা বলিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যেখানে বিচারের জন্য—পদার্থের বিশেষ-পরীক্ষার জন্য অপরের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াই লওয়া হয়, তাহাকেও তখন একটা সিদ্ধান্ত মধ্যে গণ্য করা উচিত। সে সিদ্ধান্ত খাঁটি না হইলেও কোন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বটেই। সেই সম্প্রদায়ের তাহাই নিশ্চিত শাস্ত্রার্থ। সুতরাং সিদ্ধান্তের সামান্য-লক্ষণ তাহাতেও আছে। কোন্‌টী যথার্থ সিদ্ধান্ত—ইহাত পূর্ব্বে স্থির হইবে না, তজ্জন্য বিচার করিতেই হইবে। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইলে তাহাকে যথার্থ বলিয়া পূর্ব্বে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শব্দকে দ্রব্য পদার্থও কোন—সম্প্রদায় বলেন। তাঁহারা ঐরূপেই শাস্ত্রার্থ-নিশ্চয়

করিয়াছেন; তবে শব্দের দ্রব্যত্ব, কোন তন্ত্রেরই সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে, তাই উহাকে প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলা যায় না। যেমন মীমাংসকদিগের শব্দনিত্যত্ব, সকল মীমাংসক-সম্মত, তাই উহা প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত। শব্দের দ্রব্যত্ব ঐরূপ নহে। উহা কোন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত। যদি কেহ উহার কোন পরীক্ষা না করিয়া বলেন, আমি উহা মানিলাম, শব্দ দ্রব্য হইলে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু শব্দ নিত্য—ইহা আমি মানিনা, উহার নিত্যত্ব-পরীক্ষা আমি করিব। তখন ভাষ্যকারের মতে ঐ শব্দের দ্রব্যত্ব, অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত। উহা একেবারে অসিদ্ধান্ত বলিয়া সর্ব্বসম্মত নহে। সুতরাং বিচারক্ষেত্রে উহাকে "অভ্যুপগম" সিদ্ধান্ত বলিতে তিনি নিঃসংশয়। বিচারক টীকাকারগণ, বিচার-গ্রন্থে অনেক স্থানেই এইরূপ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া বিচার করিয়াছেন; ন্যায়শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। নব্যন্যায়ের অনেক গ্রন্থে অনেক স্থানেই ঐরূপ অভ্যুপগম-সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ-সংগতি করিতে হইয়াছে ও হইয়াথাকে।

এখন দেখিতে হইবে, তবে ভাষ্যকার, মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে কোন্ সিদ্ধান্তের মধ্যে গণ্য করিবেন? এই বিষয়টি চিন্তা করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ—মহর্ষি গোতমের লক্ষণ-সূত্রের "তন্ত্র" শব্দের অর্থ কি? ইহা একবার চিন্তা করিতে হইবে। ব্যাখ্যাকারবর্গের ভাবে বুঝা যায় "তন্ত্র"শব্দের অর্থ ওখানে শাস্ত্রমাত্র নহে, ষড়্দর্শনের সূত্রগুলিই ওখানে তন্ত্রশব্দের অর্থ, কিন্তু তন্ত্রশব্দের ঐরূপ অর্থ-সংকোচ সুসংগত নহে, বিশেষ আবশ্যকও নহে। যদি তন্ত্র বলিতে ওখানে শাস্ত্রমাত্রই বুঝি, তাহা হইলে মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে ভাষ্যকার, সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তই বলিতে পারেন। "সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ" ইহাই ত সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের লক্ষণ? মনের ইন্দ্রিয়ত্ব, সর্ব্বতন্ত্রে অবিরুদ্ধ। গোতমাদি-তন্ত্রে সাক্ষাৎ অধিকৃত না হয়, অন্য শাস্ত্রে ত মনকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। "মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" ইত্যাদি গীতা-বাক্যও ত শাস্ত্র? স্মৃতিশাস্ত্রেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সুব্যক্ত আছে। বেদান্তপরিভাষাকার ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র, যাহাই বলুন, তাঁহার গ্রন্থ ত শাস্ত্র নহে? মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কোন শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহা তাঁহাকেও বলিতে হইবে। আর যদি "তন্ত্র" বলিতে ঋষিদিগের দর্শন কয় খানাই বুঝি,—তাহাতেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব উহার কোন তন্ত্রে অধিকৃত নহে, ইহা কি করিয়া বুঝিব? সাংখ্যতন্ত্রে রহিয়াছে "উভয়াত্মকং মনঃ"। বেদান্ততন্ত্র মহর্ষি-গোতম-তন্ত্রের পরে রচিত, তাহার মত কি এবং তাহাতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব, সূত্রে অধিকৃত হইবে না, ইহা মহর্ষি গোতম, কি পূর্ব্বেই বুঝিয়া লইয়াছিলেন? ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকুক, বেদান্ত-তন্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সুব্যক্তই আছে। আর যদি সিদ্ধান্ত-সামান্য-লক্ষণসূত্রে "সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতঃ" এখানে দ্বিতীয় তন্ত্র শব্দটী গোতমোক্ত ন্যায়-তন্ত্রই বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলেই বা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বাদ পড়িবে কেন? ন্যায়সূত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সাক্ষাৎ অধিকৃত হয় নাই বটে, কিন্তু একেবারে অধিকৃত হয় নাই, ইহা বলা চলিবেনা। তাহা হইলে আর বৃত্তিকার "অপরীক্ষিত" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে "সাক্ষাৎ

অসংস্রিত" বলিতে গিয়াছেন কেন? ঐখানে সাক্ষাৎ শব্দের প্রয়োজন কি? মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ন্যায়সূত্রে একেবারে অবর্ণিত নহে, তাই বৃত্তিকারের ঐখানে 'সাক্ষাৎ' শব্দের আশ্রয়। মহর্ষির সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের লক্ষণে "তন্ত্রেঽধিকৃতঃ" এস্থানে সাক্ষাৎ শব্দ নাই; যে কোন ভাবে তন্ত্রে অধিকৃত হইলেই হইল। সুতরাং মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে ভাষ্যকার, সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিতে সংকুচিত হইবেন কেন? তিনি কি বলেন, তাহা লিখিয়া গেলে আর বড় ভাবনা ছিলনা। প্রাচীনদিগের অপেক্ষায় নব্যগণ বহুভাষী হইলেও তাঁহাদিগের কথা রক্ষা করিতে বড় কষ্ট পাইতে হয় না।

এখন প্রশ্ন এই যে, তবে সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তের লক্ষণ-সূত্রে "তন্ত্রেঽধিকৃতঃ" এই অংশ ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ যাহা সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধ তাহাই "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত" ইহা বলিলে কোন দোষ দেখিনা। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব, সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে, তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ "তন্ত্রেঽধিকৃতঃ" এই অংশের দ্বারা তাহা বারণ করিয়া দিয়াছেন। এখন মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি স্বীকার করিবেন, তাঁহার মতে সূত্রের ঐ অংশের সার্থকতা থাকে না।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাই যে, যেটী "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত" হইবে, সেটী শাস্ত্র-বর্ণিত হওয়া চাই। মনে করুন, আমার জীবন-চরিত চীনদেশীয় ভাষায় লিখিত হয় নাই, ইহা অতি সত্য; তাই বলিয়া উহা কি "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত" হইবে? যদি কেবল সর্ব্বতন্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেই তাহা সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে উহাও সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে। তাই সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তের লক্ষণে বলা হইয়াছে "তন্ত্রেঽধিকৃতঃ" অর্থাৎ যেটী সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইবে—তাহা কোন তন্ত্রে অধিকৃত হওয়া চাই—অর্থাৎ উহাতেও সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ থাকা চাই। বিশেষ-লক্ষণের দোষ-বারণের জন্য ঐরূপ বিশেষণ সকলকেই দিতে হয়, তাই সেই কথাই মহর্ষি বলিয়াছেন। তাহাতে বুঝা গেল, যেগুলি সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ হইলেও কোন শাস্ত্রেই বর্ণিত হয় নাই, তাহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত নহে। যদি "সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধঃ" ইহার অর্থ সর্ব্বশাস্ত্র-বর্ণিত বলা যায়, তাহা হইলে ছল জাতি প্রভৃতি যে কতকগুলি অসদুত্তর আছে, তাহাদের অসদুত্তরত্ব সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হয় না, কারণ উহা কেবল গোতমের ন্যায়-তন্ত্রেই বর্ণিত। সর্ব্ব-শাস্ত্রের সম্মত অর্থ বলিলে যাহা কোন শাস্ত্রে বর্ণিত না হইয়াও সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত তাহাও "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" হইয়া পড়ে! তাই সর্ব্বতন্ত্রে অবিরুদ্ধ অথচ কোন তন্ত্রে অধিকৃত অর্থাৎ সিদ্ধান্তের সামান্য-লক্ষণযুক্ত পদার্থকেই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। আমরা প্রাচীন ভাষ্যকারের পক্ষে যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহার কিছু প্রকাশ করিলাম। এখন সুধী পাঠকগণ চিন্তা করুন। সূত্রে এখানে যদিও "তদ্বিশেষপরীক্ষণং অভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ" ইহা বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত অপরীক্ষিতের অভ্যুপগম অথবা অভ্যুপগত অপরীক্ষিত পদার্থকেই অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রে পদার্থকেই সিদ্ধান্ত রূপে স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা-পক্ষে অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ এখানে ' যবর্থে

পঞ্চমী বিভক্তি বুঝিলেই চলিবে। "অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ" ইহার প্রতিশব্দ 'অপরীক্ষিতাভ্যুপগমং বিধায়'। এইবার আমরা সিদ্ধান্ত শেষ করিলাম। এখন "অবয়বের" দিকেই দৃষ্টিপাত করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

হিন্দুর আধুনিক কর্ম্ম।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

একদিন কবি গাহিয়াছিলেন "সেথা আমি কি গাহিব গান"? ভাবুক কবি ভাবে আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছিলেন "সেথা আমি কি গাহিব গান?" সেদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ের উপর দিয়া এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের প্রবাহ ছুটিয়াছিল, বঙ্গবাসী সেইদিন ভাবে মজিয়াছিল। সেইদিন বুঝিয়াছিল, আমাদের কিসের অভাব। আজ বহুদিন পরে কবির সেই গান মনে পড়িল। কবি গাহিয়াছিলেন;—

সেথা আমি কি গাহিব গান।
যেথা, গভীর ওঁকারে সাম-ঝঙ্কারে
কাঁপিত দুর বিমান॥
যেথা স্বর-সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা
বাণী বিদ্যা কমলাসীনা;
যেথা তটিনীর নীরে জলদ-গম্ভীরে
যমুনা বহিত উজান॥
সেথা আমি কি গাহিব গান॥

তাই, আজ মনে পড়িল—আমাদের ধর্ম্মের কথা। একদিন আমাদের এই ধর্ম্ম-সমাজের পদতলে শত সহস্র ক্ষত্রিয়-সম্রাটের শির অবনত হইত। একদিন যে ধর্ম্ম, আমা মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, উচ্ছৃঙ্খলতার উন্মত্ত গতিকে রোধ করিয়া আমাদিগকে কঠোর শাসনে শাসিত করিত, একদিন যে ধর্ম্ম, নিস্বার্থতার পবিত্রোজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত হইত, যে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া পরোপকার, দান ও ত্যাগের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইত, যাহা একদিন আমাদের মনুষ্যত্বের সমাজের মহৎ উপকার করিয়াছিল, আজ সেই ধর্ম্ম—সমাজের প্রাণ-স্বরূপ ধর্ম্ম, অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় অনন্তে বিলীনপ্রায়, স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল ঝটিকায় ছিন্ন ভিন্ন, উচ্ছৃঙ্খলতার কালমেঘে আচ্ছাদিত, স্বার্থের কুঠারাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও অধর্ম্মের পঙ্কিল সলিলে নিমগ্নপ্রায়। তাই আজ কবির গান মনে পড়িল।

আমাদের এ ধর্ম্মের অধঃপতন আজ হয় নাই। যে দিন আমাদের স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির উপর দিয়া অনাচারের প্রবল ঝটিকা গিয়াছে, যে দিন এই পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতি, পাপের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে, যেদিন, এই হিন্দুজাতি আচার এবং পরোপকার ভুলিয়া কেবল অর্থকেই চিনিয়াছে, যেদিন হইতে আমরা আত্মচিন্তায় অমনোযোগী হইয়াছি, সেই দিন হইতে ধর্ম্মের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন হইতে সামাজিক আচার নিয়ম, শাসন, উদারতা, দান, পরোপকার ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছিলেন ;—

"আর কি ভারতে আছে সে মন্ত্র,
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি ভারতে আছে সে তন্ত্র,
আর কি ভারতে আছে সে তান।
সেথা আমি কি গাহিব গান॥"

বাস্তবিক আমাদের কি সে মন্ত্র নাই? যে মন্ত্র-বলে এই মোহদীর্ঘ-নিদ্রায় নিদ্রিত মানবের হৃদয়স্থ সুপ্ত গুপ্ত ধর্ম্মবীজকে জাগরিত ও অঙ্কুরিত করা যায়? আমাদের কি সে যন্ত্র নাই? যাহার সাহায্যে, এই অধঃ-পতিত সমাজের উদ্ধার করিতে পারা যায়, যে যন্ত্রবলে এই মুমূর্ষ সমাজকে সঞ্জীবিত করা যায়? আমাদের কি সে তন্ত্র নাই, যাহার ভিতর এই পবিত্র মন্ত্র নিহিত আছে?

একবার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সদাচারের জন্য, সমাজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব—আমাদের সবই আছে, কেবল আমরাই নাই। জিনিস আছে, ব্যবহার করে কে? দৃশ্য বস্তু সম্মুখে বিদ্যমান, কিন্তু দৃষ্টি-নিক্ষেপ-কারকেরা স্বার্থ-মোহকুঞ্জে নিদ্রিত হইয়া আছে। নিদ্রা ভাঙ্গায় কে? বিলাসিতার সুখ-সাগরে ডুবিয়া আছে, উঠে কে? এখন আমাদিগকে শিক্ষিত আদর্শ-তন্ত্রের পবিত্রোজ্জ্বল মন্ত্রে কর্ম্ম-যন্ত্রের ঐ আরাধনায় দীক্ষিত হইতে হইবে। সে দীক্ষার শুভলগ্ন— প্রতি মুহূর্ত্ত, আর সে মন্ত্র—সন্ধ্যা।

এই সন্ধ্যা—ত্যাগাত্মক যজ্ঞ, এবং এই যজ্ঞানুষ্ঠানই ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের, সমাজের এবং জীবনের উন্নতির কারণ। এই সন্ধ্যার প্রথম উদ্দেশ্য—স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদন-জনিত মানসিক পবিত্রতা এবং আত্মপ্রসাদলাভ। যে ব্যক্তি উপনয়নের পর হইতে যথানিয়মে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, সেই ব্যক্তি বলিতে পারেন, মানসিক পবিত্রতা কি? সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছেন, আত্মপ্রসাদ কাহাকে বলে? দ্বিতীয়তঃ সন্ধ্যার উদ্দেশ্য—শারীরিক সুস্থতা। পবিত্রতাই শারীরিক সুস্থতার মূল কারণ। যেমন নির্ম্মল বসন পরিধান করিলে শরীরে কোন প্রকার পীড়া প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ পবিত্রতা অবলম্বন করিলেও শরীরে কোন প্রকার রোগ প্রবেশ করিতে পারেনা। এই পবিত্রতাই শরীরকে পুষ্ট করে। তাহার দৃষ্টান্ত, তুমি আধুনিক রীতিতে নানাপ্রকার ব্যায়াম অবলম্বন করিয়া তোমার শরীর সুস্থ রাখিতে পারিতেছ না, আর চাহিয়া দেখ, তোমারই প্রতিবেশী কোন নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী ব্যক্তি, নিত্য ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া তোমাপেক্ষা কান্তিমান্ দেহ ধারণ করিতেছেন।

এইখানে আমাদের দেশের শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। যখন তিনি বল-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে স্বীয় বল-প্রয়োগ দ্বারা ব্যাঘ্র ধরিতে যান্, সেই সময় তিনি একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে নিবিড় বন মধ্যে এক যোগী সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী, আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্যামাকান্ত স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, সন্ন্যাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার শরীরে কতটুকু শক্তি আছে, যাহার বলে তুমি এই কঠিন শক্তি-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ"? শ্যামাকান্ত তখন নিজশক্তির অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া স্বীয় পরিচয় দান করিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, যদি তুমি এতই শক্তিমান্ হইয়া থাক, তবে আমি আমার বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিটী বক্র করিলাম, সোজা কর দেখি?

শ্যামাকান্ত তখন প্রথম তাচ্ছিল্যের সহিত অঙ্গুলিটী ধরিলেন। পরে যখন তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরের বল-প্রয়োগেও ঐ ক্ষীণ পুরুষের বাম-হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিটী সোঁজা করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার উচ্চ অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়া আসিল। ক্রমে তাঁহার ঐ অহংকার বিগলিত হইল। মস্তক, যোগীর পদতলে লুটিয়া পড়িল। তখন বিনয়, শ্যামাকান্তের হৃদয় অধিকার করিল;—ভক্তি, বিনয়কে আশ্রয় করিল, জ্ঞান, বিনয়কে অবলম্বন করিল—বিবেক, জ্ঞানকে ধরিল। তখন বিনীত যোগি-পদতল-নিপতিত শ্যামাকান্ত, বিবেক-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, সংসারে শুধু শারীরিক বল দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না—মানসিক বলের দরকার—ধর্ম্মের সাহায্য প্রয়োজন। তখন শ্যামাকান্ত সন্ন্যাসীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি সন্ন্যাসী। গল্প সত্য হউক্ বা মিথ্যা হউক্, শ্যামাকান্ত সম্বন্ধে এইরূপই প্রবাদ আছে। যাহা হউক্ এই উদাহরণ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্ম-বল ভিন্ন, মানসিক বল ভিন্ন সংসারে কার্য্য-সাধনের অন্য উপায় নাই। এই মানসিক বল ও ধর্ম্ম-বল-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়—সন্ধ্যাহ্নিক। এই মানসিক এবং ধর্ম্মবল বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদের সন্ধ্যায় প্রাণায়ামের বিধান আছে। প্রাণায়াম শরীরকে লঘু করে, শরীরে অক্ষয় বল দান করে, প্রাণবায়ুর বিস্তার সাধন করে, হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া পবিত্রতা আনয়ন করে। পবিত্রতারই অপর নাম—পরিচ্ছন্নতা। অঘমর্ষণ, আপোমার্জ্জন, আচমন ইত্যাদিও হৃদয় ও শরীরকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত সন্ধ্যায় বিহিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ সন্ধ্যার ফল—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব-রক্ষা। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই ব্রাহ্মণজাতির ধর্ম্মের এবং সমাজের অধঃপতন হইল কিসে? একবার অতীত কথার আলোচনা করিয়া দেখিলে নিজকে আর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হইবে না। একবার পৌরাণিক আর্য্য ঋষিদিগের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তখন এই ব্রাহ্মণ-সমাজচক্র এক ভাবে চলিত আর এখন তাহার বিপরীত দিকে চলিতেছে। পূর্ব্বে আর্য্য মহর্ষিগণ প্রাতরুত্থানের পর প্রাতঃস্নান, নিত্যহোম, বেদপাঠাদি করিতেন, আর আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণের প্রাতঃক্রিয়ার পর এক পেয়ালা চা ও বিস্কুট ভিন্ন আর চলে না।

আ'জ অনেক দিনের কথা, একবার আমি ও আমার একটী বন্ধু কোন দূর দেশে যাইতে গোয়ালন্দ লাইনে পাংসা ষ্টেসনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করি। রাত্রি তখন বারটা। আমি জলপানেচ্ছু, আর আমার সহচর বন্ধুটী ধূম-পানেচ্ছু, সুতরাং উভয়েই পিপাসায় কাতর হইয়া ষ্টেসনে পরিভ্রমণ করিতেছি। এমন সময় দেখিলাম, ষ্টেসনমাষ্টার মহাশয় এক স্থানে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করিতেছেন। আমার ধূমপিপাসু ব্রাহ্মণ সহচর বন্ধুটী তাঁহার নিকট ধূমপানেচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমিও তাঁহাকে ষ্টেসনমাষ্টার

জানিয়া জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া, নানাপ্রকারে আমাদের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহুক্ষণের পর আমার বন্ধুটীকে স্বীয় হুঁকা হইতে কলিকাটী নামাইয়া দিয়া "পানিপাঁড়ে"কে আমার জল-পানেচ্ছা জানাইলেন। বন্ধুটী অপমানজনিত ঘৃণাব্যঞ্জক মুখে একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি অনন্যোপায় দেখিয়া তাঁহাকে পান করিতে ঈঙ্গিত করিয়া, বিকৃত দেহ পিশাচাকৃতি পাঁড়েজির সহিত জলপানে চলিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পাঁড়েজি এক ঘৃণ্য অপরিস্কৃত পাত্র হইতে এক ঘটী জল গ্রহণ করিয়া আমাকে হাত পাতিতে বলিল। আমি আমার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়া ঘটীটী স্বহস্তে চাহিলাম। পাঁড়েজি তাহাতে অস্বীকৃত হইল। আমি তখন অপমানিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—হায় রে অধম ব্রাহ্মণজাতি! যে উচ্চ গৌরব বহন করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতে, একদিন উন্নতির উচ্চতম শিখরে উত্থিত হইয়া নিজকে ব্রহ্মের সমান মনে করিতে, আজ এইখানে তোমাদের সে গৌরব—সে কীর্ত্তি কোথায় রহিল? এই খানেই তোমার অধঃপতন। একদিন যাহাদের পদতলে শত শত ক্ষত্রিয় সম্রাটের শির অবনত হইত, আজ কিনা এক বর্ব্বরের করে তাহারা লাঞ্ছিত—অপমানিত। একদিন যে ব্রহ্মতেজ জগৎকে বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিল, আজ কিনা সেই তেজ অপমান-জনিত অশ্রুজলে পরিণত হইয়া এক অজ্ঞের পদতলে নিপতিত। ব্রাহ্মণসমাজের অধঃপতন এইখানেই প্রকাশ পাইল। তখন ভাবিতে লাগিলাম—এই অধঃপতনেন কারণ কি? ব্রাহ্মণের এ লাঞ্ছনার হেতু কি? এক মাত্র পূর্ব্ববৎ ক্রিয়ার অভাব। পূর্ব্বে যে হোমাদি, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মবল ও মনোবল বৃদ্ধি করিত, যে পাঠাদি জ্ঞান-বল-পুষ্ট করিত, যে ঘৃত শরীরের তেজ বৃদ্ধি করিত, আজ কালের স্রোতে সংসর্গদোষে সেই হোমাদি, সেই বেদ-পাঠাদি, সেই আজ্যাদি অনন্তে মিশিয়াছে। যে জাতি কুসংসর্গের পাপ-পঙ্কে বিবেককে ডুবাইয়া নিজের দোষে এই অমূল্য রত্নগুলি হারাইয়াছে, তাহাদের অধঃপতন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহাতে দুঃখ নাই। এ অধঃপতন উপযুক্ত। এইরূপে চিন্তামগ্নতার পর যখন আমার জ্ঞান হইল; তখন চাহিয়া দেখি, পাঁড়েজি অঞ্জলিপুটে জল-পানে অস্বীকৃত ভাবিয়া অস্ফুট স্বরে আমাকে গালি দিতেছে। আমি বলিলাম পাঁড়েজি! যাহাই বল, তোমার হাতে আর আমি জল খাইব না। সেই সময় হইতে আমি সন্ধ্যাহ্নিকে প্রবৃত্ত হইলাম।

একবার সন্ধ্যার প্রাতরাচমনের "সূর্য্যাদি" মন্ত্রটী স্মরণ করিলে দেখিতে পাইব, উপাসক একাগ্রচিত্তে প্রত্যক্ষ-দেবতা সূর্য্য এবং অপ্রত্যক্ষ দেবতা ইন্দ্রাদির নিকট কি চাহিতেছেন? উপাসক ভক্তি-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতেছেন—"সূর্য্য এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ, আমাকে সমগ্র

ক্রোধ শোক এবং দৈন্যাকৃত পাপ হইতে রক্ষা করুন, আমি রাত্রিকালে শরীর, মন, বাক্য, হস্ত-পদ, উদর শিশ্নাদি দ্বারা যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছি, এই দিবা (প্রাতঃকাল) আমার সে সমস্ত পাপ নাশ করুক। সমস্ত. পাপ নাশ করিলেও যাহা কিছু দুষ্কৃতি আমার অবশিষ্ট থাকিবে, সেই পাপের জন্য পরমাত্মা অমৃতপ্রভব সূর্য্যকে এই জল দান করিতেছি”। এখন এই পবিত্র মন্ত্রটীর ভিতর নিবিষ্ট-চিত্তে প্রবেশ করিয়া দেখ,—একবার ঐ ঐকাগ্র্য-নিবদ্ধচেতা উপাসকের হৃদয়ের সঙ্গে আপন হৃদয় মিলাইয়া দেখ,—একবার সংসারিক চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য ত্যাগ করিয়া জ্ঞানক্ষেত্রে দেখ, দেখিবে, উপাসকের হৃদয়ে কি প্রগাঢ় বিশ্বাস, কি দৃঢ় ভক্তি, কি গভীর প্রেম বিরাজ করিতেছে। পবিত্র মন্ত্রে কি উদ্দীপ্ত ধর্ম্মভাব ও উদারতার কি প্রবল স্রোত বহিতেছে। উপাসক বিশ্বাস ভক্তি এবং প্রেমে আত্মহারা হইয়া, উদারতার প্রবল স্রোতে হৃদয় নিক্ষেপ করিয়া ধর্ম্মের প্রবল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, কি পবিত্রবিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন—মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হয় এবং হৃদয় পবিত্র হয়। এই মন্ত্রটী বিশ্বাস এবং পবিত্রতার উজ্জ্বল ভাব প্রকাশ করিতেছে। একদিন এই বিশ্বাস এবং পবিত্রতাই আমাদিগকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিত। এখন আমাদিগের হৃদয়ে ইহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। হৃদয় হইতে রাজসিক ভাব দূর করিতে হইবে—সাত্ত্বিকতাকে ধরিতে হইবে। ইহাই হিন্দুর প্রধান এবং আধুনিক কর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

তীর্থযাত্রা।

পুষ্কর।

২৬শে চৈত্র সোমবার—প্রাতে সাড়ে আটটার সময়ে আজমীর ষ্টেশনে পৌঁছিলে পুনরায় আমাদের প্লেগ-পরীক্ষা হইল। ষ্টেশনেই পুষ্করের ভাবুত লাল পাণ্ডার সহিত আমাদের সাক্ষাত হইল। তাহার ঠিকানা ছোটচণ্ডি, বরাহজি-মন্দিরের নিকট; তাহার পিতার নাম [illegible] দত্ত। এখান হইতে ॥৶৬ চুক্তিতে একখানি গোযান লইয়া আমরা পাণ্ডার সহিত পুষ্কর যাত্রা করিলাম। এখান হইতে পুষ্কর চারি ক্রোশ দূর। অধিকাংশ পথই পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে। একস্থানে খুব চড়াই ও উৎরাই আছে। এই স্থানে পথটী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া করা হইয়াছে। যাঁহারা দার্জ্জিলিংএর রেল-পথ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই এই পথের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। পথের এই অংশ প্রায় একমাইল দীর্ঘ। এই স্থানে আমরা গো-শকট হইতে অবতরণ করিয়া, চড়াই ও উৎরাই পার হইয়া সোঁজাপথে গেলাম। গো-শকট, বক্র-পথে আমরা যাওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট পরে যাইয়া পৌঁছিল। পথি পার্শ্বে কয়েকটী বালির পাহাড় দেখিলাম। স্তুপীকৃত বালুকারাশি পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের পর এপথে চলা অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য, বিশেষ চৈত্র মাসের রৌদ্রে, পথের বালি ও পাথর এরূপ গরম হয় যে, কাহার সাধ্য তদুপরি পদক্ষেপ করে! আমরা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পুষ্করে উপনীত হইলাম। পুষ্কর হ্রদ একটী অতিবৃহৎ পুষ্করিণীর ন্যায়; জলে কুম্ভীর আছে। পুষ্কর-তীর্থ, ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ; এখানে স্নান করিলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনাশ হয়। হ্রদের তীরেই ব্রহ্মার মন্দির, মন্দিরচূড়ায় ব্রহ্মার বাহন হংসের মূর্ত্তি আছে। প্রতি বৎসর লক্ষাধিক যাত্রী পুষ্কর-স্নান-জন্য আসিয়া থাকে। পুষ্করে স্নান করিয়া এবং তীর্থ-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া, আমরা বৈকালে ৪টার সময়ে জনৈক পথ-প্রদর্শক বালকের সহিত নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি সরস্বতী ও সাবিত্রী দেবী দর্শন করিতে গেলাম। পর্ব্বতোপরি এক মাইল উঠিতে হয়। উঠিবার জন্য সোপান আছে, তথাপি উপরে উঠা বিলক্ষণ শ্রমসাধ্য। আমরা উঠিতে চারিবার বিশ্রাম করিয়াছিলাম। পাহাড়ের ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। পর্ব্বতচূড়া হইতে পুষ্করের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। পুষ্কর চারিদিকেই পর্ব্বতবেষ্টিত। পাহাড়ের উপর পাহাড়, তার পর পাহাড়, এইরূপ অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী; মধ্যে পুষ্কর হ্রদ; হ্রদের ও পর্ব্বতের অবকাশ-স্থান বালুকাময় মরুভূমি, তন্মধ্যে পুষ্করতীর্থ। এইরূপ পর্ব্বতবেষ্টিত মরুমাঝে জলাশয়, নিতান্তই দেবতার অনুগ্রহ বলিতে হইবে। আমরা অনেক কষ্টে পাহাড়ে উঠিয়া সরস্বতী ও সাবিত্রী দেবী দর্শন করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম অন্তে সুস্থতা লাভ করিয়া জল পান করিলাম। পর্ব্বত হইতে অবতরণ-কালে কষ্ট হয় নাই।

পুষ্করের তীর্থ-মাহাত্ম্য।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পুষ্কর, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। বিধাতৃবিহিত পুষ্করতীর্থ সর্ব্বলোক-বিশ্রুত। এই ভূমণ্ডলে দশসহস্রকোটি তীর্থ আছে; পুষ্কর তীর্থে, এই সমুদায় তীর্থেরই সতত সান্নিধ্য আছে। দেব দৈত্য ও ঋষিগণ এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনায় রত থাকিয়া এই তীর্থে অভিষেক করে, তাহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের দশগুণ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে বাস করিয়া একটীমাত্রও ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সে ইহকাল ও পরকালে পরমানন্দ লাভ করে। যে ব্যক্তি এইস্থানে থাকিয়া অসূয়া-শূন্য চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শাক, বা ফল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যে স্বয়ং জীবন ধারণ করে, তাহার অশ্বমেধের ফল-লাভ হয়। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র যে-কেহ পুষ্কর তীর্থে স্নান করে, তাহাকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্কর-তীর্থে গমন করে, তাহার অক্ষয়-ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে সায়ং ও প্রাতঃকালে পুষ্কর-তীর্থের স্মরণ করে, তাহার সকল তীর্থস্নানের

ফললাভ হয়। স্ত্রী কিম্বা পুরুষের জন্মাবধি যে সকল পাপ জন্মিয়া থাকে, একবার পুষ্করে স্নান করিলে মাত্র তৎসমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন ভগবান্ মধুসূদন সর্ব্বদেবের আদি, তদ্রূপ পুষ্করতীর্থ যাবতীয় তীর্থের আদি। সংযত হইয়া পবিত্রচিত্তে দ্বাদশ বৎসর পুষ্কর-তীর্থে বাস করিলে, সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ ও চরমে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ শত বৎসর অগ্নিহোত্র উপাসনা করে, আর যে ব্যক্তি একবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পুষ্করে বাস করে, এই উভয়েরই তুল্য ফললাভ হয়। পুষ্করতীর্থে সংযত ও পরিমিতাহারী হইয়া দ্বাদশরাত্র বাস করিয়া পরিশেষে ত্রৈতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণ-সেবিত জম্বুমার্গে গমনে অশ্বমেধের ফললাভ ও সর্ব্বকাম-প্রাপ্তি হয়।*

শুভ্র রজত-গিরির ন্যায় শৃঙ্গ ত্রয় হইতে তিনটী প্রস্রবণ নিঃসৃত হইয়া পুষ্কর তীর্থে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং উহা অনাদি ও অনন্ত। পুষ্করে পর্য্যটন, তপ ও দান অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য বলিয়া জনসমাজে বিদিত।*

পুষ্কর-তীর্থের পৌরাণিক বিবরণ :—

একদা লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, একটী পদ্ম হস্তে লইয়া পুণ্যভূমি প্রদেশে যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া, এক অতি রমণীয় পার্ব্বত্যবনে প্রবেশ করিলেন।

---

* কস্মিংস্তীর্থে মহারাজ নিত্যমেব পিতামহঃ।
উবাস পরম প্রীতো ভগবান্ কমলাসনঃ ॥২৫
পুষ্করেষু মহাভাগ দেবাঃ সিদ্ধগণাঃপুরা।
সিদ্ধিং পরমিকাং প্রাপ্তাঃ পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ ।২৬
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
অশ্বমেধাদ্দশ গুণং ফলং প্রাহুর্মনীষিনঃ ॥২৭
অপ্যেকং ভোজয়েদ্বিপ্রং পুষ্করারণ্য মাশ্রিতঃ।
তেনাসৌকর্ম্মণা ভীষ্ম প্রেত্যচেহ চ মোদতে ।২৮
শাকৈর্মূলৈঃ ফলৈর্ব্বাপি যেন বর্ত্তয়তে স্বয়ম্।
তদ্বৈদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ ॥২৯
তেনৈব প্রাপ্নুয়াৎ প্রাজ্ঞো হয়মেধফলং নরঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বা রাজসত্তম ॥৩০
নৈব যোনৌ প্রজায়ন্তে স্নাতাতীর্থে মহাত্মনঃ।
কার্ত্তিকীং তু বিশেষেণ যোঽভিগচ্ছতি পুষ্করম্ ॥৩১

প্রাপ্নুয়াৎ স নরো লোকান্ ব্রহ্মণঃ সদনেঽক্ষয়ম্।
সায়ং প্রাতঃ স্মরেদ্ যস্তু পুষ্করাণি কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩২
উপস্পৃষ্টং ভবেৎ তেন সর্ব্বতীর্থেষু ভারত।
জন্ম প্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষেন বা ॥৩৩
পুষ্করে স্নাতমাত্রস্য সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি।
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ ॥৩৪
তথৈবং পুষ্করং রাজং স্তীর্থানাং চাদিরুচ্যতে
উষ্ট্বা দ্বাদশ বর্ষাণি পুষ্করে নিয়তঃ শুচিঃ ॥৩৫
ক্রতূন্ সর্ব্বানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি।
যস্তু বর্ষশতং পূর্ব্বং অগ্নিহোত্রমুপাসতে ।৩৬
কার্ত্তিকীং বা বসেদেকাং পুষ্করে সমমেব তৎ ।৩৭
ত্রীণি শৃঙ্গানি শুভ্রানি ত্রীণি প্রস্রবণানিচ।
পুষ্করাণ্যাণি সিদ্ধানি নবিদ্মস্তত্র কারণম্ ।৩৮
দুষ্করং পুষ্করং গন্তুং দুষ্করং পুষ্করে তপঃ।
দুষ্করং পুষ্করে দানং বস্তুঞ্চৈব সুদুষ্করম্ ॥৩৯
(মহাভারত বনপর্ব্ব ৮২ অধ্যায়)

* রাজর্ষি বিশ্বামিত্র পুষ্করে তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষশতানি চ ॥২৮
(রামায়ণ বালকাণ্ড, ৬২ সর্গ)

তাঁহার হস্ত হইতে পদ্মটী ধরণীতলে পতিত হইল। সেই পদ্ম-পতনের মহাশব্দে দেবতাগণ কম্পিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সুরবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই মৃগশাবক-সঙ্কুল বনেই বাস করিতে কল্পনা করিলেন। এইজন্য ঐ স্থানকে ভগবান্ লোকহিতৈষী ব্রহ্মা, ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ পুষ্কর নামক তীর্থরূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন :—আমি তোমাদিগের হিত ও রক্ষার নিমিত্ত ভয় বিনষ্ট করিয়াছি। বালকদিগের প্রাণহন্তা বজ্রনাভ নামক অসুর রসাতলে অবস্থান করিতেছিল। এই অসুর, তোমরা এখানে আসিয়াছ, ইহা জানিতে পারিয়া, সশস্ত্রে সমাগত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অতএব আমি কমল-পাতে এই রাজ্যৈশ্বর্য্য-দর্পিত অসুরের বিনাশ বিধান করিয়াছি। এই জগতে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের দুর্গতি দূর হউক এবং তাঁহারা উত্তম গতি লাভ করুন। হে দেবগণ! আমি দেব, দানব, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও সমুদায় ভূতগ্রামের-পক্ষে তুল্য। আমি তোমাদিগেরই হিতের নিমিত্ত এই পাপিষ্ঠ অসুরকে মন্ত্রদ্বারা বিনষ্ট করিয়াছি এবং এই কমল দর্শন করিয়া এই অসুরও পুণ্যবান্‌দিগের লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি পদ্ম নিক্ষেপ করিয়াছি বলিয়া, এই স্থান ভবিষ্যতে পুষ্কর নামে অতি পবিত্র মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীরই পুণ্যপ্রদ বলিয়া কথিত হইবে।

পুষ্করমাহাত্ম্যে এই তীর্থের এইরূপ চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"স এবমুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তৈরমরৈঃ সহ
ক্ষেত্রং নিবেশয়ামাস যথাবৎ কথয়ামি তে॥
উত্তরে চন্দ্রনদ্যাস্তু প্রাচী যাবৎ সরস্বতী
পূর্ব্বস্তু তদ্বনাৎ কৃৎস্নং যাবৎকল্পং সুপুষ্করং॥
বেদী হ্যেষা কৃতা যজ্ঞে ব্রহ্মণা লোক-
কারিণা।"

সেই ভগবান্ ব্রহ্মা অমরগণের সহিত এইরূপে যথাযথ ক্ষেত্রস্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্র-নদীর উত্তরে প্রাচী সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত সেই বনের পূর্ব্বদিকের সমস্ত ভূভাগই লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা, যজ্ঞের নিমিত্ত আকল্প এই পুষ্কর—বেদীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পদ্ম-পুরাণে সৃষ্টি-খণ্ডে (১৪—২৯ অঃ) ও নারদপুরাণে উপরিভাগে (৭১ অঃ) সবিস্তার পুষ্কর ক্ষেত্র ও পুষ্কর-তীর্থের মাহাত্ম্য এবং এখানকার চন্দ্রা, নন্দা ও প্রাচীনদী, যজ্ঞপর্ব্বত, বিষ্ণুপদ প্রভৃতি এবং এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরী প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

এই পুষ্কর তীর্থ অতি প্রাচীন। মহাভারতে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। সাঞ্চি হইতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ-শিলালিপি হইতে জানাগিয়াছে, খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসরেরও বহু পূর্ব্বে এই স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল।

বর্ত্তমান পুষ্কর সহরে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরী-নারায়ণ, বরাহ ও শিব আত্মাতেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান। এই মন্দিরগুলি সমস্তই আধুনিক। ঔরঙ্গজেবের প্রভাবে প্রাচীন মন্দির সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

এখানকার পুষ্কর হ্রদ দেখিবার জিনিষ।

এই হ্রদের ধারে স্নানের জন্য বহু তীর্থ এবং রাজপুতনার রাজবংশীয়গণের বিশ্রামার্থ প্রসাদমালা শোভা পাইতেছে। এই সহরের সীমার মধ্যে কোন প্রকার পশু-হত্যা নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসে মেলার সময় এখানে লক্ষাধিক যাত্রী আসিয়া থাকে। এই সময় অশ্ব, উষ্ট্র, বৃষাদি পশু এবং নানাবিধ দ্রব্য বিক্রীত হয়। এখানকার স্থায়ী লোকসংখ্যা চারি হাজারের অধিক হইবেনা। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই পোকর্ণ-ব্রাহ্মণ।

পোকর্ণ ব্রাহ্মণের বিবরণ।

ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে। ইঁহারা বলেন যে "পুষ্পকর্ণ" হইতে তাহাদের 'পোকর্ণ' নাম হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ইঁহাদের মধ্যে একটী গল্প প্রচলিত আছে; ইঁহাদের আদিপুরুষ বৈষ্ণব—লক্ষ্মীর পূজা করিতেন। একদা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি মাংস-ভোজনে অস্বীকার করায় অভিশপ্ত হন। পরে তাঁহারই বংশধরগণ জন্মভূমি জশলমীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সিন্ধু কচ্ছ, মুলতান ও পাঞ্জাবের নানা স্থানে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হন। এখানকার ভিন্ন-জাতীয়গণ বলেন যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ধীবর-কন্যার গর্ভে ইঁহাদের উৎপত্তি। ইঁহাদের মধ্যে উপনয়ন-প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহকালে অথবা কোন পুণ্য-তীর্থে বিধি-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ইঁহারা সাধারণতঃ উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্য-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ, ইঁহাদের সহিত একত্রে ভোজন করেন না। ইঁহাদের মধ্যেও সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। জন্মের পর অষ্টম দিনে গৃহস্থরমণীগণ গান করিতে করিতে জাত বালকের মাতুলালয়ে গমন করেন, এবং তথা হইতে একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘোটক লইয়া আসেন। বিবাহ-কালে পুরুষেরা নৃত্য করেন, ও স্ত্রীলোকগণ অশ্লীল গান গাহিয়া থাকেন। কথিত আছে, ইঁহারাই পুষ্কর হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। যে খনিত্র দ্বারা ইঁহারা পুষ্কর খনন করিয়াছিলেন, পাঞ্জাববাসী পোকর্ণগণ, এখনও সেই খনিত্রের পূজা করিয়া থাকেন। রাজপুতনা-বাসী ভাটিয়ারগণ ইঁহাদের যজন কার্য্য করিয়া থাকেন। জাত্যংশে ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে ইঁহারা সারস্বত-ব্রাহ্মণাপেক্ষা অনেক হেয়। কিন্তু সিন্ধু-প্রদেশের সারস্বতগণের সহিত ইঁহাদের প্রচলন দেখা যায়। পোকর্ণ ব্রাহ্মণগণ নিরামিষভোজী। কদাচিৎ দুই এক জনকে মৎস্য বা মাংস ভোজন করিতে দেখা যায়। ইঁহারা মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করেন। সিন্ধুদেশের পোকর্ণগণ স্বজাতির গৌরব-বৃদ্ধির জন্য কঠোর আচরণে দিনযাপন করিয়া থাকেন। পোকর্ণগণ অনেকাংশে আমাদের দেশের "পিরালী" ব্রাহ্মণগণের তুল্য।

সাবিত্রী পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আমরা একক্রোশদূরবর্ত্তী পঞ্চকুণ্ড-তীর্থে গমন করিলাম। ইহাও একটী পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। কয়েকটী পার্ব্বতীয় প্রস্রবণ ও একটী কুণ্ড আছে বলিয়াই ইহা পঞ্চকুণ্ড নামে খ্যাত। এই স্থানে কয়েকটী সন্ন্যাসীর

'আ-স্থান' আছে। পুষ্করের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এ স্থানটী বেশ নির্জ্জন। এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাত্রি হইল। রাত্রিতে পুষ্করের পাণ্ডার গৃহেই অবস্থান করিলাম। পুষ্করে সহস্রাধিক পাণ্ডার বাস। রাত্রিতেই গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম, ভোরে উঠিয়া আজমীড় যাত্রা করিলাম। আজমীড় রাজপুতনার অন্তর্গত মারবার বিভাগের প্রধাননগর। কাহারও মতে মহাভারতের বনপর্ব্বে উক্ত বিদুর-রাজের এই রাজ্য। কালক্রমে উহা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে ১১৫ খৃঃ অঃ অজয়পাল নামক চৌহানরাজ উহা পুনঃ নির্ম্মাণ করেন। কাহারও মতে সূর্য্যবংশীয় অজমীঢ় রাজা এই নগর নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

ধর্ম্মরহস্য।

"ধর্ম্মরহস্য" লইয়া মানব সমাজে বহুকাল হইতে বহুতর বিপ্লব ঘটিয়া আসিতেছে। জনবিস্তর সকলেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কি রাজা, কি প্রজা, সকলেই শান্তির জন্য—ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্য, চিন্তিত হইয়া, যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, সেই সকল উপায়ের নামই "ধর্ম্ম"। এই উপায়, দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে বিভিন্ন হইলেও তাহার মূলগত পার্থক্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। তবে জন-সমাজে তাহা লইয়া এত বিবাদ-বিসম্বাদ কেন? এই প্রশ্নের উত্তর—এপর্য্যন্ত কোথায়ও যে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ত বোধ হয় না!

মঙ্গল-গ্রহে মানুষ আছে কিনা, জানিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদগণ যে যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহা বিশুদ্ধ (Perfect) না হওয়ায়, সে পক্ষে নানা মতভেদ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেহ বলিতেছেন, উহা নির্ব্বাণোন্মুখ নীহারিকা; কোন্ দিন্ সূর্য্যগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে; উহাতে জীব থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। কেহ বলিতেছেন, উহাতে যখন খাল, বিল, নদী, নালা দেখা যাইতেছে, তখন উহা যে জীবনিবাস তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্ত্তমান কালের দূরবীক্ষণ, যতদুর বিশুদ্ধতা (Perfection) লাভ করিয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই মতবাদের সৃষ্টি,-সুতরাং ইহার মীমাংসা সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে এখনও নিহিত রহিয়াছে।

জ্যোতিষতত্ত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার মীমাংসা, কালে যে কি দাঁড়াইবে, সেজন্য জন-সমাজ তত চিন্তিত নহে, কিন্তু ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য জানিবার জন্য সকলেই চিন্তিত। তাই অতিপুরাকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য-সমাজে তাহার জন্য যথেষ্ট আলোচনা হইয়া আসিতেছে। একজন নিম্ন জ্ঞানের চক্ষে দেখিয়া যে সাক্ষ্য দিলেন, অন্যে তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসিলেন, পরিণামে তাহাতে আর কিছুই সার পাইলেন না। এ অবস্থায় কে কাহাকে উদ্ধার করিবে? ইহা যে এক রহস্য-ময়ী চিন্তা বৈ আর কিছুই নহে, তাহা তাঁহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। মানব-সমাজে এইরূপ শত শত মানব, সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া, যে সকল চিন্তা রহস্যের

প্রবাহ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহার চিহ্ন, অদ্যাপি সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের উপলখণ্ড (Hava) বৈ আর কিছুই নহে। এই উপলখণ্ড দেখিয়া যাঁহারা জ্ঞানলাভ করতঃ, ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা মনকে মানদণ্ড করিয়া, যে উপায়-পরীক্ষণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাতে "প্রত্যাদেশ" "ঈশ্বর-দর্শন" প্রভৃতি বহুতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মঙ্গলগ্রহে মানব-বাসের কল্পনার ন্যায় সকলে তাহাকে "অবিসম্বাদী সত্য" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাই সেই পথে পুরাতন চিহ্নের ন্যায় তাঁহাদেরও পদচিহ্ন তাহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।

এমন বিষম-সমস্যার সময় এ রহস্য ভেদ করিতে শত শত ভাবনা হৃদাকাশে উপস্থিত হওয়া অসঙ্গত নহে। মহাচিন্তাশীল মনস্বী ডাক্তার গ্রোভার বলিয়াছিলেন, "যদি জনসমাজের প্রকৃত অবস্থা জানিতে চাহ, তবে জনসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কোন দূরবর্ত্তী ভূমিতে আরোহণ করিয়া, দূর হইতে তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর, তাহা হইলে, তাহার প্রকৃত অবস্থা অতিসহজে অনুভব করিতে পারিবে"। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির তাহাই করা উচিত। তোমার অবলম্বিত বিষয় কি, কি বলিয়া লোকে তাহাতে দোষারোপ করে, আর তাহার গুণগত সার্থকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাহাকে বিচারক্ষেত্রে আনিলে হাস্যাস্পদ বা সম্মানিত হইতে হইবে, ইহা ভাবিলে চলিবেনা। তুমি সত্যান্বেষী, শান্তিপ্রিয় ও ঈশ্বর-পরায়ণ, সুতরাং তোমাকে শান্তিময় রাজ্যে বাস করিতে হইবে, অথচ ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব-বিবাদ করিয়া সেই শান্তিময় সংসারে অশান্তির প্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছ কেন? এ প্রশ্ন কি স্বাভাবিক নহে? না বলিলেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই দ্বন্দ্ব-বিবাদের মধ্যে অবিসম্বাদে অজ্ঞান কার্য্য করিতেছে। তাহা বুঝাইতে গিয়াই যত বিপদ্। এই বিবাদের মূল সকল ধর্ম্মের মধ্যে বিচ্ছুরিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্ম হইতে দুই একটী বিষয় প্রদর্শন করিতে পারা যায়।

সকল ধর্ম্মই প্রত্যাদেশ বা ঈশ্বর-দর্শন বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আদিম আর্য্যজাতির মধ্যে ঈশ্বর, মনুষ্যরূপে অবতরণ করিয়া মনুষ্য-সমাজে কত লীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন! তাঁহাদের সেই বরণীয় দেবগণ স্বর্গ মর্ত্ত বিচরণ করিতেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ন্যায়, তাঁহারা অনুগত জনকে বর প্রদান করিয়া কত বিচিত্র ঘটনা (Miracles) দেখাইতেন। তাঁহারা দিনকে রাত্রি করিতে, রাত্রিকে দিন করিতে পারিতেন। মৃতকে সঞ্জীবিত, এবং জীবিতকে মৃত করিতে পারিতেন। ভৌতিক জগৎ তাঁহাদের আজ্ঞা বহন করিত। এতগুলি প্রমাণ সত্বেও কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকেরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া আবার অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়াছিল।

অনার্য্যজাতির মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস আরো বিচিত্রিতা-ময়। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বস্ত মানুক্ আর না মানুক্, প্রেত-যোনিতে

সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। তাহারা শূন্যাকাশে কেবল মাত্র প্রেতাবাস দেখিতে পায়। সেই প্রেতাবাস হইতে ক্ষমতাশালী প্রেতগণ ভূমণ্ডলে অবতরণ করিয়া কাহারও ইষ্ট, কাহারও বা অনিষ্ট সাধন করে। সেই জন্য তাহারাই, তাহাদিগের বরণীয় ও পূজনীয়। এই ভীতি-সঞ্চার-কারী বীভৎস-দৃশ্য প্রেত-গণই তাহাদের ধর্ম্ম-জগতের দেবতা। কালে, তাহারাও তাহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আর্য্যদিগের অবলম্বিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

যদি তৌরেত এবং জেন্দ অবেস্তা জগতে বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে মোহম্মদীয় ধর্ম্ম, আরবের অনুর্ব্বর ভূমিতে উদ্ভূত হইত কি না সন্দেহস্থল। আদিকাল হইতে কোরেশ এবং বেদুনী জাতি, ভারতীয় আর্য্যজাতির ন্যায় দেব-দেবীর উপাসক ছিল। তাহাদের পিতামহ ইব্রাহীম, তাহার প্রবর্ত্তন কর্ত্তা। তৌরেতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে মুশা এবং যীশু আগমন করিলে সেই ২ প্রদেশে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার অতীত চিহ্ন সকল কোথায় না বিদ্যমান রহিয়াছে? সেই চিহ্ন ধরিয়া, যে প্রবাহ আরবে প্রবাহিত, তাহার "ষোল আনা শক্তি" কি মোহম্মদে সঞ্চারিত হয় নাই? যীশু, ঈশ্বরের আজ্ঞা বহন করিয়া মুশার পদানুসরণ করতঃ যে রূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে আরব কিছুই নূতনত্ব দেখিল না, প্রত্যুত তদ্বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া যে লীলা দেখাইল, তাহাতেই বা নূতনত্ব কোথায়? সেই আদেশ, সেই উপদেশ, সেই বিশ্বাস— আর এক আকারে সন্নিবেশিত মাত্র।

এই সকল দেখিয়া সেদিন—নিউম্যান্ থিয়োডোর পার্কার, ম্যানিক্, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহানুভবগণ যে উপায় স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া, যে ঈশ্বরবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতেও তেমনি নূতনত্ব কোথায়ও নাই; সকলেই সেই সেই পুরাতন চিহ্নিত পথের যাত্রী। ইহাঁরা কেহই নূতন পথ আবিষ্কারে যত্ন পান নাই। কেবল এক প্রাচীন-রীতি-নীতির সংস্কার করিতে গিয়া, চিন্তাশীল-দিগের নিকট মোহম্মদের ন্যায় ধরা পড়িয়াছেন।

আর্য্য-জাতির দর্শন-শাস্ত্র আলোড়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষীয় দর্শন-কারেরা কেহ কাহারো মুখাপেক্ষী হন নাই। তাঁহারা নিজ নিজ উপার্জ্জিত আত্মজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মজগতের নানা মতবাদ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদের অযৌ-ক্তিকতার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই জন্য তাঁহারা কেহ কোথায়ও দাঁড়াইতে পারেন নাই। সুতরাং সেই সকল অর্থকর তর্কতরঙ্গ যেন উদ্বেলিত হইয়া পাঠকগণকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। তাহাতে চিন্তাশীলতার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম রক্ষা পাইতেছে না।

তবে কি ধর্ম্ম, কেবল 'কথার কথা' মাত্র? প্রায় আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইল, রাজকুমার সিদ্ধার্থ এইরূপ ভাবিয়া, তাহার প্রতিকারার্থ যে উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তাহা আংশিক ভাবে অযথার্থ নহে। সিদ্ধার্থের অভিজ্ঞতা, বহিরঙ্গ হইতে অন্তরঙ্গে উপনীত হইয়াছিল। তিনি বিষয়-বিভবের মধ্যে দেখিলেন, জরা—ব্যাধি—মৃত্যু; তাহার পর

কি? চিন্তা করিতে গিয়া, অন্তরঙ্গে উপনীত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাই তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম নিরালম্ব-সাধন। তাহা করিতে গিয়া তিনি জগতের দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কিন্তু অন্তিমকালে নিজ প্রিয়তম সঙ্গী আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "এইরূপে সকলকেই সাধন করিতে হইবে।" পথ আবিষ্কৃত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে জগতের দুঃখ-কষ্ট গেল কৈ? সুতরাং সকলকেই যখন তাঁহার আদিষ্ট পথে সাধন করিতে হইবে, তখন আর তাঁহার গরিমা রহিল কোথায়?

জগতে এ কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িলে, বোধ হয় যীশু কহিলেন "আইস, আমার নিকট আইস, হে ভারাবনত-শ্রান্ত ক্লান্ত মনুষ্যগণ, আমি তোমাদের ভার লাঘব করিব এবং শান্তির পথে আনয়ন করিয়া অনন্ত সুখে সুখী করিব"। মানবের মস্তক হইতে সে ভার অদ্যাপি অপনীত হইল না দেখিয়া, বিশ্বাসীর হৃদয়, ক্রমে আরো আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই বিপুল জনতাপূর্ণ জগতের অধিকাংশ মনুষ্য, বৌদ্ধ, খৃষ্টান্ এবং মুশলমান্ ধর্ম্মে বিশ্বাসী। তাহাদের চিত্ত-সকাশে যদি এ ভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিল, তবে আর মানবের অবলম্বনীয় ধর্ম্মের ভাব কোথায় স্থান পাইবে?

ইহার উত্তরে অভিনব একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের লোক কহিতেছেন, "আমরা ন্যায়-নীতি ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়া জগতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষ্য মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইয়া, জগতে সার্ব্বভৌম শান্তি বিস্তার করিবে।" এখন দেখা যাউক, তাঁহাদের সেই প্রতিজ্ঞা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে!

সভ্যজগতের ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতাগ্রগণ্যগিঃ, বলিতেছেন—জীবশ্রেষ্ঠ মানবের অধিবাসের জন্য এই জগৎ প্রস্তুত হইতে অন্যূন সত্তর কোটি বৎসর লাগিয়াছিল। তাহার পর সেই আদিম মনুষ্যের আদিমাবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা আর নাই। ভূগর্ভস্থ মানবকঙ্কাল দেখিলে বোধ হইবে যে, তাহার সহিত বর্ত্তমানকালের মনুষ্যদিগের অবয়বের অনেকাংশে অমিল। তাহাদের তুলনায় আজিও নাকি মনুষ্যের করোটী, এবং পাদদ্বয় সম্পূর্ণ আকার ধারণ করিতে অতঃপর কোটি ২ বৎসরের প্রয়োজন। তখন মানবধর্ম্ম কি ভাবে দাঁড়াইবে, কে বলিতে পারে? এই মত ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত। এই মতবাদীরা বলেন, পশুভাব হইতে মনুষ্য, ক্রমে উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছে। সেকালের লোক বর্ব্বর ছিল, বন্য জন্তুর সহিত একত্র বাস করিয়া, তাহাদের সংঘর্ষে যাহা কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছিল। কালে সেই পশুভাব তিরোহিত হইয়া গেলে, মনুষ্য উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য এক করিয়া লইবে।

কিন্তু আর্য্যজাতি, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, এই জগতের একটী নাম 'মেদিনী'। এই মেদিনী, মেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বসম্ভূত মেদিনী, মহাসূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জল গর্ভে নিহিত ছিল, তাহাতে পুষ্ট ও উচ্ছি্রত হইয়া ক্রমে জীব-সঞ্চার লাভ

করে। সেই জীবশ্রেণী উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ এই চারি ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতির এই জীব-জালে কতবার এই জগৎ পূর্ণ হইল, আবার পরিবর্ত্তিত হইল। এই রূপে ক্রম-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই আকার আবার চারি যুগে বিভক্ত—প্রত্যেক যুগের পরিমাণ কোন নির্দ্দিষ্ট কালে নিবদ্ধ; সেই নিবদ্ধ কালের জীব-প্রবাহ একরূপ হইলেও তাহাতে প্রকৃতি-গত বৈলক্ষণ্য বিবিধাকারে বিন্যস্ত রহিয়াছে। এ সমস্তই কালের অধীন। সেই কাল্ আবার মহাকালের গর্ভে অনবরত নিমজ্জিত রহিয়াছে। আবার তাহা জগ-বিশ্বের আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে, কিয়ৎ-কাল স্থিতি করিয়া তাহাতেই লীন হইয়া যাইতেছে। এমন জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ কত বার হইয়াছে, কত বার হইতেছে, আবার কত বার হইবে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?।

(ক্রমশঃ)

হিমারণ্য-বাসী জনৈক পরিব্রাজক।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি।

বর্ত্তমানে বৃত্তি-নির্ণয়-নিয়ম অনেকাংশে শিথিল হওয়ায় ব্রাহ্মণসন্তানগণ, সুযোগ ও শক্তি অনুসারে নানাবিধ বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এসময়ে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধ হয়।

দেশের এক সম্প্রদায় বলেন, ব্রাহ্মণের অধ্যাপন, যাজন ও সৎ-প্রতিগ্রহই জীবিকা। যুদ্ধ, বাণিজ্য বা শ্ববৃত্তি—চাকরী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও তাহাই বলিয়াছেন—ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণিকর্ম্মাণি জীবিকা। যাজনাধ্যাপনেচৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ। ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মা; তন্মধ্যে যজন, অধ্যয়ন ও দান, জীবিকা হইতে পারেনা, পূর্ব্বোক্ত তিনটাই জীবিকা। ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, যাজক ও সৎ-প্রতিগ্রহী হইবেন।

আপদ্ধর্ম্মপ্রকরণে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ যদি নিজবৃত্তি দ্বারা দিন-নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাহাদ্বারাও যদি দিননির্ব্বাহ অসম্ভব হয়, তবে বৈশ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, কিন্তু কদাচ 'শ্ববৃত্তি' বা 'শূদ্রধর্ম্ম' গ্রহণ করিবেন না। এখানে দেখা গেল, অবস্থার পীড়নে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ-কর্ম্ম, বাণিজ্য-ব্যাপার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু শ্ববৃত্তি বা চাকরী ব্রাহ্মণের পক্ষে ত্যাজ্য।

আপদ্ধর্ম্ম আপৎকালের আশ্রয়। আপৎ-কাল কোন্ সময়? যখন স্বজাতি-বিহিত উপায়ের দ্বারা জীবন-যাত্রানির্ব্বাহ অসম্ভব হয়, সেই সময়ই। প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন "ন কেবলং ধনাভাবমাত্র-মাপৎ, কিন্তু তস্মিন্ সতি বিহিতোপায়া-সম্ভবঃ।" ধনাভাবই আপৎ নয়; ধনাভাব আছে, অথচ বিহিত উপায়ে ধনাগমের সম্ভব নাই, ইহারই নাম আপৎ; এইরূপ কালই আপৎকাল। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, আপৎকাল কোনও কাল-বিশেষ নয়, সকল কালই ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে আপৎকাল হইতে পারে। যখন একজনের আপৎকাল, তখন অন্যের অনাপৎকাল হইতে বাধা নাই। অতএব একজন ব্রাহ্মণ

যে কালে যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহ দ্বারা দিনযাপন করিতেছেন, সেই কালেই বাধ্য হইয়া অন্য ব্রাহ্মণ যোদ্ধৃকর্ম্ম করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বধর্ম্মত্যাগ হইবেনা, কারণ তিনি আপৎকালের আক্রমণে ক্লান্ত। একজন নিজবৃত্তি দ্বারা কালাতিপাত করিতে পারেন, অন্য একজন পারিবেন না কেন? এ প্রশ্ন শূন্যগর্ভ, কারণ সকলেই এক প্রকার অবস্থার অনুকূলতা লাভ করিতে পারেনা, পারিলে আপদ্ধর্ম্মের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন হইত, আর আপদ্ধর্ম্মও যুগধর্ম্মে পরিণতি লাভ করিত। সুতরাং বর্ত্তমানে অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণসন্তানগণ, ক্ষত্রিয়বৃত্তি বা অগর্হিত বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়া অপরাধী হইয়াছেন, মনে করার কারণ দেখি না।

এখন একটী কথার আলোচনা করিতে হইবে; কথাটীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কথাটী এই যে—যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, চাকরী করিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছেন কিনা? অবশ্য যাঁহারা 'শ্ববৃত্তি' অর্থ 'চাকরী' বুঝেন, তাঁহারা বলিবেন, আপৎকালেও উহা কর্ত্তব্য নয়, উহাতে অধঃপতন হইতেছে। ভাবনার কথা! যে সমাজের অধিকাংশ কৃতবিদ্য জন ধর্ম্মভ্রষ্ট অধঃপতিত, সে সমাজের ভরসা কোথায়? আমরা বলিতে চাই, যাঁহারা 'শ্ববৃত্তি' বলিতে চাকরীমাত্রই বুঝেন, তাঁহারা একটু ধীরভাবে শাস্ত্রানুসন্ধান করুন। 'শ্ববৃত্তি' অর্থ চাকরী নয়। প্রথমতঃ চাকরীর একটা বর্ণনা চাই। শিক্ষকতা, শাসকতা, বিচারকতা, মন্ত্রিতা, কর্ম্মাধ্যক্ষতা, সেনাধ্যক্ষতা, প্রভৃতি অবশ্য চাকরীই বটে, কিন্তু এ সকলও কি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়? ইহার কোনওটী ব্রাহ্মণের অকর্ত্তব্য নয়, পরন্তু শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য, ইহা আমরা দেখাইব। কেহ কেহ বলেন, এই সকল কার্য্য করায় দোষ নাই, তবে বেতন বা 'ভৃতি' গ্রহণ করাই দোষ, 'ভৃতি' লইলেই 'ভৃত্য'ত্ব বা চাকরী করা হইল। আমরা দেখাইব, বেতন-গ্রহণ অশাস্ত্রীয় নয়। বেতন না লইলে ঐ সকল কর্ম্ম জীবিকা হইবে কিরূপে? জায়গীর পাওয়া বা নগদ মুদ্রাগ্রহণের পার্থক্য কি?

প্রথম দেখা যাউক, 'অধ্যাপন' জীবিকা হইবে কিরূপে? শুধু বিদ্যাশিক্ষা দিলে কি উদরান্নের সংস্থান হয়? অনেকে বলেন, অধ্যাপকগণ অদ্যাপি নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া থাকেন, পত্রবিদায় হইতে অর্থাগম হয়, উহার মূলে অধ্যাপন, কাজেই অধ্যাপন জীবিকা। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিদায় পাওয়াটা প্রত্যক্ষ প্রতিগ্রহ। অধ্যাপন উহার কারণও নয়, অধ্যয়নই কারণ। শাস্ত্রজ্ঞ লোককে দান করিলে ফলাধিক্য আছে জানিয়াই লোকে সৎপাত্রে (পণ্ডিতে) ধনদান করে। সকল পণ্ডিতই অধ্যাপক নহেন। পণ্ডিতগণই বিদায় পাইয়া থাকেন, অধ্যাপক না হইলে পান না, এমন নহে। অধ্যাপক যদি অধ্যাপনার পরিণামস্বরূপ গুরুদক্ষিণা না লইতেন, তবে অধ্যাপন নিষ্কামকর্ম্ম হইত। বস্তুতঃ উপনিষদের বহুস্থানে ও পুরাণে রীতিমত দক্ষিণার দাবীর বর্ণনা আছে, আমরা সে সব উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকলেবর বাড়াইবনা। আসল

কথা এই যে, অধ্যাপককে সাহায্য করিতেন,—রাজা ও সমাজপতিগণ। ছাত্রগণ গুরুর জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিতেন এবং গুরুর গোধন-পালনাদি করিতেন। এককথায় ছাত্রগণ, গুরুগৃহে একাধারে ছাত্র, পুত্র ও ভৃত্যরূপে বিরাজ করিতেন। ইহাতেও যদি "অধ্যাপনায় অর্থসম্বন্ধ থাকিত না," বলিয়া কেহ সুখী হন, তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করুন, আমরা বাধা দিবনা। শাস্ত্রে যে ভৃতকাধ্যাপকের নিন্দা আছে, তাহা "বিনাবেতনে পড়াই না" এরূপ ভাবানুবন্ধযুক্ত অর্থদৃষ্টি অধ্যাপকের প্রতিই প্রযোজ্য। অধ্যাপনায় দক্ষিণাগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত, তবে তাহার অভাবে বিদ্যাদানের অভাব, তামসিকতারই লক্ষণ।

যাজনে দক্ষিণাগ্রহণ আছে। দক্ষিণাটী যে প্রতিগ্রহ নয়; বেতন-স্বরূপ, তাহার প্রমাণ—জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থের আর্ত্বিজ্যধনবিভাগ-প্রকরণের "দক্ষিণা চ ন প্রতিগ্রহঃ, বেতনরূপত্বাৎ তস্যাঃ" এই পংক্তি। দক্ষিণাগ্রহণ বেতন-গ্রহণই বটে। বেদে ঋত্বিগ্‌দিগের প্রাপ্য দক্ষিণাকে স্পষ্ট কথায় 'ভৃতি' বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। দক্ষিণার জন্য যজমান ও যাজকের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের সংবাদও পুরাণে প্রচুর। অদ্যাপি অনেক স্থানে পুরোহিতের বার্ষিক বৃত্তি বর্ষকৃত্য-দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট আছে, আবার পুরোহিতের "চাকরা জমী"ও আছে। মোট কথা মুদ্রা না হইলে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিও অবৃত্তি হইয়া যায়।

শিক্ষাদানে ব্রাহ্মণগণ চিরদিনই ব্রতী ছিলেন; অর্থও লইতেন। পৌরোহিত্যেও দক্ষিণার দাবী করিতেন, সুতরাং ইহাতে "ভৃতি" ছিল বলা যায়। ব্রাহ্মণ চিরদিনই শাসক ও বিচারক। শাস্ত্র বলেন "গ্রামগোব্রাহ্মণো যোদ্ধাঃ" প্রাচীনকালে গ্রামপালক হইতেন ব্রাহ্মণ। তিনি নির্দ্দিষ্ট ভূমি ও গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশ পাইতেন, তাহাই জীবিকা ছিল। স্মৃতি-সংহিতায় ইহার প্রচুর পরিচয় আছে। প্রাড়্‌বিবাক বা বিচারপতির পদ, ব্রাহ্মণেরই নিজস্ব, বলিলেও চলে। তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহা অনায়াসবোধ্য। মন্ত্রী হইতেন প্রায়ই ব্রাহ্মণ। তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া খাইতেন না। অগ্নিপুরাণ বলেন—"জ্ঞাত্বা বৃত্তিবিধীয়তে" ইঁহাদের রাজসরকার হইতে বৃত্তি-ব্যবস্থা ছিল। রাজসভার সভাসদ বা সদস্যপদে অর্থাৎ কাউন্সিলের মেম্বরের পদে অনেক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাও বৃত্তি পাইতেন। বিশ্বস্ত দূতরূপে অনেক ব্রাহ্মণ চাকরী করিতেন। অনেক বড় বড় কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মাধ্যক্ষ হইতেন। তাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মের উপাসনা করিতেন না। অধিক কি সেনাপতি-পদেও ব্রাহ্মণের ন্যায্য অধিকার ছিল। অগ্নিপুরাণে ২২০ অধ্যায়ে "রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা" আছে। দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মত্যাগী ছিলেন না। চিকিৎসকতা যে ব্রাহ্মণের আপদ্ধর্ম্ম, তাহা হিন্দু-পত্রিকায় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ফলকথা, বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ ভাবপ্রকাশের রচয়িতা ভাবমিশ্র, কাশীপ্রদেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। "ওকালতী" ব্রাহ্মণের কর্ম্ম কিনা,

এ প্রশ্নের উত্তরে নারদ-ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা পাঠ করিতে অনুরোধ করিব। পাটলীপুত্র-ধর্ম্মাধিকরণে ব্রাহ্মণচূড়ার ও স্মার্ত্তশেখর নামক 'ধর্ম্মপণিক' বা উকীল ব্রাহ্মণযুগলের আইন্-ব্যাখ্যার সংবাদ, ব্যাখ্যাকার জানিতেন, তাহাই তিনি লিখিয়াছেন। স্মৃতিসংহিতায় যে "অনিযুক্ত সদস্য ব্রাহ্মণের" কথা আছে, তাহার মধ্যেই ওকালতীর বীজ নিহিত। রাজাকর্ত্তৃক নিযুক্ত নয়, অথচ বিচারে সত্য-নির্ণয়ে সহায়তা করিবে, এমন সদস্য ব্রাহ্মণের রাজসভায় বিদ্যমানতা যে শাস্ত্রে আছে, তাহাতে উকীলের নাম না থাকিলে হানি আছে কি? তবে তখন অর্থ-গ্রহণের জন্য পীড়ন, কোনও কার্য্যেই ছিলনা, কারণ সেদিন ব্রাহ্মণের অভাব হইত অল্পই। যে দিন ব্রাহ্মণের অন্নের জন্য দেশের সম্রাট্ চিন্তা করিতেন, সেদিনও ব্রাহ্মণগণ বড় বড় চাকরী করিতেন, আর আজ হাকিম, উকীল, সকলেই বর্ণ-ধর্ম্মের কণ্টক হইলেন? বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ মাত্র "পুরোহিতের জাতি" ছিলেন না; ভারতের সর্ব্বকার্য্যের পরিচালক ছিলেন।

এখন কথা এই যে, তবে 'শ্ববৃত্তি' কি? শাস্ত্রে আছে, শ্ববৃত্তি সেবা। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, "সেবা পরচিত্তানুবর্ত্তনম্" পরের অভিপ্রায় অনুসারে চলাই যদি সেবা হয়, তবে পুরোহিতও 'সেবক' হইবেন। আমরা বুঝি—সেবা অর্থ স্বীয় অঙ্গ দ্বারা পরিচর্য্যা। যাহাকে সোজা কথায় খানসামাগিরি কহে, তাহাই সেবা, তাহাই শ্ববৃত্তি, তাহাতেই ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। বিচারকার্য্য শাসনকার্য্য, ও দায়িত্বপূর্ণ অন্যান্য কার্য্য-ভার লইয়া জজ, মুন্সেফ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, ডেপুটী, দেওয়ান, ম্যানেজার প্রভৃতি রূপে কার্য্য করায়, ব্রাহ্মণের চিরদিনই শাস্ত্রীয় অধিকার অব্যাহত। এসকল কার্য্য কখনই 'শ্ববৃত্তি' নহে। বর্ত্তমানে যে সকল ব্রাহ্মণ এই সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত, তাঁহারা কেহই এই কর্ম্মের জন্য 'অব্রাহ্মণ' হইয়া যাইবেন না। তবে অন্তরে অধর্ম্ম থাকিলে সকল জাতিরই পতন হয়। আমরা এবিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করি।

শ্রী-

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানং মাল্যানুলেপনম্।
প্রসাধনঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি ॥৩১৯

পতি, বিদেশে গমন করিলে আমি অঞ্জন, ও গন্ধদ্রব্য-সেবা, স্নান, মাল্য-ধারণ, অনুলেপন ও অলঙ্কারাদি-ধারণ করিতাম না। ৩১৯

নোত্থাপয়ামি ভর্ত্তারং সুখ-সুপ্তমহং সদা।
আন্তরেষ্বপি কার্য্যেষু তেন তুষ্যতি মে মনঃ ॥৩২০

পতি, সুখে শুইয়া থাকিলে আন্তরিক কার্য্য থাকিলেও তাঁহাকে উঠাইতাম না; তজ্জন্য আমার মন সন্তুষ্ট থাকিত। ৩২০

নায়াসয়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেঽপি সর্ব্বদা।
গুপ্তগুহ্যা সদাচাস্মি সুসংমৃষ্ট-নিবেশনা ॥৩২১

কুটুম্বের জন্য পতিকে সতত আয়াসযুক্ত করিতাম না; গোপনীয় বিষয় সমুদায় গোপন করিয়া রাখিতাম এবং সর্ব্বদা গৃহ সকল পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম। ৩২১

ইমং ধর্ম্মপথং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩২২

যে রমণী সমাহিতা হইয়া এই ধর্ম্মপদ্ধতি পালন করেন, তিনি রমণীগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৩২২

ভীষ্ম উবাচ।

এতদাখ্যায় সা দেবী সুমনায়ৈ তপস্বিনী।
পতিধর্ম্মং মহাভাগা জগামাদর্শনং তদা ॥৩২৩ (ঠ)

ভীষ্ম কহিয়াছিলেন, তপস্বিনী মহাভাগা দেবী, সুমনাকে এই পতিধর্ম্ম কহিয়া তৎকালে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। ৩২৩

ভগবতী উমা-কথিত স্ত্রীধর্ম্ম এই—

উমোবাচ।

স্ত্রী-ধর্ম্মো মাং প্রতি যথা প্রতিভাতি যথাবিধি।
তমহং কীর্ত্তয়িষ্যামি তথৈব প্রশ্রিতো ভব ॥৩২৪

উমা মহাদেবকে কহিয়াছিলেন—স্ত্রী-ধর্ম্ম আমি যেরূপ জানি, তাহা যথাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, তদ্বিষয়ে অবহিত হউন্। ৩২৪

স্ত্রীধর্ম্মঃ পূর্ব্ব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ।
সহধর্ম্মচরী ভর্ত্তুর্ভবত্যগ্নিসমীপতঃ ॥৩২৫
সুস্বভাবা সুবচনা সুবৃত্তা সুখদর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী ভর্ত্তুঃ সা ধর্ম্মচারিণী ॥৩২৬

পূর্ব্বে বিবাহকালে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক এই স্ত্রীধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে,—রমণীগণ অগ্নির নিকট পতির সহধর্ম্মচারিণী হন। যিনি সুস্বভাবা, সুবচনা, সুশীলা, সুখদর্শনা, সুমুখী; যিনি পতিকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তিনি ধর্ম্মচারিণী হন। ৩২৫-৩২৬

সা ভবেদ্ধর্ম্মপরমা সা ভবেদ্ধর্ম্মভাগিনী।
দেববৎ সততং সাধ্বী যা ভর্ত্তারং প্রপশ্যতি ॥ ৩২৭

শুশ্রূষাং পরিচারঞ্চ দেববদ্ যা করোতি চ।
নান্যভাবাহ্যবিমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা ॥৩২৮

যে সাধ্বী, পতিকে নিরন্তর দেবতার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি পরমধার্ম্মিকা ও পরম-ধর্ম্মভাগিনী। তিনি পতিকে দেবতার ন্যায় ভাবিয়া শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করেন, তিনি পতি ভিন্ন অন্য ভাবনা করেন না, তিনি কদাচ দুঃখিতা থাকেন না; তিনি সুব্রতা ও সুখদর্শনা। ৩২৭ ৩২৮

পুত্রবক্ত্রমিবাভীক্ষ্ণং ভর্ত্তুর্বদনমীক্ষতে।
সা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী ॥৩২৯
শ্রুত্বা দম্পতি-ধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্মকৃতং শুভং।
যা ভবেদ্ধর্ম্ম-পরমা নারী ভর্তৃসমব্রতা ॥৩৩০
দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
দম্পত্যোরেষ বৈ ধর্ম্মঃ সহধর্ম্মকৃতঃ শুভঃ ॥৩৩১

যিনি নিরন্তর পুত্রের মুখ-সদৃশ পতির মুখ নিরীক্ষণ করেন এবং যিনি সাধ্বী ও নিয়তা-চারা তিনিই ধর্ম্মচারিণী হন। সহধর্ম্ম-কৃত শুভ দম্পতীধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া যে রমণী, ধর্ম্মপরায়ণা হন এবং পতির তুল্য ব্রত আচরণ করেন, সেই পতিব্রতা সর্ব্বদা পতিকে দেবতার ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন ও তিনি পতির সহিত শুভধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন। ৩২৯-৩৩০-৩৩১

শুশ্রূষাং পরিচারঞ্চ দেব-তুল্যং প্রকুর্ব্বতী।
বশ্যা ভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী ভর্ত্তুঃ সা ধর্ম্মচারিণী ॥৩৩২

যিনি দেবতুল্য পতির শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করেন, পতির বশীভূতা হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সুমনা, সুব্রতা ও সুখদর্শনা হন এবং যে নারী অনন্যচিত্তা ও সুমুখী, তিনিই ধর্ম্ম-চারিণী হইয়া থাকেন। ৩৩২

(ঠ) মহাভারতে অনুশাসন-পর্ব্বণি ১২৩ অধ্যায়ে।

পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুঃ যা নারী সা পতিব্রতা॥৩৩৩

পতি, নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে এবং ক্রুদ্ধ-লোচনে নিরীক্ষণ করিলেও যে রমণী, পতির সম্মুখে সুপ্রসন্ন মুখে থাকেন, তিনিই পতিব্রতা। ৩৩৩

ন চন্দ্র-সূর্য্যৌ ন তরুং পুন্নাম্নো যা নিরীক্ষতে।
ভর্ত্তৃবর্জ্জং বরারোহা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী॥৩৩৪

যে নারী, পতি ব্যতিরেকে চন্দ্র, সূর্য্য, এমন কি পুরুষ-নামক তরুর প্রতিও দৃষ্টি-নিক্ষেপ না করেন, সেই বরারোহা রমণী ধর্ম্মচারিণী হন। ৩৩৪

দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকর্শিতং।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥৩৩৫

যে রমণী, দরিদ্র, পীড়িত, দীন, পথশ্রান্ত পতিকে পুত্রের ন্যায় সেবা করেন, তিনি ধর্ম্মচারিণী হন। ৩৩৫

যা নারী প্রযতা দক্ষা যা নারী পুত্রিণী ভবেৎ।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥৩৩৬

যে রমণী, প্রযতা ও দক্ষা হন এবং পুত্রবতী হন; আর যে রমণী পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা হন, তিনিই ধর্ম্মভাগিনী হন। ৩৩৬

শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্যবিমনাঃ সদা।
সুপ্রতীতা বিনীতা চ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥
৩৩৭

যে রমণী সুপ্রীতা, বিনয়বতী এবং অনন্যমনা হইয়া সর্ব্বদা পতির পরিচর্য্যা ও শুশ্রূষা করেন, তিনিই ধর্ম্মভাগিনী। ৩৩৭

বিভর্ত্ত্যন্নপ্রদানেন কুটুম্বং চৈব নিত্যদা।
ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা॥
৩৩৮

স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।
কল্যোত্থানরতির্নিত্যং গৃহশুশ্রূষণে রতা।
সুসংমৃষ্টক্ষয়া চৈব গো-শকৃৎকৃত-লেপনা॥ ৩৩৯
অগ্নিকার্য্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নির্ব্বাপ্য পতিনা সহ॥
৩৪০

শেষান্নমুপভুঞ্জানা যথান্যায়ং যথা বিধি।
তুষ্টপুষ্টজনানিত্যং নারী ধর্ম্মেণ যুজ্যতে।
৩৪১

যিনি নিত্য নিত্য অন্ন প্রদান দ্বারা কুটুম্বগণকে প্রতিপালন করেন, যিনি পতির প্রতি প্রচুর অনুরাগ প্রকাশ করেন, কাম-ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখে তাদৃশ অভিলাষ করেন না, সেই নারী ধর্ম্মভাগিনী। যিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করেন, যিনি গৃহশুশ্রূষায় রত থাকেন এবং গৃহ সমুদায় সুন্দররূপে মার্জ্জিত ও গোময়লিপ্ত করেন; যিনি নিয়ত অগ্নিকার্য্যে তৎপরা থাকেন ও সতত পুষ্পবলি প্রদান করেন; যিনি পতির সহিত দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে যথান্যায়ে অন্ন দান করিয়া বিধি অনুসারে শেষান্ন ভোজন করেন; যাঁহার দ্বারা গৃহ-জনগণ সতত তুষ্টি ও পুষ্টি লাভ করেন, সেই রমণী ধর্ম্ম-ভাগিনী হন। ৩৩৮—৩৪১

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বাদে ও গুণে। শর্করার স্বাদ অনেকেই জানেন, কিন্তু গুণ, সকলে জানেন না। সম্প্রতি এক জন ফরাসী ডাক্তার বলিতেছেন—ক্ষত-স্থান শর্করোদকে (চিনির জলে) ধুইয়া ফেলিবে এবং ক্ষত স্থানে শর্করা ছড়াইয়া দিয়া, রেসমসূত্র দ্বারা বাঁধিবে; তাহা হইলেই ক্ষত সারিয়া যাইবে। শর্করা যেমন স্বাদে সর্ব্বজন-প্রিয়, গুণেও তেমনি প্রিয়তা লাভ করিতে চলিল। "চিনির জল" খাইলে ক্ষতগ্রস্তের উপকার হয় কি না, এ সংবাদ জানিতে অনেকের ইচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

দুগ্ধ ও দন্ত। ইংলণ্ডের সহরের একটী কারখানায় সরবিহীন দুগ্ধ হইতে হস্তিদন্তের ন্যায় দৃঢ় ও শুভ্র এক প্রকার

পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে এবং ঐ পদার্থ দ্বারা বোতাম, ছাতার বাঁট প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এখন ভাবিবার কথা এই যে, দুগ্ধের সহিত দন্তের কোনও গূঢ় সম্বন্ধ আছে কি না!

আকাশ-মণ্ডলের আলোক-চিত্র।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্‌গণ বিগত তিন বৎসর শ্রমস্বীকার করিয়া সম্প্রতি নভোমণ্ডলের আলোক-চিত্র গ্রহণ শেষ করিয়াছেন। চিত্রে ১৫০০০০০ নক্ষত্র স্থান পাইয়াছে। এই বিশালকায় নানাখণ্ডে বিভক্ত আলোকচিত্রের দ্বারা ১৬ বিঘারও অধিক ভূমি আবৃত হইতে পারে। না জানি, ইহা দ্বারা গগনমণ্ডলের কত নূতন তথ্য জানিতে পারিব! অধ্যবসায়ে ধন্যবাদ!

পাপের কথা।

সংবাদপত্রে প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলার স্থল-বিশেষে গত তিন মাসের মধ্যে দুর্বৃত্তগণ বিষ প্রয়োগে ১০টী মহিষ ও ১৮০টী গাভীর বিনাশ-সাধন করিয়াছে। এ সংবাদে হিন্দুর হৃদয়ে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা বর্ণনাতীত। হিতকর পশুর প্রতি বিশেষতঃ গোমাতার প্রতি এরূপ নৃশংস অত্যাচার নিতান্ত পাপের কথা! অর্থলালসাই এপাপের মূল। এহেন পাপীগণকে "ভগবতি বসুধে কথং বহসি?"

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উত্তরাখণ্ডপরিক্রম। শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং কলিকাতা ৩৯নং স্কটস্ লেন হইতে শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের ৪০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তক। পুস্তকখানির বাঁধাই বেশ সুন্দর। পুস্তকের কাগজ এন্টিক্। ছাপাও ভাল। পুস্তকে গ্রন্থকারের নিজের একখানি চিত্র, এবং এতদ্ব্যতীত হরিদ্বার গঙ্গাতীরের, কেদারনাথের মন্দিরের, বদরিকাশ্রমের, নেপালের পশুপতিনাথের মন্দিরের এক এক খানি চিত্র এবং উত্তরাখণ্ডের একখানি মানচিত্র আছে। মূল্য মাত্র দেড় টাকা। গ্রন্থকার ভাবুক ও ধার্ম্মিক। তিনি তীর্থভ্রমণে গিয়া অযোধ্যা, হরিদ্বার, ডেরাডুন, মসুরি, উত্তরকাশী, ভৈরবঘাটি গঙ্গোত্তরী, বুড়াকেদার, ত্রিযুগীনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, গুপ্তকাশী, তুঙ্গনাথ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, বদরিকাশ্রম, নন্দপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, ভিল্লকেদার, লছমনঝোলা, হৃষীকেশ, টিহরী, নেপাল, প্রভৃতি স্থান ও তত্তৎ স্থানের শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিয়া, তাহার যে সরসবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন' তাহা তীর্থযাত্রীগণের প্রভূত উপকারে আসিবে। তবে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের গভীর গবেষণার প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা এগ্রন্থে বিশেষ কিছু পাইবেন না। যাঁহারা তীর্থযাত্রাভিলাষী, বিশ্বাসী, তাঁহাদেরই এগ্রন্থ উপকারে আসিবে। গ্রন্থকারের ভাষায় বেশ মাধুর্য্য আছে। নেপাল-রাজ্যের বিবরণ এত সংক্ষিপ্ত যে তাহাদ্বারা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালের বিশেষত্বগুলির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে পশুপতিনাথ-দর্শনার্থীর যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা এগ্রন্থে বিদ্যমান! হিন্দুসমাজে এখনও তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অল্প নয়। এ পুস্তকখানি পাঠ করিলে উত্তরাখণ্ডের দুষ্কর তীর্থযাত্রায় প্রচুর উপকার সাধিত হইবে, ইহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। পুস্তকের আদর হইলে আমরা আনন্দিত হইব। তীর্থের শাস্ত্রীয় উৎপত্তি-বিবরণ ও মাহাত্ম্যবর্ণনা, এগ্রন্থে খুব বেশী নাই, আছে কেবল পথের কথাই সুপ্রচুর। তীর্থের উৎপত্তি তথ্য, ও মাহাত্ম্যকথা এবং প্রত্নতত্ত্বের পরিচয় থাকিলে গ্রন্থখানি আরও মূল্যবান্ হইত।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

(১৮৬৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা



২০শ বর্ষ, ২০শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

ভাদ্র।

১৩২০ সাল, ১৮৩৫ শকাব্দাঃ।

শান্তি।

ভীষণ পরিবর্ত্তন-স্রোত উত্তাল জলধি-জলপ্রবাহের মত অবিরত নৃত্য করিতেছে। প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। আণুবীক্ষণিক কীটাণু হইতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড পর্য্যন্ত সকলেই পরিবর্ত্তন সমরে মাতোয়ারা। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই কেবল ছুটাছুটী, সংঘর্ষ—সংহার। ঐ বেগা নক্ষত্র, সেকেণ্ডে ৫০ মাইল ছুটিতেছে; পৃথিবী মিনিটে ১৮ মাইল ছুটিতেছে; আলোক-পরমাণু মিনিটে কত কোটি মাইল ছুটিতেছে। ঐ দেখ বিরাট্ অম্বরে রবিগ্রহ সৌরজগতের সঙ্গে অন্য একটী বৃহত্তর গ্রহকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। চতুর্দ্দিকেই ছুটাছুটী।

তুমি একদিন একটী আণুবীক্ষণিক জীবাণু ছিলে। তুমি এক্ষণ সার্দ্ধত্রিহস্ত-অবয়ববিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জ। তুমিও কি না ছুটিয়া আছ? অবয়বের হিসাবেই প্রথমে দেখ,—প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তোমার দৈহিক পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে একটা তুমুল ছুটাছুটি সংঘটিত হইতেছে—কতকগুলির তিরোভাব ও কতকগুলির আবির্ভাব হইতেছে; ৪০ দিবসের মধ্যে সমগ্র জৈব-কোষগুলির সম্পূর্ণ নূতনত্ব সংসাধিত হইতেছে। তুমি কা'ল যাহা ছিলে, আ'জ তাহা নহ। এক্ষণ যাহা আছ, এক সেকেণ্ড পরে তাহা আর থাকিবে না। তোমার দেহের পরমাণুপুঞ্জ, খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর জলস্রোতের মত নিরন্তর অবিরামভাবে ছুটিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যদিও তুমি স্থির হইয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছ, তথাপি তুমি বস্তুতঃ ভীষণ বেগে ছুটিতেছ।

ঐ দেখ সুনীল সুন্দর আকাশে মেঘ, ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। ঐ দেখ চাঁদ, ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। ঐ দেখ, তাহার হেমরশ্মিমালা ছুটিয়া ছুটিয়া বিমানে, ধরাতলে, তরুপরে, সৌধচূড়ে, নদী-সৈকতে পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ দেখ সমীরণ হিল্লোল তুলিয়া; নদীর জল, কল্লোল তুলিয়া; সমুদ্র-জল, তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়াছে। কেবল ছুটাছুটী।

ঐ দেখ—কৈশোর যৌবনের দিকে, যৌবন জরার দিকে, জরা ধ্বংসের দিকে ছুটিতেছে। কোমল কলিটী ফুল্লাবস্থার দিকে ছুটিতেছে; অনিবার্য্য গতিতে—প্রখর বেগে ছুটিতেছে। এ বেগ অতীব ভীষণ ও নিতান্ত অপ্রতিহত। তুমি ভ্রান্ত; তাই মনে কর, নলিনী-দলগত তরল যৌবনের লাবণ্য টুকু ধরিয়া বাঁধিয়া তুমি শরীরে ঝুলাইয়া রাখিবে। তাই তুমি দিবসের মধ্যে সহস্রবার মুকুরে মুখাবয়বের লাবণ্য-ভঙ্গীটুকু দেখিয়া, কেশকলাপের চিকণত্ব দেখিয়া, তাম্বুল-রাগরঞ্জিত অধরপল্লবে হাসির মনোহারিণী রক্তিমাভা দেখিয়া, পূর্ণায়ত চক্ষুতে কটাক্ষের ঢুলু-ঢুলুত্ব, বিলোলত্ব দেখিয়া, আপন গলিয়া যাইতেছে। তুমি বড় ভ্রান্ত! অই দেখ, তোমার সাধের চক্ষু কোটরে পড়িল; অই দেখ, কেশে কাশকুসুম ফুটিল; অই দেখ, দন্ত চ্যুত হওয়ায় তোমার সেই নিটোল কপোল যুগল নিখাতগ্রস্ত হইল; হাসির জ্যোৎস্নামাখা অধরে বিষাদ-অন্ধকারের ছায়া আসিয়া পড়িল। সে অধর, সে কপোল, সে কেশ, সে লাবণ্য সব ছুটিয়াছে; এখনও ছুটিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই এবম্প্রকার সমর-তরঙ্গ! সামাজিক বিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। কত প্রকার বিপ্লব, সংঘর্ষ, চঞ্চলতা, কত প্রকার ছুটাছুটী! দেখিতে দেখিতে ভারতে রামরাজত্বের সুখ ছুটিয়া গেল; দেখিতে দেখিতে পাঠান ও মোগলের অপ্রতিহত প্রভাব ছুটিয়া গেল; আবার বৃটিশ-শাসনের মহাবিক্রম প্রবল বেগে, প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতেছে। এই তরঙ্গের নিকট আট্‌লাণ্টিক্ মহাসমুদ্রের অত্যুচ্চ তরঙ্গও নগণ্য। যে দিকেই দেখ, যে কালেই দেখ, যে বিভাগেই দেখ, কেবল ছুটাছুটী! প্রবল বেগে ছুটাছুটী!

একটী কন্দুক প্রবল-বেগে ঘুরিলে, মনে হয়, যেন উহা স্থির, কিন্তু বস্তুতঃ উহা প্রবল বেগে ঘুরিতেছে; তদ্রূপ আমরা প্রবল বেগে ঘুরিতেছি, ছুটিতেছি, অথচ মনে হইতেছে, আমরা বড়ই স্থির হইয়া আছি। একটু অনুধাবন করিলেই অপ্রতিহত চঞ্চলতার অনুভূতি হইবে। একটী তৃণ হইতে অত্যুচ্চ হিমাদ্রিশিখর পর্য্যন্ত, একটী জীবাণু হইতে একজন মহামহোপাধ্যায় পর্য্যন্ত, প্রত্যেকের মধ্যেই এই চঞ্চলতা, এই আকুলতা দেদীপ্যমান!

এই মহাসমরস্রোত, এই মহীয়সী আকুলতা, এই ভীষণ ছুটাছুটী কিসের জন্য? যেন কোন-কিছু হারাইয়াছে! যেন সেই হারাণ দ্রব্যটী অন্বেষণ করিবার জন্য,—সেই অভীপ্সিত জিনিসটী পাইবার জন্য চরাচর আজ ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে। সেই জিনিসটী কেহ বিদ্যায় খুঁজিতেছে, কেহ ক্ষমতায় খুঁজিতেছে, কেহ অর্থে খুঁজিতেছে, কেহ রূপে খুঁজিতেছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

অই দেখ—ক্রীসস্ ধনকুবের হইয়াও অতৃপ্ত। অই দেখ—সিরাজউদ্দৌলা সুন্দরী-বৃন্দের লাবণ্য-সরিতে সন্তরণ দিয়াও অতৃপ্ত। অই দেখ—আলেকজন্দর সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়াও অতৃপ্ত। অই দেখ—নিউটন অমানুষিক প্রতিভামণ্ডিত হইয়াও অতৃপ্ত; তাই তিনি বলিলেন "জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে তিনি মাত্র উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন।" কেহই তৃপ্ত নহেন; কেননা যে জিনিসের জন্য অণ্বেষণ চলিতেছে, তাহা মিলিতেছে না।

জগতের যাবতীয় প্রাণী যে জিনিসটী খুঁজিতেছে, সেই ঐন্দ্রজালিক মহামূল্য দ্রব্যটী তবে কি? কোথায় বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? শাস্ত্র বলেন, সেই জিনিসটী——শান্তি; এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল শান্তির ভিখারী। শুধু শান্তির জন্যই এত অণ্বেষণ,—এত সংঘর্ষ,—এত ছুটাছুটী,—এত অতৃপ্তি। শান্তিই ব্রহ্মাণ্ডের বাঞ্ছনীয়; শান্তিই ব্রহ্মাণ্ডের সেই হারাণ নিধি; শান্তিই বিশ্বের প্রকৃতি।

এখন দেখা যাউক, এই শান্তি কি? মাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই শান্তির প্রকৃততথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য জাতি, ভ্রান্ত পথিকের মত শান্তি খুঁজিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুরাই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তাই, হিন্দুশাস্ত্র, শান্তির যেরূপ প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বলিব। শাস্ত্র বলেন, শান্তিই মোক্ষ, শান্তিই নিরবচ্ছিন্ন সুখ, শান্তিই কৈবল্য। যে সুখের বিরতি নাই, বিশ্রান্তি নাই, তাহাকেই শান্তি বলে। যে সুখের চেয়ে সুখ আর নাই, যাহা পাইলে জীব আর কিছু চায় না, সেই সুখকে শান্তি বলে। শ্রীভগবান্ গীতায় মধ্যে দশটী স্থলে শান্তির প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখপঙ্কজ-বিগলিত সেই সুধাবাণী এই:—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥
(২য় অঃ ৬৬।)

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
(২য় অঃ ৭০।)

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
(২য়ঃ ৭১।)

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
(৪র্থ অঃ ৩৯।)

"যুক্তঃ কর্ম্মফলংত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥
(৫ম অঃ ১২।)

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥
(৫ম অঃ, ২৯।)

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥
(৬ষ্ঠ অঃ, ১৫।)

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে
ধ্যানাৎ কর্ম্মফল-ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥
(১২শ অঃ, ১২।)

"অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
(১৬শ অঃ, ২।)

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি
শাশ্বতম্ ॥
(১৮শ অঃ, ৬২)।

"যিনি আপনার চিত্তকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার বুদ্ধিও নাই ভাবনাও নাই; ভাবনাশূন্য ব্যক্তির শান্তিও নাই। শান্তি বিহীন পুরুষের সুখ কোথায়?

"যেমন সমস্ত নদ-নদী জলে পরিপূর্ণ অতল গম্ভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয় সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহাত্মা কখন বিক্ষেপযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে এই শান্তি দুর্লভা।

"যে ব্যক্তি কামনা-ত্যাগ-পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম, ও নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"যিনি শ্রদ্ধাবান্, গুরুশুশ্রূষু ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্র কৈবল্য-মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

"যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মযোগিগণ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষরূপ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং অযুক্ত ব্যক্তিগণ কামনা বশতঃ ফললাভে আসক্ত হইয়া বন্ধন-দশাগ্রস্ত হয়েন।

"মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্ব্বলোক-মহেশ্বর এবং সকলের সুহৃদ্ জানিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

"সংযতচিত্ত যোগাভ্যাসী পুরুষ, সকল সময়ে মন বিরোধ করিয়া, আমার স্বরূপভূত নির্ব্বাণরূপ পরম-শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"হে অর্জ্জুন! অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ও ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। "এই ত্যাগানন্তরই মুক্তিরূপ শান্তি-লাভ হইয়া থাকে।

"অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল, এতাবৎ দৈবী সম্পৎ। শান্তি—অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের উপশম।

"হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে। শান্তি—মনোনিবৃত্তিরূপ পরমশান্তি।

এখন দেখা গেল "শান্তি কি?" সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে হইবে; অর্থাৎ আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যই অনাসক্ত ভাবে, মাত্র কর্ত্তব্যবোধে সম্পূর্ণ কামনাবিহীন হইয়া করিতে হইবে। ভগবানের কার্য্য করিতেছি, অহোরাত্র কেবল এই চিন্তা জাগরূক রাখিয়া কার্য্য করিতে করিতে কর্ম্মযোগ আয়ত্ত হইবে। তার পর, শান্তির স্বর্গীয়-ভাতি হৃদয়ক্ষেত্রে বিকীর্ণ হইতে থাকিবে। তখন আর পার্থিব কামিনীকাঞ্চনের মোহমদিরা আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবেনা। সাধক, তখন তুমি পৃথিবীর সুখদুঃখের অতীত জীবন্মুক্ত; তখন তুমি পুরীষস্তূপে মণ্ডিত থাকিয়াও ত্রিদিবের পারিজাত-সৌরভে মাতোয়ারা থাকিবে; দারিদ্র্য-রাক্ষসীর বিকটকবলে কবলিত হইয়াও আপনাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী মনে করিবে। তখন তোমার চতুর্দ্দিকে নিরন্তর অক্ষয় আনন্দসমুদ্র তরঙ্গভঙ্গীতে উদ্বেলিত হইতে থাকিবে। তখন তুমি

পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গবাসী, নশ্বর হইয়াও অবিনশ্বর, ছিন্নকন্থাধারী হইয়াও মহারাজ-চক্রবর্ত্তী। মনের এতদবস্থার নামই শান্তি; ইহাই মুক্তি, ইহাই কৈবল্য। 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া, মনকে বশীভূত করতঃ, ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া, ভগবদনুসন্ধানে নিযুক্ত করিতে হইবে। সততই ভগবচ্চিন্তা-সহকারে কার্য্য করিতে হইবে। আপনার সত্তা, ভগবৎ-সত্তায় মিশাইয়া, আপনার স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া, অনুক্ষণ কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে মনের উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ থাকিবে না ও কর্ম্মযোগ সফল হইবে—শান্তিরত্ন-লাভ ঘটিবে। ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের শিক্ষা।

মনের ঐ শান্তিময় ভাব কাল্পনিক নহে। অভ্যাস করিলে বাস্তবিকই ঐ দেব-বাঞ্ছিত অবস্থায় আরোহণ করা যায়। জন্ম-জন্মান্তরের কথায় বা পৌরাণিক-যুগের ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথায় কাজ নাই, এই কালেই ঐরূপ অবস্থাপন্ন বহু মহাত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। সে বেশী দিনের কথা নয়, রূপ-সনাতন, অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক, কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিয়া, বিমল-শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তুমি-আমি স্বার্থের কীট; আমরা দেখিলাম, তাঁহারা বৃক্ষ-তলায় থাকিয়া, ছিন্নকন্থা ধারণ করিয়া, অনশনে অর্দ্ধশনে কত কষ্টই পাইলেন। আমরা সংকীর্ণ-হৃদয়, সুতরাং আমাদের ধারণাও তদনুরূপ। আমরা ঐ মহাত্মাদের দেবদুর্ল্লভ মানসিক সুখের আস্বাদ কেমন করিয়া পাইব? অল্পদিনের কথা, লালা বাবুও সংসার-আসক্তি ছিন্ন করিয়া শান্তি পাইয়াছিলেন! গৌতম, চৈতন্য, সকলেই ঐ শান্তি উপভোগ করিয়া গিয়াছেন চৈতন্যের মত প্রগাঢ় পণ্ডিত এই পৃথিবীতে কমই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাঁহার অবলম্বিত পথে শুধু কষ্ট থাকিত, শান্তির সাক্ষাৎকার না মিলিত, তবে কদাচ তিনি ঐ পথে থাকিতেন না। এই মহাত্মা প্রতারক ছিলেন না। তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা যে শান্তি সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। শান্তির অবস্থা যে কাল্পনিক নহে, তাঁহারাই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

শান্তির অবস্থাই ব্রহ্মভূতাবস্থা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শান্তিই বিশ্বের প্রকৃতি। পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত মাত্র। ব্রহ্মভাব হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি এবং পুনরায় স্ব প্রকৃতি-রূপ শান্তিকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া উন্মত্ত ও উদ্ভ্রান্ত ভাবে ছুটিতেছি। স্থাবর-জঙ্গম সকলের মধ্যেই এই ভাব। যতই আমরা ব্রহ্মভাবের সামীপ্য লাভ করিতেছি, যতই পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, যতই জ্ঞানের উন্মেষ সংসাধিত হইতেছে, ততই এই আকুলতার বেগ অধিকতর সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইতেছে। এইজন্যই মনুষ্যের মধ্যে শান্তির আকাঙ্ক্ষা সমধিক বলবতী। মনুষ্যজাতির মধ্যে আবার যাঁহারা সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্যে এই আকুলতা আরও প্রকটতা লাভ করিয়াছে।

অনেক ভাবেন, 'শান্তি' ও 'সুখ' একই, কিন্তু, বস্তুতঃ তাহা নহে। 'শান্তি' সুখ

নহে, কিন্তু 'সুখ' শান্তি নহে। তুমি সুখাদ্য-ভোজন, সুস্বর-শ্রবণ, সুদৃশ্য-দর্শন ও সুগন্ধ-গ্রহণ প্রভৃতিতে সুখ পাও, কিন্তু সে সুখ শান্তি নহে। কেননা উহাতে স্থায়িতৃপ্তি নাই। কিছু দিন ভোগের পরই আবার কি এক "নাই-নাই"-ভাব প্রাণে জাগিয়া উঠে। অতএব, যাহাকে আমরা পার্থিব হিসাবে 'সুখ' বলি, সেটা অতীব অকিঞ্চিৎকর, ঘৃণ্য, নগণ্য। তাহা জীবনের পথে কেবল মৃগতৃষ্ণিকা আনয়ন করে মাত্র। আমরা বৃথা উহার অনুসরণ করিয়া উদ্ভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত, অবসন্ন ও অবশেষে বিনষ্ট হই। তবে যে সুখ, শান্তির সহিত সংসৃষ্ট, শান্তির উপর স্থাপিত, শান্তির অনুকূল, তাহা অতি পবিত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে দেখা যায়, কতকগুলি সুখ, শান্তির সহিত সংসৃষ্ট,—শান্তির অনুকূল; আবার কতকগুলি, শান্তির বিরোধী,—শান্তির প্রতিকূল। শান্তির অনুকূল যে সুখ, তাহাই বাঞ্ছনীয় ও অনুসরণীয়। শান্তির প্রতিকূল যে সুখ, তাহা নিন্দনীয় ও পরিহরণীয়। কোন্ সুখ শান্তির অনুকূল ও কোন্ সুখ প্রতিকূল, ইহা বিচার করিতে গিয়া, লোকে পাছে ভ্রমে পতিত হয়, এইজন্য শ্রীভগবান্ গীতার মধ্যে অতি সরলভাবে সুখের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দনিঃসৃত অমৃতস্রাবী তথ্যগুলি এই :—

"সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি॥
"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
"বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥
"যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥
(১৮শ অঃ, ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯)

"হে ভরতর্ষভ! অভ্যাসবশতঃ যে সুখে আসক্তি বৃদ্ধি পায় ও যে সুখ প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান হয়, আমি সেই সুখের ত্রিবিধ ভেদ কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

"যে সুখ প্রথমতঃ বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয়, এবং যে সুখ দ্বারা আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, যোগিপুরুষগণ তাহাকেই "সাত্ত্বিক সুখ" বলিয়াছেন।

"বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয় এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা "রাজস সুখ"।

"যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মুগ্ধ করে এবং নিদ্রা ও আলস্যাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা "তামস সুখ"।

ভগবান্ উপর্য্যুক্ত তিন প্রকার ভেদ সূচিত করিয়াছেন। নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ-জনিত সুখ—তামস। বিষয়-বিভব, অর্থ-বিত্ত ও রমণী-ভোগ প্রভৃতি জনিত সুখ—রাজস। ভগবচ্চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, পরোপকার প্রভৃতি জনিত সুখ—সাত্ত্বিক। এই ত্রিবিধ-সুখের মধ্যে রাজস ও তামস সুখ পরিত্যাজ্য; কেননা, ইহাতে চিত্ত-মালিন্য জন্মে ও ইহা বন্ধনের কারণ। এই রাজস সুখের প্রতি হেয়তাজ্ঞান উদিত হওয়ায় অর্জ্জুনও একদিন বলিয়াছিলেন,—

"কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈ-
জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ
সুখানিচ ॥"
"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানিচ"

"হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আর জীবন-ধারণেরই বা ফল কি ? কেননা, যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করা যায়, তাঁহারাই আ'জ রণক্ষেত্রে উপস্থিত।

হে কৃষ্ণ! আমি বিজয়-কামনা করিনা; রাজ্যসুখ-ভোগাদির আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন যে, রাজস-তামস সুখে একদিন-না-একদিন ঐ প্রকার হেয়তাজ্ঞান হইই হয়। ঐ সুখ চিরদিন ভাল লাগে না। ভগবান্ যে কেবল প্রকারান্তরেই শিক্ষা দিয়াছেন, এমত নহে। তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন,—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
[২য় অঃ, ৫৬]

"যাঁহার চিত্ত দুঃখ-প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না, ও বিষয়-সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ।

এখন দেখা যাইতেছে যে, রাজস ও তামস সুখে যাঁহার স্পৃহা নাই, ভগবান্ তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন; অতএব, স্পষ্টই তিনি ঐ সুখ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন। পক্ষান্তরে, তিনি সাত্ত্বিক সুখের অনুসরণ করিতেও বলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের কথা এই,—

"ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম।"
[২য় অঃ ৬৬]

"ভাবনাশূন্য ব্যক্তির শান্তি নাই। শান্তিবিহীন পুরুষের সুখ কোথায় ?"

অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ ও 'শান্তির' সম্বন্ধ আছেদ্য, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শান্তি ও সাত্ত্বিক সুখে যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা শ্রীভগবানের নিম্নলিখিত কথামৃত হইতেও উপলব্ধি করা যায়। কথাগুলি এই :—

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥
[৫ম অঃ, ২১]

"বাহ্য শব্দাদিতে আসক্তিশূন্য ব্যক্তি, অন্তঃকরণে শান্তি-সুখ অনুভব করেন। তৎপরে ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন।"

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥
(৬ষ্ঠ অঃ ২১)

"যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত ও কেবল শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অত্যন্ত সুখের অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আত্মস্বরূপ ভাব হইতে কিছুতেই বিচলিত হয়েন না।

"প্রশান্ত-মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥
(৬ষ্ঠ অঃ, ২৭।২৮)

"প্রশান্তচিত্ত যোগীর মন যখন

রজস্তমোগুণাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি নিরতিশয় সুখলাভ করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে নিজ মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম-বোধ-বর্জ্জিত নিষ্পাপ যোগী, অনায়াসে ব্রহ্মরূপ অপরিচ্ছিন্ন-সুখানুভব করিয়া থাকেন।

উদ্ধৃত ভগবদ্বাক্য হইতে এরূপ ভগবদুদ্দেশ্য স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাত্ত্বিক সুখেই শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং তাহাই জীবের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জগতের জীব, যে সুখের জন্য ছুটিয়া বেড়ায়, সে সুখ সাত্ত্বিক সুখ—সেই শান্তি—সেই মুক্তি—সেই জীবের স্বপ্রকৃতি—সেই ব্রহ্মপ্রকৃতি; এবং যখন "শান্তি নাই—শান্তি নাই" বলিয়া চীৎকার করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি সেই সাত্ত্বিক সুখেরই অন্বেষণ করিতেছে। অতএব, শান্তিই বল, আর সাত্ত্বিক সুখই বল, উভয়ই বিষয়ে অনাসক্তি, বৈরাগ্য, মনোবৃত্তির উপশম, ও নিবৃত্তিমার্গের সেবা ব্যতীত মিলিতে পারে না। ইহাই সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের ভেরী-নিনাদ এবং এই ভাবই জগতের অবলম্বনীয়।

ওঁশান্তি! ওঁশান্তি!! ওঁশান্তি!!!

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

ন্যায়দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

৩২। সূত্র প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ।

ব্যাখ্যা। "প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি" বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ পঞ্চবাক্যবিশেষাঃ "অবয়বাঃ" (অবয়বশব্দেন পরিভাষিতাঃ)—।

তাৎপর্য্যানুবাদ। (১) প্রতিজ্ঞা [২] হেতু [৩] উদাহরণ [৪] উপনয় [৫] নিগমন [যাহাদিগের লক্ষণ যথাক্রমে মহর্ষি বলিবেন] এই পাঁচটী বাক্যবিশেষ 'অবয়ব' শব্দের দ্বারা পরিভাষিত হইয়াছে।

টীকা। এইবার "অবয়বের" কথা। অবয়ব শব্দের অর্থ অঙ্গ বা অংশ। সূত্রোক্ত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী বাক্য, ন্যায় নামক মহাবাক্যের অংশ। তাই মহর্ষি ইহাদিগকে "অবয়ব" বলিয়াছেন। যথাক্রমে এই প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি-নিগমনপর্য্যন্ত বাক্যসমূহের নাম 'ন্যায়'; সুতরাং প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি তাহার অংশ। নব্যনৈয়ায়িকগণ এই ন্যায়ের লক্ষণ বলিয়াছেন—"উচিতানুপূর্ব্বীকপ্রতিজ্ঞাদিপঞ্চসমুদায়ত্ব" — অর্থাৎ প্রথম প্রতিজ্ঞাবাক্য, তাহার পরে হেতুবাক্য, তাহার পরে উদাহরণবাক্য, তাহার পরে উপনয়বাক্য, তাহার পরে নিগমন-বাক্য প্রয়োগ করিলে, ঐগুলির প্রকৃত আনুপূর্ব্বীক্রমে অর্থাৎ যে অক্ষরের পরে যে অক্ষর, ঠিক সেই ভাবে সংযোজিত বর্ণক্রমে একটী মহাবাক্য হয়, ঐ মহাবাক্যই ন্যায়। পরার্থানুমানে ঐ ন্যায়-প্রয়োগ আবশ্যক। তাই ন্যায়ের অবয়বগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। স্বার্থানুমানে অর্থাৎ আমরা নিজের তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য নীরবে যে সব অনুমান করিয়া থাকি, তাহাতে, এই ন্যায়প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। আর যেখানে অপরকে মানাইবার জন্য অনুমান করিতে হয়, সেই পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা নিজের বিবক্ষিত

বিষয়টী বুঝাইতে হয়, তাই সেখানে প্রথমতঃ পঞ্চাবয়বাত্মক 'ন্যায়' প্রয়োগ করিতে হয়। 'নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ অনেন" অর্থাৎ যাহার দ্বারা বিবক্ষিত বস্তুর সিদ্ধি পাওয়া যায়—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পূর্ব্বোক্ত মহাবাক্যে ন্যায়শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নব্য-নৈয়ায়িকগণ এই ন্যায়ের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের ন্যায় সামান্যতঃ অবয়বের লক্ষণও বলিয়াছেন। 'অবয়ব'গ্রন্থে নব্যগণের বিস্তৃত বিচার এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু মহর্ষি গোতমের সূত্র পাঠ করিয়া বুঝাযায়, তিনি অবয়বের লক্ষণ-ব্যাখ্যায় কোন গুরুচিন্তা করেন নাই। তাঁহার কথিত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চবাক্যান্যতমত্বই অবয়বের সামান্য লক্ষণ, ইহা তাঁহার সূত্রে সূচিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরূপই বলিয়াছেন।

এখানে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"দশাবয়বানেকে নৈয়ায়িকা বাক্যে সঙ্ক্ষতে" অর্থাৎ কোন কোন নৈয়ায়িক, ন্যায়বাক্যে দশটী অবয়ব বলেন। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকরও বলিয়াছেন "একে তাবদ্ ব্রুবতে দশাবয়বং বাক্যং অপরে ত্র্যবয়বমিতি।" ফলতঃ এই মত-নিরাকণের জন্যই মহর্ষি সূত্রদ্বারা পঞ্চাবয়ব-বাদের—প্রচার করিয়াছেন, ইহাই প্রাচীন ভাষ্যকার প্রভৃতির বিশ্বাস। মীমাংসকমতে অবয়ব তিনটী। উত্তরমীমাংসা বেদান্তের ঐমত, ইহাও পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রের "ভামতী" গ্রন্থে পরার্থানুমানে ন্যায়বাক্যে গোতমোক্ত এই পাঁচটী অবয়বেরই প্রয়োগ দেখিতে পাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র কোন্ মতের পক্ষপাতী, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

আবার "পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ", এই সাংখ্যসূত্র পাঠ করিয়া পঞ্চাবয়ব-বাদ যে সাংখ্য-সম্মত নহে, ইহাও বুঝিতে পারি না। মিশ্রমহোদয় সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতেও স্থলবিশেষে পরার্থানুমানে ন্যায়বাক্যে পঞ্চাবয়বেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী অবয়বের স্বরূপপ্রকাশন করিয়া, এই পঞ্চাবয়ববাদে ভাষ্যকারের কথা জানাইব।

এখন প্রশ্ন এই যে—ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকগণের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, এই নৈয়ায়িক কাহারা? মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বেও কি নৈয়ায়িক ছিলেন? মহর্ষি, কাহাদিগের মত-নিরাকরণের জন্য সূত্র করিয়াছেন? এখন এই প্রশ্নের সমাধানে অনেকেই চিন্তিত। আমাদিগের প্রথম কথা এই যে, ভাষ্যকারের নৈয়ায়িকগণ, গোতমের পরবর্ত্তী হইবার কোন বাধা নাই। অনেক পরবর্ত্তী মত-নিরাকণের জন্যও দার্শনিক ঋষিগণ সূত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা দর্শনের ভাষ্যকারগণ দৃঢ় বিশ্বাস করেন। বেদান্তসূত্রে বৌদ্ধ যোগাচার প্রভৃতির মত-নিরাকরণে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যপাদের—ব্যাখ্যা দেখিলে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝাযায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে সময়ে ভাষ্য-রচনা করেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, তাঁহার বিরুদ্ধবাদী নৈয়ায়িকগণও তখন ছিলেন। ঋষি-সূত্র সাহায্যে তাঁহাদিগের দশাবয়ববাদ রূপ মত-বিশেষ খণ্ডন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার কথায় "একে—নৈয়ায়িকা বাক্যে সঙ্ক্ষতে" এইরূপ বর্ত্তমানকাল-নির্দ্দেশ রহিয়াছে—"কোন ২ নৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন" এইরূপ কথা, সমকালবর্ত্তী নৈয়ায়িকের কথা

মনে আনিয়া দেয়। তবে ঋষিমতবিরুদ্ধ-মতবাদী নৈয়ায়িক হইতে পারে না, ইহা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা, ভাষ্যকারের নৈয়ায়িকগণ, আস্তিক অথবা নাস্তিক-সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা পূর্ব্বে স্থির করুন। নাস্তিক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও তৎকালে অনেক প্রবীণ নৈয়ায়িক ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ন্যায়সূত্রে বাৎস্যায়নও সূত্র সাহায্যে অনেক নাস্তিকমতের নিরাকরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, অনুমান প্রমাণ, মহর্ষি গোতমের সৃষ্ট নহে। উহা অনাদিকাল হইতে জীবদেহের সহিত সৃষ্ট। ঐ অনুমানে যাহা আবশ্যক; তাহাও চিরদিনই আছে এবং যথাসম্ভব সে গুলির আলোচনাও সুচিরকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। নচেৎ দার্শনিক আলোচনা চলিতেই পারে না। গোতমের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী ঋষিগণ কি এই ন্যায়তত্ত্বের কিছুই জানিতেন না? তাঁহাদিগেরও সাম্প্রদায়িক মত ছিল। ফলতঃ ন্যায়ের অবয়বের কথা চলিতেছে; যাঁহারা ন্যায়জ্ঞ, তাঁহাদিগকেও নৈয়ায়িক শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া ভাষ্যকার "একে নৈয়ায়িকাঃ" এই কথা বলিতে পারেন। ভাষ্যকারের "নৈয়ায়িক" শব্দের দ্বারা গোতমের ন্যায়দর্শনে পণ্ডিত, ইহাই বুঝিতে হইবে, এমন নহে। "ন্যায়ং বেত্তি অধীতে বা" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতেই "নৈয়ায়িক" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ন্যায় বলিতে এখানে—পরার্থানুমানে প্রয়োজনীয় "ন্যায়"ই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই ন্যায়জ্ঞ লোক পূর্ব্বেও ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দশাবয়ববাদী যাঁহারা ছিলেন, ন্যায়তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি গোতম, তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করেন নাই। সে কাহারা, তাহার বিশেষ বার্ত্তা কিছু পাওয়া যায় না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি গোতমোক্ত পাঁচটী অবয়ব ভিন্ন জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্য-প্রাপ্তি, প্রয়োজন, এবং সংশয়-ব্যুদাস, নামে আরও পাঁচটী অবয়ব-বাদী। তাই তাঁহারা দশাবয়ববাদী। ইহাদিগের মধ্যে ত্যাগবুদ্ধি, গ্রহণবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধিই প্রয়োজন। 'জিজ্ঞাসা' বলিতে জানিবার ইচ্ছা। জানিবার ইচ্ছা—বশতঃ পদার্থ জ্ঞানে, তজ্জন্য ঐ ত্যাগাদি-বুদ্ধিরূপ প্রয়োজন হয়। সংশয় না হইলে জিজ্ঞাসা হয় না, তাই সংশয়, জিজ্ঞাসার জনক। শক্য-প্রাপ্তি বলিতে প্রমাণ গুলির জ্ঞানোৎপাদন-শক্তি। সংশয়-ব্যুদাস বলিতে তর্ক। এই জিজ্ঞাসা প্রভৃতি ব্যতীত কোন প্রস্তাবের উত্থাপন হয় না, তাই উহারা আবশ্যক। কিন্তু উহারা অবয়ব হইতে পারে না, কারণ উহারা বাক্য নহে। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়-নামক মহাবাক্যের অঙ্গ বা অংশকেই অবয়ব বলে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—জিজ্ঞাসা প্রভৃতি—পর-প্রতিপাদক নহে, এজন্য উহাদিগকে বাক্যাঙ্গ অবয়ব বলা যাইতে পারে না। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী বাক্য মিলিত হইয়া একটী মহাবাক্য হয়। উহারা সেই মহাবাক্যের প্রয়োজন সম্পাদন করে বলিয়া, অবয়ব শব্দের দ্বারা পরিভাষিত হইয়াছে। মূল কথা অবয়ব এই পাঁচটীই। ইহা ছাড়া আর অবয়ব নাই। ইহাই মহর্ষি গোতমের সূত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির পরিচয় পাইলে, একথা বিশদ রূপে বুঝা যাইবে॥ ৩২।

৩৩। সূত্র। সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা।

ব্যাখ্যা। "সাধ্যস্ত [প্রজ্ঞাপনীয়ধর্ম্ম বৈশিষ্ট ধর্ম্মিণঃ] নির্দ্দেশঃ" [বোধকবাক্যং] প্রতিজ্ঞা" [প্রতিজ্ঞানামকোহবয়বঃ]।

তাৎপর্য্যানুবাদ। যে ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্মটীকে অনুমানের দ্বারা বুঝাইতে হইবে, সেই ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মীর বোধক বাক্যবিশেষকে প্রতিজ্ঞা বলে।

টীকা। অবয়বের মধ্যে প্রতিজ্ঞাই প্রথম, তাই প্রথমে সেই প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিতেছেন। অনুমানে সাধ্য ও পক্ষ আবশ্যক, সে কথা অনুমান-সূত্রে [৫ম সূত্রে] বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে বহ্নি—সাধ্য, পর্ব্বত পক্ষ। পর্ব্বত সিদ্ধ হইলেও বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত, যে অনুমানের পূর্ব্বে সিদ্ধ নহে, সেই অনুমানের দ্বারা বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতও সাধিত হয়, সুতরাং সাধ্য শব্দের দ্বারা বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেও প্রকাশ করা যায়। মহর্ষির এই সূত্রে সাধ্য শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহা পরে আরও পরিস্ফুট হইবে। এখানে সাধ্য শব্দের দ্বারা কেবল বহ্নি প্রভৃতি ধর্ম্ম বুঝিলে, কেবল "বহ্নি" এই রূপে তাহার নির্দ্দেশও প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান স্থলে "বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ অথবা পর্ব্বতো-বহ্নিমান্" এইরূপ বাক্যই প্রতিজ্ঞা। এই বাক্যের দ্বারা বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত-রূপ ধর্ম্মীর বোধ হয়, সুতরাং সাধ্যের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর বোধক বাক্য হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞা হইতে পারিল। "নির্দ্দিশ্যতেহনেন" অর্থাৎ নির্দ্দেশ করা যায় যাহার দ্বারা, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে "নির্দ্দেশ" বলিতে এখানে 'বোধক বাক্য'। সাধ্যনির্দ্দেশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্যবোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা। দীধিতিকার রঘুনাথ, অবয়বগ্রন্থে চিন্তামণিকার গঙ্গেশের কথায় এখানে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেবল "সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা" এই যথাশ্রুত সূত্রার্থকে প্রতিজ্ঞা বলিলে, ঐ সূত্রটিও প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে। কারণ ঐ সূত্রটিও সাধ্যবোধক বাক্য। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সাধ্যের বৈশিষ্ট্য-বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। ঐ যে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সাধ্যের বোধ, তাহাতে সাধ্যাংশে অতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম বিশেষণ-ভাবে জ্ঞায়মান না হয়, ইহাও ঐ প্রতিজ্ঞা-লক্ষণে বলিতে হইবে। নচেৎ 'নিগমন বাক্য'ও প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে, কারণ ঐ স্থলে "তস্মাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ নিগমনও পর্ব্বতে বহ্নিবৈশিষ্ট্যের বোধক হইয়াছে। কিন্তু "তস্মাৎ" এই বাক্য-প্রতিপাদ্য বহ্নিব্যাপ্য ধূমজ্ঞাপ্যত্ব অথবা বহ্নিব্যাপ্যধূমজ্ঞান-জ্ঞাপ্যত্ব-রূপ অতিরিক্ত ধর্ম্মটী বহ্নি-পদার্থের বিশেষণভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞা হইতে পারিল না। নিগমন বুঝিলে একথা বিশদ বুঝা যাইবে। ন্যায়-প্রয়োগ করিব না, কিন্তু পর্ব্বতোবহ্নিমান্ এই বাক্য বলিয়া বসিলাম, ইহাও প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে। তাই বৃত্তিকার প্রভৃতি বলেন যে, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির লক্ষণে "ন্যায়ান্তর্গতত্ব" বিশেষণ দিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত হওয়া চাই। কথাটায় ধরিবার কথা আছে। ৩৩।

৩৪। ৩৫। সূত্র। উদাহরণ-

সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুঃ তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ ॥

ব্যাখ্যা। সাধ্য-সাধনং [সাধ্যসিদ্ধ্যনুকূল-জ্ঞাপকত্ববোধকং বাক্যং] "হেতুঃ" [হেতুনামকোঽবয়বঃ] ইতি সামান্যলক্ষণং। তস্য দ্বৈবিধ্যমাহ "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ—" তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ ইতি। উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ" [উদাহরণ-বোধ্যান্বয়ব্যাপ্তেঃ] উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যাৎ (উদাহরণবোধ্য-ব্যতিরেক ব্যাপ্তেঃ) তথাচ দ্বিবিধ-ব্যাপ্তি-প্রযোজ্য-সাধ্যসিদ্ধ্যনুকূলত্বেয়া হেতুর্দ্বিবিধঃ, ততশ্চ হেত্ববয়বোঽপি দ্বিবিধঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ। সাধ্যসিদ্ধির অনুকূল জ্ঞাপকত্ব বোধক বাক্যই হেত্ববয়ব। উহা দ্বিবিধ। কারণ উদাহরণবোধ্য—অন্বয়-ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ভেদে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী নামে অনুমানের হেতু দ্বিবিধ। সুতরাং হেত্ববয়বও দ্বিবিধ।

টীকা। প্রতিজ্ঞার পরে হেতু। সূত্রে "সাধ্য-সাধনং হেতুঃ" এই অংশ, হেতুর সামান্য-লক্ষণ। যদিও "সাধ্যসাধন" শব্দের দ্বারা যে পদার্থ সাধ্য-সাধন তাহাই বুঝা যায়, তাহা হইলেও এখানে অবয়বের লক্ষণ চলিতেছে, সুতরাং উহা হেত্ববয়বেরই লক্ষণ বুঝিতে হইবে। বৃত্তিকার ও তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলকথা, "পর্ব্বতো-বহ্নিমান্" এইরূপ প্রতিজ্ঞার পরে "ধূমাৎ" এই বাক্যটী হেত্ববয়ব। পরার্থানুমানে ঐবাক্য-টীও আবশ্যক, সুতরাং উহাকেও সাধ্যসাধন বলা যাইতে পারে। তবে উহাদ্বারা কেবল "ধূমাৎ" ইত্যাদি হেতুবাক্যই বাক্যতে লক্ষ্য হয়, এইভাবে ব্যাখ্যাকরা আবশ্যক। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সাধ্যসিদ্ধির অনুকূল জ্ঞাপকত্ব-বোধক শব্দ। বস্তুতঃ তাহা হইলে হেতু-বাক্যই হয়, সুতরাং সূত্রোক্ত সাধ্যসাধনস্বরূপ সামান্য-লক্ষণ হেত্ববয়বে সংগত হইতেছে। জ্ঞাপকত্ব-বোধক না বলিয়া জ্ঞাপ্যত্ববোধক বলিলেই সহজে বুঝাযায়। তবে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 'জ্ঞাপকত্ববোধক' বলিয়াছেন বলিয়া তাহাই বলিলাম। আমাদের কথায় আমরা পঞ্চমী-বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপ্যত্বই বলিব। "ধূমাৎ"—এই বাক্যটী সাধ্যসিদ্ধির অনুকূল এবং জ্ঞাপকত্ববোধক। ঐবাক্যে পঞ্চমীর বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপকত্ব। জ্ঞাপকত্ব বলিতে জ্ঞান-জনক জ্ঞানবিষয়ত্ব ধূমজ্ঞান, অনুমানরূপ বহ্নি-জ্ঞানের জনক। ঐ ধূমজ্ঞানের বিষয়ত্ব ধূমে আছে বলিয়াই ধূমে বহ্নির জ্ঞাপকত্ব আছে। ঐ জ্ঞাপকত্ব "ধূমাৎ" এইরূপ পঞ্চম্যন্ত বাক্যটীর দ্বারা বুঝা যায়। সাধ্যসিদ্ধির অনুকূল অন্য পদার্থও আছে, কিন্তু "জ্ঞাপকত্ববোধক" শব্দ তাহারা নহে। সুতরাং এই লক্ষণে অতি-ব্যাপ্তি-দোষ নাই। "উদাহরণ—সাধর্ম্ম্যাৎ" এবং "তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ" (৩৫ সূত্র) এই কথার দ্বারা হেতুবাক্যের দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। উদাহরণের সাধর্ম্ম্য বলিতে এখানে অন্বয়ব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে; কারণ দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্য বশতঃ ঐ অন্বয়ব্যাপ্তিরই জ্ঞান হইয়া থাকে। উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্য বলিতে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে; কারণ দৃষ্টান্ত-বৈধর্ম্ম্য বশতঃই ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। ব্যাপ্তির কথা যেখানে বলিয়া আসিয়াছি (৫ম সূত্রে) সেখানেই এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তির তত্ত্ব বলিয়াছি। ফলতঃ সেই অন্বয়-ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হেতুবোধক এবং সেই ব্যতি-রেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুবোধক এই দ্বিবিধ

বাক্যই হেত্ববয়ব। কেহ বলেন—যে হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি উভয়ই বুঝা গিয়াছে, সেই হেতুর নাম অন্বয়ব্যতিরেকী। সেই হেতু-বোধক হেত্ববয়বও মহর্ষি সূচনা করিয়াছেন। এই দুই সূত্রে উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য এবং উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যের কথা থাকায় যেমন দ্বিবিধ হেতু মহর্ষি-সম্মত বলিয়া বুঝিতেছ—সেইরূপ অন্বয়ব্যতিরেকী নামে তৃতীয় আর এক প্রকার হেতুও উহাদ্বারা বুঝিবে। নব্যনৈয়ায়িকগণের অনেকেই এই মতের গায়ক। ফলতঃ অন্বয়ী, ব্যতিরেকী, এবং অন্বয়ব্যতিরেকী নামে হেতু ত্রিবিধ। এখানে কিন্তু হেত্ববয়বেরই লক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। বৃত্তিকারের মতে এই সূত্রে সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য বলিতে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। তাঁহার কথায় আমরা বুঝিয়াছি, তাঁহার মতে ব্যাপ্তি এবং তাহার এই দ্বিবিধ ভেদ মহর্ষির সূত্রেই পাওয়া যায়। ব্যতিরেকব্যাপ্তিও মহর্ষির উক্ত। ভাষ্যকার এই সূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য" ব্যাখ্যায় বিশেষ কিছু বলেন নাই। (অন্য কথা ৫ম সূত্রের টীকায় দেখুন) ॥ ৩৪। ৩৫।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

শ্রীনারায়ণোপনিষৎ।

ওঁ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত, প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে, মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে। নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে। নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে। নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে। নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ, সর্ব্বাণি ছন্দাংসি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে, নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। এতদৃগ্বেদশিরোঽধীতে। ১

অথ নিত্যো নারায়ণঃ, ব্রহ্মা নারায়ণঃ, শিবশ্চ নারায়ণঃ, শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ, দিশশ্চ নারায়ণঃ, বিদিশশ্চ নারায়ণঃ, ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ, অধশ্চ নারায়ণঃ, অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ, নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পঃ নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণঃ ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি। এতদ্যজুর্ব্বেদশিরোঽধীতে।২

ওঁ মিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ, নারায়ণায়েতি উপরিষ্টাৎ। ওমিত্যেকাক্ষরম্, নম ইতি দ্ব্যক্ষরম্, নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি, এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমধ্যেতি, অনপব্রুবঃ সর্ব্বমায়ুরেতি, বিন্দতে প্রাজাপত্যং রায়স্পোষং গৌপত্যং ততোঽমৃতত্বমশ্নুতে ততোঽমৃতত্বমশ্নুতে ইতি,—এতৎ সামবেদশিরোঽধীতে। ৩

প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্। অকার উকারো মকার ইতি। তা অনেকধা সমভবৎ তদেতদোমিতি। যমুক্ত্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসার-বন্ধনাৎ। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনং গমিষ্যতি। তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্, তস্মাত্তড়িদাভমাত্রম্,—ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ

ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরুচ্যতে ইতি। সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওমিতি। এতদথর্ব্বশিরোঽধীতে। ৪

প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি, সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি, তৎসায়ং-প্রাতরধীয়ানঃ পাপোঽপাপো ভবতি, মাধ্যন্দিনমাদিত্যাভিমুখোঽধীয়ানঃ পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে। সর্ব্ববেদ-পারায়ণ-পুণ্যং লভতে। নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি, শ্রীমন্নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি য এবং বেদ। ওঁ শান্তিঃ। ৫

ইতি শ্রীনারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ।

পরমপুরুষ নারায়ণ কামনা করেন, যে "আমি প্রজাসৃষ্টি করিব।" এতাদৃশ কামনার পরে নারায়ণ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। নারায়ণ হইতে মন ও ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। নারায়ণ হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উদ্ভূত হয়। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি প্রজাত হন। নারায়ণ হইতে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসু উৎপন্ন হন। সমস্ত ছন্দই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হয়। সমস্তই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সমস্তই নারায়ণে বিলীন হয়। ঋগ্বেদের শিরোভূত এই তত্ত্ব অধ্যয়ন করিবে। ১

একমাত্র নিত্যতত্ত্বই নারায়ণ। ব্রহ্মাও নারায়ণ, শিবও নারায়ণ, ইন্দ্রও নারায়ণ, কালও নারায়ণ, দিক্‌ও নারায়ণ, বিদিক্‌ও নারায়ণ, উর্দ্ধও নারায়ণ, অধও নারায়ণ, অন্তরেও নারায়ণ, বাহিরেও নারায়ণ। নারায়ণই ভূত, ভবিষ্যত্, বর্ত্তমান সমস্ত। নারায়ণই একমাত্র নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন নির্ব্বিকল্প নামাদিসম্বন্ধশূন্য, শুদ্ধ, দ্যোতনশীল পরমপদার্থ। নারায়ণ ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ নাই। যিনি এ তত্ত্ব অবগত হন, তিনি বিষ্ণুস্বরূপ হইয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদের শিরোভূত এই তত্ত্বসার অধ্যয়ন করিবে। ২

প্রথমে "ওঁ"কার উচ্চারণ করিবে, পরে "নমঃ" শব্দ উচ্চারণ করিবে, তৎপরে "নারায়ণায়" পদ উচ্চারণ করিবে। 'ওঁ' একাক্ষর, "নমঃ" দ্ব্যক্ষর এবং "নারায়ণায়" পঞ্চাক্ষর; সম্মেলনে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই (নারায়ণের) অষ্টাক্ষর মন্ত্র সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি নারায়ণের এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি সমস্ত জীবন অনুপদ্রবে অতিবাহিত করেন; তিনি জীবনে প্রজাপতি, ধনপতি ও গোপতি হইয়া থাকেন, এবং পরিণামে অমৃতত্ত্ব বা মোক্ষলাভ করেন। সামবেদের শিরোভূত এই তত্ত্ব অধ্যয়ন করিবে। ৩

নারায়ণ অন্তরানন্দ-রূপী ব্রহ্মপুরুষ ও ওঁকারের বাচ্য-স্বরূপ। নারায়ণ-বাচক প্রণব, এক হইয়াও 'অ'কার 'উ'কার 'ম'কার এই ত্রিবিধ রূপে প্রকাশমান, ওঙ্কারের ঐ মাত্রাত্রয়ের আবার স্থান-বলাদি-ভেদে অনেকরূপ প্রকটিত হয়। এই ওঁকার-উচ্চারণ-রূপ সাধনার দ্বারা যোগীগণ জন্ম ও লোকান্তর-প্রাপ্তিরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে সাধক "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের

উপাসক, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। তাহাই এই পুণ্ডরীক রূপ বিজ্ঞানঘন। তাহা হইতে বিদ্যুদাভ পরমজ্যোতির প্রকটন। দেবকী-নন্দন, মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্যদেবই 'বিষ্ণু'নামে কথিত হন। সর্ব্বভূতস্থিত একমাত্র কারণপুরুষ স্বয়ং অকারণস্বরূপ, নারায়ণই প্রণব-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। অথর্ববেদের শিরোভূত এই তত্বসার অধ্যয়ন করিবে। ৪

এই চতুর্ব্বেদের তত্বসার স্বরূপ উপনিষৎ প্রাতঃকালে যিনি অধ্যয়ন করেন, তাঁহার রাত্রিকৃত পাপ বিনষ্ট হয় এবং সায়ংকালে যিনি অধ্যয়ন করেন, তাঁহার দিবসকৃত পাপ বিদূরিত হয়, প্রাতঃকালে সায়ংকালে উভয় সময় যিনি নিত্য অধ্যয়ন করেন, তিনি পাপী হইলেও পাপহীন হন। মধ্যাহ্নে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া যিনি অধ্যয়ন করেন, তিনি পঞ্চবিধ মহাপাতক (ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণ-হরণ, গুরুপত্নী-গমন, এবং এই সমস্ত কর্ম্মকারীর সংসর্গ) ও নানাবিধ উপপাতক (গোহত্যা প্রভৃতি) হইতে মুক্তিলাভ করেন, সকল বেদপাঠের পুণ্য লাভ করেন এবং চরমে নারায়ণের সাযুজ্য (নারায়ণে মিলিত বা যুক্ত হওয়া) রূপ মুক্তি প্রাপ্ত হন। আর যিনি ইহা অবগত হন, তিনিও এতদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ওঁ শান্তি।

শ্রীনারায়ণোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রী-



প্রমাণ।

প্রমার করণ বা সাধনই প্রমাণ। প্রমা—যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমভিন্ন জ্ঞান। অবাধিত ও অজ্ঞাত-বিষয়ক চিত্তবৃত্তি দ্বারা মানবের যে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে তাহারই নাম প্রমা। প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থেরই যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। ভ্রমজ্ঞান প্রমা নহে—কারণ তাহা বাধিত। স্মৃতি বা স্মরণকে প্রমা বলা যায় না—যে হেতু তাহা জ্ঞাতবিষয়ক। জ্ঞানই মানবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়, জ্ঞানলাভেই মানবের মানবত্ব, জ্ঞানেই পশু পক্ষী প্রভৃতি হইতে মানবের পার্থক্য। সেই জ্ঞান প্রমাণ-সাপেক্ষ।

সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণই বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত। উপমিতি, অর্থাপত্তি ও অভাব তাদৃশ প্রচলিত নহে। উপমিতি ও অর্থাপত্তি অনুমানেরই প্রকার-ভেদ। অভাব, অধিকরণাত্মক বলিয়া স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। যদিও কোন কোন মতে উপমিতি ও অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা হইয়াছে—তথাপি এই দুইটীর প্রভেদ যৎসামান্য।

প্রত্যক্ষ।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে জাত যে মনোবৃত্তি-বিশেষ—তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজ মনোবৃত্তি মাত্রেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, মানবের ইন্দ্রিয় প্রায়ই দুষ্ট বা বিকৃত হইতে দেখা যায়। সেই দুষ্ট বা বিকৃত ইন্দ্রিয়-সংসৃষ্ট মনোবৃত্তি

প্রমাণ নহে। ভ্রান্তিবশতঃ আমরা যে মরুভূমে মরীচিকা দেখি, শেষরাত্রের জ্যোৎস্নাকে প্রভাত বলিয়া প্রতারিত হই, তাহার মূলে প্রমাণ আছে বলা যায় না।

যাহা ভ্রান্তিপ্রসূত তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। চক্ষু-রোগাক্রান্ত হইলে প্রকৃত বস্তু বিকৃত দেখায়—তাহা দোষজন্য—কাজেই প্রমাণ নহে। অতএব মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না বলিয়া বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জন্য বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করা উচিত।

বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ। বিষয়—পৃথিব্যাদি বস্তু সমূহ, জড়সমষ্টির নামই বিষয়। চক্ষুরাদি করণের নামই ইন্দ্রিয়। সন্নিকর্ষ অর্থাৎ উভয়ের সম্বন্ধ। অবশ্য, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান থাকিলে রূপ-প্রত্যক্ষ জন্মে না। এই ধর, আমি সূর্য্য দেখিতেছি, কিন্তু মধ্যে মেঘ আসিয়া আচ্ছাদন করিলে আর সূর্য্য দেখিতে পাই না। তাহা হইলে ঐ সন্নিকর্ষ নির্ব্বাধ হওয়া আবশ্যক।

চক্ষু দ্বারা যেমন চাক্ষুষ, তদ্রূপ কর্ণ দ্বারা শ্রাবণ, ত্বক দ্বারা ত্বাচ, নাসিকা দ্বারা গান্ধ, রসনা দ্বারা রাসন প্রত্যক্ষ জন্মে। এতদ্ব্যতীত একটি মানস প্রত্যক্ষ আছে। মানস প্রত্যক্ষের বিষয় বা গোচর পরমেশ্বর। "মনোমাত্রস্য গোচরঃ"। সত্বগুণ-নির্ম্মল মনোদর্পণেই ঐ পরমেশ্বর অভিব্যক্ত। বিশুদ্ধ ভক্তিপূত অন্তঃকরণই ভগবদধিষ্ঠানের ক্ষেত্র। "নৈব বাচা ন মনসা" পরমেশ্বর মনের মেয় নহেন, এস্থলে সাধারণতঃ মায়াবদ্ধ কামনাপরবশ মনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। জলের গতি নিম্নাভিমুখে, মনের গতি বিষয়াভিমুখে। স্বভাব-নিয়ত সেই বিষয়াভিমুখতা হইতে আকর্ষণ করিয়া মনকে অন্তর্মুখ করাই মানবের তপস্যা। যোগ উপাসনা, জপাদি অভ্যাস দ্বারাই মনকে অন্তর্মুখ করিতে হয়। মানস-প্রত্যক্ষ স্বানুভববেদ্য। যিনি অনুভব করেন, তিনিই জানেন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের মত ইহার অস্তিত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত। তবে মানস প্রত্যক্ষ ভাষায় ঠিক্ ব্যক্ত করা যায় না। যোগী ভক্তজন ইহার রসাস্বাদন করেন। চক্ষু দ্বারা রূপ-প্রত্যক্ষের নামই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চক্ষুর অভিমুখবর্ত্তী দ্রষ্টব্য পদার্থমাত্রই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়। এই বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ—নির্ব্বাধ সংযোগই বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ। কিন্তু আবার দেখ, মন যদি অন্য বিষয়ে সে সময়ে একাগ্র থাকে, তাহা হইলে চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইলেও রূপ-প্রত্যক্ষ হইতে দেখা যায় না। তাহা হইলে মনঃ-সংযোগের নিয়ত অপেক্ষাই রহিল।

রূপপ্রত্যক্ষ দুই প্রকারে উপপত্তি করা যায়। প্রথমতঃ, আমাদের তরল অন্তঃকরণ, চক্ষুঃ-প্রণালী সাহায্যে বহির্গত হইয়া বিষয়াকার ধারণ করে। বিষয়াকারে পরিণত হয় অর্থাৎ এই বিষয় যে আকারের, অন্তঃকরণও সেই আকার প্রাপ্ত হয়। বারিধারা প্রণালী-সাহায্যে আলবালের মধ্যে পতিত হইয়া আলবালের আকার ধারণ করে; অন্তঃকরণ বিষয়াকার ধারণ করিবেনাই বা কেন?

অন্তঃকরণের এই তদাকারাকারিতাকেই (তদাকার-এস্থলে বিষয়াকার) অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণাম বলে। "প্রমাণমন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ"। অন্তঃকরণ-বৃত্তিই প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রকারে উপপত্তি আছে; ধর, এই পুষ্প। তোমার চক্ষুর সহিত পুষ্পের সন্নিকর্ষ হইল; নেত্ররশ্মি পুষ্পের উপর পড়িল। পুষ্পের আকৃতি, স্বচ্ছ চক্ষুর্গোলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তঃকরণে গিয়া পৌঁছিল; অন্তঃকরণ পুষ্পাকার ধারণ করিল।

প্রত্যক্ষের বড় প্রমাণ নাই, কিন্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয় দুষ্ট বা বিকৃত, এবং অন্তঃকরণ অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত বা বিক্ষিপ্ত থাকিলে প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হয়। বাষ্পীয়যানে আরোহণ করিলে দেখিবে, সম্মুখে এক-ক্রোশের মধ্যেই পর্ব্বত, কিন্তু বাস্তবিক সে পর্ব্বত হয়ত ১৫ক্রোশ দূরে রহিয়াছে। মরুভূমে যাও দেখিবে, সম্মুখে স্বচ্ছ সলিল তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু যতই অগ্রসর হও কেবল ধূ ধূ। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, জলের চিহ্ন নাই, তথাপি বুঝিবে না—ইহা মরীচিকা। মানবীয় প্রত্যক্ষ প্রতিপদেই ভ্রান্ত ও সন্দিগ্ধ, তজ্জন্য এই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব আয়ত্ত করা অসম্ভব।

অনুমান।

অনুমান বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ। অনুমান একটি প্রমাণ। অনুমানও প্রত্যক্ষ-মূলক। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখিলে, গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাইয়াছে ও লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তুমি বুঝিলে, পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। এখানে গঙ্গার জলবৃদ্ধি বা লোহিতবর্ণপ্রাপ্তি কার্য্যই প্রত্যক্ষ হইল; এই কার্য্য দৃষ্টে পশ্চিমাঞ্চলের বৃষ্টি হওয়ারূপ কারণের জ্ঞান জন্মিল। ইহাই অনুমান, আর এই অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। কার্য্যদৃষ্টেই কারণের অনুমান।

অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হইলে তৎপ্রত্যক্ষ-মূলক সেই অনুমানও ভ্রান্ত হইবে। অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান, সাধারণ-মানব-বুদ্ধি-গম্য নহে। মানবীয় প্রত্যক্ষ এখানে দুর্ব্বল; আর ভ্রান্তিরও পদে পদে অপরিহার্য্যতা। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে যে কোন অনুমানই কার্য্যকর হয় না, এমন বলি না। "ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ"। পৃথিবীর কর্ত্তা আছেনই, যখন ইহা কার্য্য। প্রত্যেক কার্য্যেরই যখন কর্ত্তা আছে, তখন এ স্থলেই বা ব্যভিচার হইবে কেন? কেবল অনুমান দ্বারাই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বের জ্ঞান, সম্ভব নহে। তবে শ্রুতি-সংকৃত অনুমানের সাহায্যে পরমার্থতত্ত্ব আয়ত্তীকৃত হয়। প্রথমতঃ পরমার্থতত্ত্ব শ্রুতিবেদ্য, অনুমান অনুভব তাহার পরে। অতীন্দ্রিয়-স্থলে অনুমান, প্রত্যক্ষের অধীন নহে, তবে শব্দের অধীন। কারণ শ্রুতি যে প্রণালীতে চলিতেছেন, তদ্দৃষ্টেই অনুমান করিতে হইবে। "সর্ব্বে ভাবাশ্চেতনাঃ" এই মূলতত্ত্ব প্রথম উপনিষৎ প্রচার করেন; মানব, পরে আপনাদের চিন্তাশক্তি দ্বারা ঐ বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছে।

শব্দ প্রমাণ।

শব্দ-শ্রবণান্তর প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্রোতার যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি—তাহাই

শব্দ-প্রমাণ। তাহার ফলে শব্দজ্ঞান। বেদ পৌরুষেয় নহে। এ কারণ ভ্রান্তি বা প্রতারণা সম্ভব নহে, কাজেই শ্রুতি প্রমাণ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাদের বাক্য সত্য ব্যতীত মিথ্যা হইবে না। শাস্ত্র ঋষিপ্রণীত, কাজেই অভ্রান্ত। সত্যবাদীর বাক্য সত্য হইবে, অতএব প্রমাণ। কোন কোন স্থলে বক্তার বাক্যে যদি দোষ বা ভ্রান্তি থাকে, আর সেই বাক্য নির্দ্দোষ অভ্রান্তরূপে বুঝিলে অবশ্য সেই বাক্য প্রমাণ হইবে না। শব্দপ্রমাণ সর্ব্বত্র অভ্রান্ত নহে। প্রত্যক্ষেই যখন ভ্রান্তি দেখা যায়, তখন অতীন্দ্রিয় পরোক্ষ বিষয়ে যে ভ্রান্তি ঘটিবে না এমত নহে;—তাহা বলিয়া প্রমাণ হইবে না কেন? "হো" "হা" প্রমাণ নহে। "অমুক বৃক্ষে যক্ষ বাস করে," ইহাও প্রমাণ নহে। আপ্তবাক্যই প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ না মানিলে চলে না। আমরা এক জীবনে কত দেখিতে পাই, কত বিষয়ই বা বুঝিতে পারি, কাজেই শব্দ প্রমাণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। বিশেষ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, মানবের সাধারণ-বুদ্ধি-বেদ্য নহে। সাধনপূত বুদ্ধিতেই পরমার্থ তত্ত্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে। পরলোক-তত্ত্ব, মানববুদ্ধি-বেদ্য নহে, কাজেই শব্দ প্রমাণের আশ্রয় ব্যতীত উপায়ান্তরই নাই, কিন্তু যদি ঐ শব্দ প্রমাণ ভ্রান্তি-প্রসূত হয়, অজ্ঞতাজাত হয়, তাহা হইলে উহা সত্য হইবে না; প্রমাণরূপে দাঁড়াইবে না। সকল কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা চলে না। জলে ডুবিয়া মরা কেমন, ইহা নিজে মরিয়া দেখা যায় না। তজ্জন্য কার্য্যাকার্য্য-নির্দ্ধারণও শব্দপ্রমাণ-সাপেক্ষ।

"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ"। শাস্ত্রবাক্য-শব্দ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ যেখানে চলে না, সুতরাং অনুমানও সেখানে কিছুই করিতে পারে না, সে স্থলে শব্দ প্রমাণই বলবাৎ। ভগবদ্বাক্য ও মহাপুরুষোক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমান অপেক্ষাও বলবৎ প্রমাণ। কারণ, আমাদের চিন্তাশক্তি দুর্ব্বল, বুদ্ধি স্থূল; তাহার উপর আমরা বাসনামুগ্ধ. তজ্জন্য আমরা নিজ শক্তি সাহায্যে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের ইয়ত্তা করিতে পারি না। আমাদের কুশাগ্রীয়বুদ্ধি শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকগণও শ্রুতি—উপনিষদ্বাক্য এমত বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যক্ষ বলিতে তাঁহারা শ্রুতিই বুঝিতেন, অনুমান বলিতে স্মৃতিই বুঝিতেন। তাহা হইলে বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজ জ্ঞান স্থূল প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ; কিন্তু সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষের প্রতি (অতীন্দ্রিয় তত্ত্বই এখানে সূক্ষ্ম) কারণ একমাত্র শ্রুতি, অভাবে স্মৃতি। প্রত্যক্ষ অভাবে অনুমান। অনুমান প্রত্যক্ষ-মূলক, স্মৃতি ও শ্রুতিমূলক।

উপমানের এক অংশ প্রত্যক্ষের, অপর অংশ অনুমানের অন্তর্গত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত অন্য উপমিতি-স্বীকার অনাবশ্যক। উপমিতির স্থল যথা—"গো-সদৃশঃ গবয়ঃ"।

অর্থাপত্তি।

"পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে" দেবদত্তকে দিবসে ভোজন করিতে দেখি

না, অথচ তাঁহার দৈহিক স্থূলতা দিন দিনই বাড়িতেছে। এ ক্ষেত্রে দেবদত্ত যে রাত্রিতে ভোজন করেন, তাহা নিশ্চিত। এই স্থূলতা দেখিয়া রাত্রি-ভোজন-কল্পনা—ইহাই অর্থাপত্তি। ইহা অনুমানেরই অন্তর্গত। স্থূলত্ব দৃষ্টে রাত্রি-ভোজন অনুমিত হইতেছে।

অভাব।

ন্যায়মতে অভাব স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকৃত। অনুপলব্ধি প্রমাণই অভাব-জ্ঞানের করণ বা সাধন। অনুপলব্ধি—উপলব্ধির-অভাব। অভাব—প্রাগভাগ, ধ্বংশাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব—এই চতুর্ব্বিধ। ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের যে অভাব ছিল, সেই অভাবই প্রাগভাব। প্রাগভাব, বিনাশী অভাব। কারণ, ঘটোৎপত্তির পর এই অভাব থাকে না। ঘটধ্বংশের পর যে অভাব—তাহাই ধ্বংশাভাব। ত্রৈকালিক নিত্য অভাবই অত্যন্তাভাব। যে অভাব পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে—তাহারই নাম অত্যন্তাভাব। মনুষ্যে অশ্বে যে ভেদ—তাহাই অন্যোন্যাভাব।

অভাব বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। ধর, ভূতলে ঘট নাই, ভূতলবৃত্তি এই ঘটাভাব, ভূতল ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ ভূতল ব্যতীত ঘটাভাব বলিয়া কোন নূতন পদার্থ প্রত্যক্ষীকৃত হয় না। অভাব অধিকরণাত্মক। যে স্থানে ঘটের অভাব বর্ত্তমান, ঘটাভাব সেই স্থান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণই সাধারণতঃ প্রচলিত। তজ্জন্যই এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় বলা হইল। এই ত্রিবিধ প্রমাণের বলেই মানবীয় ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে। এই তিনটীর কোনটিই অপলাপ্য নহে।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

উপাসনা।

VI.

আহারের সময় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

যাম-মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসস্তিষ্ঠেৎত্রিযামে তু রসক্ষয়ঃ।

এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে শরীরে রসের ভাগ বৃদ্ধি হয়। আর তৃতীয় প্রহর অন্তে আহার করিলে রসক্ষয় হয়। উভয়ই অস্বাস্থ্যের কারণ।

মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং নিত্যং।
অহনি চ তথা তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রহরযামান্তঃ।
(ছন্দোগ পরিশিষ্ট)

ঋষিগণ পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে প্রত্যহই দিনের মধ্যে দুইবার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দিবসে আড়াই প্রহরের মধ্যে একবার এবং রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে আর একবার আহার করিবে।

এক সূর্য্যে দুইবার আহার-নিষেধ যথা—
দিবাপুনর্নভুঞ্জীতান্যত্র ফলমূলেভ্যঃ। (আপস্তম্ব)

ফলমূলাদি লঘু (হালকা) আহার ভিন্ন দিবসে পুনরায় খাইবে না।

গৃহস্থের রাত্রিভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য; বৈদ্যশাস্ত্রে আছে—

রাত্রাবভোজনং যস্য ক্ষীয়ন্তে তস্য ধাতবঃ।

যাঁহারা রাত্রিতে আহার করেন না, তাঁহাদের মাংসাদি সপ্ত ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতি-শাস্ত্রে আছে—মানবগণের দিবা ও রাত্রি এই দুই সময়েই আহার-কার্য্য বেদের অনুমোদিত। আজ কাল ঋষিদিগের এই নিয়ম, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বড় একটা কেহ পালন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আমাদের আহারের সংযমই সকল অনিষ্টের মূল। কিন্তু যাঁহারা এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্যজাতীয় বিধানের অনুকরণে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আহার করিতেছেন, তাঁহারা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষা বেশী স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছেন, এমত বোধ হয় না। পরিপাকযন্ত্রের বিকলতা হইতে প্রায়শঃ ভুগিতে দেখা যায়। পেটের অসুখ এখন সাধারণ রোগ হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা পচানব্বই জন লোক পাকযন্ত্রের পীড়ায় আক্রান্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষিত সমাজ, আহার সম্বন্ধে সংযত হইতে নেহাৎ নারাজ। তাঁহাদের মতে আর্য্যদিগের পানভোজন সম্বন্ধীয় যাবত নিয়মাবলী কুসংস্কারাপন্ন। এই বিশ্বাসে তাঁহারা আর্য্যদিগের আহারের কাল দেশ-পাত্র-পরিমাণ-বিচার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকই এখন 'যা পান তাই খান'—এখন আর মেধ্য অমেধ্য খাদ্য অখাদ্য কেহ বিচার করেন না। বাস্তবিক আমাদের শাস্ত্রকারগণের বহুমূল্য উপদেশের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া যে যথেচ্ছাচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি, ইহাতে আমরা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আর্য্য আচার ও আর্য্য আহার-বিহার পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকার আধি-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। উৎকট ব্যাধিসমূহ এখন আমাদের নিত্য সহচর। এ ভাবে আর কিছুকাল চলিলে, আর্য্য প্রকৃতি সমূলে উৎপাটিত হইবে।

বস্তুতঃ আহার সম্বন্ধে আচার-বিচার অতি কল্যাণকর, সে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিয়া আমরা আমাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছি। আর্য্যগণের নিয়মগুলির সারবত্তা, একে একে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন।

এতকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের পানীয় জল সম্বন্ধে কতই মতভেদ ছিল! কেহ বলিতেন, আহারের সময় মোটেই জল পান করা উচিত নহে। এই সম্বন্ধে কতই বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আহারের সঙ্গে সঙ্গে বার বার জল পান করা আবশ্যক।

আর্য্যগণ বহু পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ
মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥

ভক্ষ্য বস্তুর দ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবে, জল দ্বারা একভাগ পূর্ণ করিবে এবং বায়ুসঞ্চারের জন্য চতুর্থ ভাগ শূন্য রাখিবে।

অত্যম্বু-পানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং, অনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নি-বিবর্দ্ধনায় মুহু মুর্হুর্বারি পিবেদভূরি। (ভাবপ্রকাশ)

অত্যন্ত জল পান করিলে, বা একেবারে জলপান না করিলে, অন্ন-পরিপাক হয় না; এইজন্য পাচকাগ্নির বৃদ্ধির নিমিত্ত বার বার জল পান করিবে।

আদৌ বারি হরেৎ পিত্তং, মধ্যে বারি কফাপহং।
অন্তে বারি পচেদন্নং সর্ব্বং বার্য্যমৃতোপমং॥

আহারের প্রথম ভাগে জলপান করিলে পিত্ত, মধ্য ভাগে কফ নষ্ট হয় এবং শেষ ভাগে জলপান করিলে পরিপাক হয়, এজন্য ত্রিবিধ প্রকার জলপানই অমৃততুল্য। নিত্য আহারের সময় আমরাও যথাশাস্ত্র কুলপ্রথানুসারে ভূরাদি পঞ্চদেবতা অথবা নাগ কূর্ম্মাদি নব বায়ুকে ভূমিতে অন্ন নিবেদন করিয়া, অন্ন-ব্যঞ্জন সমস্ত ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করিয়া, এক গণ্ডুষ জল "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" (হে জল তুমি অমৃত স্বরূপ হইয়া আমার ভুক্ত অন্নের নীচে আস্তরণ রূপে থাক) মন্ত্রে পান করি। আহার শেষে পুনরায় এই মন্ত্রে একগণ্ডুষ জল পান করিয়া পাত্র ত্যাগ করি—

যথা "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা"

হে অমৃতসদৃশ জল, তুমি আমার ভক্ষ্য বস্তুর উপরে আবরণ-স্বরূপ হইয়া থাক।

অতিভোজন সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলেন—

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
মনু ২। ৫৭

অতিভোজন করিলে শরীর রোগে আক্রান্ত হয়, পরমায়ুর হ্রাস হয় এবং স্বর্গসাধন যাগাদি যাবতীয় ধর্ম্ম-কার্য্যে অনধিকারী হইতে হয়, এজন্য ইহা অপুণ্য অর্থাৎ নরকের কারণ। লোকে ঔদরিক বলিয়া নিন্দা করে, অতএব অতিভোজন অবশ্য পরিত্যাজ্য।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে মিতাহারী লোকের এইরূপ ছয়টী গুণ বর্ণিত আছে মিতাহারীর রোগ হয় না, আয়ু বৃদ্ধি হয়, বল পূর্ণ থাকে, সুখে থাকে, সন্তানে আলস্যদোষ ঘটে না এবং লোকে ঔদরিক বলিয়া গালি দেয় না।

স্বয়ং ভগবান্ গীতায় নিয়তাহার ও যুক্তাহার-বিহারের উপদেশ দিয়াছেন। চতুর্থাধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে "নিয়তাহার" শব্দের শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—

"নিয়তঃ পরিমিতঃ আহারো যেষাং"

ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অতিরিক্তাহারী তাহার যোগ হইতে পারে না, আর যে অতিশয় অল্প আহার করে, তাহারও যোগ অসম্ভব। হে অর্জ্জুন! অতিশয় নিদ্রাশীল, আর একেবারে জাগরণশীলেরও যোগ আয়ত্ত হয় না। কিন্তু যিনি পরিমিত-আহারী, পরিমিত-পরিশ্রমশীল, এবং পরিমিতনিদ্র ব্যক্তি, তাঁহারই সর্ব্ব সংসারদুঃখের বিনাশক যোগ-ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে।

বাস্তবিক যাঁহারা যুক্তাহার-বিহার-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য এবং তাঁহারাই মনুষ্যোচিত ধর্ম্মে অলঙ্কৃত। যা' তা' কতকগুলি উদরসাৎ করিলেই যে লোক নীরোগ ও বলিষ্ঠ হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার।

"আমিষ নিরামিষ" আহার নিয়া বহুকাল একটী তর্ক চলিয়া আসিতেছে। আর্য্যগণ, নিরামিষ আহার—সাত্ত্বিক আহার বলিয়া, তৎপ্রতি পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা মনে

করেন যে, সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার আমাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের অন্তরায়, তাঁহারা একবার কলির ভীম রামমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি করুন। রামমূর্ত্তির আহার সম্বন্ধে হিন্দু-পত্রিকায় ১৩১৯ সালের আশ্বিন-সংখ্যায় ২৩৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি এল্ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"তিনি (রাম-মূর্ত্তি) প্রাতে ৮ টার সময় বাদাম-পেস্তার সরবৎ, এক ঘণ্টা পরে ছটাক খানেক টাট্কা মাখন, বেলা ১ টার সময় কিছু ভাত, ডাল, তরকারী ও শাকসব্জি ও জল সর্ব্বশুদ্ধ এক পোয়ার অধিক নহে, অপরাহ্ণ চারিটার সময় প্রাতঃকালের ন্যায় সরবৎ, অতিরিক্তের মধ্যে একটু পায়স, তার পর রাত্রে সার্কাস-ভঙ্গের পর সর্ব্বশুদ্ধ পোয়াটেক ওজনের ডাল ভাত তরকারী আহার করেন।"

সম্প্রতি দুইজন জর্ম্মণ-দেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, বিশেষরূপ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিরামিষ-ভোজনই মনুষ্যের দীর্ঘায়ু-লাভ ও স্বাস্থ্য-রক্ষার অমোঘ উপায়।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকপ্রকৃতি-সম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ঋষিগণ, ঝটিতি রাজসিক ও তামসিক মৎস্যমাংস-পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রীয় আদেশ অনুসারে "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ" ক্রমে উপরত হইবেন। তাড়াতাড়ি ছাড়িলে, ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। ঋষিগণ আমাদের ন্যায় রাজসিক-তামসিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি সুন্দর উপায় সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদের অসীম জ্ঞানবত্তায় স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রথমে প্রতি মাসে চারি রবিবারে ও পঞ্চপর্ব্বে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি) মৎস্য-মাংস নিষেধ করিয়াছেন, পরে কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে আমিষ-ভক্ষণ ত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। যাঁহারা সম্পূর্ণ মাস নিরামিষ ভোজন করিতে অশক্ত, তাঁহাদের নিমিত্ত অনুকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা সমস্ত কার্ত্তিক মাস আমিষ-ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহারা শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী হইতে রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই পাঁচদিন নিরামিষ আহার করিলেই সমস্ত মাস নিরামিষ-আহারের ফল পাইবেন।

একাদশ্যাদিষু তথা তাসু পঞ্চসু রাত্রিষু।
দিনে দিনে চ স্নাতব্যং শীতলাসু নদীষু চ।
বর্জ্জিতব্যা তথা হিংসা মাংস-ভক্ষণমেব চ।

এইরূপে ধীরে ধীরে (শনৈঃ শনৈঃ) রাজসিক তামসিক আহার ছাড়িয়া সাত্ত্বিক আহার অভ্যাস করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ সেন বি এল্।

বিশ্বসৃষ্টি।

(১)

কে জানে কখন্ কোন্ দিন, দূরব্যাপ্ত দীপ্ত নীহারিকা,
নিবিড় গভীর অন্ধকারে জ্বালাইল স্বর্ণদীপ-শিখা!

অকস্মাৎ উঠিল জাগিয়া, দীর্ঘ দীর্ণ চিন্তার প্রান্তরে,—
সুপ্রাচীন নিদ্রিত অতীত, স্নেহপূর্ণ মধুর মর্ম্মরে!

(২)

অভিনব প্রেম-মূর্চ্ছনায়, পরিপূর্ণ নীরব সঙ্গীত,
দিকে দিকে গুঞ্জরিল সুখে, বিশ্বযন্ত্রে, করুণ, ললিত!
জড়ত্বের অন্তিম-রেখায়, অনুভূতি অনন্ত চেতনা,
বিধাতার বিরাট্‌চরণে, জানাইল মর্ম্মের বেদনা!

(৩)

মহাপ্রাণ সিন্ধুর হৃদয়ে উচ্ছ্বসিল নির্ম্মল বাসনা;
আঁকি' দিল প্রকৃতির পটে, লক্ষ কোটি মদির কামনা!
সংসারের সৌন্দর্য্য-শিয়রে সুরঞ্জিল আশার স্বপন;
বিহ্বলিত প্রেমাবেশে সুখে, ধরণীর সহস্র চুম্বন!

(৪)

সে অবধি চির বিরাজিত, বিশ্বদৃশ্য রহস্য-আধারে,
তরঙ্গিত নীল নীরনিধি, তাহারে বেড়িছে চারিধারে!
গূঢ়তম ভূমার পাথারে কে করিবে সমস্যার সীমা?
বিশ্বের বিচিত্র-চিত্র-পটে সুশোভিত ধাতার মহিমা!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

ধর্ম্মরহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপে এই মেদিনী, জীব-সঞ্চার করিয়া, তাহার মেদে পরিপুষ্ট হইয়া, তাহাতেই ওতপ্রোত হইয়া মহাকালের গর্ভ পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। গীতা, তাই সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরের বিরাট্ মূর্ত্তি এই ভাবে দেখাইতেছে। ১০ অঃ বিভূতিযোগ। তিনি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃসকলের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। ২১ বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, এবং ভূতগণের মধ্যে চেতনা। ২২। একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু। ২৩ পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, এবং স্থির জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর। ২৪ মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য সকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞগণের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়। ২৫ বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ, এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি। ২৬ অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা; গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, এবং মানবগণের মধ্যে নরাধিপ। ২৭ অস্ত্র সকলের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, প্রজাগণের উৎপত্তি-হেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকি। ২৮ নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে

বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, এবং নিয়মকারিগণের মধ্যে যম। ২৯ দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীভূতকারিগণের মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে সিংহ, এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়। ৩০ বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিদিগের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, এবং স্রোতোমধ্যে জাহ্নবী। ৩১ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত, বিদ্যাসকলের মধ্যে আত্মবিদ্যা, এবং বাদিগণের মধ্যে বাদ। ৩২ অক্ষরগণের মধ্যে অকার, সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রবাহরূপ অক্ষয়কাল এবং বিশ্বতোমুখ ধাতা, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল-বিধাতা। ৩৩ সংহারকগণের মধ্যে মৃত্যু, ও ভবিষ্যৎ প্রাণীদিগের-উদ্ভব, নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, এই সপ্ত দেবতারূপা। ৩৪ সাম সকলের মধ্যে বৃহৎসাম, বেদ সকলের মধ্যে গায়ত্রী, মাস সকলের মধ্যে মার্গশীর্ষ, এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত। ৩৫ আমি বঞ্চকগণের দ্যূত, তেজস্বিদিগের-তেজ, জেতৃদিগের জয়, উদ্যমশীলদিগের উদ্যম এবং সাত্ত্বিকগণের-সত্ত্ব। ৩৬ বৃষ্ণিগণের বাসুদেব, পাণ্ডবগণের ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, এবং কবিগণের মধ্যে উশনা (শুক্রাচার্য্য) ৩৭ দমনকারিগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের নীতি, গুহ্য সকলের মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান। ৩৮

এতদূর বলিয়াও তৃপ্ত না হইয়া কহিলেন—যাহা সর্ব্বভূতের বীজ (অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ) তাহাই আমি, যে হেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে, এরূপ চর বা অচর ভূত নাই। ৩৯ আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। বিভূতি-বাহুল্য, তিনি এইরূপে সংক্ষেপে কহিয়াছিলেন—ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, অথবা প্রভাববলাদি গুণ দ্বারা সমৃদ্ধ, যাহা যাহা আছে, সে সমুদায়ই আমার প্রভাবের অংশসম্ভূত। ৪১ অথবা হে ধনঞ্জয়, এইরূপ পৃথগ্বিধ বহু জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদয় জগৎ একাংশে ধরিয়া অবস্থিত রহিয়াছি, অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ৪২

বাক্য-মনের অগোচর ঈশ্বরের স্বরূপ-বর্ণন করিতে গিয়া এইরূপ না বলিয়া আর কি বলিবেন!

যদি তাহাই হয়, এখনও তবে ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব অতল জলে নিমজ্জিত রহিয়াছে! গীতাকার মহাপণ্ডিত, তিনি আধ্যাত্মিক-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া, যে সকল রহস্যময় মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা সেকালে সমীচীন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও একালে সম্পূর্ণ রহস্যময় বলিয়াই বোধ হইবে। এই অনন্ত আকাশে আদিত্যের দ্বাদশসংখ্যা—গণনা কে করিল? বর্ত্তমানকালের সংস্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র, তাহার সংখ্যা অগণ্য দেখাইতেছে! তাহাই ক্রোড়স্থ করিয়া বিষ্ণু, অনন্তশয্যায় শায়িত। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তৎকালের উপার্জ্জিত জ্ঞান, দ্বাদশ আদিত্যের উপরে আর উঠিতে পারে নাই। জ্যোতিঃসকলের মধ্যে সেই অনন্ত আকাশে আমাদের এই কিরণমালী সূর্য্য কি খদ্যোতোপম নহে? আবার নক্ষত্রগণের মধ্যে তিনি "চন্দ্র"! চন্দ্র, নিজে তেজোময় নহে, সূর্য্যের কিরণে তাহার যে প্রভা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা সূর্য্যসম নক্ষত্রগণের

প্রভার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেমন করিয়া হইবে? মরুৎ বায়ুদেবতা। মরীচি, (সপ্তর্ষি-মণ্ডলের একটী নক্ষত্রের কিরণ) কিরূপে বায়ুসংঘাতের সংস্পর্শে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে? "নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র" আরও রহস্যময়। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং নিজে তেজোময় নহে। অন্যদিকে নক্ষত্রগণ সৌরজগতেরও অনেক উপরে অবস্থিত, তাহাদের কেহ কেহ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ। তাহাদের কেন্দ্র-স্থানে আমাদের এই সূর্য্য, যে কনক-প্রভা বিস্তার করিতেছে, তাহা তাহাদের অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র, তাই এই পৃথিবী তাহাকে পরিক্রম করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই সূর্য্য যখন সেই সুবিশাল নক্ষত্রগণের সমকক্ষ হইতে পারে নাই, তখন তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চন্দ্র শ্রেষ্ঠ হইবে কিরূপে? অথচ উহাই গীতার ভগবদ্বাক্যে ঘোষিত!

তাহার পর একাদশ অধ্যায়ে তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ দেখ। তাঁহাতে সেই দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, অশ্বিদ্বয় ও উনপঞ্চাশৎ মরুৎ সহ অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু বর্ত্তমান। তদ্ব্যতীত তাঁহার শরীরে একত্রস্থিত সমুদয় চরাচর জগৎ এবং আরও কত কি দেখিতে পাওয়া যায়! তাহা দেখিবার জন্য ভগবান্, ধনঞ্জয়কে দিব্য চক্ষুঃ দান করিলেন। তখন সেই দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা তিনি যাহা দেখিলেন তাহা এই—

"অনেকমুখনেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুত-দর্শন, অনেক অলৌকিক আভরণ-বিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যতদিব্যাস্ত্র-বিশিষ্ট রূপ! আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি একদা উদিত হয়, তবে তাহা তাঁহার প্রভার সদৃশ হইতে পারে!" এখানে অনন্তের অনন্তত্ব কোথায়?

ইহা দেখিয়াই অর্জ্জুন, স্তম্ভিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—"হে মহাত্মন্! স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমুদয় দিক্ এক তোমা কর্ত্তৃকই ব্যাপ্ত রহিয়াছে! এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক ভীত হইতেছে।" ত্রিলোক ভীত না হউক্, অর্জ্জুনের ন্যায় দিব্যচক্ষুঃ-বিশিষ্ট মহাত্মা যে ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্য! তিনি জ্ঞান-চক্ষুঃপ্রভাবে এতদিন যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, আজি তাহা দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইয়াছেন! অবাক্ হইবার কথাই বটে, কারণ পরক্ষণেই শ্রী-ভগবান্ কহিতেছেন "আমি লোকক্ষয়-কর্ত্তা অনন্ত কাল, লোক সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি।" তাই অর্জ্জুন দেখিলেন, যেমন নদী-সকলের বহুজলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, বেগশালী পতঙ্গগণ মরণের নিমিত্তই প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই রূপ বেগশালী জনগণও মরণের নিমিত্তই তাঁহার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে! তাহা দেখিয়াই অর্জ্জুন ভয়ে বিহ্বল হইয়া কহিতেছেন—"উগ্ররূপ তুমি কে? ইহা আমায় বল; কিজন্য তোমার এরূপ চেষ্টা, তাহা আমি জানি না"। তাহার উত্তরে ভগবান্ নিজের সংহার-রূপ বর্ণনা করিলেন।

তিনি যুদ্ধে নিবৃত্ত অর্জ্জুনকে প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে কি কহিয়াছেন তাহা এখানে একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। "আমি যে কখনও ছিলাম না এমন নয়, সেই রূপ তুমিও ছিলে না এমন নয়; এই রাজগণ ছিলেন না এমন নয়, ইহার পর আমরা

সকলে থাকিব না এমনও নয়। দেহাভিমানী ...দের ...ন এই দেহে কৌমার-যৌবন ও ...ক্য, দেহান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যু ও ...রূপ অবস্থাভেদ মাত্র, অতএব জ্ঞানী ...াতে মোহিত হন্ না। অনিত্য বস্তুর ...স্তিত্ব ...। নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই। ... ব্যক্তি আত্মাকে 'হন্তা' মনে করে এবং ... ইহাকে 'হত' মনে করে, তাহারা উভয়ই ...নে না, যে হেতু ইনি হত্যা করেন না, ...ং হতও হয়েন না। ইনি কখন জন্মেন ..., বা মরেন না, অথবা উৎপন্ন হইয়া পুন-...র উৎপন্ন হন না। ইনি জন্মরহিত, ...ত্য (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য) শাশ্বত (অপক্ষয়-...) এবং পুরাণ; (পরিণাম-শূন্য;) শরীর ...ত হইলেও ইনি হত হন না। যিনি ...ক অজ, অব্যয় (ক্ষয়শূন্য) নিত্য ...র্বদা একরূপ) এবং অবিনাশী বলিয়া ...েন, তিনি কিরূপ কাহাকে হনন করান, ...হাকেই বা হনন করেন? যেমন মনুষ্য, ...ীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র ...গ্রহণ করে, সেই রূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ...রিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ ...রে। শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে ...ারে না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে ...না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না, বায়ু ...ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী ...স্থিরস্বভাব, সদা একরূপ এবং অনাদি। ...ই আত্মা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, মন ... কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর। ভূত সকল ...দিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং নিধনে ও ...ব্যক্ত। এই হেতু ইহার জন্য শোক করিতে নাই!" এখন সমালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

দশম অধ্যায়ে জানিয়াছি "তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই"। একাদশ অধ্যায়ে, কহিতেছেন- "আমি লোক-ক্ষয়কর্ত্তা অনন্ত কাল, লোক-সকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি"। আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কহিয়া-ছেন, "ইনি হত্যা করেন না এবং হতও হয়েন না, অতএব তিনি কিরূপে কাহাকে হনন্ করান, কাহাকেই বা হনন্ করেন?" তাহাই ইনি যখন সকলি, তখন কাহাকে কে হনন্ করিবে?

যখন এই লোক সকল তিনিই, তখন তিনি তাঁহাকে কি করিয়া সংহার করিতে প্রবৃত্ত রহিবেন? রহস্য বটে!

গীতা যে ধর্ম্মভাব প্রহসনে পরিণত করিয়া দেখাইতেছে, তাহাতে নূতনত্ব কি আছে? গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী মনস্বীগণ যে ভাবে "সর্ব্বং-খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া শত শত বেদান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ইহার প্রভেদ কি? যদি উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা না থাকে, তবে এত কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়া রহস্যসৃষ্টি করা কেন?

বহুদিন হইতে পণ্ডিত-সমাজে, এই কথার আন্দোলন হইয়া আসিতেছে। বেদে উপনি-ষদে ব্রহ্মের ধারণা যে রূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং ব্রহ্মকে ধর্ম্মাবহ পাপনুদ বলিয়া যে রূপে স্তুতি করা হইয়াছে, তাহাতে জীব-ব্রহ্মের পার্থক্য স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। তাহার পর মায়াবাদ-খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রকৃতিবাদ সমর্থিত হইয়াছে। তাহা হইলে, ঈশ্বর সকল বিষয়ে

নিমিত্ত কারণ হইলেও, তাঁহার সৃষ্ট জগৎ এবং জীবাত্মা তাহা হইতে পৃথক্। এই পার্থক্য ভাব সমর্থন করিতে গিয়া, আর্য্য-ঋষিগণ, ধর্ম্মের মধ্যে সাধন—পূজা—উপাসনার বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে সেব্য-সেবক, প্রভু-দাস, ভগবান্-ভক্ত স্বরূপ সোপান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জগতে অপরাপর যত ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহাতেও এই জীব-ঈশ্বর-প্রসঙ্গ পৃথগ্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সম্ভবতঃ শাক্যসিংহ এইরূপ ভাব-প্রণোদিত হইয়া ভাবিলেন, "ইহা ত বহিরঙ্গের আবর্ত্ত, প্রকৃত চিন্তা-প্রসূত নহে। তবে অন্তর্জগতে যাইয়া দেখি, সেখানে ইহার কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা?" কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি বোধিদ্রুমের ছায়ায় বসিয়া তাহার খেঁই হারাইয়া ফেলিলেন। তাই এখানে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া গেল! কাজেই কুমারীল—শঙ্কর তাহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সেই "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়মে"র রাজ্য পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর তাহার ব্যাখ্যা, কত তরঙ্গ তুলিয়া পুরাণে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইভাবের একটী প্রসঙ্গ বড় সুন্দর-রূপে চীনদেশের ইতিহাসে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কোন মহাত্মা চীনের সিংহাসনে অধি-রোহণ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে অবিচারে দণ্ডিত মনুষ্যদিগকে কারামুক্ত করিলেন। সকলেই স্বাধীনতার সুবিমল বায়ু সেবন করিতে চাহে; তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া নূতন নরপতিকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে এক নবতি-বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে কহিল—"মহারাজ! আমি কারামুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। আমি যে অন্ধকার-কক্ষে এতকাল যাপন করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে আরামের স্থান। বিশ বৎসর বয়সে যে কারাগৃহে আমি আসিয়াছিলাম, আর এই সপ্ততি বৎসর যাহার মধ্যে বাস করিয়াছি, সেখানেই যাহাতে জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন কাটাইতে পারি, তাহাই আমার প্রার্থনা। হে চীনেশ্বর! আমি নিরপরাধে কারাগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমার প্রতিবাদীর কথায় বিশ্বাস করিয়া, বিচারক, আমার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আমাকে যে দণ্ড—দিয়াছিলেন, আজি সপ্ততি বৎসর সেই দণ্ড ভোগ করিয়া, এখন এ কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়া বোধ করি না; পক্ষান্তরে অভ্যস্ত হওয়ায় আমার দুঃখের দিন সুখের হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। এখন এই বাহিরের সমুজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণ সহ্য করিতে পারিতেছিনা। আমি নগরের সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখি-লাম, "আমার" বলিয়া আমার আর, সে স্থানে কেহই নাই। আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই কালের হস্তে নিহত হইয়াছে। এখন কে আমাকে সহায়তা করিবে? প্রতিবাসী যাহারা বর্ত্তমান আছে, তাহারা আমায় চিনিতে পারে না। তাহারা আমার নাম পর্য্যন্তও জানে না। তাই বলিতেছি, আমার আর সে স্বাধীনতায় প্রয়োজন নাই। আমি এখন জীর্ণ দেহ লইয়া সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কারা-গৃহে অবশিষ্ট কয়েক দিন কাটাইতে চাহি। সেই কারাগৃহের অন্ধকার আমার আরামদায়ক

তাহার চতুঃসীমার প্রাচীর আমাকে যে আনন্দ দান করে, সে আনন্দ আমার পক্ষে এই রাজ-প্রাসাদেও দেখিতে পাই না। কত দিন আর আমি জীবিত থাকিব! তাই বলিতেছি, যেখানে আমি যৌবন কাল অতিবাহিত করিয়াছি, জীবনের কারাকষ্ট সুখের করিয়া লইতে পারিয়াছি, সেই খানেই আবার আমাকে প্রেরণ করুন।"

এই বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে, কত সত্য সংশিত রহিয়াছে! ইহার সহিত আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম-বিশ্বাসের জীবন-ব্যাপী কার্য্যকলাপের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, জনসমাজে সকল মানবেরই ঐ এক দশা। আমরা সংস্কারের পুঁটুলী, এবং সেই সংস্কার-সম্ভুত স্বভাবের দাস। এই সংস্কার অভ্যস্ত হইয়া দীর্ঘকাল একভাবে কাটাইলে, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, বরং তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন পাইলে অনেক কষ্ট অনুভব করিতে হয়।

বর্ব্বর মনুষ্যেরা, আজন্ম উলঙ্গ; বৃক্ষ-কোটরে বা পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিয়া, আম মাংস ভোজন দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়া, যে স্বভাব লাভ করিয়াছে, শত চেষ্টায়ও তাহার ব্যত্যয় হইতেছে না! তাহাদিগকে লজ্জা-নিবারণ জন্য বস্ত্র পরিধান এবং সহজপাচ্য সুপক্ক অন্ন আহার করান যায় না। বলপূর্ব্বক তাহাতে বাধ্য করিলে, তাহারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এইজন্য সভ্য-জগতে শিক্ষা-দীক্ষার এত বাড়াবাড়ি! কিন্তু তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে, তাহাদের উপর যে সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতেই যত বিবাদ যত বিসম্বাদ! এই বিবাদ-বিসম্বাদ তিরোহিত করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে মহাসঙ্কট উপস্থিত!

এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর, তাঁহারা ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া একধর্ম্মা হইতে চাহিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিরণ্য-বাসী জনৈক পরিব্রাজক।

তীর্থযাত্রা।

জয়পুর।

২৭শে চৈত্র মঙ্গলবার—৮টার সময়ে অমরা আজমীর হইতে জয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আজমীর হইতে জয়পুরের ভাড়া ৸৶০ মাত্র। এখনও আমরা মরুভূমির মধ্য দিয়া গমন করিতেছি,—দুই দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই বালুরাশি ধূ ধূ করিতেছে। স্থানে স্থানে উচ্চ বালুকা-ভূমি মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের কিরণ-সম্পাতে মরীচিকার অভিনয় করিতেছে। আমরা বেলা এক-টার সময়ে জয়পুরে উপনীত হইলাম। এখানকার রেলষ্টেসেনটী পুষ্পোদ্যানে সুসজ্জিত এবং বিবিধ প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধে আমোদিত। এখানে আমরা জনৈক খাবার-ওয়ালা—বেণিয়ার—দোকানে আশ্রয় লইলাম। এখানে অত্যন্ত মাছির উৎপাত। জয়পুর, আজমীর

প্রভৃতি অঞ্চলের গৃহে কবাট ব্যতীত কাষ্ঠের অন্য উপকরণ নাই; সমস্তই পাথরের। বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমে একটী উদ্যান-বাটী দেখিতে গেলাম। উদ্যানবাটীর চতুর্দিক লৌহবেষ্টনী দ্বারা সংরক্ষিত, গ্যাসের আলোক-মালায় সুসজ্জিত, সুবাসযুক্ত নানাবিধ কুসুমিত বৃক্ষে সুশোভিত। এই উদ্যানের মধ্যে স্থানে স্থানে পশু-নিবাসে অনেক প্রকার পশু রহিয়াছে। একটী সুরম্য দ্বিতল হর্ম্ম্যে কলিকাতার যাদুঘরের ন্যায় একটী যাদুঘর (Museum) আছে। এই মিউজিয়মে বৈদ্যুতিক এবং অন্য বহু প্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আছে। হর্ম্ম্যের এই অংশ Lobaratory Hall নামে অভিহিত। মনুষ্য-শরীরের অস্থি, শিরা ও অপরাপর যন্ত্রাদির সংস্থান-প্রদর্শক একটী আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি এখানে আছে; উহা দেখিবার যোগ্য। এইস্থান হইতে আমরা নগর দেখিতে গেলাম। জয়পুর সমৃদ্ধিশালী দেশীয় রাজ্য। জয়পুরের ন্যায় সুন্দর ও সুসজ্জিত সহর, ভারতের আর কুত্রাপি নাই। নগরের চতুর্দ্দিকে পাহাড়; পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে দুর্গ আছে। পাহাড়ের পর নগরের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর আছে। নগরে প্রবেশ জন্য কয়েকটী তোরণ আছে। এই তোরণ ব্যতীত নগরে প্রবেশের অন্য পথ নাই। রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত এবং উভয় পার্শ্বে কলিকাতার ন্যায় ফুট্‌পাথ-যুক্ত। রাস্তার দুই পার্শ্বের বাড়িগুলি সমস্তই লাল বর্ণের এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত। রাস্তা ও গৃহগুলি সমস্তই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোন স্থানেই কোন রূপ আবর্জ্জনা নাই। নগরে কিছু মাত্র বিশৃঙ্খলতা দেখিলাম না। জয়পুরের প্রস্তর-শিল্প ভারতে অদ্বিতীয়। এতদ্ব্যতীত এখানে জহরতের কারখানাও আছে। এখানে কাঁসার বাসন প্রস্তুতের কারখানাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়পুরে জলের কলও আছে।

সহরের ভিতর বাজার কলেজ, পুস্তকালয়, মুদ্রাযন্ত্রালয়, অস্ত্রাগার, মেও-হাসপাতাল, আর্টস্কুল, দর্শনযোগ্য। প্যালেস-গেটের মধ্য দিয়া কিছু দূর যাইলে মানমন্দির (Observatory) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মহাত্মা জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানে বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে। এই সকল যন্ত্রে গ্রহ ও নক্ষত্রগণের গতি ও শূন্যে অবস্থান দেখান হয়। সময়-নির্দ্দেশের জন্য দিবা ও রাত্রের স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে। এইস্থানে আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত অনেক গুলি যন্ত্রও আছে। নভোমণ্ডলে নয়টী গ্রহ ও তাহাদের উপগ্রহগণের অবস্থান ও গতি-বিষয়ক একটী সুন্দর যন্ত্র দেখিলাম, উহাতে স্প্রিং ঘুরাইয়া দম্ দিলে গ্রহ ও উপগ্রহগুলি ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে। কয়েকটী দূরবীক্ষণও আছে। এই সময়ে বন্ধুবর রাধাগোবিন্দের কথা আমাদের মনে হইল। তিনি থাকিলে এই সকল যন্ত্রের মর্ম্ম কতক কতক বুঝিতে পারিতেন। আমরা বিজ্ঞানের কিছুই জানিনা, সুতরাং সবিশেষ বুঝিতে পারিলাম না। মানমন্দিরের পর আফিস-আদালত, তৎপরে হস্তিশালা,

তৎপরে গোবিন্দজির মন্দির; অন্য দিকে অশ্বশালা। সহরের বাহিরে সিপাহিদিগের বাসস্থান। সহরের মধ্যে কোন রূপ প্রহরীর বন্দোবস্ত নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শান্তিরক্ষকের বিনা সহায়তায় এখানে এত শান্তি বিরাজিত। সহরের মধ্যে এক স্থানে একটী গৃহে কয়েকটী ভীষণাকার ব্যাঘ্র রহিয়াছে। আমরা এই সকল দেখিয়া পরে গোবিন্দজি দর্শন করিতে গেলাম। তখন ৫টা বাজিয়াছে। শুনিলাম ৬টার পূর্ব্বে গোবিন্দজির মন্দিরের দ্বার খোলা হইবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দ্বার খোলা হইলে গোবিন্দজি দর্শন করিলাম। কি রমণীয় মূর্ত্তি! দর্শন মাত্রই মনে ভক্তির উদয় হয়। মন্দিরটী বৃক্ষ-লতাকীর্ণ কুঞ্জবনের মধ্যে অবস্থিত। সম্মুখে রাজান্তঃপুর, মন্দির ও অন্তঃপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানও উপবনে শোভিত। ময়ুর ময়ুরী স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কেকারবে এবং অন্য বহু জাতীয় বিহঙ্গগণের কাকলি-ধ্বনিতে স্থানটী মুখরিত। মনে হইল, যেন প্রকৃতি দেবী বিহ্বল-কণ্ঠে গোবিন্দ-জির স্তুতি গান করিতেছেন। আমরাও গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিলাম—

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলা-
ক্রান্তগণ্ডং।
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বধর-
ন্যস্তবেণুম্॥
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং
বৈজয়ন্ত্যা।
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্ম গোপাল-
বেশম্॥

সন্ধ্যার পর গোবিন্দজির আরতি দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। অদ্য দিনে অন্নাহার হয় নাই। সন্ধ্যার পর নিজেরাই অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া উদরের তৃপ্তি সাধন করিলাম। আমরা যে বেণিয়ার দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সে একজন পুরা ব্যবসায়ী; তাহার নিকট পয়সা ভিন্ন কথা নাই। আমরা আহার করিয়া রাত্রের ট্রেণেই চলিয়া যাইব এমন চুক্তিতে ঘর ভাড়া ৵৬ দিতে স্বীকার করিয়া ছিলাম; এবং বাসায় জিনিষপত্র রাখিয়া সহর দেখিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়! বাসায় আসিতেই বেণিয়া বলিল, "সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাড়ার চুক্তি ছিল, রাত্রের ভাড়া পৃথক্ লাগিবে।" সমস্ত দিন অনাহারের পর সন্ধ্যাকালে বাসায় আসিয়া ও তাহার এই বাক্য শুনিয়া আমাদের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল! কিন্তু রাগ করিয়া কোন ফল নাই! অগত্যা বেণীয়াকে তোষামোদে তুষ্ট করিয়া আহারাদি করা হইল। অতঃপর রাত্রি ১১—৪৫ এর ট্রেণে আমরা আগ্রাযাত্রা করিলাম। এখান হইতে আগ্রার ভাড়া ১৷৵০ এক টাকা নয় আনা মাত্র।

জয়পুরের দুই ক্রোশ দূরে প্রাচীন অম্বর সহর। মহারাজ মানসিংহ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমানকালে অম্বরের পূর্ব্বশ্রী বিগলিত হইয়াছে। এখানকার রাজ-প্রাসাদ পরিত্যক্ত হইলেও সৌন্দর্য্যে, এখনও অনেক রাজপ্রাসাদকে পরাজিত করে। প্রাসাদটী পাহাড়ের উপর সমতল-ক্ষেত্রে স্থাপিত। এই স্থানে যশোরেশ্বরী

কালিকাদেবী বিদ্যমান আছেন। প্রসিদ্ধ আছে—মহারাজ মানসিংহ বঙ্গদেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সুন্দরবন-পরিবেষ্টিত যশোহর-নগরের শেষ স্বাধীন নৃপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে সমরে পরাজিত করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনকালে তথা হইতে এই কালিকা-দেবীকে লইয়া আইসেন। মানসিংহের পর মহারাজ সবাই জয়সিংহ অম্বর হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারই নামানুসারে জয়পুরের নামকরণ হইয়াছে।

সবাই জয়সিংহের বিবরণ।

(বিশ্বকোষ হইতে গৃহীত।)

টড্ সাহেবের কৃত "রাজস্থান" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বিদ্যাধর নামে একজন অদ্বিতীয় শাস্ত্রবিদ্ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শ মত জয়সিংহ ১৭২০ খৃঃ অঃ জয়পুর-নগর নির্ম্মাণ করেন। নগরের চতুর্দ্দিকে যে প্রস্তর-প্রাচীর আছে, উহাতে নগর-প্রবেশের জন্ত ৭টী সিংহদ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারের উপর দুইটী করিয়া আরাম-গৃহ ও তোপ রাখিবার স্থান আছে। প্রাচীরের স্থানে স্থানে গুম্বজ ও তাহার মধ্য হইতে গোলা গুলি ছুড়িবার জন্ত ছিদ্র আছে। নগরের দেড় মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে গিরি-শিখরে গুলতা নামে একটী সুন্দর সূর্য্য-মন্দির আছে। এখানে একটী প্রস্রবণ হইতে ৭০ ফিট নিম্নে জল পতিত হইতেছে। হিন্দুদিগের নিকট ঐ প্রস্রবণের জল অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ। জয়সিংহ, অম্বররাজ মির্জ্জা জয় সিংহের প্রপৌত্র ও বিষ্ণু-সিংহের পুত্র। ইনি সবাই জয়সিংহ নামে প্রসিদ্ধ এবং ভারতের একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন। ১৬৯৯ খৃঃ অঃ ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাধিরোহণের পর ইনি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিতে যান। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করায় দিল্লির সম্রাট্ ইঁহাকে প্রথমে দেড় হাজার পরে দুই হাজার মনসবদারের পদ প্রদান করেন। জয়-সিংহ স্বচরিত "জিজ মহম্মদ শাহী" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তিনি অনবরত সাতবর্ষ কাল জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া-ছিলেন। বাস্তবিক জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য শ্রবণ করিয়াই সম্রাট্ মহম্মদ সাহ তৎকাল-প্রচলিত পঞ্জিকা-সংস্কারের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। সেই জন্তই সম্রাট তাহাকে "সবাই" অর্থাৎ সকল রাজকুমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই উপাধি প্রদান করেন। ক্রমে তাঁহার সুখ্যাতির কথা দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িলে নানা-স্থানের জ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। জ্যোতির্ব্বিৎ কৃপারাম ও কালী কৃষ্ণরাম তাঁহার সভায় থাকিতেন। সম্রাট্ তাঁহাকে পঞ্জিকা-সংস্কারের ভারার্পণ করিলে, তিনি গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি, চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয়াস্ত, রাশিস্ফুট, গ্রহস্ফুট ও গ্রহণ প্রভৃতির বিশুদ্ধ গণনা, পরিদর্শন ও অভিনব নক্ষত্রের আবিষ্কারের জন্ত নিজস্ব সভায় যে সকল যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, আগ্রা ও মথুরায় বহু অর্থ ব্যয়ে বৃহৎ বৃহৎ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই সকল যন্ত্র স্থাপন

করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সৃষ্টিতত্ত্ব পরিদর্শন করিয়া একপ্রকার নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর জয়সিংহ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অতীব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনা করিয়াও সর্ব্বত্রই ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতেন। তিনি স্বকৃত "জিজ মহম্মদ সাহী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলময় অনন্ত-শক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়াই হিপার্ক্‌াস নির্ব্বোধ কৃষকের ন্যায় বিরক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বস্রষ্টার মহতী শক্তি কল্পনায় টলেমি বাদুড়ের মত সত্যরূপে সুর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। ইউক্লিডের সূত্রগুলি বিশ্বপাতার অনন্তসৃষ্টির অসম্পূর্ণ আলেখ্যের কল্পিত রেখা মাত্র। জমসেদ দসি অথবা নাসির তুসি এইরূপে বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া গিয়াছেন।"

পর্ত্তুগালের রাজা, তাঁহার নিকট যে সকল যন্ত্র পাঠাইয়া ছিলেন, তৎসম্বন্ধে উদয় সিংহ বলিয়াছিলেন—"প্রকৃত পরীক্ষা ও সমালোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে, এই যন্ত্রে চন্দ্রের যে অবস্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা অর্দ্ধ অংশ কম, সুতরাং ঠিক্ নহে। অন্যান্য গ্রহগণের অবস্থান সম্বন্ধে যদিও ইহাতে কোন গোল নাই, কিন্তু গ্রহণ-সম্বন্ধীয় গণনায় ৪ মিনিট্ সময় কম-বেশী দেখা যায়।" এইরূপ অবিশুদ্ধ যন্ত্র হইতেই হিপার্কাস, টলেমি, ডিলাহায়র প্রভৃতির গণনায় ভুল হইয়াছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অক্ষয় ও অপূর্ব্ব-কীর্ত্তি স্বরূপ মানমন্দিরগুলি এখনও ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাঁহার বিখ্যাত "জিজ মহম্মদ সাহী" গ্রন্থ রচনায় পূর্ব্বে তাঁহার সভায় জগন্নাথ পণ্ডিতের দ্বারা সম্রাট্ সিদ্ধান্ত রেখাগণিত নামে ইউক্লিডের এবং নেপীয়ারকৃত গণিত-পুস্তকের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই মতানুসারে রাজপুত-সমাজে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু এক-সময়ে সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্যে তাঁহারই পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। জয়সিংহ যে কেবল জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন, তাহা নহে, একজন ঐতিহাসিক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাহার যত্নে ও নামানুসারে "জয়-সিংহ-কল্পদ্রুম" নামে সুবৃহৎ স্মৃতিসংগ্রহ সঙ্কলিত হয়।

জয়সিংহ বৃদ্ধ বয়সে অহিফেণে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতিভারও খর্ব্বতা হয়। এই সময়ে তিনি মারবারপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৭৩২ খৃঃ অঃ সম্রাট্ তাঁহাকে মালব-রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। সে সময়ে মহারাষ্ট্রগণ অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া মালবের শাসনভার তাঁহাদের হস্তেই অর্পণ করেন। তাহাতে অন্যান্য রাজপুতগণ অসন্তুষ্ট হইলেও সম্রাট, ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন নাই। বৃদ্ধ-বয়সে জয়সিংহ সমাজ-সংস্কারে মনোযোগ দিয়াছিলেন। ১৭৪৩ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।



হিন্দুর আধুনিক কর্ম্ম।

তৃতীয় প্রস্তাব।

মনু-কথিত ঋষ্যাদি পঞ্চযজ্ঞের কর্ত্তব্যতা-নির্দ্ধারণই বর্ত্তমান প্রস্তাব ত্রয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। মনু বলিয়াছেনঃ—

"ঋষি-যজ্ঞং দেব-যজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃ-যজ্ঞং পিতৃ-যজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ"॥

ঋষি-যজ্ঞ দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পিতৃ-যজ্ঞ, গৃহস্থদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহা কখনও ত্যাগ করিবে না। ঋষি-যজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন।

রাত্রি শেষ যামে উপনীত। উষার মধুর আলোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। ভারতের পবিত্র আর্য্য তপোবনের প্রান্তভাগে পুণ্য-তোয়া স্রোতস্বতী "কুল কুল" রবে "তর তর" প্রবাহিতা। এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জটা-মণ্ডিত-মস্তক, কটিতটে বল্কলাচ্ছাদন, তেজঃপুঞ্জ-কলেবর আর্য্য ঋষিগণ, প্রাতঃ স্নাত-হইয়া প্রাতাঃকৃত্য সমাপনে রত। ক্রমে বেলা বাড়িল, দ্বিতীয় যামার্দ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ ঋষিগণ উচ্চকণ্ঠে পবিত্র মধুর স্বরে সাম-গান করিতেছেন! সঙ্গীত-মাধুরী, সুর-প্রবাহে তরঙ্গিণীর আলুলায়িত তরঙ্গ-রাশির উপর দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া কোন সুদূর নীলিমায় মিশিয়া যাইতেছে। সে ভক্তি-রসাশ্রিত আবেগপূর্ণ আকুল কণ্ঠ-ধ্বনি, নিখিল বিশ্ব প্রতিধ্বনিত করিয়া, কোন্ আলোকময় প্রদেশে পবিত্রতার মহিমা বিস্তার করিতেছে! সে পুণ্য-সঙ্গীত, কত মধুর, কত পবিত্র—কি স্বর্গ-সুষমা-বিজড়িত—কে বলিতে পারে! ইহাই ঋষি-যজ্ঞের প্রাচীন কাহিনী। অতীতের স্মৃতি মন্দিরে ইহাই বিরাজমান। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ইহার অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই "সে রাম নাই—সে অযোধ্যাও নাই।" সে তপোবন নাই—সে আর্য্য ঋষিও নাই—সাম-সঙ্গীতের সে পবিত্রতা নাই—তটিনীতীরের সে শোভাও নাই। সে ভক্তিও নাই,—সে হৃদয়ও নাই—সে কাল নাই—তাই, সে যজ্ঞও নাই। কেন নাই? ইহার উত্তরে কি বলিব? আমরা নাই—তাই আমাদের জীবনের বন্ধনীও নাই। আমরা তরল কাব্য, নাটক, উপন্যাস, নবন্যাস, কল্পিত কথা কাহিনী পড়িতে ভালবাসি, এমন কি চার্ব্বাকগ্রন্থও আমাদের নিকট অতি আদরের সামগ্রী! দুরূহ নাস্তিকতাময় কূটতর্ক বেশ বুঝি, কিন্তু সন্ধ্যার মন্ত্রগুলি আমাদের নিকট অবোধ্য বলিয়া বোধ হয়! সে গুলিতে প্রীতি আদৌ নাই! ব্যর্থ কর্ম্মের সময় আমাদের অনেক হইতে পারে, কিন্তু ১০।১৫ মিনিটের জন্য সন্ধ্যার আসনে বসিতে আমাদের মূল্যবান্ সময় বৃথা নষ্ট হয়! আমরা অনিয়ম অত্যাচার অনাচারের পদতলে স্বেচ্ছায় মস্তক অবনত করিতে পারি, কিন্তু ভগবানের কাছে শির নত করিতে স্বীকৃত নহি! বৈদেশিক মনীষিগণ সমুদ্রের পার হইতে আসিয়া আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের অনুবাদ করিয়া লইয়া যাইতেছেন; আর আমরা সে অমূল্য রত্নে—অযত্ন করিয়া তাঁহাদের অনুবাদের অপেক্ষায় বসিয়া দিন গণিতেছি! আমাদের অমূল্য নিধি, অপরের করে উজ্জ্বলতা লাভ করিতেছে, আর আমরা

কেবল অহঙ্কারভরে ঘরে শুইয়া দিন কাটাইতেছি! ইহাই আমাদের অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। বস্তুতঃ বর্ত্তমানযুগে সন্ধ্যার অবসানে যে "ব্রহ্মযজ্ঞ জপ" অনুষ্ঠিত হয়—সেই বেদমন্ত্র-চতুষ্টয়-পাঠই ঋষিযজ্ঞ নামে অভিহিত। সুতরাং সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিলেই ঋষি-যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইবে। অতএব বর্ণাশ্রমিগণ প্রত্যহ যথাবিধি সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন। ঋষি-যজ্ঞ সম্বন্ধে ইহাই হিন্দুর আধুনিক কর্ম্ম।

দেবযজ্ঞ—হোমাদি। ভূতযজ্ঞ—ভূত-(প্রাণী)-বলি। নৃ-যজ্ঞ—অতিথি-সৎকার। পিতৃ-যজ্ঞ—শ্রাদ্ধাদি। এখানে ভূত-যজ্ঞ ও নৃযজ্ঞের বিবরণ দেওয়া হইল।

পাঠক! একবার কল্পনা-নয়নে প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের চিত্র ধ্যান করুন, এবং ভূতযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞের তত্ত্ব চিন্তা করুন। রম্য তপোবনে ঋষি দিগের ক্ষুদ্র কুটীর-শ্রেণী—নিসর্গ-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত—পবিত্রতার মধুরোজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত ও প্রকৃতির কনক-আভরণরূপে বিরাজিত। কুটীরদ্বারে শ্রেণিবদ্ধ তরুরাজির মূলদেশ আলবাল-বেষ্টিত। ঋষি-কুমারীগণ তরুগণের প্রতি করুণা-বশতঃ আলবাল জলপূর্ণ করিতেছেন! তপোবনস্থ বিহঙ্গমগণ ভক্তিভরা জলপানে তৃপ্ত হইয়া, আশ্রম-দেশ মুখরিত করিয়া, মধুরকণ্ঠে ভগবানের মহিমা গান করিতেছে—শোকতপ্ত হৃদয়ে শান্তি-বারি সেচন করিতেছে। সে সঙ্গীতের অঙ্গুলী-সঞ্চালন, হৃদয়ের তারে ভগবৎপ্রেমের ঝঙ্কার তুলিয়া দিতেছে। কুটীর-প্রাঙ্গণে অপরিমিত নীবার—বিকীর্ণ, বিশুষ্ক। নীবার-ভোজনে পরিতৃপ্ত মৃগকুল, দ্বারে বৃক্ষচ্ছায়ায় অলসতার ক্রোড়ে দেহ রাখিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে রোমন্থনে রত। চিত্তে ভয় নাই, হিংসা নাই, কঠোরতা নাই। ঋষি কুমার কোমল তৃণ-গুচ্ছ হস্তে লইয়া সোহাগের আকুল কণ্ঠে মৃগশিশুকে ডাকিতেছেন। হরিণ-শাবক অকুণ্ঠিত চিত্তে সে তৃণ-ভোজনে ব্যাপৃত। ঋষিবালকের হাত খানি যেন তাহার কত পরিচিত—কত বিশ্বস্ত! এ দৃশ্য দর্শনে, এমন কি চিন্তনেও চিত্ত বিগলিত হয়—হৃদয় পবিত্র হয়! আশ্রমের মুনি-কুমার-কুমারীদিগের এই জীব-বাৎসল্য দর্শনে কে বলিতে পারে—ইহা অপেক্ষা শান্তিময় স্থান সংসারে আছে? এই জীববাৎসল্যই ভূতযজ্ঞের মূল। নিরাশ্রয় প্রাণিদিগের প্রতি দয়া-প্রকাশ ও বাৎসল্যভাব-পোষণই এই যজ্ঞের মূলমন্ত্র। অন্যদিকে—

দ্বার-দেশে অতিথি দণ্ডায়মান। অতিথি ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, শূদ্র হউন, দীন হউন, ধনী হউন, সধর্ম্মী বা বিধর্ম্মী হউন, গৃহী বা সন্ন্যাসী হউন, তবু তিনি অতিথি। অতিথি মন্দ্র-মধুর স্বরে ডাকিলেন—"অতিথিরহং ভোঃ"॥ সে কণ্ঠস্বর, আশ্রম-বালিকার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল। বালিকা গৃহস্থ কার্য্যে ব্যাপৃতা; তাহার সে কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিল! কারণ সে জানে,—

"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥"

ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি, ক্ষত্রিয়াদি সকল

বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ, স্ত্রীর একমাত্র গুরু পতি এবং সকলের গুরু অতিথি। বালিকা দেখিল—সেই অতিথি দ্বারে দণ্ডায়মান। তাহার সহস্র কার্য্য পড়িয়া রহিল—সে তখন অতিথি-সৎকারে নিবিষ্ট হইল। আলুলায়িত কুন্তল নাচাইতে নাচাইতে ব্যস্তা বালিকা আসন আনিতে ছুটিল! সাদর সম্ভাষণে অতিথিকে বসিতে দিল। তাহার মুখে সেবা-ব্রতের অনুরাগ-চিহ্ন প্রকটিত—নয়নে ভক্তির উজ্জ্বল প্রতিভা বিদ্যমান—কর্ত্তব্যের ব্যস্ততায় হৃদয় আকৃষ্ট। অতিথি বসিলেন—আশীর্ব্বাদ করিলেন—"চিরায়ুষ্মতী ভব"। তখন অতিথির জন্য কেহ অর্ঘ্য সাজাইতে ব্যস্ত, কেহ বা পাদ্য আনিতে ব্যস্ত, কেহ বা অতিথিকে লইয়া মধুর আলাপনে ব্যাপৃত। ফলতঃ আমাদের দেশে গুরুদেবের আগমনে ভক্তি-পূত শিষ্যের চিত্তে যেমন ব্যস্ততা, আগ্রহ ও আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, অতীত-যুগে অতিথির জন্য সাধারণ গৃহস্থ-বালক-বালিকাদিগের চিত্ত সেইরূপ ব্যস্ততা, আগ্রহ ও আনন্দে পূর্ণ হইত। প্রাচীন ভারতে ইহাই নৃ-যজ্ঞের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার এই কর্ত্তব্যের অপালনের শোচনীয় পরিণাম-স্বরূপ একটী পৌরাণিক ব্যাপারের দৃশ্য চিত্তানেত্রে অবলোকন করুন।

ঐ দেখুন, তপোবনে কণ্ব মুনির আশ্রম-কুটীর। সে কুটীরের অলিন্দে বসিয়া স্বামিবিরহতপ্তা শকুন্তলা চিন্তা-মগ্না! অন্তরের অন্তস্তলে প্রেমিকার অন্তর প্রবিষ্ট। প্রাণের ভিতর প্রাণময়ী দৃষ্টিতে সে তাহার প্রাণের প্রাণ প্রিয়তম পতিকে দেখিতেছে—স্বামী—স্মৃতির শয়নে সুপ্ত! তাহার নিকট বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত—শরীর নিষ্পন্দ—সে ভাবাবেশে চিত্রিতবৎ অবস্থিতা! দ্বারে রুদ্র-মূর্ত্তি অতিথি দণ্ডায়মান। শকুন্তলা তাহার কিছুই জানে না। সে বাহ্য জগতের বহির্ভাগে, তাই সে তাহার লৌকিক কর্ত্তব্য—আশ্রম-কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিল না! অতিথির পূজা হইল না! তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধ জন্মিল—তিনি শাপ দিলেন—

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতং।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমকৃতামিব॥"

অভিশাপ-বাণী তপোবন প্রতিধ্বনিত করিয়া অনন্তে মিশিল। পতি-প্রাণার হৃদয় তাহাতেও জাগিল না। অতিথি ক্রোধভরে প্রস্থান করিলেন। আশ্রম-বালিকার কর্ত্তব্যাবহেলায়, তপস্বীর অভিসম্পাতের ফলে—দুষ্মন্তের স্মৃতি-লোপ—শকুন্তলা—পরিত্যাগ—দম্পতির মর্ম্ম-যাতনা-ভোগ শোচনীয় পরিণাম! নৃযজ্ঞের অবহেলার এই এক প্রতিফল। এরূপ পরিণাম এভাবে সকলের পক্ষে প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য-পালনেই মানবের আত্মরক্ষা হয়, অন্যথায় তাহার বৈরীপত্য ঘটে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দুর গৃহ আবার ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞের মহিমায় মহিমান্বিত হউক।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

হিন্দুগৌরব।

ধর্ম্মশাস্ত্রে হিন্দুর অতীত গৌরবের যে আলোকদীপ্ত চিত্র বিরাজমান, তাহা বর্ত্তমান যুগে স্মৃতিমাত্র-শেষ হইলেও ঐতিহাসিক সময়ে যে তাহার জীর্ণ অথচ উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, বৈদেশিক পরিব্রাজকের সত্যশংসিনী লেখনী শতমুখে সে তথ্য প্রচার করিয়াছে। পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ্ প্রাচীনভারতের গৌরব-মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ঋষিশাসিত ভারতীয় সমাজকে শান্ত, সংযত, সত্যরত, সুখশান্তিপূর্ণ সুব্যবস্থিত, ও মনুষ্যত্বের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত বলিয়া না লিখিয়া পারেন নাই। অদ্য আমরা সেই সুব্যবস্থিত সমাজের একটী ব্যবস্থার কথা পাঠকবর্গকে শুনাইব।

উপনিষদের যুগে ভারতীয় সমাজ এত উন্নত ছিল যে, সেই সময়ে একজন নৃপতি উচ্চকণ্ঠে কহিয়াছিলেন "নমে স্তেনোজনপদে" অর্থাৎ আমার রাজ্যে তস্কর নাই। মানবপ্রকৃতির ধর্ম্মপ্রবণতা-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে চৌর্য্য-কুকার্য্য প্রবেশলাভ করিলে পরেও ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিগণ ভারতীয় সমাজ-পালক রাজশক্তির যে গৌরবকর কর্ত্তব্যানুসরণের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে যুগপৎ আহ্লাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

তস্কর-নিগ্রহের ব্যবস্থা সমস্ত সভ্য সমাজেই আছে। অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, যথোপযুক্ত প্রমাণ গ্রহণের পর দ্রব্যস্বামীকে ফেরৎ দিবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে রাজকীয় চৌর-গ্রাহক- (পুলিশ-) গণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, অথচ দ্রব্যস্বামীর দ্রব্যনাশ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়, সেইস্থলে রাজকোষ হইতে দ্রব্যস্বামীর ক্ষতিপূরণ করা বোধ হয় আধুনিক সভ্য সমাজে সভ্যতার অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন "চৌরহৃত-মবজিত্য যথাস্থানং গময়েৎ স্বকোশাদ্ বা দদ্যাৎ" অর্থাৎ রাজা, চোরের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্য আদায় করিয়া যথাস্থানে, অর্থাৎ দ্রব্যস্বামীকে প্রদান করিবেন; অসমর্থ হইলে রাজকোশ হইতে দিবেন। আর একজন ঋষি বলিয়াছেন—"রাজা জানপদেভ্যস্তু দেয়ং চৌরহৃতং ধনম্"। রাজা জনপদবাসীগণকে অপহৃত ধন প্রদান করিবেন। এরূপ উদার ব্যবস্থাকে হিন্দু-গৌরব বলিতে আপত্তি আছে কি? যেখানে এরূপভাবে ক্ষতিপূরণ করিতে রাজশক্তির বাধ্যতা থাকে, সেখানে যে, হৃত দ্রব্যের উদ্ধারের জন্য অধিকতর মনোযোগ বা সাবধানতার প্রয়োজন হয়, ইহা অনায়াসবোধ্য। পক্ষান্তরে যদি চৌর-নিগ্রহের জন্য ও কঠোর দণ্ডদানের জন্য রাজশক্তির তীব্র প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকে, তবে চৌর্য্যের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে থাকে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। দণ্ডদানের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেই চৌর্য্য পলায়ন করিতে বাধ্য হয়—এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব থাকিলে, অনুসন্ধানশ্রম যেরূপ পূর্ণতা লাভ করে, অন্য সময় তাহা না করিতেও পারে।

রাজকোষ যদি ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে, তবে যে অধিকতর যোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির উপর অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত হওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাহাও অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানকারীর ত্রুটীতে হৃতদ্রব্য-সংগ্রহের অসুবিধা হইলে যে অনুসন্ধানকারী স্বয়ংই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য থাকেন, এরূপ অনুমান করাও কষ্টকল্পনা নহে। মোটের উপর সমাজে শান্তিস্থাপনার্থে সামাজিকগণের হৃতদ্রব্যের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা দ্বারা প্রাচীন যুগের হিন্দু রাজশক্তি যে প্রচুরতর গৌরব-ভাজন হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। ফলতঃ এরূপ ব্যবস্থার গুণাগুণ পর্য্যালোচনা করা প্রত্যেক সভ্য মানবের কর্ত্তব্য মনে করি।

শ্রী——

জীবন-স্রোত।

ছুটিছে জীবন-স্রোত, তরঙ্গ তুলিয়া
কোন্ মহাসিন্ধুপানে!—রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বসি' উঠিছে যেন নবশক্তি বলে,
নিভৃত হৃদয়-রাজ্যে, মানস-অচলে!
স্বপনে গীতে মৃদুস্বর করে নিরন্তর—
উপল-ব্যথিত গতি; বিশীর্ণ, মন্থর!
কত দেশ, কত বন, কত মরুভূমি
দূরে যায় দেখা;—একে একে অতিক্রমি'
যেতে হবে সেই দিব্য আনন্দ-পাথারে,
সংসারের সুবিপুল রহস্যের পারে!
কখনো বা নিরালম্ব প্রবাহ গভীর,
প্লাবিয়া বিরাট্ দীপ্ত পর্ব্বত-শরীর,
ধাইতেছে মহাবেগে, উন্মত্ত আবেশে;—
ভাসাইয়া তৃণ, গুল্ম, গৈরিক, নিশেষে!
কোথাও প্রবেশি' অন্ধ-তামস-কন্দরে,
ধরণীর বন্দীসম সংক্রোধে সঞ্চরে!
না জানি কখন্ কোন্ রন্ধ্রপথ দিয়া,
আবার বহিবে প্রেমে উধাও হইয়া!
পঙ্কিল প্রমত্তধারা ফিরে রাত্রিদিন;
দূরে ঐশ্বর্য্যের দেশ, দিগন্তে বিলীন!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা।
মাতাপিতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধনা॥
৩৪২

যে গুণবতী সতী, শ্বশ্রূ এবং শ্বশুরের চরণ বন্দনা করেন এবং মাতা পিতার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন, তিনিই তপোধনা।৩৪২

ব্রাহ্মণান্ দুর্ব্বলানাথান্ দীনান্ধকৃপণাংস্তথা।
বিভর্ত্ত্যন্নেন যা নারী সা পতিব্রত-ভাগিনী॥৩৪৩

যে রমণী ব্রাহ্মণ, দুর্ব্বল, অনাথ, দীন, অন্ধ ও কৃপাপাত্রগণকে অন্নদান দ্বারা প্রতিপালন করেন, তিনি পতিব্রতভাগিনী হন।৩৪৩

ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘুসত্বকা।
পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতিব্রতভাগিনী॥৩৪৪

যিনি অল্পজ্ঞা হইয়াও নিত্য নিত্য দুশ্চর ব্রত আচরণ করেন এবং যিনি

পতিগতচিত্তা ও পতিহিতকারিণী তিনিই পতিব্রতভাগিনী ৩৪৪

পুণ্যমেতৎ তপশ্চৈব স্বর্গশ্চৈষ সনাতনঃ।
সা নারী ভর্তৃপরমা ভবেদ্ভর্তৃ-ব্রতা সতী॥৩৪৫

যে রমণী পতিকে পরমশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, সেই সতী নারীই পতিব্রতা; তাঁহার সেই পতিসেবাই পুণ্য, পতিশুশ্রূষাই তপস্যা এবং তাহাই সনাতন স্বর্গ।৩৪৫

পতির্হি দেবো নারীণাং পতির্বন্ধুঃ পতির্গতিঃ।
পত্যা সমাগতির্নাস্তি দৈবতং বা যথা পতিঃ॥ ৩৪৬

রমণীগণের পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গতি; পতির সমান গতি নাই, পতিও যাদৃশ, দেবতাও তাদৃশ।৩৪৬

পতি-প্রসাদঃ স্বর্গো বা তুল্যোনার্য্যা ন বা ভবেৎ।
অহং স্বর্গং নহীচ্ছেয়ং ত্বয্যপ্রীতে মহেশ্বর।৩৪৭

রমণীগণের প্রতি পতির প্রসন্নতা এবং স্বর্গবাস সমান হইতে পারে না। হে মহেশ্বর! তুমি প্রসন্ন থাকিলে আমি স্বর্গবাসও কামনা করি না।৩৪৭

যদকার্য্য মধর্ম্মং বা যদি বা প্রাণ-নাশনং।
পতির্ব্রূয়াদ্দরিদ্রো বা ব্যাধিতো বা কথঞ্চন॥৩৪৮
আপন্নো রিপুসংস্থো বা ব্রহ্মশাপর্দ্দিতোঽপি বা
আপদ্ধর্ম্মাননুপ্রেক্ষ্য তৎকার্য্যমবিশঙ্কয়া॥৩৪৯

পতি যদি দরিদ্র, কোনপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত, আপন্ন, রিপুবশীভূত অথবা ব্রহ্মশাপার্দ্দিত হইয়াও কোন অকার্য্য অধর্ম্ম এমন কি, প্রাণ-নাশ করিতেও আদেশ প্রদান করেন, তাহাও আপদ্ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া নিঃশঙ্কভাবে কর্ত্তব্য।৩৪৮ ৩৪৯

এষ দেব ময়া প্রোক্তঃ স্ত্রীধর্ম্মোবচনাৎ তব।
যাত্বেবম্ভাবিনী নারী সা পতিব্রতভাগিনী॥ ৩৫০ (১)

হে দেব! এই ত আমি তোমার কথাক্রমে স্ত্রীধর্ম্ম কহিলাম। যে নারী এইরূপ হইবেন, তিনি পতিব্রত-ভাগিনী।৩৫০

ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বম্। শ্বশ্রূ-শ্বশুর-গুরু-দেবতাতিথি-পূজনম্। সুসম্মৃষ্টোপস্করতা, অমুক্তহস্ততা, সুগুপ্তভাণ্ডতা, মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ, মঙ্গলাচারতৎপরতা, ভর্ত্তরি প্রবাসিতে প্রতিকর্ম্মক্রিয়া, পরগৃহেষ্বনভিগমনম্, দ্বারদেশগবাক্ষকেষু নাবস্থানম্, সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রতা, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যেষ্বপি পিতৃ-ভর্তৃপুত্রাধীনতা।৩৫১

পতির সমান ব্রতাচরণ। শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা। গৃহোপকরণ দ্রব্যকে বেশ পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখা, অল্পব্যয় করা, ধনাদি গোপন করিয়া রাখা, বশীকরণাদি মূলকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলাচার-তৎপরতা, পতি প্রবাসে থাকিলে বেশ-বিন্যাস না করা, সর্ব্ব কর্ম্মে স্বাধীনতা না থাকা, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যে পিতা, পতি ও পুত্রের বশে থাকা।৩৫১

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥৩৫২

পতির মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য বা পতির অনুগমন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী-লোকদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত এবং উপবাস নাই, কিন্তু তাঁহারা পতিকে সেবা করা বশতঃ স্বর্গে আদৃতা হন।৩৫২

---

(১) মহাভারতে অনুশাসন-পর্ব্বণি।

পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাস ব্রতঞ্চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥৩৫৩
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
৩৫৪ (ভ)

যে রমণী পতি জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করেন, তিনি পতির আয়ুঃ হরণ ও নরকে গমন করেন। পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী হইবেন। সাধ্বী স্ত্রী পুত্রবতী না হইলেও সনকাদি ব্রহ্মচারিদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।৩৫৩ ৩৫৪

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
৩৫৫

যে রমণী দরিদ্র, পীড়িত, মূর্খ পতিকে অবজ্ঞা করেন, তিনি মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করেন।৩৫৫

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা সদ্ ব্রহ্মচারিণঃ ॥
৩৫৬

যে নারী পতির মৃত্যুতে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করেন, তিনি মরণান্তে ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন।৩৫৬

তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি রোমাণি মানুষে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানু গচ্ছতি ॥
৩৫৭

পতির দেহান্তে যে রমণী সহমৃতা হন, সেই রমণী মানব-দেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি সংখ্যক রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল স্বর্গভোগ করেন।৩৫৭

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥
৩৫৮ (চ)

ব্যালগ্রাহী (সাপুড়ে) যেমন গর্ত্ত-মধ্য হইতে সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া, তাঁহার সহিত স্বর্গ-সুখ ভোগ করেন।৩৫৮

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী নীলীবস্ত্রং প্রধারয়েৎ।
ভর্ত্তা তু নরকং যাতি সা নারী তদনন্তরং ॥
৩৬০ (ণ)

যে রমণী পতির মৃত্যুর পর নীলবস্ত্র (কালাপেড়ে কাপড়) পরিধান করেন, তাঁহার পতি নরক গমন করেন, তদনন্তর সেই নারীও নরকে গমন করেন।৩৬০

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

(ভ) বিষ্ণু সংহিতা।

(চ) পরাশর-সংহিতা

(ণ) অঙ্গিরঃ স্মৃতিঃ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

নূতন! ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্যাপারটা অনেকটা নূতন। পত্রান্তরে প্রকাশ—মালদহ-রামজীবনপুরের মৌলবী সলিমুদ্দিন আহাম্মদ, টোলে পড়িয়া সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। এজন্য মৌলবী সাহেবের অধ্যাপকমহাশয় তাঁহাকে "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি দিয়াছেন। মুসলমান মৌলবী "বিদ্যাবিনোদ" হইলেন, বোধহয় এই নূতন,

টোলের পণ্ডিতও বোধহয় মৌলবীকে উপাধি দিলেন এই নূতন! এই অধ্যাপক মহাশয়কে কেহ সংকীর্ণচেতা বলিতে সাহস করেন কি?

ভ্রমের ভোগ। সংবাদপত্রে প্রকাশ—নারায়ণপাড়া-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান, বালীর এক ষোড়শী বিধবা ব্রাহ্মণ-বালাকে বিবাহ করেন। বিবাহ সময়ে পাত্রীর বৈধব্যসংবাদ, পাত্রপক্ষ জানিতেন না। বিবাহের বহুদিন পরে, একটী কন্যার জনক হইয়া শ্রীমান্ বর জানিতে পারেন যে, তিনি ভ্রমক্রমে বিধবা-বিবাহ করিয়াছেন। সংবাদ প্রকাশ পাওয়ায় সমাজের শাসনদণ্ড শ্রীমানের মস্তকে পড়িয়াছে। পণ্ডিতেরা নাকি বলিয়াছেন যে, চিরদিনের জন্য কন্যা ও স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলে পরে সমাজ-শাসন হইতে নিষ্কৃতি মিলিতে পারে! বিবাহটা বিশেষ বুঝিয়া জানিয়া করিলে এতভোগ হইত কি?

সত্যবতীর কৃতকার্য্যতা। কুমারী শ্রীমতী সত্যবতী (জলন্ধরের কন্যামহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী) বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের "শাস্ত্রী" পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। কলিকাতার "তীর্থ" পরীক্ষায় জগৎপুর আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা অনেকে উত্তীর্ণা হইয়াছেন জানি, কিন্তু "শাস্ত্রী" পরীক্ষায় রমণীর কৃতকার্য্যতা ইহার পূর্ব্বে বোধহয় শুনি নাই। এ ব্যাপারে শাস্ত্রী মহাশয়েরা যদি কিছু মনে করেন, তবে আমরা বলিব, গার্গী বাগ্দেবী প্রভৃতির দেশে এ সংবাদে নূতনত্ব কি?

বিবাহ ও ব্যয়বৃদ্ধি। ব্যয়বৃদ্ধির ভয়ে অনেকে বিবাহ করেন না। বিবাহিতের ব্যয়বৃদ্ধি, খুবই সম্ভব, কারণ গৃহধর্ম্মের সকল ক্ষেত্রেই ব্যয়ের প্রয়োজন। কিন্তু সম্প্রতি শুনিতেছি, সুসভ্য ফ্রান্স-প্যারিষের "বজেট কমিটি" ৩০ বৎসরের অধিকবয়স্ক অবিবাহিতগণের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে কর ধার্য্য করিয়াছেন! এবড় বিষম উপদ্রব! বিবাহ এড়াইতে গিয়াও যে করের দায় এড়ান গেল না! এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসী, চিরকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও বনস্থ ভিন্ন অন্যে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হন।

পণ্ডিতের পরলোক। কলিকাতা বাগবাজারের পণ্ডিত গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় মাসাধিক কাল পূর্ব্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত গুরুনাথ দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে কাতর হইয়াও প্রাণপণে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন—অধ্যাপনযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। এ ভাব বড়ই দুর্ল্লভ! শেষ জীবনে সংস্কৃত-পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিয়া পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থের বলে দারিদ্র্য-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। তখন অধ্যাপনার অনুরাগও ক্ষীণ হইয়াছিল। ফলতঃ গুরুনাথের দারিদ্র্যপীড়িত প্রথমজীবন, পণ্ডিতবর্গের অনুকরণীয়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টারীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২০শ বর্ষ, ২০শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩২০ সাল, ১৮৩৫ শকাব্দাঃ।

দান।

জলে জলে মাথা খুঁড়ে' চরণে তোমার
কত ভিক্ষা মাগে মাগো! প্রতিমা সম্মুখে,
কারো ভিক্ষা ধন জন, যশ মান কার,
পুত্রের কল্যাণ কেহ চাহে সাশ্রুমুখে।
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে আমি দেখি কুতূহল,
মনে ভাবি—কি মাগিব চরণে তোমার?
কি দিতে রেখেছ বাকি? কি নহে স্বচ্ছল?
এত টুকু হৃদি-পাত্রে কি ধরিবে আর!
দিয়েছ সকলি তুমি না চাহিতে কেহ,
বিশ্বময় আপনারে দিয়েছ বাঁটিয়া;
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও তোমার স্নেহ
ঝরিছে, উঠিছে তাহে হৃদয় ভরিয়া!
জননিগো! এই মাত্র অভাব আমার—
যা' দিয়েছ নাহি ঠাঁই তাই রাখিবার।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল্।

ন্যায়দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩৬ সূত্র। সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্ম-ভাবী দৃষ্টান্তউদাহরণং।

ব্যাখ্যা। "সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ (সাধ্যস্য-প্রজ্ঞাপনীয়ধর্ম্মবিশিষ্টধর্ম্মিণঃ সাধর্ম্ম্যাৎ সমান-ধর্ম্মাৎ) তদ্ধর্ম্মভাবী (তস্যসাধ্যস্য ধর্ম্মং ভাব-য়তি অনুভাবয়তি যঃ তাদৃশঃ) দৃষ্টান্তঃ (দৃষ্টান্তবচনং) উদাহরণং অন্বয়্যুদাহরণং"।

তাৎপর্য্যানুবাদ। সাধ্য অর্থাৎ প্রজ্ঞা-পনীয়ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত তাহার ধর্ম্মবোধক যে দৃষ্টান্তবাক্য তাহাই অন্বয়ী উদাহরণ।

টীকা। দৃষ্টান্তকে উদাহরণ বলে, একথা সকলেই জানেন। মহর্ষির দৃষ্টান্ত পদার্থ পূর্ব্বেই গিয়াছে, সুতরাং তাঁহা আর বলিতে হইবে না। তবে এসূত্রে আবার কোন্

উদাহরণ বলিতেছেন—একথাটাই আগে বুঝিতে হইবে। যে অবয়বের কথা চলিতেছে, তাহার মধ্যে উদাহরণ তৃতীয় অবয়ব। তাহাকেই মহর্ষি "দৃষ্টান্ত উদাহরণং" এই অংশের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে দৃষ্টান্ত বলিতে "দৃষ্টান্তবাক্য" তাহাই উদাহরণ অর্থাৎ তৃতীয় অবয়ব "উদাহরণ-বাক্য।" বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন "দৃষ্টান্ত উদাহরণং" এইটুকুই উদাহরণের সামান্য লক্ষণ। অপর অংশ এবং ইহার পরবর্ত্তী সূত্রটী যথাক্রমে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী উদাহরণের লক্ষণ-বচন। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যায় ইহা বুঝা যায় না। তাঁহাদিগের মতে এইসূত্র ও পরবর্ত্তীসূত্র যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ উদাহরণের লক্ষণ-বচন। পূর্ব্বোক্ত হেতু-লক্ষণসূত্রেও তাঁহাদিগের সেই ভাব। আমরা হেতু-সূত্রে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাই দেখাইয়াছি। এই উদাহরণ-সূত্রে ভাষ্যকারের পথে চলিতেছি। বস্তুতঃ মহর্ষির সূত্র পাঠ করিলে উদাহরণের "সামান্য লক্ষণ" তাঁহার বিবক্ষিত বলিয়া বোধ হয় না। দুই সূত্রে দ্বিবিধ উদাহরণের দ্বিবিধ রূপই তিনি দেখাইয়াছেন। "দৃষ্টান্ত উদাহরণং" এই অংশের দ্বারাই শিষ্যগণ উদাহরণের সামান্যলক্ষণ বুঝিয়া লইবেন। সূত্রকারের বাক্য-সংক্ষেপে এই ভাবের কৌশল বহুস্থলেই দেখা যায়। মূলকথা, পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা ও হেতু-প্রয়োগের পরে ব্যাপ্তিবোধের জন্য যে দৃষ্টান্ত-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাই উদাহরণ-বাক্য। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত ইহা নহে। তাহা সেই পূর্ব্ব-লক্ষণাক্রান্ত পদার্থ। ইহা সেই দৃষ্টান্ত-বোধক বাক্য। উদাহরণ দেখুন—"পর্ব্বতোবহ্নিমান্" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে "ধূমাৎ" এই হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিলেন, তাহার পরে "যথা মহানসং" এই বাক্যটীর প্রয়োগ করিলে ইহাই তৃতীয় অবয়ব "উদাহরণ"। ইহা অন্বয়ী উদাহরণ। কারণ এই—উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা ধূমহেতুতে বহ্নিসাধ্যের পূর্ব্বোক্ত অন্বয়ব্যাপ্তিই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি এই অন্বয়ী উদাহরণের পরিচয় দিয়াছেন—"সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী"। এখানে সাধ্য বলিতে প্রজ্ঞাপনীয়-ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী। প্রদর্শিত স্থলে—সাধ্য,—বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত। তাহার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ—সমান ধর্ম্ম এখানে ধূম। কেননা মহানস অর্থাৎ পাকশালাতেও ধূম আছে, পর্ব্বতেও ধূম আছে। সুতরাং ধূম, বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত এবং মহানসের সমানধর্ম্ম। ঐ সমানধর্ম্ম ধূম—প্রযুক্ত তদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতের ধর্ম্ম যে বহ্নি—সেই বহ্নির জ্ঞাপক ঐ দৃষ্টান্ত-বাক্যটি (যথা মহানসম্) হইয়াছে, তাই ঐ বাক্যটী অন্বয়ী উদাহরণ। "যথা মহানসং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, মহানসে ধূম আছে এবং বহ্নিও আছে, সুতরাং সাধ্য ও হেতুর সহচার অর্থাৎ একত্র অবস্থান বুঝিয়া উহার দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তির বোধ হয়। অবশ্য ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলে হয় না। ফলতঃ ঐ উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা উপদর্শিত অন্বয়—ব্যাপ্তির জ্ঞান বশতঃ ঐ স্থানে বহ্নিরূপ ধর্ম্মের অনুমান রূপ জ্ঞান হয়, তাই ঐ বাক্যকে—"সাধ্য-সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত

তদ্ধর্ম্মভাবী” বলা হইয়াছে। এখানে “সাধ্য” বলিতে যদি বহ্নি প্রভৃতি ধর্ম্মই মহর্ষির বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে তদ্ধর্ম্মভাবী না বলিয়া মহর্ষি “তদ্ভাবী” এই কথাই বলিতেন। “তদ্ধর্ম্ম” পদে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে “ধর্ম্ম” শব্দের সার্থক্য থাকে না। সুতরাং আমরা এখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই প্রকাশ করিলাম।

তবে ভাষ্যকারের মতে “তদ্ধর্ম্মভাবী” একথার অর্থ—তদ্ধর্ম্মের বিদ্যমানতা যে দৃষ্টান্তে আছে। তাহাই উদাহরণ। বৃত্তিকার বলেন “তদ্ধর্ম্মভাবী” বলিতে তদ্ধর্ম্মের বোধক। বস্তুতঃ এখানে দৃষ্টান্তবাক্যকেই উদাহরণ বলিতে হইবে সুতরাং “তদ্ধর্ম্মভাবী” এই কথার (তদ্ধর্ম্মং ভাবয়তি বোধয়তি) তদ্ধর্ম্মবোধক এই অর্থ ব্যাখ্যা করিলেই সূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত শব্দটীর প্রতিপাদ্য দৃষ্টান্তবাক্য সহজে বুঝা যায়। কারণ দৃষ্টান্তবাক্যই ঐরূপে সাধ্যসাধর্ম্ম্যবশতঃ তদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ বহ্নি প্রভৃতি অনুমেয় ধর্ম্মের বোধক হয়। ঐস্থলে অন্বয়ব্যাপ্তি-জ্ঞানের দ্বারা বহ্নির অনুমানে “যথা মহানসং” এই বাক্যটী সহায়তা করে, তাই ঐ বাক্যকে “তদ্ধর্ম্মভাবী” অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মবোধে প্রযোজক বলা যায়। এখানে “সাধ্য” শব্দে আমরা ভাষ্যকারের মতানুসারে “ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী”ই ব্যাখ্যা করিলাম। ভাষ্যকারের যুক্তিও দেখাইলাম। ভাষ্যকার বলেন “তদ্ভাবী” না বলিয়া “তদ্ধর্ম্মভাবী” বলিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই এইখানে সাধ্যশব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। “সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা” এই সূত্রে সাধ্য শব্দের ব্যাখ্যা সেখানেই বলিয়াছি। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও সেখানে “সাধ্য” বলিতে “ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী” বলিয়াছেন। মহর্ষির পূর্ব্বাপর সূত্র পর্য্যালোচনা করিলে এবং “সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ” ও “তদ্ধর্ম্মভাবী” এই দুইটি কথার প্রতি মনোযোগ করিলে, এখানেও সাধ্য শব্দের ব্যাখ্যাত অর্থই বিবক্ষিত বলিয়া বোধ হয়। “সাধ্যসাধর্ম্ম্য” ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলিয়াছেন—সাধ্যসমানাধিকরণ ধর্ম্ম—অর্থাৎ প্রকৃত হেতু। সাধর্ম্ম্য শব্দের দ্বারা সমানধর্ম্মই বুঝা যায়। পর্ব্বত মহানসের ন্যায় ধূমবান্—এইরূপ বলিলে, ধূমত্বরূপে ধূম, পর্ব্বত ও মহানসের সাধর্ম্ম্য, ইহা বুঝা যায়। ধূম বহ্নির সমানাধিকরণ—একথার দ্বারা—ধূম বহ্নির সাধর্ম্ম্য ইহা বুঝা যায় না। তবে প্রয়োজন হইলে ঋষিসূত্রের দ্বারা সবই ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে কোন প্রয়োজন নাই। প্রতিজ্ঞাসূত্র দেখিলেও মহর্ষির এই সব স্থলের “সাধ্য” শব্দের প্রতিপাদ্য একই, ইহাও মনে আসিবে। ৩৬।

৩৭ সূত্র। তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং।

ব্যাখ্যা। তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা (পূর্ব্বোক্ত সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাচ্চ) “বিপরীতং” (অতদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্তঃ) উদাহরণং—ব্যতিরেক্যুদাহরণং ইতি যাবৎ।

তাৎপর্য্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত সাধ্যের বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত বিপরীত অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মাভাবের জ্ঞাপক-বাক্যও উদাহরণ—(ব্যতিরেকি উদাহরণ)।

টীকা। দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ। অন্বয়ী ও

ব্যতিরেকী। সাধর্ম্ম্যমূলক দৃষ্টান্তকে অন্বয়ী দৃষ্টান্ত বলে। বৈধর্ম্ম্যমূলক দৃষ্টান্তকে ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত বলে। এই দ্বিবিধ দৃষ্টান্তের প্রয়োগ, সকল শাস্ত্রেই দেখা যায়। কিন্তু ঐ দৃষ্টান্তবোধক বাক্যই এখানে উদাহরণ—ইহা মনে রাখিতে হইবে। যেখানে পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত সাধ্যের বৈধর্ম্ম্য বশতঃ সেই সাধ্যের ধর্ম্মটীর অভাব বোধ হয় সেই অতদ্ধর্ম্মজ্ঞাপক দৃষ্টান্ত-বাক্যই—ব্যতিরেকী উদাহরণ। উদাহরণ দেখুন ;—প্রতিজ্ঞা করিলেন "জীবৎশরীরং সাত্মকং"—তাহার পরে হেতু-প্রয়োগ করিলেন "প্রাণাদিমত্ত্বাৎ"। এখন উদাহরণ চাই। দৃষ্টান্ত থাকিলে ত তদ্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিবেন! দৃষ্টান্ত কৈ ?। যেখানে যেখানে প্রাণ আছে—সেই সমস্তই সাত্মক অর্থাৎ—আত্মযুক্ত—ইহার দৃষ্টান্ত ঐ জীবনবিশিষ্ট শরীর ভিন্ন আর কোন পদার্থ হইতে পারে না। কারণ—আর কোন পদার্থই ঐরূপ সাত্মকত্ব রূপ সাধ্যবিশিষ্ট নহে। কিন্তু প্রতিপক্ষ, কোন জীবনবিশিষ্ট শরীরেই সাত্মকত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহাকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবেন না। কিন্তু আপনি ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। আপনি বলিবেন "যাহা সাত্মক নহে, তাহা প্রাণাদিবিশিষ্ট নহে, যেমন ঘট।" এখানে ঘটে সাধ্য অর্থাৎ সাত্মক জীবনবিশিষ্ট শরীরের বৈধর্ম্ম্য প্রাণাদিশূন্যতা প্রযুক্ত অতদ্ধর্ম্ম—অর্থাৎ—সাত্মকত্বের অভাব বুঝিলাম। ঐভাবে ঐ অতদ্ধর্ম্মজ্ঞাপক "যন্নৈবং তন্নৈবং" অথবা "যথা ঘটঃ" ইত্যাকারক বাক্যই ব্যতিরেকী উদাহরণ—হইল। ৩৭।

৩৮ সূত্র। উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতিবা সাধ্যস্যোপনয়ঃ।

ব্যাখ্যা। সাধ্যস্য (ধর্ম্মবিশিষ্টত্বেন সাধনীয়স্য ধর্ম্মিণঃ পক্ষস্যইতি যাবৎ) "উদাহরণাপেক্ষঃ" (উদাহরণানুসারী) "তথা" ইতি "ন তথা" ইতি বা "উপসংহারঃ" (উপসংহারবাক্যং) "উপনয়ঃ" (উপনয়নামাবয়বঃ)

তাৎপর্য্যানুবাদ। উদাহরণানুসারে পক্ষের "তথা" অথবা "ন তথা" এইভাবে যে—উপসংহার-বাক্য তাহাই উপনয়।

টীকা। উদাহরণের পরিচয় পূর্ব্বসূত্রেই পাওয়া গিয়াছে। উদাহরণবাক্যের পরে চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয়। সে কিরূপ—তাহাই এবার বক্তব্য। "পর্ব্বতোবহ্নিমান্—এই প্রতিজ্ঞার পরে "ধূমাৎ" এই হেতুবাক্য প্রয়োগ করিয়া "যথা মহানসং" এই উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই উদাহরণ অন্বয়ী। সুতরাং উহার দ্বারা ধূম-হেতুতে বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি উপদর্শিত হইয়াছে। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, ইহা বুঝিয়া ঐ বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম-দৃষ্টান্ত মহানসে আছে, ইহা বুঝিয়াছি, কিন্তু তাহাতে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানের কিছু কারণ পাইতেছিনা। সুতরাং আমাকে অনুমান দ্বারা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ইহা বুঝিতে হইলে, আপনাকে উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগের পরে বলিতে হইবে "তথাচ অয়ং" অথবা "বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবাংশ্চ অয়ং"। আপনার—ঐ বাক্যকে উপনয়-বাক্য বলে। উহার দ্বারা অর্থাৎ আপনি যে উদাহরণ

দ্বারা ধূম বহ্নিব্যাপ্য—ইহা বুঝাইয়াছেন এবং ঐ বহ্নিব্যাপ্য ধূম যে মহানসে আছে ইহা আমার স্বীকৃত—সেই উদাহরণানুসারে এখানে পক্ষ পর্ব্বতের "তথা" বলিয়া উপসংহার-বচনের দ্বারা আমি বুঝিব—সেই মহানসের ন্যায় এই পর্ব্বতও বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্। সুতরাং—পর্ব্বতোবহ্নিমান্ এই অনুমানের কারণ আমাতে উপস্থিত হইল। এই সূত্রেও 'সাধ্য" শব্দ ধর্ম্মী অর্থে প্রযুক্ত। পর্ব্বত প্রভৃতি ধর্ম্মীতে বহ্নি প্রভৃতি ধর্ম্মকে সাধন অর্থাৎ অনুমান করা হয় এই জন্য বহ্নি প্রভৃতি ধর্ম্মই সাধ্য শব্দের প্রতিপাদ্য; কিন্তু যেখানে সে অর্থ খাটে না, সেখানে উহার অর্থান্তর বুঝিতে হয়। "সাধ্য-নির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা" এই সূত্রেই প্রথমতঃ মহর্ষি গোতমের "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগটি চিন্তা করিয়া দেখুন। অন্যান্য সূত্রে এ কথা বলিয়াছি। ফলতঃ পর্ব্বত প্রভৃতি ধর্ম্মীকে বহ্নি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট রূপে সাধন করা হয়—অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের দ্বারা বহ্নি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট রূপে পর্ব্বত প্রভৃতি ধর্ম্মীও সাধিত হয়। পর্ব্বতাদি পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও বহ্নি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট রূপে তখন সিদ্ধ নহে, সুতরাং ঐভাবে ঐ ধর্ম্মীকেও সাধ্য শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহর্ষি তাহাই করিয়াছেন। তবে প্রতিজ্ঞাদি-সূত্রে সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী পর্য্যন্তই সাধ্য শব্দের দ্বারা তিনি ধরিয়াছেন, এখানে কেবল "ধর্ম্মী" অর্থাৎ অনুমানের পক্ষই ধরিয়াছেন। কারণ—উপনয়বাক্যে কেবল পক্ষই লাগিবে। এখন দেখুন, সাধ্যের অর্থাৎ পক্ষের "তথা" এইরূপে উপসংহার কি? "তথা" এই কথার দ্বারা বুঝা যায়—সেইরূপ। সেইরূপ বলিলে পূর্ব্বের কথা মনে করিতে হয়। পূর্ব্বে—উদাহরণের দ্বারা এ পর্য্যন্ত বুঝা গিয়াছে যে, মহানস বহ্নিব্যাপ্য-ধূম-বিশিষ্ট। সুতরাং—পক্ষও (পর্ব্বত ও) "তথা" ইহা বলিলে বুঝাগেল পক্ষও (পর্ব্বতও) বহ্নিব্যাপ্য-ধূম-বিশিষ্ট। উদাহরণবাক্যের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহার উপসংহার করা হইল। যে বাক্যের দ্বারা ঐ উপসংহার করা হইল, তাহাই উপনয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—উপসংহার করা হয় যাহার দ্বারা তাহাই উপসংহার। বৃত্তিকার বলিয়াছেন—"উপসংহার উপন্যাসঃ" অর্থাৎ বচন। মূলকথা উপসংহার এখানে বাক্যই। কারণ উপনয়, ন্যায়বাক্যের অবয়ব—একটী বাক্যবিশেষ। প্রকৃত উদাহরণের দ্বারা উপদর্শিত যে ব্যাপ্তি, ঐ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতু, ঐ হেতুবিশিষ্ট যে পক্ষ; ঐভাবে পক্ষবিষয়ক শাব্দবোধের জনক ন্যায়াবয়বই উপনয়, ইহাই উপনয়-বাক্যের নিকৃষ্ট লক্ষণ। "তথা" শব্দের দ্বারা সূত্রকার এই লক্ষণেরই সূচনা করিয়াছেন। এই উপনয়ও উদাহরণের ন্যায় অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী নামে দ্বিবিধ। কারণ উপনয় যে উদাহরণাপেক্ষ, সেই উদাহরণ দ্বিবিধ। "তথা" এই ভাবে পক্ষের উপসংহারই অন্বয়ী উপনয়। "ন তথা" এই ভাবে পক্ষের উপসংহারই ব্যতিরেকী উপনয়। অন্বয়ী উদাহরণের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি বুঝিয়া, অন্বয়ী উপনয়ের দ্বারা অন্বয়-পরামর্শ

হয়—এবং—ব্যতিরেকী উদাহরণের দ্বারা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি বুঝিয়া, ব্যতিরেকী উপনয়ের দ্বারা ব্যতিরেক-পরামর্শ হয় (৫ম সূত্রের টীকা দেখুন) এইজন্য বলা হইয়াছে "উদাহরণাপেক্ষঃ"। অন্বয়ী উপনয় দেখাইয়াছি, এখন ব্যতিরেকী উপনয় দেখাইতে হইবে। ব্যতিরেকী উদাহরণটা মনে করুন। জীবন-বিশিষ্ট শরীর সাত্মক, কারণ তাহাতে প্রাণাদিমত্ত্ব আছে—এখানে "যথা ঘটঃ" এই ভাবে ব্যতিরেকী উদাহরণের প্রয়োগ করিলে, তাহার দ্বারা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি উপদর্শিত হয়। শেষে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-হেতুমান্ বলিয়া পক্ষকে বুঝিলেই প্রকৃত সাধ্যের অনুমান হয়। পক্ষকে ঐভাবে বুঝাই "ব্যতিরেক পরামর্শ"। ঐস্থলে "যথা ঘটঃ" এইরূপ বাক্য বলিয়া—"জীবন-বিশিষ্টশরীরং নতথা" এইপ বলিলে জীবনবিশিষ্ট শরীর ঘটের ন্যায় প্রাণাদিশূন্য নহে, ইহা বুঝা যায়। যাহা সাত্মক নহে, তাহা প্রাণাদিযুক্ত নহে, এই ভাবে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির জ্ঞান হইয়াছে; তাহাতে প্রাণাদি, সাত্মকত্বের ব্যাপ্য ইহা বুঝিয়াছি। ঐ ব্যাপ্য ধর্ম্ম প্রাণাদি, পক্ষে আছে, এতদ্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিলেই তখন তাহা উপনয়বাক্য হইবে। বৃত্তিকার বলেন—ইহাতে "তথা এবং নতথা" এইরূপ শব্দ-প্রয়োগই করিতে হইবে—এমন কোন কথা নাই। উদাহরণের দ্বারা যেরূপ ব্যাপ্তি উপদর্শিত হয়, ঐ ব্যাপ্তি-বিশিষ্টহেতুমান্ পক্ষ—এই রূপ শাব্দবোধ যে বাক্যের দ্বারা হইতে পারে, তাহাই উপনয়। পর্ব্বতে ধূমহেতুক বহ্নির অনুমানস্থলে "তথাচ অয়ং" অথবা "বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চ অয়ং" এইরূপ বাক্য উপনয় হইবে। আবার ঐ ব্যতিরেকী উদাহরণ প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ "যেখানে বহ্নি নাই সেখানে ধূম নাই, যেমন দৃশ্যমান বৃক্ষাদি" এইরূপ উদাহরণ প্রয়োগ করিলে "পর্ব্বতো নতথা" কিম্বা "অয়ং নতথা" কিম্বা বহ্ন্যভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিধূমবাংশ্চ অয়ং" এই রূপ বাক্য উপনয় হইবে। ভাষ্যকারের মতে উপনয়ে "তথা এবং নতথা" এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ সূত্রে সেই ভাবই বর্ণিত। (৫ম সূত্রের টীকা দেখুন) ৩৮। (ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

সংশয়।

সংসারের এক রহস্যময় সামগ্রী সংশয়। সংশয় ভিন্ন প্রশ্ন হয় না, প্রশ্ন ব্যতীত উত্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—তত্ত্বনির্ণয় হয় না। ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যগণ তত্ত্ববিচারের পাঁচটী উপকরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রথম বিচার্য্য বিষয়, তারপর তাহাতে যে সংশয়, তারপর প্রশ্ন বা পূর্ব্বপক্ষের উদয়, তারপর উত্তরপরিচয় অবশেষে সঙ্গতিনির্ণয়—এইরূপে বিচারিত ও সিদ্ধান্তিত হওয়ার পরেই যুক্তি-শাস্ত্রের "কষ্টিপাথরের" হাত এড়ান যায়। সংশয় উপকরণ বটে, অবস্থাবিশেষে উপসর্গও বটে। সংশয়ে যেখানে সমাপ্তি, সেখানে পরিণাম ক্ষতি। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" ভগবানেরই কথা। সংশয় চাই, আবার সংশয়-নিরাসও চাই। অন্যথায় সংশয়ের কাছে

উপকারের প্রত্যাশা নাই। সংশয় বিনষ্ট হইয়াই যথার্থ উপকার করে। বিচারক্ষেত্রে সংশয়, দ্বিতীয় দধীচি। সকল সময় আমরা সংশয়ের সুফল পাই না, কারণ শেষ পর্য্যন্ত যাই না। ইহাতে সংশয়ের লেশমাত্র দোষও নাই, আমাদেরই সাধন-সম্পদের ত্রুটি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে একটী সংশয়ের কথা বলিব, সিদ্ধান্তের আলোচনাও করিব, তবে সকলের কাছে সে সিদ্ধান্তের সম্মান আছে কিনা সংশয়, সুতরাংই প্রবন্ধের শিরোনাম দিলাম "সংশয়"।

বিষয়—বাল্যবিবাহ। সংশয়—ভারতীয় সমাজের উন্নতির দিনে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল কি না? এ সংশয় বস্তুতই জটিল। নানাভাবে নানাস্থানে ইহার বিচার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্র হইতে সুরু করিয়া চিকিৎসকগণের মত পর্য্যন্ত এ বিচারে আলোচিত হইয়া থাকে। সেরূপ আড়ম্বরের অবতারণা এখানে অসম্ভব। কেবলমাত্র একটী প্রমাণই এখানে বিবেচিত হইবে।

ভারতের রত্নভাণ্ডাররূপ মহাগ্রন্থ রামায়ণে যে কোশল বিদেহ প্রভৃতির উন্নত সভ্যতার চিত্র আছে, জগতের খুব অল্প গ্রন্থেই তাহার প্রতিরূপ চিত্র পাওয়া যায়। রামায়ণ-বর্ণিত কোশল-সভ্যতা যেন পৃথিবীকে ছাড়িয়া উপরে উঠিতে অগ্রসর! রামায়ণবর্ণিত সভ্যতার সহিত অলৌকিকতা বা অতিরঞ্জনের সম্পর্ক নাই, সমস্তই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ধর্ম্ম, নীতি, লোকশিক্ষা, রণদীক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য সবই যেন সে সময় সমুন্নত! সমাজ তখন ধনে, জনে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, দৃষ্টান্তে, সিদ্ধান্তে, উচ্চতর সোপানে অবস্থিত! নীতি ও চরিত্রের বলে সে সমাজের নায়কগণ সমগ্র জগতের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। রাম সীতার তুলনা বুঝি এজগতে মিলে না! রামায়ণ-বর্ণিত সময়, ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বলস্তর। এই ভারতগৌরব রামায়ণের জগদ্বন্দ্যা সীতারও বাল্য-বিবাহই হইয়াছিল। কথাটা অবিশ্বাসের নয়।

বাল্মীকীয় রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে পরিব্রাজকরূপী অতিথি রাবণের প্রশ্নের উত্তরে জানকী, নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন দেখা যায়। ব্রাহ্মণবেশধারী রাবণ, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, জানকী প্রত্যুত্তর দিতে কিঞ্চিৎকাল ইতঃস্তত করিয়া পরে "ব্রাহ্মণশ্চাতিথিশ্চৈষ অনুক্তো হি শপেত মাম্।" অর্থাৎ ইনি ব্রাহ্মণ এবং অতিথি, উত্তর না দিলে শাপ দিবেন,—ভাবিয়াই নিজেদের আগাগোড়া পরিচয় দিয়াছিলেন। অত্যন্ত অযোগ্যভাবে অল্পবয়সে তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন,—ইহা বুঝাইবার জন্য জানকী, স্বামীর ও নিজের বয়সেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অষ্টাদশহি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে।" আমার জন্মাবধি অষ্টাদশবর্ষ অতীত হইয়াছে। টীকাকার লিখিয়াছেন—"মম জন্মতঃ বনপ্রবেশসময়ে অতীতানি ইত্যর্থঃ।" যখন তাঁহারা বনে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই সময় জানকীর বয়ঃক্রম, অষ্টাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। এখানে আমরা মোট বয়স পাইলাম, কিন্তু বিবাহের বয়স পাইলাম না। আরণ্যকাণ্ডের ঐ ৪৭ সর্গে পূর্ব্বেই জানকী বলিয়াছিলেন "উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূনাং নিবেশনে। ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী।" অর্থাৎ ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের ভবনে (অযোধ্যা-রাজধানীতে) দ্বাদশবৎসর বাস

করিয়া, নানারূপ সুখ ভোগ করিয়াছি। এখানে পাওয়া গেল, জানকী দ্বাদশ বৎসর অযোধ্যায় বাস করিবার পরে বনে আসিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে—জগদারাধ্যা পতিদেবতা জানকী যখন ছয় বৎসরের বালিকা, তখনই তাঁহার বিবাহ হয়।

"সমাঃ" অর্থ বৎসর। কেহ কেহ "সমাঃ" অর্থ "মাস" বুঝেন। তাঁহাদের মতে জানকী, বিবাহের পরে এক বৎসর অযোধ্যায় বাস করিয়া, পরে বনে গমন করেন। সুতরাং ১৭ বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল,মনে হয়। এই মত ভ্রান্ত। ৪৭ সর্গের "উষিত্বা দ্বাদশসমাঃ" প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকটী এই—"তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্ঞামন্ত্রয়ত প্রভুঃ। অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ।" অর্থাৎ (দ্বাদশ বৎসর নানা সুখ ভোগের পর) ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, রাজা দশরথ, আমার স্বামী রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। এখানে স্পষ্টরূপে "ত্রয়োদশে বর্ষে" বলা হইয়াছে। অভিষেকের সময়েই ত বনগমন! অভিষেকের মন্ত্রণাটা যদি জানকীর অযোধ্যাবাসের ত্রয়োদশবর্ষে হয়, তবে দ্বাদশ বৎসর অযোধ্যায় সুখ-ভোগ করাই সঙ্গত বোধ হয়। ভোগের বেলায় ১২ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর হইলেই বা কি লাভ! যখন অযোধ্যাবাসের ত্রয়োদশবর্ষে অভিষেকের আয়োজন ও নির্ব্বাসন, তখন বনগমনকালে বা সেই বৎসরে বয়স অষ্টাদশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইলে বিবাহটা সেই ৬ বৎসরেই দাঁড়ায়।

কেবল রামায়ণে নয়, অন্য শাস্ত্রেও ইহার অনুকূল বর্ণনা আছে। রাম-চরিত্র-বর্ণনা, পুরাণাদি গ্রন্থেও আছে। শ্রীরাম-সীতা, ভারতের ধন, বাল্মীকির একার নয়। আমরা পদ্মপুরাণে দেখিয়াছি—তত্র দ্বাদশবর্ষাণি রাঘবঃ সহ সীতয়া। রমমাণাস ধর্ম্মাত্মা নারায়ণ ইব শ্রিয়া। তস্মিন্ কালে মহারাজঃ প্রীতোরামস্য সদ্গুণৈঃ। জ্যেষ্ঠং রাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ সর্ব্বনৃপাজ্ঞয়া। রাম, সীতার সহিত দ্বাদশবর্ষ অযোধ্যায় আনন্দ ভোগ করিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাজ দশরথ, রামচন্দ্রের গুণে প্রীত হইয়া, সকল রাজার আজ্ঞানুসারে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এ বর্ণনায় ১২ বৎসর অযোধ্যা-বাসের কথাই স্থিরীকৃত হয়। বিবাহের সময় সীতা অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। তদবধি দ্বাদশ বৎসর, তিনি অযোধ্যায়ই বাস করিয়াছিলেন।

বিবাহের সময় রামের বয়স ১৫ বৎসর হইয়াছিল। ১৫ বৎসরের বর এবং ৬ বৎসরের কন্যার বিবাহ হইলে, তাহাকে বাল্যবিবাহ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। জগতের অদ্বিতীয় আদর্শ-পুরুষ ধার্ম্মিক নীতিমান্ গুণবান্ জ্ঞানবান্ মহাপ্রাণ রামচন্দ্র এবং সতীশিরোমণি জনকনন্দিনীর বিবাহ যখন বাল্যবিবাহ, তখন উন্নত ভারতে বাল্যবিবাহ ছিল না—কে বলে? বাল্য-বিবাহ যদি জানকীর জীবন-গঠনে সহায়তা করিয়া থাকে, তবে তাহাকে নিন্দা করিবার অধিকার কাহার? আমরা জানি, বাল্যবিবাহের দোষ নাই, দোষ সমাজের কুশিক্ষার; দোষ উচ্ছৃঙ্খলতার, দোষ মোহান্ধ মানুষের। অনেকে বলিবেন—"এ বিষয়ে এখনও ঘোর সংশয় আছে", তাঁহারা সংশয়ে থাকুন, আমরা আপাততঃ বিদায় লই। ঐ

ব্রাহ্মণ।

বহুকাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর ব্রাহ্মণ, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও অধিক ভক্তিভাজন।" শূদ্র, সেবাব্রতে পরিপক্ক হইলে, কৃপা এবং স্নেহের পাত্র হন। বৈশ্য, কৃষি-বাণিজ্যে সুপটু হইলে, ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে জন-সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। ক্ষত্রিয়, বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া শরণাগতদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে, তাঁহার মান-সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হয়। ব্রাহ্মণ কিছুই না করিয়া কিরূপে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন, তাহা বিবেচ্য! সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ মনু, ব্রাহ্মণের জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের তাহা স্মরণ রাখা উচিত। এই অবসরে আমি তাহার উল্লেখ করিয়া রাখি।

যাহাতে কোন জীবের প্রতি হিংসা না ঘটে, ব্রাহ্মণ এইরূপ বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাপদে জীবন যাপন করিবেন। অগর্হিত কর্ম্মদ্বারা, শরীরকে ক্লিষ্ট না করিয়া, যাহাতে জীবন-যাত্রা মাত্র সম্পন্ন হয়, এরূপ ধন-সঞ্চয় করিবেন। উঞ্ছবৃত্তি, দানগ্রহণ, ভিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য এই পাঁচটি বৃত্তির পূর্ব্ব-পূর্ব্বটির অভাবে পর-পরটি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ কখনও কুক্কুর-বৃত্তি বা পরসেবা করিবেন না। জীবিকার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, কখনও সাধারণলোকের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। তিনি অজিহ্ম, অশঠ ও বিশুদ্ধ জীবিকা অবলম্বন করিবেন। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদিতে কামনাপূর্ব্বক আসক্ত হইবেন না। চিত্ত হইতে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিবেন। তিনি উৎপীড়িত হইলেও পরকে মর্ম্মভেদী কথা বলিবেন না। যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কর্ম্ম—মনেও চিন্তা করিবেন না। যে বাক্য শুনিলে লোকে উদ্বেজিত হয়, সেরূপ কথা তিনি কখনও বলিবেন না। লোকে যেমন বিষ চাহেনা, ব্রাহ্মণও তেমনি সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। লোকে অমৃত প্রার্থনা করে, তিনিও অপমান আকাঙ্ক্ষা করিবেন। যে ব্রাহ্মণ, পর কর্ত্তৃক অপমানিত হন, তিনি সুখে নিদ্রা যান, সুখে জাগরিত হন এবং সুখে বিচরণ করেন, কিন্তু যিনি তাঁহাকে অপমান করেন, তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন। মনুসংহিতার এই সমস্ত নিয়ম, বাসনানিবৃত্তির ঔষধ বলিয়া বোধ হইতেছে।

ইক্ষুদণ্ড হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে চিনি এবং চিনি হইতে মিছরির উৎপত্তি হয়। মিছরির গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণে স্বীকৃত হয়। এস্থলে এই উপমা প্রয়োজ্য হইলেও মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্যদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব-লাভে সমর্থ হয়?" তদুত্তরে ভীষ্ম কহিলেন "ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতির

ব্রাহ্মণত্ব-লাভ নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব, বারম্বার জন্ম-মৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব, তির্য্যগ্-(পশুপক্ষ্যাদি,) যোনি হইতে মনুষত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ-(অধমজাতিবিশেষ) যোনিতে উৎপন্ন হইয়া, সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শূদ্রত্ব লাভ করে, তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যত্বলাভ হয়, বৈশ্যত্ব লাভের পর এক লক্ষ অশীতি বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্বলাভ ঘটে ও ক্ষত্রিয়ত্ব-লাভের পর একশত অশীতিলক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত-ব্রাহ্মণত্ব-লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শকোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবি-ব্রাহ্মণকুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্টাশত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণ-বংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুইশত উনষষ্টিলক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয়-গৃহে জন্ম পরিগ্রহণ করে। ঐ শ্রোত্রিয়-বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাগ্বিতণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করে; ঐ সময় যদি সে হর্ষ-শোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদগতি-লাভ হয়। আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। "হে মতঙ্গ"! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্টবর প্রার্থনা কর, ব্রাহ্মণত্বলাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন।" ব্রাহ্মণ হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া মতঙ্গনামে এক চণ্ডাল-তনয়, অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এমন সময়ে ইন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া উপর্য্যুক্ত কথা গুলি বলিয়াছিলেন।" এই কারণেই বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন কিন্তু "ব্রাহ্মণ" হইতে পারেন নাই। কর্ম্ম অর্থে—শাস্ত্রসঙ্গত কর্ম্ম, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্ম নহে।

আজি কালি বর্ণ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা কেহই রক্ষা করিতে সম্মত নহে। তাহার কারণ বহুদূরে যাইয়া খুঁজিতে হইবে না; বর্ণধর্ম্ম-বিশ্বাসী মনুষ্যদিগের আচরণ দেখিলেই উহা উপলব্ধ হইবে। আবার তাহাদিগের আচরণের অভ্যন্তরে যে প্রয়াস জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শিখা ধরিয়া টানিয়া দেখ, তখনি বুঝিতে পারিবে—সকলেই জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বিপথে পদচালনা করিতেছে। যাহারা বর্ণ—ধর্ম্মের প্রভাব বহুকাল হইতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারাই ঐহিক সুখ-সাধনে অবিরত অনুরত, সুতরাং তাহারা ইহ জীবনই সার ভাবিয়াছে। অপর যত ধর্ম্ম আছে, তাহাদের এই সার বিশ্বাস যে, মানুষের এই প্রথম জন্ম, এই বিশ্ব-সৃষ্টির পর ঈশ্বর, এই মাত্র মনুষ্যজীব সৃষ্টি করিয়াছেন, সে আজি প্রায় ৬। ৭ হাজার বৎসরের কথা। ইহার জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ এই জাগতিক জীবনেই শেষ হইবে, তাহার

পরই—কর্ম্মানুসারে তাহার গতি হইবে—হয় নরক, নয় স্বর্গ; তাই এই নরক-স্বর্গের অনেক বিবরণ তাহাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে।

হিন্দু-শাস্ত্র হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস ছয় সাত হাজার বৎসরের নহে। তাহা সনাতন সত্যসিন্ধু হইতে উত্থিত হইয়া জীব-জগতে বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সেবা, সংপোষণ, রক্ষণ এবং সাধন করিতে হইলে প্রকৃতির ক্রোড়ে পরিপুষ্ট হইয়া প্রকৃতির পর পরব্রহ্মে লীন হইবার জন্য যত্ন পাইতে হইবে। তাহা একজন্মে সাধিত হইবার নহে। তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরমায়ুর প্রয়োজন। সেই পরমায়ুষ্কাল কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ। সেই কর্ম্মবন্ধনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারি বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রকরণে তাহা কেমন সুন্দররূপে সংজড়িত!

"পরমেশ্বর প্রথমে আকাশের সৃষ্টি করিলেন। সেই আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে এই পৃথিবী উৎপন্ন হইল। এই আকাশাদি ভূত সকল অবিমিশ্র, ইহাদের একের সহিত অন্য ভূত মিশ্রিত নহে। এই পাঁচটি অমিশ্র ভূতের নাম "পঞ্চতন্মাত্র"। মায়াসহিত পরমেশ্বর ইহাদিগকে লইয়া সমস্ত জগতের সৃষ্টি-সাধন করিয়াছেন। ঈশ্বরের এই মায়া আবার ত্রিগুণাত্মিকা। সুতরাং তৎসৃষ্ট পঞ্চতন্মাত্রও ত্রিগুণাত্মক। কিন্তু সেই পঞ্চতন্মাত্র ত্রিগুণাত্মক হইলেও তাহাতে তমোগুণেরই প্রভাব অধিক। এই জন্য সত্বাদিগুণের প্রভাব উহাতে প্রভূত পরিলক্ষিত হয় না। আকাশের গুণ শব্দ, কারণ-গুণ ক্রমে শব্দ, বায়ুতে উদ্ভূত হইয়াছে। তেজের নিজগুণ রূপ, জলের নিজগুণ রস, পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ। এই শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ সমাহৃত হওয়ায় পৃথিবী বহুগুণ-যুক্তা হইয়াছে। তন্মাত্রের এক একটীর সাত্বিকাংশ হইতে এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র; বায়ুর সাত্বিকাংশ হইতে ত্বক; তেজের সাত্বিকাংশ হইতে চক্ষু; জলের সাত্বিকাংশ রসনা, এবং পৃথিবীর সাত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্, ত্বকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য, রসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ, এবং ঘ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিনীকুমার (সূর্য্য-তাপ)। এই শ্রোত্রাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে পাঁচটি দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দাদি—বিষয়ের জ্ঞান সম্পাদন করে। তাহার পর সেই পঞ্চতন্মাত্রের সাত্বিকাংশ মিলিত হইয়া মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি করে। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মনের এবং বুদ্ধির অন্তর্ভূত। গর্ব্বাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ অহঙ্কার, মনের অন্তর্গত এবং অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ চিত্ত, বুদ্ধিরই অন্তর্গত। এই অন্তঃকরণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার; যথাক্রমে ইহাদের কার্য্য—সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব এবং স্মরণ।

এই মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চতুর্ম্মুখ, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শঙ্কর এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অচ্যুত। এই মন প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তৎ তদ্বিষয়ের ভোগ সাধন করেন। শ্রোত্রাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দাদি বহির্বিষয়ের ভোগ সাধন করে বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, অন্তর্বিষয় প্রকাশ করে বলিয়া তাহারা অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণরূপে কথিত হইয়াছে। ইহারা প্রকাশাত্মক বলিয়া আকাশাদির সাত্ত্বিকাংশের কার্য্য। আবার ঐ আকাশাদির পৃথক্ পৃথক্ রজঃ-অংশ হইতে পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশের রজঃ-অংশ হইতে বাক্, বায়ুর রজঃ-অংশ হইতে পাণি, তেজের রজঃ-অংশ হইতে পাদ, জলের রজঃ-অংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজঃ-অংশ হইতে উপস্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে। যথাক্রমে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি ; এবং যথাক্রমে ইহাদের কার্য্য বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ এবং আনন্দ। আকাশাদিগত রজঃ-অংশ গুলি মিলিত হইয়া প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের সৃষ্টি-সম্পাদন করিয়াছে। প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। প্রাগ্গমনশীল বায়ুর নাম প্রাণ, উহা নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান, উহা পায়ু-প্রভৃতিস্থানবর্ত্তী। সর্ব্বতোগামী বায়ুর নাম ব্যান, উহা সমস্তশরীরবর্ত্তী। কণ্ঠস্থানবর্ত্তী উৎক্রমণ-বায়ুর নাম উদান ভুক্ত, পীত অন্ন-জলাদির পরিপাককারী অর্থাৎ ভুক্ত পীত বস্তু যে বায়ুর সাহায্যে রস-রক্ত-শুক্রাদি রূপে পরিণত হয়, তাহার নাম সমান, উহা নাভিস্থানবর্ত্তী।

এই কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ও বায়ু সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়া উহারা রজঃ-অংশ-কার্য্য ; তমোগুণযুক্ত আকাশাদি হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইতেছে। আকাশাদি পঞ্চীকৃত হইলেই তাহারা স্থূলভূত বলিয়া অভিহিত হয়। পঞ্চীকরণ যথা—আকাশাদি এক একটি সূক্ষ্মভূতকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই ভাগদ্বয়ের মধ্যে তাহার প্রথম ভাগকে আবার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টয়ের দ্বিতীয় ভাগে যোজনা করিলে, পঞ্চীকরণ সম্পন্ন হয়। আকাশের প্রথম অর্দ্ধাংশকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ বায়ুর অর্দ্ধাংশে, অপর অংশ তেজের অর্দ্ধাংশে, অন্য অংশ জলের অর্দ্ধাংশে এবং অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে যোজিত করিলে,—এইরূপ বায়ুর প্রথম অংশ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক অংশ আকাশের, এক অংশ তেজের, এক অংশ জলের এবং এক অংশ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে যোজিত করিলে,—তেজ, জল ও পৃথিবীর প্রথমার্দ্ধকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের এক এক ভাগ অপর ভূত-চতুষ্টয়ের অর্দ্ধাংশের সহিত মিশ্রিত করিলে কি দাঁড়াইতেছে ?—পঞ্চীকৃত আকাশে অর্দ্ধাংশ আকাশ, দুই আনা পরিমাণ বায়ু,

দুই আনা তেজ, দুই আনা জল ও দুই আনা পৃথিবীর অংশ। এই বায়ু প্রভৃতি অপরাপর ভূতের অর্দ্ধাংশ নিজের এবং অপর অর্দ্ধাংশ অপরাপর ভূতচতুষ্টয়ের সম্মিলনে হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উক্তরূপে প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের সমাবেশ থাকিলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই ভূত বলিয়া কথিত হইবে।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে উপর্য্যুপরি অবস্থিত ভূর্লোক, ভুবর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ও সত্যলোক—এই ঊর্দ্ধস্থ সপ্তলোকের এবং যথাক্রমে অধোভাগে অবস্থিত অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল নামক অধস্থ সপ্তলোকের—ব্রহ্মাণ্ডের এবং তদন্তর্গত—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীরের এবং তদ্ভোগ্য অন্নপানাদির উৎপত্তি হয়। এই স্থূলশরীরের অপর নাম অন্নময়-কোষ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণাদি বায়ু-পঞ্চকের নাম প্রাণময়কোষ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মনের নাম মনোময়কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির নাম বিজ্ঞানময় কোষ। সংসারের মূলীভূত অজ্ঞান আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকোষ আত্মা নহে; আত্মা তাহা হইতে অতিরিক্ত। বিজ্ঞানময় কোষ, জ্ঞান-শক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপ। মনোময় কোষ, ইচ্ছা-শক্তি-মান্—করণরূপ। ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রাণময় কোষ—কার্য্যরূপ। এই শক্তিত্রয়-মিলিত প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞান-ময় কোষকে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম-শরীর বলা হয়, অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, ও দশইন্দ্রিয়সমন্বিত ভোগ-সাধন দেহ সূক্ষ্ম শরীর। অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। এই সূক্ষ্মশরীর, মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সংসারের মূলীভূত অজ্ঞানকে কারণশরীর বলা হয়। এই প্রত্যেক শরীর আবার ব্যষ্টি ও সমষ্টি-রূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জীব—ব্যষ্টি-কারণশরীরাভিমানী; ঈশ্বর—সমষ্টিকারণ-শরীরাভিমানী। সমষ্টিকারণ বা সমষ্টি অজ্ঞান বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান, তদুপহিতচৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, জগৎ-কারণ ও ঈশ্বর নামে অভিহিত। সমষ্টি-সূক্ষ্মশরীরাভিমানী বা সমষ্টি-সূক্ষ্মশরীর-উপহিত চৈতন্য সূত্রাত্মা হিরণ্য-গর্ভ ও প্রাণ বলিয়া কথিত হন। হিরণ্যগর্ভ-আদিজীব। ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরোপহিত চৈতন্য তৈজস নামে কথিত হইয়াছে। সমষ্টি-স্থূল-শরীরোপহিত চৈতন্য—বৈশ্বানর ও বিরাট্ নামে এবং ব্যষ্টিস্থূল-শরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্ব নামে কথিত হন। এখন বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র চৈতন্য, বিবিধ উপাধি যোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত হইতেছেন, বস্তুগত্যা ইহাদের কোন ভেদ নাই।"

এখন বুঝা যাইবে, উপরোক্ত ভীষ্ম-দেবকথিত মহাভারতীয় উপাখ্যান কত-দূর যুক্তিসঙ্গত! পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে যে শরীরসৃষ্টি, তাহা চারি ভাগে বিভক্ত; উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। ইহারই ক্রমোৎকর্ষে জরায়ুজের মধ্য দিয়া মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের সমাবেশ

ধার্য কলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই ভূত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। তাহার পর উদ্ভিজ্জ হইতে জরায়ুজ পর্য্যন্ত জন্মান্তরে উৎকর্ষ লাভ করিয়া মনুষ্য-পদবীতে উন্নীত হইয়া, সেবা, কৃষি এবং বলবর্দ্ধনের উপযুক্ত হইয়া, উন্নত হইতে উন্নততর ব্রাহ্মণশ্রেণীতে সমুন্নীত হইয়া মনুপ্রোক্ত ব্রাহ্মণাচার অবলম্বন করত মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে। এই জন্যই এই শ্রেণী-বিভাগ সর্ব্বজীবের হিতকর। হায়! কবে এই কথা বর্ত্তমানকালের ব্রাহ্মণেরা বুঝিতে পারিবেন!

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বহু-গবেষণার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে উপর্য্যুক্ত বিধানের অনুকূল। তাঁহারা বলেন, "পঞ্চতন্মাত্র ক্রমবিকাশ সূত্রে একীভূত হইতে কোটি কোটি বৎসরের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার পর সেই তরল প্রকৃতি ঘনীভূত হইতেও কোটি কোটি বৎসরের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার পর এই জগৎ, জগদাকারে উদ্ভাসিত হইয়া, কোটি কোটি বৎসর জীব-সঞ্চারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার পর প্রাণী উদ্ভিজ্জ রূপে তদুপরি উদ্ভূত হইয়া, তাহাকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও স্থিতিস্থাপক করিয়া তুলে। তখন স্বেদজ-প্রাণীর উৎপত্তি হয়। সে কালেরও কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হইলে অণ্ডজ প্রাণীর উৎপত্তি হয়। সেকালের ও কোটি কোটি বৎসর অতীত হইলে, তবে প্রাণি-জগতের রাজা মনুষ্য, জরায়ুজ শ্রেণীর মধ্য দিয়া আগত হয়।" এই আগত মনুষ্যের আদিকাল পুরুষদশা। তাহারা এই অধম যোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর অতি নিকৃষ্ট ভাবে কাল-যাপন করে। তাহার পর তাহারা শূদ্রযোনির মধ্য দিয়া, বৈশ্য-ক্ষত্রিয় যোনি-চক্রে কোটি কোটি বৎসর ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ-যোনিতে উপনীত হয়, তাহার পর কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া, ব্রত-নিয়ম-যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করিতে করিতে শ্রোত্রিয়-কুলে সমাগত হইয়া কোটি কোটি বৎসর তপস্যা করত ব্রহ্মগতি লাভ করে। এ সমস্তই জ্ঞানকর্ম্ম গত অবস্থা ভেদের পরে প্রতিষ্ঠিত।

এই ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া মহাত্মারা ঋষিপদ-বাচ্য হইয়াছিলেন। ঋষি মুনি, তপস্বী, শাস্ত্রকার আচার্য্য। তাঁহারা দিব্য-চক্ষু লাভ করিয়া তখন মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেন। তাঁহাদের অনেকেই সুরাসুরগণের পৌরোহিত্য করিতেন। বৃহস্পতি, শুক্র, প্রভৃতি মনুষ্যগণ, ইহাদিগের আদিপুরুষ মনু—ব্রহ্মার পুত্র। তিনি প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশ রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, বেদসাবর্ণি ইন্দ্রসাবর্ণি এই চতুর্দ্দশ মনু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে সপ্তম বৈবস্বত মনুর রাজত্ব-কাল চলিতেছে। ইহাঁদিগের অসীম প্রভাব সর্ব্বত্র প্রচারিত। রাজগণ ইহাঁদিগের আজ্ঞাকারী ছিলেন। তাঁহারা ইহাঁদিগের মন্ত্রণা উপদেশ কদাচ অবহেলা করিতে পারিতেন না। তাহা না করিয়াই শত শত নরপতি, সুখে ও সম্পদে

রাজ্যপালন করিয়া, কীর্ত্তিমান্ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রের বৃহস্পতি, শ্রীরামচন্দ্রের বশিষ্ঠ, জনকের শতানন্দ, যুধিষ্ঠিরের ধৌম্য জগদ্বিখ্যাত। তাহার পর যুগে যুগে যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপও সামান্য নহে। এইজন্যই ব্রাহ্মণ, পূজ্য ও ভূদেব বলিয়া সম্মানিত।

(ক্রমশঃ)

হিমারণ্যবাসী জনৈক পরিব্রাজক—



মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য—

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নটী মনুষ্যের পক্ষে অতি আবশ্যকীয়। যাঁহারা তরঙ্গে তৃণের মত সংসার-সমুদ্রে কেবল ভাসিয়া যাইতেছেন না—শুধু শৃগাল-কুক্কুরাদি ইতর জন্তুর মত আহার-বিহার-নিদ্রা-মৈথুনেই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের পরিসমাপ্তি করিতেছেন না, যাঁহারা একদিনও বিবেক-বুদ্ধির সুপরামর্শ হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই এই গুরুতর প্রশ্নটী একদিন না-এক-দিন জাগিয়াছে।

এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে পাশ্চাত্য জগৎ একরূপ বলিবেন, প্রাচ্যজাতি অন্যরূপ বলিবেন; দার্শনিক একরূপ বলিবেন, কবি অন্যরূপ বলিবেন। আমরা হিন্দু, ধর্ম্মগতজীবন জগদ্গুরু আর্য্যঋষিদিগের বংশধর; সুতরাং আমরা আমাদিগের সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুসারেই উহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীর সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই সর্ব্বকালেই এই গুরুতর প্রশ্নটী লইয়া চিন্তা করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য—"কর্ম্ম"। কেহ বলিয়াছেন—"জ্ঞান"। কেহ বলিয়াছেন—"কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি পার্থিব ঐশ্বর্য্য"। কেহ বলিয়াছেন—"আহার-বিহারাদিজনিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি"। এইরূপ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত এ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুজাতির গবেষণা সুদূরপ্রসারিণী। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের উত্তর স্বাভাবিকরূপেই স্বতন্ত্র ও গুরুগম্ভীর—অর্থযুক্ত। যে জাতি অধ্যাত্মতত্ত্বধারণায় আজও জগতের গুরু, সে জাতির মুখে এপ্রশ্নের যেরূপ উত্তর আশা করা যায়, সেইরূপ উত্তরই হিন্দুজাতি দিয়াছেন।

দেখা যাউক্, এ প্রশ্নের উত্তরে হিন্দুশাস্ত্র কি বলেন? ঐ শুন, জলদ-গম্ভীর স্বরে পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া, হিন্দুঋষি বলিতেছেন "মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য—ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার-লাভ।" ভগবান্ জিনিসটী কাল্পনিক নহে, সাম্প্রদায়িক নহে,—প্রলাপ নহে, অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে প্রতারিত করিবার একটী কৌশলময় ঐন্দ্রজালিক রহস্যও নহে। ভগবান্ জিনিসটী হাড়ে হাড়ে সত্য। ইঁহাকে বুঝিতে হইবে, ইঁহাকে দেখিতে হইবে, ইঁহার সহিত মিশিতে হইবে, ইঁহাকে সর্ব্বদা পাইতে হইবে—ইহাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই মনুষ্য-জীবন সার্থক হইল, কঠোর জঠর-যন্ত্রণার শেষ হইল, ও নির্ব্বাণ—মুক্তি—ব্রহ্মপদ, আয়ত্ত হইল, বুঝিতে হইবে।

জন্ম-মরণরূপ চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে, ক্ষণবিধ্বংসী পাঞ্চভৌতিক দেহে যদি এই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লওয়া যায়, যদি সেই সচ্চিদানন্দঘনরূপ সন্দর্শন করা যায়, তবে তাহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ভগবানকে লাভ করা—যদি মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হইল, তবে কি সংসার-ধর্ম্ম স্ত্রী-পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বিপিনে বা গিরি-গহ্বরে যাইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে কর্ম্মাদি—পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে? কখনই না। ভগবান্ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন নাই। পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

গীতা ৩য় অঃ, ৮।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র জগৎকেই উপদেশ দিতেছেন যে,— "সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবে। কর্ম্ম না করিলে জীবন-ধারণ পর্য্যন্তও চলিতে পারে না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে হইলে, সন্ন্যাসী সাজিবার প্রয়োজন নাই। সাংসারিক কাজ কর্ম্ম, ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল নহে। পুত্র কলত্র-পরিবেষ্টিত থাকিয়া ও বিষয়-সম্পত্তিতে ব্যাপৃত থাকিয়াও, ভগবচ্চিন্তা—ভগবদারাধনা চলিতে পারে এবং ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে। ভগবদুক্তিতে প্রতিপন্ন হইল—কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না। তাই বলিয়া, কর্ম্ম, জীবনের উদ্দেশ্য নহে। কর্ম্ম, ভগবৎসাধনের প্রথম ক্রম। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে, জ্ঞানোদয় হইবে; জ্ঞানোদয় হইলে, ভগবদ্দর্শন ঘটিবে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান, জীবনের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মাত্র।

কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ তাই বলিয়াছেন,—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি"

গীতা ৪র্থ অঃ, ৩৮।

"যোগসংসিদ্ধ" অর্থাৎ কর্ম্মযোগদ্বারা সিদ্ধ হইলে কালক্রমে আত্মজ্ঞান-লাভ হয়। জ্ঞানলাভ হইলেই কৈবল্যমুক্তি-প্রাপ্তি—ঈশ্বর-দর্শন হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যম্"

"জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্যমুক্তি হইয়া থাকে"

অতএব, ভগবদ্বাক্যে জানা গেল যে, কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞান হইবে না। এখন "কর্ম্মযোগ" বুঝা দরকার। সাধারণভাবে আহার-বিহারাদি ক্রিয়াকলাপের নাম "কর্ম্ম"। ইহা জীবমাত্রেই সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ কর্ম্ম লক্ষ্য নয়। যে কর্ম্মের ফল ভগবানের উপর ন্যস্ত, কর্ত্তা যে কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহাই "কর্ম্মযোগ"। জীব, কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া বদ্ধ হয়; ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়। "কর্ম্ম" ভগবৎ-সাধনার প্রতিকূল, আর, "কর্ম্মযোগ" ভগবৎ-সাধনার অনুকূল। তাই, ভগবান্ কর্ম্মযোগের অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মের উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥
গীতা ৩য় অঃ, ৩০।

"তুমি আমাতে কর্ম্মরাশি সমর্পণ-পূর্ব্বক কামনা, মমতা ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর।"

কর্ম্মরাশি ভগবানের উপর ন্যস্ত করা অর্থই কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। তুমি কর্ম্ম করিতেছ, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতেছ না—এ ক্ষেত্রে তোমার কর্ম্ম, কর্ম্মযোগ হইল না। কর্ম্মযোগ না হইলে, তদ্দ্বারা জ্ঞানলাভ হইল না; সুতরাং ভগবদ্দর্শনও হইল না। ফল-কামনাই অনর্থের মূল। কারণ, কামনাতেই জ্ঞান আবৃত হয়। ফলে জ্ঞানের স্নিগ্ধকারিণী, পাপতোষিণী, কৌমুদী-বিমলা জ্যোতি প্রতিভাত হইতে পারে না। তাই, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শোমলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য-বৈরিণা
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥
গীতা ৩য় অঃ ৩৮। ৩৯

"যেমন ধূম অগ্নিকে; ও রজঃরূপ মল দর্পণকে আবৃত করে, এবং যেমন জরায়ু-চর্ম্ম, গর্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ কাম, জ্ঞানকে আবৃত করে"।

"হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলোপম কাম, জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে।"

অতএব, এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে কামনা, জ্ঞানের আবরক ও জ্ঞানীর শত্রু। সুতরাং, কামনাই ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়। আমাদিগের কার্য্য যদি কামনাশূন্য হয়, যদি আমরা মাত্র কর্ত্তব্যানুরোধে ও কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করিতে পারি, কর্ম্মের ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, সে বিষয়ে দৃক্‌পাত না করি, তবেই আমাদিগের কর্ম্ম, কর্ম্মযোগ হইবে, ও মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনের অনুকূল হইবে।

ভগবান্ যন্ত্রী, আমরা তাঁহার হস্তে যন্ত্র-স্বরূপ। তিনি আমাদিগের দ্বারা কর্ম্ম করাইতেছেন, তাই আমরা করিতেছি। স্বাধীন-বুদ্ধিতে বা স্বাধীনভাবে আমরা একটী পদও অগ্রসর হইতেছি না। এতদ্বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়, তাহাই ভগবানের উদ্দেশে করা হইল, বুঝিতে হইবে। ভগবদুদ্দেশে এবম্প্রকার কর্ম্ম করিলে, তাহা বন্ধনের কারণ, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কারণ ও ভগবদ্দর্শনের প্রতিকূল হইতে পারে না। আর ভগবানের কথাটিও মনে আনিলাম না, অথচ "অহংমমেতি" জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলাম, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! তাই, ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্ত-সঙ্গঃ সমাচর ॥
গীতা ৩য় অঃ, ৯।

"মনুষ্যগণ ভগবদারাধনার্থ কর্ম্ম না করিয়া অন্যথা অনুষ্ঠান করায় বন্ধন-দশাগ্রস্ত হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয় তুমি ফল-কামনা-রহিত হইয়া ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।" নিত্য-নৈমিত্তিক-কার্য্যানুষ্ঠানকালে তুমি যদি মনে কর যে, তুমি ভগবৎ-প্রেরিত হইয়াই তাঁহারই কার্য্য করিতেছ, তাহা হইলে অহংমমেতিরূপ মোহ, তোমার হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারিবে না, এবং কামনাশূন্য হওয়ায়

তোমার কর্ম্মসমূহ কর্ম্মযোগে পর্য্যবসিত হইবে, সুতরাং নির্ম্মল আত্মজ্ঞানের দিব্য জ্যোতিতে হৃদয় উদ্‌ভাসিত হইবে।

কামনাশূন্য, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, ভগবদুদ্দেশে কৃত কর্ম্মই "কর্ম্মযোগ"। কেবল মাত্র জ্ঞান-গরিষ্ঠ হিন্দুজাতিই এই কর্ম্মযোগতত্ত্ব অবগত আছেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই আধ্যাত্মিক বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যাঁহারা কর্ম্মকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম সমুদ্রের উপর ভাসিয়াছেন মাত্র। কর্ম্ম সমুদ্রের গভীর নিম্নদেশে যে কর্ম্মযোগরূপ অমূল্যরত্ন নিহিত আছে, তাহা তাঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন। সে রত্ন, কেবল হিন্দুজাতিই উদ্ধার করিয়াছেন। কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মযোগ অধিকতর মূল্যবান এবং কর্ম্মযোগাপেক্ষা জ্ঞান আরও মূল্যবান্। জ্ঞানাপেক্ষা ভগবদ্দর্শন অধিক স্পৃহনীয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান, জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অথবা ভগবদ্দর্শনের সোপানপরম্পরামাত্র। মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য এবং শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যই—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভ।

কর্ম্মযোগ যদি জানা থাকিল, অর্থাৎ কামনা, বাসনা, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যদি কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করা গেল, তবে ভগবদ্দর্শনের পথ সুগম হইল। কর্ম্মযোগী পুরুষ, জনক-নারদ-শুকাদির মত নির্লিপ্ত, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন-কর্ম্মকৃৎ ॥
গীতা ৪র্থ অঃ, ১৮।

"যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগযুক্ত ও সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা"

কর্ম্ম করিয়াও যদি মনে আসক্তি না রহিল, তবে সে—ই নৈষ্কর্ম্ম্য বা কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মযোগ বা অকর্ম্ম। আর গহন কাননে যাইয়া, বাহিরে সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া, চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে পুত্র কলত্র, বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতির চিন্তা-প্রবাহ চলিতে লাগিল কিম্বা কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ-তরঙ্গে চিত্ত তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। তখন বাহিরে কর্ম্ম না করিয়াও কর্ম্মজালে জড়িত হইলাম। এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া কামনা-ত্যাগ সহকারে কর্ম্ম করিতে হইবে। এবম্প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানই আত্মজ্ঞানলাভের অনুকূল।

কর্ম্ম যেমন মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে, জ্ঞানও তদ্রূপ জীবনের লক্ষ্য নহে। কিন্তু সাধন-মার্গে জ্ঞান দ্বিতীয় সোপান, সুতরাং, কর্ম্মযোগ হইতে পবিত্রতর। তাই, ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"
গীতা ৪র্থ অঃ, ৩৮।

"ইহলোকে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নাই"।

শ্রুতিও বলিয়াছেন যে—"জ্ঞানেই মুক্তি"। "জ্ঞানের" তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। আমরা বলিয়া থাকি যে, অমুকের "ভাষায়" বা "গণিতে" দিব্য "জ্ঞান" আছে। শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের এরূপ অর্থ নহে। কর্ম্ম-যোগাভ্যাসে

যে জ্ঞান আবির্ভূত হয়, যাহা কৈবল্যপ্রদ ও ভগবদ্দর্শনের সাধনভূত, তাহার অর্থ অন্যরূপ। "জ্ঞান" বলিতে "আত্মজ্ঞান" বুঝিতে হইবে। জীবে ও ব্রহ্মে যে অভেদ-বুদ্ধি, তাহাকেই জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি নামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। মনুষ্যের পাপক্ষয় হইলেই এই অভেদবুদ্ধির উদয় হয়;—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ"

"পাপকর্ম্ম ক্ষয় হইলেই মনুষ্য, জ্ঞানাধিকারী হয়।"

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্॥
গীতা ৩য় অঃ, ৪১।

"হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া, সর্ব্বপাপের মূলীভূত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট কর।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কামনাকে বিনাশ করিলেই অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলেই সকল পাপের মূল বিনষ্ট হইবে, আত্মজ্ঞানেরও শত্রু যাইবে। সুতরাং ব্রহ্মবোধিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইবে। এখন দেখিতে হইবে, এই আত্মবোধিনী বুদ্ধি আমাদিগকে কোথায় লইয়া যায়! ইহা মুক্তির নিকট লইয়া যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করায়; সুতরাং ঐ ব্রহ্মদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।

কপিল মুনি যে বুদ্ধিতে স্পর্দ্ধা-সহকারে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়া উঠিলেন, শাস্ত্রানুসারে তাহাকে জ্ঞান বলিতে পারি না। নিউটন যে বুদ্ধিতে "মাধ্যাকর্ষণ শক্তি" আবিষ্কার করিলেন; কালিদাস যে বুদ্ধিতে "কুমার-সম্ভব" লিখিলেন; ষ্টীফেন্‌সন্ যে বুদ্ধিতে বাষ্পীয়রথ আবিষ্কার করিলেন, সে বুদ্ধিকে জ্ঞান বলা যায় না, কারণ, সে বুদ্ধি ব্রহ্মবোধিনী নহে। সে বুদ্ধি ভগবৎ-সাধনার অনুকূল নহে। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন আত্মজ্ঞানী পুরুষ কালিদাস বা নিউটন অপেক্ষা অধিকতর মাননীয়। একজন সম্রাট্ অপেক্ষা একজন সন্ন্যাসী অধিকতর সৌভাগ্যবান্; কেননা সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানী, কর্ম্মযোগাভ্যাসী; সুতরাং তিনি হয়, ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, না হয় ব্রহ্মদর্শনের পথে দাঁড়াইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; আর, সম্রাট্, বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া, নিতান্ত পশুর মত জীবনাতিবাহিত করিতেছেন, ও পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইয়া পড়িতেছেন। এ হিসাবে একজন সন্ন্যাসীই সম্রাট্, ও সম্রাট্ই দীন দরিদ্র। জ্ঞানদৃষ্টিতে এই হিসাবই প্রকৃত ও নির্ভুল হিসাব। সেই জন্যই দেখা যায়, দুর্ব্বাসা নারদাদি দীনবেশী তাপসগণের নিকট অমিত-ধনশালী মহাগর্ব্বিত দুর্য্যোধনাদি রাজন্যবর্গের মস্তক অবনত। সেই জন্যই, রাজা পরীক্ষিতের নিকট দিগম্বর তাপস শুকদেবের এত সম্মান। সেই জন্যই, রাণী বোডিসিয়া আ'ল্ ড্রুইড নামক সামান্য পুরোহিতের পদতলে সমাসীনা। সেই জন্যই, মৃত্যুকালে ক্রীশস্, ছোলনের পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিতেছিলেন। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্ত্রীপুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, মণি-মাণিক্য প্রভৃতি পার্থিব ঐশ্বর্য্য এবং উহাদের সম্ভোগ, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদি

পারিত, তবে কুবেরসদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী ঐ সকল সম্রাটগণ ঐপ্রকার কাতরতা প্রকাশ করিবেন কেন? অতএব, "চৌর্য্যং কৃত্বা সুখী ভবেৎ" বা "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ চুরি করিয়াও সুখী হইবে এবং ঋণ করিয়াও ঘৃত-পান করিবে—প্রভৃতি বাক্য পরিপালনীয় বা অনুসরণীয় হইতে পারে না। এই সকল বাক্য নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় বা আসুরিকভাবসম্পন্ন। স্ত্রীপুত্রাদি কামমোহাদি ইন্দ্রিয়-প্ররোচক বলিয়া আত্মজ্ঞানের আবরক; সুতরাং ভগবানের স্বরূপসাক্ষাৎকারেরও প্রতিবন্ধক। একটি ক্ষণবিধ্বংসী, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর সামগ্রীর জন্য, নিত্য অনির্বচনীয় সুখশান্তির মহাসমুদ্রসদৃশ ভগবদ্বস্তুকে হারান' বা ভুলিয়া থাকা নিতান্তই মূঢ়ের কার্য্য। তুমি যুবতীর মধুর হাসি, অনুপম রূপলাবণ্য, প্রাণোন্মাদকারী স্বপ্নময়ী কাবাময়ী ঢুলু ঢুলু আঁখিতে অমৃতময় প্রেম-কটাক্ষ দেখিয়া, আ'জ পাগল হইয়াছ! যুবতী আজ তোমার সমস্ত মনটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছে! আ'জ তোমার পতঙ্গবৃত্তি, রূপের অনলে ঝাঁপ দিয়াছে! তুমি কেন! আ'জ, পৃথিবীর প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনেতিহাসের দৈনন্দিন অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে, ঈদৃশ পতঙ্গবৃত্তির ভূরি ভূরি উদাহরণ চক্ষে পড়িবে! কিন্তু একটীবার যদি বস্তুবিচার করিয়া দেখ, তবেই রূপলাবণ্যের মোহ বিদূরিত হইয়া যাইবে। দুইশত আটখানি খণ্ড অস্থি, খানিকটা জল, খানিকটা শ্লৈষ্মিক পদার্থ, খানিকটা চর্ব্বি, শর্করা-ক্ষার, ইহাই ত মনুষ্য-শরীরের উপাদান! ইহার জন্য এত পাগল! অহো লজ্জারও কথা, পরিতাপেরও কথা! এই অকিঞ্চিৎকর, ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, পূতিগন্ধময়, কৃমিকীটের আবাসভূমি, মলমূত্র-বিজড়িত দ্রব্য-পুঞ্জের জন্য, সংমূঢ়চিত্ত হইয়া, আমরা পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে একবারও ভাবি না! অথচ, তাঁহারই সাধনা, মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য; এবং এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইব বলিয়া, জাগতিক বিবর্ত্তন ক্রমে অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া, অশেষ জঠরযন্ত্রণা সহিতে সহিতে আ'জ দুর্ল্লভ অধিকার মানবদেহ ধারণ করিয়াছি। ইহা কি কম ভ্রান্তি!—কম দুর্ভাগ্য!—কম পরিতাপের বিষয়! তাই বলিতেছিলাম, পত্র কলত্র, রূপলাবণ্য বিষয়-সম্পত্তি, এতাবদ্বস্তুনিচয় অতি ক্ষণস্থায়ী, ছায়ার ন্যায় চঞ্চল, অলীক প্রপঞ্চ। ইহা জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মণিমাণিক্যাদিও তদ্রূপ। স্বর্ণ রৌপ্য, মণি-মাণিক্যাদি সবই মৃৎপিণ্ডেরই রূপান্তর মাত্র! আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, পাথরিয়া কয়লাও যাহা, হীরকও তাহাই। মূলতঃ উভয়ই এক পদার্থ। তবে অকিঞ্চিৎকর মৃৎখণ্ডের জন্য এত বিমুক্তি কেন? যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা কি ইহাতে বিমুগ্ধ হয়েন? কখনই না। ঐ দেখ, শ্রীচৈতন্য, অলৌকিকরূপগুণ-সম্পন্না বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন! ঐ দেখ, রাজপুত্র গৌতম, রূপবতী স্ত্রীর প্রেমালিঙ্গন ছিন্ন করিয়া গেলেন! ঐ দেখ, আবার তিনি মহামূল্যবান রাজপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করিলেন! ঐ দেখ, রূপ-সনাতন অতুল ঐশ্বর্য্যের ঐন্দ্রজালিক আসক্তি ছিন্ন করিলেন!

তাই বলিতেছি, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যাঁহারা ভগবদ্বস্তু বুঝিয়াছেন, তাঁহারা এতাবৎ পার্থিব বস্তুনিচয়কে লাভের জিনিস মনে করেন না। শ্রীভগবান্‌ও তাই বলিয়াছেন,—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে
গীতা ৬ষ্ঠ অঃ, ২২।

"যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী, অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ করেন না, এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কোনরূপ দুঃসহ দুঃখেই বিচলিত হয়েন না।"

যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের এতদবস্থা হইয়া থাকে। তদ্রূপ, যাঁহারা ভগবৎ স্বরূপ পরমানন্দরস পান করিয়াছেন, যাঁহারা ভগবদ্বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারাও পার্থিব কোন লাভকেই ভগবান্ অপেক্ষা অধিকতর লাভের বস্তু বলিয়া মনে করেন না।

অতএব, প্রতিপন্ন হইল যে, কর্ম্ম, জ্ঞান, ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ধনৈশ্বর্য্য ক্ষণস্থায়ী অনিত্য বস্তু; তুচ্ছ মৃত্তিকারই রূপান্তর মাত্র। যে কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা-জড়িত, সে কর্ম্ম, বন্ধনের—জন্ম-মরণের হেতু। যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত, তাহাই ভগবৎসাধনের প্রথম ক্রম। এবম্প্রকার কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি ও পরিণামে জ্ঞানোন্মেষ হইয়া থাকে। যে জ্ঞানে ভগবদ্বোধিনী বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা, তাহাই জ্ঞান; এবং তদ্রূপ জ্ঞানই সাধন-মার্গে দ্বিতীয় ক্রম। এই জ্ঞানই মুক্তিদায়ক। কিন্তু ইহা মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ভগবদ্দর্শনই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও পরম লক্ষ্য।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

উপাসনা।

(৪) রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণ-প্রণালী।

VII.

যাহারা একান্ত মাংস-পরিত্যাগে অসমর্থ, যাহাতে অধর্ম্ম্যা হিংসাপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন না করে, তজ্জন্য তাহাদের পক্ষে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ পশুর মাংস "বৈধ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার ঐসব পশুকেও নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য বধ করিতে নিষেধ করিয়া, কেবল দেবোদ্দেশে ও পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে বধ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—যে মনুষ্য, দেবলোক ও পিতৃলোককে বিধিমতে মাংস দিয়া ভোজন না করে, সে মৃত হইয়া একবিংশতি জন্ম পশু-যোনি প্রাপ্ত হয়।

মন্দের ভাল বলিয়া যজ্ঞে দেবতার নিকট পশু "বলি" দিবার বিধান করিয়াছেন।

শ্রুতি "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" বলিয়াও পরে ব্যবস্থা দিয়াছেন "তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ" যে কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবের উদয় না হয় এবং হিংসা-প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞাদিতে পশুবধ কর্ত্তব্য। তন্ত্রশাস্ত্রও এইভাবে বলিয়াছেন—

অহিংসা পরমো ধর্ম্মো নাস্ত্যহিংসা-পরং সুখং
বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সাত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা।

ভূত-হিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ,
বলিদানং বিনা দেবি হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জয়েৎ ॥

যাঁহারা হিংসা না করিয়া পারেন না, তাঁহারা দেবোদ্দেশে বলিদান ভিন্ন অন্য সময়ে হিংসা করিবেন না। প্রাচীনগণ কখনও "বৃথা মাংস" ভক্ষণ করিতেন না। এক্ষণে "বলি দেওয়া" দোষের হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ উদর-পূর্ত্তির জন্য পশু-হিংসাতে কেহ কোন দোষ মনে করেন না। শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, দেবোদ্দেশে বলি দিলে হিংসাবৃত্তি দেবতার অর্থে নিয়োজিত হইলে, ক্রমে ভক্তি-বৃদ্ধি হইতে থাকিবে সুতরাং নিরুদ্ধ হিংসাবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। অবৈধ হিংসা অপেক্ষা বৈধ হিংসা অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক বলিয়া "অহিংসা" নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৈধ হিংসাও হিংসা। কিন্তু যাহাতে লোকে অবৈধ বৃথা হিংসা পরিত্যাগ করিয়া বৈধ হিংসাতে প্রবৃত্ত হয়, এজন্য ঐরূপ বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ ঐ অধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া বিধি-নিষেধ দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছেন। ইষ্ট-দেবের প্রতি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া বলি দিতে দিতে ক্রমে হিংসাপ্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত হইবে। সাধক যখন বলি দেয়, তখন হিংসা-প্রণোদিত হইয়া দেয় না; ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই দিয়া থাকে; কিন্তু চিত্তে রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রবল থাকা নিবন্ধন মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে না; কাজেই ঋষিগণ এইভাবে ঐ রূপ প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা সাত্ত্বিকবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের পক্ষে বলিদানের ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা নিরামিষ উপহার দিবেন।

সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।

সাত্ত্বিকী পূজা, জপ-যজ্ঞ ও নিরামিষ নৈবেদ্যে, আর রাজসিকী ও তামসিকী পূজাতে বলির ব্যবস্থা। "রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস-শোণিত সংযুতঃ"

অনেকে মনে করেন, বলি না দিলেই সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যাহার চিত্তে হিংসাবৃত্তি ও মাংসাহারের প্রবৃত্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত, তিনি বলি না দিলেও সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক নহেন। তাহার পক্ষে বলি দেওয়াই বিধি, বরং বলি না দিলে পূজার অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিবে। সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক না হইলে সাত্ত্বিকী পূজা হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বোধে যথাবিধি যে পূজা বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক পূজা বা সাত্ত্বিক যজ্ঞ কহে। ফল-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা যশোলিপ্সা দ্বারা চালিত হইয়া যে পূজা ও যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে রাজস পূজা বা যজ্ঞ বলে। আর যে পূজা বা যজ্ঞ, বিধিহীন, অন্নদান-বিহীন, মন্ত্রবিহীন ও উপযুক্ত দক্ষিণা-বিহীন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা-বিরহিত, তাহাকে তামস পূজা বা তামস যজ্ঞ বলে। আমরা কে কোন্ প্রকার পূজার অধিকারী, তাহা নিজ নিজ অন্তঃকরণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। যাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল এবং অহিংসা,

অক্রোধ, সরলতা, সর্ব্বভূতে দয়া, সত্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণরাশি দ্বারা ভূষিত হইয়াছে, তিনিই সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক।

আমাদিগকে সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রে অনেক প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে—তন্মধ্যে আহারশুদ্ধি অর্থাৎ সাত্ত্বিক পানীয় আহারের প্রতি—বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট। শাস্ত্রে যেরূপ সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা, সেই প্রকার আচারবান্ হইয়া পবিত্র ভাবে ভোজন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। আহার-শুদ্ধি হইলে তবে সত্বশুদ্ধি হইবে। "আহার-শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ" ইহা উপনিষদের উপদেশ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণং ॥

৪র্থ অধ্যায় ১৫৬ শ্লোক।

সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি আয়ু লাভ করেন এবং পুত্র-পৌত্রাদি প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার শরীরে অলক্ষণ-সূচক কোন চিহ্ন থাকিলেও তাহা নষ্ট হয়।

রজোগুণ ও তমোগুণ-সম্ভূত চাঞ্চল্য ও আলস্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া, সত্ত্বরূপ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহারই নাম শাস্ত্রাচার বা সদাচার। এই সদাচার, মানুষের ক্রিয়াভেদে অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। আহার সম্বন্ধে মহর্ষি চরকের উপদেশ এইঃ—

উষ্ণং স্নিগ্ধং মাত্রাবজ্জীর্ণে বীর্য্যাবিরুদ্ধং, ইষ্ট-দেশে ইষ্টসর্ব্বোপকরণং নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং ন জল্পন্ ন হসংস্তন্মনা ভুঞ্জীত আত্মানমভিসমীক্ষ্য সম্যক্।

(বিমান, ১ম অঃ)

পূর্ব্বভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে, পরিমিতভাবে এবং অবিরুদ্ধ ঈষদুষ্ণ স্নিগ্ধ (ঘৃতাদিযুক্ত) অন্ন, পবিত্র (গোময়াদিলিপ্ত) স্থানে মনঃপ্রীতিকর পরিষ্কৃত বাসনাদি-উপকরণযুক্ত, অতিদ্রুতও নহে, অতিশয় ধীরে ধীরেও নহে, বৃথা গল্প ও হাস্য-পরিহাস ত্যাগ করিয়া, তদ্গত চিত্তে একমনে, নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিবে।

অতিদ্রুত ও অতিধীরে ভোজন উভয়ই দোষাবহ। অতিধীরে ভোজন সম্বন্ধে চরকে এইরূপ লিখিত আছে—

অতিবিলম্বিতং হি ভুঞ্জানো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি বহু ভুঙ্‌ক্তে শীতলী ভবতি চাহারজাতং বিষমপাকঞ্চ ভবতি তস্মান্নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ ॥

(বিমান ১ অঃ)

অতিশয় ধীরে ধীরে আহার করিবে না। যাহারা অতিধীরে আহার করে, তাহারা আহারে পরিতৃপ্ত হয় না, কেবল খাইতেই থাকে। আহারের মাত্রা বাড়িয়া যায়, আহার্য্য বস্তু শীতল হইয়া যায় এবং পাচকাগ্নি বৈষম্য ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব অতিধীরে আহার করিবে না।

গোময়াদি-লিপ্ত স্থানের নাম শুনিয়া কেহ চমকিত হইবেন না। হিন্দুর চক্ষে গোময় অতি পবিত্র; তাঁহারা আবহমান কাল হইতে গোময় ব্যবহার করিয়া আসি-

হেছেন। গোময়ের নানা প্রকার গুণ ধর্ম্মশাস্ত্রে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। হিন্দুরা যে কেবল গোময় দ্বারা স্থান পরিষ্কার করেন এমত নহে; নানা ধর্ম্ম-ক্রিয়ায় গোময়দ্বারা পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) পান করিয়া পবিত্র হন। গোময় দুর্গন্ধ নিবারণ করে, নানা প্রকার রোগের বীজাণু নষ্ট করে এবং চিত্তে সাত্ত্বিকভাব আনিয়া দেয়। ইহা কাল্পনিক কথা নহে। পাশ্চাত্য-জগতেও এই সকল সত্যের আংশিক উপলব্ধি ঘটিতেছে। সম্প্রতি ডাক্তারী পত্র ল্যান্সেটে প্রকাশ—মাদ্রাজে আর পূর্ব্ববঙ্গে যে প্লেগের প্রভাব এত অল্প, গোময় দ্বারা তদ্দেশীয় গৃহস্থের গৃহ পরিষ্কার করাই তাহার একমাত্র কারণ। পূর্ব্ববঙ্গে কুলবধুরা প্রত্যূষে জাগ্রত হইয়া সমস্ত প্রাঙ্গণে ও অন্যান্য স্থানে "গোবর-ছড়া" দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ইংরাজি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতেছেন। স্নান না করিয়া আহার করিতে শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন। স্নান না করিলে পাচকাগ্নির বৃদ্ধি হয় না এবং তৃপ্তিলাভ হয় না।

অস্নাতাশী মলং ভুঙক্তে অজপী পূয়-শোণিতং।

সুস্থ শরীরে থাকিয়া স্নান না করিয়া যে খায়, সে বিষ্ঠা খায় এবং সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া যে খায়, সে পূয়-রক্ত খায়।

অবশ্য যাহারা আতুর, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

ন স্নানমাচরেদ্ভুক্‌ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে-জলাশয়ে॥ (মনু ৪র্থ অঃ ১২৯)

ভোজন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্নান করিবে না, পীড়িত হইলে স্নান করিবে না, মহানিশায় অর্থাৎ রাত্রি ৯টার পর ৩টার মধ্যে কিংবা বহুবস্ত্র পরিধান করিয়া, অথবা বহুবার স্নান করিবে না এবং অপরিচিত জলাশয়ে স্নান করিবে না।

স্নান অতি পবিত্রতাজনক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ, এজন্য ঋষিগণ "স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য" বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্নান আত্মার ও শরীরের কল্যাণজনক। স্নান আহারের পূর্ব্বে একান্ত আবশ্যক; কারণ আহারের সময় যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রবল থাকে, তদনুরূপ আচার অবলম্বন করিতে হইবে।—

স্নানং পবিত্রমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহং,
শরীরবলগন্ধানংকেশ্যমোজস্করং পরং॥

স্নান পবিত্রতাজনক, আয়ুর্বর্দ্ধক, শ্রমনাশক, স্বেদনিবারক, মলাপহারক, কেশবর্দ্ধক, ও পরম তেজস্কর।

যাহারা অশক্ত ও আতুর, তাহাদের পক্ষে আর এক প্রকার স্নানের অনুকল্প আছে যথা—

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ তু কর্ম্মিণাং।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ।

কর্ম্মী-ব্যক্তি স্নানে অশক্ত হইলে মস্তক না ভিজাইয়া আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা গা মুছিয়া স্নানের অনুকল্প করিতে পারেন। আহার সম্বন্ধে আরও অনেক নিয়ম আছে, তন্মধ্যে

হাত পা ও মুখ প্রক্ষালন করা একটী। ইহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। যথা—

পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাদ্ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ। কূর্ম্ম ১৮

পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ হস্তদ্বয় পদদ্বয় ও মুখ ধৌত করিয়া তবে আহার করিবে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত, নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ।

আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥ (মনু ৪অঃ ৭৬ শ্লোক)

আর্দ্রপদে ভোজন করিবে, কিন্তু শয়ন করিবে না। আর্দ্র পদে ভোজন করিলে, দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হয়।

আ'জ কা'ল ক্'চিৎ মুখ ও হাত ধুইলেও পা ধুইতে অনেকেই নারাজ। পদদেশ মোজা দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা খুলিয়া পদ প্রক্ষালন করা কুসংস্কারের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে। আহারের পূর্ব্বে দূরে থাক, মল-মূত্র-ত্যাগের পরও আর কেহ বড় একটা পদ ধৌত করেন না। বিগত ৮ মার্চ তারিখের বঙ্গবাসী নামক পত্রিকায় লিখিত ছিল—

"পা-ধোয়া। কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন—দিনের ভিতর যতবার পারা যায়—পা-ধোয়া ভাল; শুইবার পূর্ব্বেও গরম জলে পা-ধোয়া কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত পরিমাণে পা-ধোয়া যে ভাল, এদেশে আচারনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট এ কথাটা নূতন নহে। কিন্তু কালধর্ম্মে অনেক বাবু হিন্দুই ইদানীং জুতা মোজা পায়ে দিয়া পায়খানায় পর্য্যন্ত গিয়া থাকেন। এ সকল কদাচারের ফল ফলিতেছে—ফলিবেও!"

হস্ত-পদাদি ধৌত করায় নিয়ম মুসলমান্ সমাজেও বহুল ভাবে প্রচলিত আছে। আমরাই বিদেশীয়দিগের অনুকরণে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত আমাদের নিজের আচার হারাইয়া কিম্ভূত কিমাকার পদার্থে পরিণত হইতেছি। এমন কি মল-মূত্র-ত্যাগ সম্বন্ধেও আমরা শৌচাচার ত্যাগ করিতেছি। এখন মূত্র-ত্যাগের পর জল-শৌচ অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। যাঁহারা এখনও এই শৌচ ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে অন্যের অলক্ষিত ভাবে জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাছে কেহ দেখিয়া অসভ্য বর্ব্বর মনে করে, এই ভয়ে আড়ষ্ট। ইহা আমাদের অতি দুরদৃষ্ট।

হিন্দুর মতে "ধর্ম্ম" কোন আগন্তুক পদার্থ নহে। ধর্ম্ম, জীবাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ নিজস্ব বস্তু। বিহিত আচার ও সাধনা দ্বারা ইহার বিকাশ হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্মের চরমোন্নতির ফল "সোঽহং জ্ঞান" বা আত্ম-দর্শন, যাহাকে ভগবান্ মনু "বিদ্যা" নামে পরম ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন—ধর্ম্মের সহিত আহারের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। অন্ততঃ তাঁহারা, আর্য্যগণ, ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখিতেন, সে ভাবে দেখেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝেন, জানি না। যাঁহারা হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহারা পানভোজনের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই—ইহা কখনও বলিতে পারেন না। আর্য্যগণের

ধর্ম্ম, ধৃতি ক্ষমা দান বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি প্রভৃতি সত্ত্বগুণ-জনিত অন্তঃকরণের এক একটী অবস্থা বিশেষ। ভগবান্ মনু, প্রধানত দশটী ধর্ম্ম-শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের অন্তঃকরণ, ধর্ম্মের বীজস্থান, এবং এই স্থূল দেহটা তাহার ক্ষেত্র-স্থান। বৃক্ষাদির মূল বীজটী যেমন আঁটির মধ্যে নিহিত থাকে, পরে উপযুক্ত মৃত্তিকায় সংস্থাপিত হইলে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের ধর্ম্মও সেইরূপ অন্তঃকরণ-রূপ আঁটির মধ্যে বীজ-ভাবে অবস্থিতি করে, পরে আমাদের শরীরের শীতবীর্য্য সত্ত্বগুণ-প্রধান উপাদান সমূহ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিপুষ্ট হয়। যাঁহাদের দেহে সত্ত্বপ্রধান উপাদান নাই এবং অবৈধ খাদ্যাদির দ্বারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন রাজসিক ও তামসিক উপাদান সঞ্চিত হইতেছে, তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ক্রমে পোষণ অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে এবং আশানুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না। তাঁহারা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, যে জীব-দেহে এই সকল ধর্ম্মের বীজ পরিপুষ্ট হয় নাই সেইরূপ দেহ আশ্রয় করিবেন। খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অতি গুরুতর সম্বন্ধ। যে জাতীয় খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুকূল পদার্থ একেবারেই নাই, কি অতি সামান্য মাত্রায় আছে, আর অধর্ম্ম-প্রবৃত্তির পোষক পদার্থ পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই দ্রব্য ভোজন করিলে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলি প্রথম অঙ্কুর মাত্রেই মরিয়া যাইবে, অথবা অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। বস্তুর গুণ-বিচার-পূর্ব্বক সাত্ত্বিকপদার্থবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করাই কল্যাণকামী মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

ঋষিগণ অধ্যাত্মশাস্ত্রের গুরু ছিলেন। তাঁহারা যে সকল আচার ও খাদ্য, ধর্ম্ম-শক্তির প্রতিকূল, তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাত্মরাজ্যে উন্নীত হইতে হইলে তাঁহাদের বিধি-নিষেধ সম্যক্ প্রকারে পালন করিতে হইবে এবং তাঁহারা যে পথে গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে হইবে।

অবিহিত আহার দ্বারা জাতি নষ্ট হয়, এই কথাটী বহুকাল হইতে হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এখন অনেকে ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিয়া থাকেন যে "জাতি আর যাইবে কোথায় ?" যাহার যে জাতি-গত মানবোচিত স্বধর্ম্ম (ধৃতি ক্ষমা আদি) তাহা যে সকল পান আহার দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয় অথবা ক্ষীণাবস্থাপন্ন হয়, ঐরূপ পান আহার দ্বারা তাহার "জাতি" যায় বা জাতিগত ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য। ধর্ম্ম-শক্তির প্রভাবেই মানুষ মানুষ। ধর্ম্মশক্তির অভাব হইলে মানুষ ও ইতর জন্তুর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। ধর্ম্মই মনুষ্যের পার্থক্যের কারণ। এই ধর্ম্মই আমাদের মঙ্গলময় পরম বন্ধু। বৈশেষিক-দর্শনকার বলেন "যতো ঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" যাহা হইতে জীবের যাবৎ প্রকার লৌকিক মঙ্গল সাধিত হয় এবং মুক্তি লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যায় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি দান করিয়া থাকে। একজ

আর্য্যগণ যাহাতে এই ধর্ম্ম-শক্তির কিঞ্চিৎ-মাত্রও অবনতির কারণ দেখিতেন, তাহা দূরে পরিহার করিতেন। ইহা তাঁহাদের কুসংস্কার নহে। অবশ্য যাঁহারা ধর্ম্ম-শক্তির বৃদ্ধি দ্বারা পরম পদার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নহে। যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মশক্তি (বিদ্যা) লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর ধর্ম্ম-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ভাবনা নাই, কাজেই তাঁহারা বিধি-নিষেধের বাহিরে। যাঁহারা মনুকথিত "বিদ্যা" রূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই এবং অধ্যাত্মরাজ্যের নিম্ন স্তরে আছেন, তাঁহাদিগকে যাহাতে ধর্ম্মশক্তির হ্রাস-নিবন্ধন অধঃপতিত হইতে না হয়, তৎ-প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না এবং এই রূপ পুরুষের পক্ষে থাকার আবশ্যকও নাই। তাঁহাদের আচার আমাদের অনু-করণীয় নহে, কারণ তাঁহারা ভিন্ন স্তরের জীব। আর্য্য ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলেন যে, মানব জাতি নিয়ম-বিরহিত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর অবনতির দিকে অগ্রসর হইবে এবং নিরন্তর কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অসৎ কর্ম্ম করিবে। এরূপ অবস্থায় মানবের ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। একারণ আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতসাধনের জন্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ধর্ম্মশক্তির অনুকূল ব্যবস্থাগুলিকে সদাচার বা আচার নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইলে নিজের প্রিয় ভোগ্য বস্তু সমস্ত তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদ-স্বরূপ সেই সকল ভোগ করিতে হইবে এবং সকল দ্রব্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অবলম্বন করিতে হইবে। শাস্ত্র, আহার বিষয়ে যে সকল আচারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের সাহায্যকারী, এজন্য সে গুলিকে মানিয়া চলিতে হইবে। ঋষি-কথিত আচার পরিত্যাগ করিলে আত্মার অমঙ্গল হইবে এবং সত্ত্ব-শক্তির বৃদ্ধি না হওয়ায় ক্রমে রজস্তমোগুণের বৃদ্ধি নিবন্ধন আমরা বিষয়ে আরও জড়াইয়া পড়িব। সুতরাং উপাসনা-রাজ্যে রসনেন্দ্রিয়ের সংযম আবশ্যক। এই ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছাচারিতায় আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মশক্তি এক কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বলিয়া, আর্য্য ঋষিগণ এ বিষয়ে এত সাব-ধান ছিলেন। যাহা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রদ কিন্তু অন্তঃকরণের অকল্যাণ-কর, তাহা তাঁহারা দূরে পরিহার করিতেন। কারণ মনুষ্যসমাজকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ন্যায় পাশব-প্রকৃতি-সম্পন্ন করিয়া তোলা কখনও মঙ্গলময় বিধাতার উদ্দেশ্য নহে। তিনি আমাদিগকে নানা প্রকার দেবোচিত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন। যাহাতে ঐ সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাই আমাদের কল্যাণকর। ঋষিগণ

যাহা শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশক্তির অনুকূল, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে কিসে ধর্ম্মের পরিপুষ্টি হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শ্রীকালীচরণ সেন বি, এল্।

উপনিষদে যম-নিয়ম।

ভারতীয় উপনিষৎশাস্ত্র, অনন্তরত্নের ভাণ্ডার। মানবীয় শিক্ষার সমস্ত উপকরণই ইহাতে স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। কর্ম্মের কথাই বল, আর জ্ঞানের তত্ত্বই বল, যোগের উপদেশই বল, আবার ভক্তির রহস্যই বল, এখানে না আছে এমন কিছুই নাই। অনেকগুলি উপনিষদে অষ্টাঙ্গযোগের বিস্তৃত বিবরণ দেখাযায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদে বর্ণিত যম-নিয়মের কথা বলা হইবে।

মুনিবর সাঙ্কৃতি, শ্রীভগবান্ মহাবিষ্ণুর নিকট যোগতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইলে ভগবান্ প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদে তাহাই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। যোগের আটটী অঙ্গ যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। এসমস্তই সাধনমার্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সামর্থ্য-লাভের সোপান। যোগের প্রথম কথাই যম ও নিয়ম। ইহার মধ্যে শুধু সংযমেরই খেলা রহিয়াছে। শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যম এই দশ প্রকার যথা,—অহিংসা, সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়া-র্জ্জবম্। ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চৈব যমাদশ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার, শৌচ এই দশটীর নাম যম। শ্রীভগবান্ অহিংসা প্রভৃতি প্রত্যেকটীর পৃথক্ পরিচয় দিয়াছেন। একটী সাধারণ পরিচয়, অপরটী গূঢ় পরিচয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শেষোক্ত পরিচয়ই উদ্ধৃত হইতেছে।

অহিংসার ব্যাখ্যায় শ্রীভগবান্ প্রচার করিয়াছেন—আত্মা সর্ব্বগতোঽচ্ছেদ্যোঽগ্রাহ্য ইতি যা মতিঃ। সাচাহিংসা পরা প্রোক্তা মুনে বেদান্তবেদিভিঃ। অর্থাৎ হে মুনে, সর্ব্বগত আত্মা অচ্ছেদ্য অগ্রাহ্য অর্থাৎ অবিনাশী এইরূপ যে মতি, তাহাই বেদান্তবাদিগণের মতে যথার্থ অহিংসা।

সত্য সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—সর্ব্বং সত্যং পরং ব্রহ্ম ন চান্যদিতি যা মতিঃ। তচ্চ সত্যং বরং প্রোক্তং বেদান্তজ্ঞান-পারগৈঃ। পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ, অন্য সমস্তই অসত্য, এইরূপ যে মতি, তাহাই শ্রেষ্ঠ সত্য, বেদান্তজ্ঞেরা ইহাই বলিয়া থাকেন।

অস্তেয় বিষয়ে ভগবদ্বাণী এই—আত্মন্যনাত্মভাবেন ব্যবহারবিবর্জ্জনম্। যত্তদস্তেয়মিত্যুক্তং আত্মবিদ্ভির্মহামতে। তাৎপর্য্য এই যে—হে মহামতে! আত্মায় অনাত্মভাব বশতঃ যে সমস্ত ভ্রান্তব্যবহার ঘটে, তাহা পরিত্যাগ করাই প্রকৃতপক্ষে অস্তেয়, আত্মবিদ্গণ এইরূপ বলিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্যের পরিচয়ে ভগবানের কথা—ব্রহ্মভাবে মনশ্চারং ব্রহ্মচর্য্যং পরন্তপ!

ব্রহ্মভাবে মনের ব্যায়াম বা বিচরণই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য।

দয়ার বর্ণনায় ভগবান্ বলিয়াছেন—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কায়েন মনসা গিরা। অনুজ্ঞা যা দয়া প্রোক্তা সৈব বেদান্তবেদিভিঃ। শরীর মন ও বাক্যদ্বারা সমস্ত প্রাণীতে যে আত্মবৎ অনুজ্ঞা, তাহাই বেদান্তজ্ঞদিগের দ্বারা দয়া বলিয়া কথিত হয়।

আর্জ্জব সম্বন্ধে ভগবানের বাক্য—পুত্রে মিত্রে কলত্রে চ রিপৌ স্বাত্মনি সন্ততম্। একরূপং মুনে যত্তদার্জ্জবং প্রোচ্যতে ময়া। অর্থাৎ পুত্র, মিত্র, পত্নী, শত্রু ও নিজাত্মায় সর্ব্বদা একরূপ ধারণা পোষণ করাই আমার মতে আর্জ্জব।

ক্ষমার পরিচয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন—কায়েন মনসা বাচা শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে। বুদ্ধি-ক্ষোভ-নিবৃত্তির্যা ক্ষমা সা মুনিপুঙ্গব! অর্থাৎ হে মুনিবর! শত্রুকর্তৃক দেহ, মন ও বাক্যদ্বারা পীড়িত ব্যক্তির যে বুদ্ধি-ক্ষোভ-নিবৃত্তি অর্থাৎ প্রতিশোধেচ্ছু বিক্ষুব্ধচিত্তের ধৈর্য্য-সম্পাদন তাহাই ক্ষমা।

ধৃতির পরিচয়ে ভগবানের উপদেশ—বেদাদেব বিনির্ম্মোক্ষঃ সংসারস্য ন চান্যথা। ইতি বিজ্ঞাননিষ্পত্তিঃ ধৃতিঃ প্রোক্তা হি বৈদিকৈঃ। বেদ অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই সংসারমোক্ষ সংঘটিত হয়, অন্য প্রকারে নয়, এইরূপ বিজ্ঞানের নিষ্পত্তি বা অবধারণই ধৃতি।

মিতভোজনের পরিচয়ে ভগবান্ ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—যোগানুগুণ্যেন ভোজনং মিতভোজনম্। যোগের অনুকূল চিত্তমল-শোধক সাত্বিক দ্রব্য, পরিমিতভাবে আহার করিলেই মিতাহার নিষ্পন্ন হয়।

শৌচের পরিচয়ে ভগবানের শিক্ষা—অহং শুদ্ধ ইতি জ্ঞানং শৌচমাহুর্মনীষিণঃ। আমি শুদ্ধ নির্ম্মল অপাপবিদ্ধ এইরূপ জ্ঞানই যথার্থ শৌচ। তাৎপর্য্যার্থ এই যে—মনে মলিন থাকিয়া শরীরে সপ্তসমুদ্রের সকল জল ঢালিয়া দিলেও শৌচ হয় না।

নিয়মের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন—তপঃসন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বর-পূজনম্। সিদ্ধান্তশ্রবণং চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপোব্রতম্, এতেচ নিয়মাঃ প্রোক্তাঃ। অর্থাৎ সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বরার্চ্চন, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও ব্রত এই কয়টী নিয়ম।

তপঃ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—কোবা মোক্ষঃ কথং তেন সংসারং প্রতিপন্নবান্ ইত্যালোচনমর্থজ্ঞাস্তপঃ শংসন্তি পণ্ডিতাঃ। জীবের মোক্ষই বা কি, আর কিরূপেই বা জীব, সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হয়, এই আলোচনাকে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তপ বলেন।

সন্তোষ সম্বন্ধে ভগবানের বাক্য যথা—ব্রহ্মাদিলোক-পর্য্যন্তাদ্বিরক্ত্যা যল্লভেৎ প্রিয়ং। সর্ব্বত্রবিগতস্নেহঃ সন্তোষং পরমং বিদুঃ। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তে বিরক্ত হইয়া ও সকল পদার্থে স্নেহশূন্য হইয়া, সাধক, যে প্রীতিলাভ করেন, তাহাই পরম সন্তোষ।

আস্তিক্যের পরিচয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, শ্রৌতে স্মার্ত্তে বিশ্বাসো যত্তদাস্তিক্যমুচ্যতে। শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসস্থাপন করাই আস্তিক্য।

দানের পরিচয়ে শ্রীভগবানের ঘোষণা—ন্যায়ার্জ্জিতধনং শ্রান্তে শ্রদ্ধয়া বৈদিকে জনে। অন্যদ্বা যৎপ্রদীয়েত তদ্দানং প্রোচ্যতে ময়া।

যথানিয়মে অর্জ্জিত জ্ঞান-ধন অথবা অন্য যে কিছু শ্রদ্ধাসহকারে অভাবগ্রস্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু জনকে সমর্পণ করাই আমার মতে প্রকৃত দান।

ঈশ্বরপূজনের পরিচয়ে সেই স্বয়ং ঈশ্বরই বলিয়াছেন—রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টাঽনৃতাদিনা। হিংসাদি-রহিতং কর্ম্ম যত্তদীশ্বর-পূজনম্। আসক্তি-বিহীন হৃদয়, মিথ্যাসম্পর্কশূন্য বাক্য ও হিংসাবিহীন কর্ম্মই প্রকৃত ঈশ্বর-পূজন। এখানে তাৎপর্য্যতঃ বুঝা উচিত যে, হৃদয় কামকলুষিত, বাক্য মিথ্যাজড়িত, কর্ম্ম হিংসামিশ্রিত, অথচ পুষ্প-চন্দন, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতির আড়ম্বর, আর ঢাক-ঢোলের হুড়হুড়ানী, ইহা প্রকৃত ঈশ্বরার্চ্চনা নয়, ইহাতে এক প্রকার বিড়ম্বনাই সার হয়।

সিদ্ধান্ত-শ্রবণ অর্থ বেদান্তশ্রবণ। তাহার বর্ণনা এইরূপ—সত্যং জ্ঞানমনন্তং চ পরানন্দং পরং ধ্রুবম্। প্রত্যগিত্যবগন্তব্যং বেদান্ত-শ্রবণং বুধাঃ। সত্যস্বরূপ জ্ঞানময় ও পরমানন্দ-রূপ ধ্রুব অনন্ত তত্ত্বই সেই প্রত্যক্ আত্মা, এইরূপে অবগত হওয়াই বেদান্ত শ্রবণ।

হ্রী অর্থ লজ্জা, তাহার বর্ণনায় ভগবানের অভিপ্রায়—বেদলৌকিকমার্গেষু কুৎসিতং কর্ম্ম যদ্ ভবেত। তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীঃ সৈবেতি প্রকীর্ত্তিতা। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে যাহা কুৎসিতকর্ম্ম বলিয়া কথিত ও লোকে যাহা কুৎসিতকর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত, সেই কুকর্ম্ম করিতে যে লজ্জা বোধ করা অর্থাৎ লজ্জা-বশতঃ তাহা হইতে যে নিবৃত্ত থাকা, তাহার নামই হ্রী।

মতির পরিচয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন—বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবেৎ। বেদোক্ত (ব্রহ্মমার্গীয়) সাধনতত্ত্বে যে শ্রদ্ধা, তাহাই মতি।

জপ সম্বন্ধে ভগবদুক্তি এই—কল্পসূত্রে তথা বেদে ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণকে। ইতিহাসে চ বৃত্তির্যা সা জপঃ প্রোচ্যতে ময়া। অর্থাৎ শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্রে, বেদসংহিতায় ও উপনিষদে, ধর্ম্ম-সংহিতায় পুরাণে ও ইতিহাসে বিক্ষিপ্তভাবে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিবরণ আছে, তাহার আলোচন ও অনুধ্যানই যথার্থ জপ।

নিয়মের শেষ স্তর "ব্রত" সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ এই উপনিষদে কিছুই বলেন নাই। কেহবা প্রাজাপত্য পরাক চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি স্মৃতি-বর্ণিত ব্রতগুলিকে এখানে 'ব্রত' বলিয়া বুঝিতে চাহেন, কেহ বা ব্রহ্মচারিগণের অনুষ্ঠেয় ব্রতগুলিকেই এই 'ব্রত' বলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সঙ্গত নয়। যোগীর পক্ষে উপবাসাদিরূপ স্মার্ত্তব্রত অকর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।" অধিক ভোজন বা একেবারে অনাহার, যোগের অনুকূল নয়। ব্রহ্মচারি-ব্রতগুলির ও পুনরাবৃত্তি অনুচিত। কারণ যোগীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচিন্তন মাত্রই। ব্রত অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ব্রহ্মমার্গাবলম্বী যোগী, আত্মজ্ঞানের অনুকূল অপর যে সকল সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সাময়িক সৎকর্ম্মের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবেন, তাহাই তাঁহার ব্রত। এই সমস্ত সাময়িক সৎকর্ম্মের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং ভগবান্ বলেন নাই। যোগমার্গের সহিত জ্ঞানমার্গের সমন্বয়-সাধনার্থেই উপনিষদে এই সকল লক্ষণের অবতারণা, এরূপ মনে করিতে বাধা নাই।

শ্রীঃ——

শ্রাদ্ধ-বিজ্ঞান।

"শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে"

মৃত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই শ্রাদ্ধ। ইহা পিতৃযজ্ঞ। শ্রাদ্ধান্নে পিতৃগণের পুষ্টি। শ্রাদ্ধান্ন-ভোজনে পিতৃগণ তৃপ্ত ও সুখী। ইহার মূল বিজ্ঞান না জানিয়াই নাস্তিক বলেন—

মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তি-কারকং
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েচ্ছিখাং॥

শ্রাদ্ধ যদি মৃত জন্তুর তৃপ্তি-দায়ক হইতে পারে, তাহা হইলে তৈল দানে নির্ব্বাণ প্রদীপের শিখা কেন জ্বলিয়া উঠে না? ইহারই প্রতিধ্বনি "মরা গোরু ঘাস খায় না!" ইহাত বালকেও জানে যে, মরা গোরু ঘাস খায় না; নির্ব্বাণ প্রদীপের শিখা তৈলদানে জ্বলে না।

পিতৃগণ শ্রদ্ধান্ন* দৃষ্টিপূত করেন মাত্র। এই দৃষ্টি করায় ভোজন-ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হয়, ভোজন-জন্য তৃপ্তিলাভ ঘটে। দেবগণের অমৃতপান ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধান্ন-ভোজন একই।

"ন বৈ দেবা অমৃতমশ্নন্তি অমৃতং দৃষ্ট্বৈব তৃপ্যন্তি। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

দেবতারা অমৃত পান করেন না, দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করেন মাত্র। পিতৃগণের পার্থিব শরীর নাই যে, অন্ন-ভোজনে রক্ত মাংস ত্বক অস্থি মজ্জা গঠিত হইবে! তাঁহাদের ভোজনেচ্ছা সংস্কার-বশতই হইয়া থাকে; সংস্কার-বশতই তৃপ্তি—অতৃপ্তি। সংস্কার অন্তঃকরণের সুদৃঢ় ভাবনা। এই সংস্কারজ তৃপ্তি অতৃপ্তি ব্যবহারিক তৃপ্তি অতৃপ্তির সমানই। সংস্কার, মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা; বাস্তবকে কল্পিত, কল্পিতকে বাস্তব করে। সংস্কার শূন্যের গাঁট! মনে করা যায়, তাই আছে—নচেৎ স্বরূপতঃ ইহার বাস্তবিকতা নাই। সুসংস্কার, পাপকে পাপ ও পুণ্যকে পুণ্য বোধ করায়, কুসংস্কার-পাপকে পুণ্য, পুণ্যকে পাপ রূপে দাঁড় করায়। সংস্কার-বশেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা।

সংস্কার ভাবপদার্থ। দেহীর জীবদ্দশায় যে বাসনা তৃপ্ত অতৃপ্ত থাকিয়া যায়—লিঙ্গ শরীরে তাহাই অনুবর্ত্তিত হয়। কর্ম্মানুযায়ি বাসনা, দেহীর অন্তঃকরণে চিত্রিতবৎ থাকে, পরে উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে—ইহাই সংস্কার। স্মৃতি—সংস্কারমূলক। উহা এমন দৃঢ়ভাবে দেহীর মনে সংলগ্ন থাকে যে, শত চেষ্টায় তাহার অন্যথা করা যায় না। কারণ লিঙ্গ-দেহে দেহী সম্পূর্ণ পরতন্ত্র। পার্থিব দেহে সংস্কারের অন্যথা সম্পাদন করা সাধনাপেক্ষ। এই সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ পাশ। পিতৃপিতামহাগত সংস্কারও জন্মান্তরীণ সংস্কারপাশ-ছেদন যে কিরূপ আয়াসসাধ্য, তাহা ত সকলেরই প্রত্যক্ষীকৃত। জীবদ্দশায় বিষয়-ভোগই লিঙ্গ দেহে ভোগের জনয়িতা। স্বপ্নজগৎ জগতেরই বাহ্যরূপ। বাহ্য দেহ—পার্থিব

* পিতৃগণ এস্থলে মৃত পিতৃগণ বুঝিতে হইবে।

দেহেরই অন্তর রূপ। বাহ্য জগতে যে যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-জনিত বুদ্ধি-বৃত্তি-বিশেষ—জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল; লিঙ্গ শরীরে সেই জ্ঞানেরই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

বাহ্য ও মানস ভোগ।

ভোগ দ্বিবিধ—বাহ্য ও মানস। বাহ্য ভোগের বিষয় বাহ্য জগৎ। মানস ভোগের বিষয় আন্তর জগৎ। মনের রাজ্য এই দুইটি। উভয়ই পরস্পরাপেক্ষ। কোন মতে বাহ্য জগতই অন্তর্জগতের আকারে প্রতিভাত, কোনও মতে অন্তর্জগতই বাহ্য জগদ্রূপে প্রতিভাসিত। স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ব্যবহারতঃ ভেদ-প্রতীতি সিদ্ধ। পার্থিব দেহে বাহ্য আন্তর উভয়ই বিদ্যমান; লিঙ্গ-দেহে মাত্র আন্তর বর্ত্তমান। লিঙ্গ-দেহে মাত্র আন্তর বিদ্যমান থাকায় ভোগ মানস—একবিধ।

বাহ্য ও আন্তর জগৎ পরস্পরাপেক্ষ বলিয়া বাহ্য ও মানস ভোগ পরস্পরাপেক্ষ। বাহ্য ভোগে অভ্যস্ত বলিয়াই দেহীর মানস ভোগ, আবার মানস ভোগ না হইলে বাহ্য ভোগ—ভোগই নহে। স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি পূর্ব্বানুভূত বিষয়ই অনুভব করে। সে সময়ে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকে না। অস্তিত্ব জ্ঞানেই অস্তিত্ব-সিদ্ধি। জগৎ মায়াপ্রপঞ্চ মিথ্যা স্বপ্নবৎ—এই বোধ জন্মিলে মিথ্যাত্বের সিদ্ধি। অথচ জগৎ যে ব্যবহারিক সত্য—তাহাই থাকে। স্বপ্ন অন্তর্জগতের ক্রীড়া; অন্তর্জগতের বোধই সেই সময়ে থাকে, বাহ্য জগতের প্রতীতি থাকে না। জাগ্রদবস্থায় সুপরিচিত বলিয়াই অন্তর্জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান—অস্তিত্ব-জ্ঞানে অস্তিত্ব-সিদ্ধি।

এই শ্রাদ্ধ, মানস ভোগ সম্পাদন করে। মানস ভোগ, স্থূলদেহাভ্যস্ত বাহ্যভোগের অপেক্ষা রাখে। শ্রাদ্ধ-ভোজন—মানসিক ভোজন, এতজ্জন্য পুষ্টিও মানস-পুষ্টি।

দেহবিমুক্ত আত্মার পারলৌকিক অস্তিত্বের উপর শ্রাদ্ধের প্রামাণ্য নির্ভর করে। পাপেই হউক, পুণ্যেই হউক, জীবাত্মা বদ্ধ, আপনাকে দেহস্থ মনে করে—ফলে দেহী দেহাত্মবাদী হইয়া পড়ে। স্থূলদেহ-বিমুক্ত হইলেও সূক্ষ্মদেহাত্মাভিমান যায় না বলিয়া, জীবাত্মা আপনাকে দেহবিমুক্ত ভাবিতে পারে না—সুতরাং সংস্কার বশতই সদসৎকর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

কোন কোন মতে লিঙ্গ-শরীরের অবস্থাত্রয়ের কথা শুনা যায়। (আতিবাহিক ইত্যাদি)। শ্রাদ্ধ ত্রিবিধ উপকার সাধন করে। প্রেতাবস্থা হইতে জীবাত্মার মুক্তি, স্বর্গ-নরকস্থের তৃপ্তি ও স্বানুরূপ দেহান্তর-ধারণের সহায়তা শ্রাদ্ধের দ্বারা ঘটে। প্রেতাবস্থার মুক্তি, গয়াধামে পিণ্ডদান দ্বারা হইয়া থাকে—ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। স্বর্গস্থ বা নরকস্থ দেহীর সংস্কার-বশতই তৃপ্তি; বিশেষ নরকত্রাতা বলিয়া শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য—শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। অবশ্য ভোগ কর্ম্মানুযায়িক, তথাপি মানবের সাধনা সর্ব্বত্র সুফল দান না করিলেও সম্পূর্ণ বিফল হয় না। শ্রাদ্ধ—পারলৌকিক আত্মার পাপদোষ-নিবারণার্থ চিকিৎসা-বিশেষ বলা যায়।

আত্মঘাতীর পাপদোষ দুশ্চিকিৎস্য। তবে দুশ্চিকিৎস্য রোগ যেমন কদাচিৎ আরোগ্য হয়, তদ্রূপ আত্মঘাতীরও এক-প্রকার শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা আছে; তাহা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। না করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পতিত হইবেন না।

আত্মঘাতীর প্রেতাবস্থা চির হাজত-বাস। সাধারণ প্রেতাবস্থা নির্দ্দিষ্ট হাজত-বাস। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে অনুকূল দেহ-ধারণের জন্য দেহীকে একবৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হয়। এই বৎসরের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধ মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ অত্যন্ত উপকারক।

আমরা যেমন প্রাত্যহিক ভোজন করি, পিতৃগণও তদ্রূপ ইচ্ছা করেন। ইঁহাদের এক দিন, আমাদের এক বর্ষ। বার্ষিক শ্রাদ্ধদ্বারা ঐ প্রাত্যহিক ভোজনেচ্ছা পূরণ করি।

শ্রাদ্ধ, মুক্ত আত্মার গতি সাব্যস্ত করিতে পারে না। "তস্য ন গতির্বিদ্যতে" মুক্ত আত্মা—ইন্দ্রিয় মন প্রাণকে আপ-নাতে সংহৃত ও লীন করিয়া লয়; খণ্ড চৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যে পরিণত হয়। সেই অবস্থা সদানন্দময়ী। অবিদ্যার অতীত, কাম-কর্ম্মবাসনা-রহিত মুক্ত পুরুষ, শাস্ত্রীয়-ব্যবস্থা দ্বারা চালিত হয়েন না। বংশে একজন মুক্ত হইলে ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার পায়। শ্রাদ্ধের কার্য্য আপনিই হইয়া গেল।

শ্রাদ্ধ স্থানে প্রেতের আগমন।

পিতৃগণের আবাস-স্থল পিতৃলোক। এই পিতৃলোক সুসন্তান দ্বারা জেয়। এই পিতৃলোকে যাঁহারা যুগ-পরিমিত কাল অবস্থানে অধিকারী হয়েন, তাঁহারা পিতৃ-দেবতা। পিতৃদেবগণের শরীরও বায়-বীয়—তবে সংকল্প-মূলক দেহ-ধারণ আয়-ত্তের মধ্যে। অন্তরীক্ষস্থ লিঙ্গ-দেহীকে বলের সাহায্যে আনয়ন করা অসম্ভব কেন? এ বল—আধ্যাত্মিক। ভক্তির টানে ভগবান আসেন, পিতৃদেবগণ আসিতে পারিবেন না কেন? যোগ-সাধনা ব্যতি-রেকে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মৃত আত্মা আনয়ন করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের শ্রাদ্ধবিজ্ঞানটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। মেস্‌মেরিজমে মৃত আত্মাকে সবলে অনর্থক আকর্ষণ করা অপেক্ষা, ভক্তি-পূর্ব্বক অন্নাদি সম্মুখে রাখিয়া, শাস্ত্রীয় অনুশাসনে পিতৃগণকে শ্রাদ্ধ-স্থলে আনয়ন করা ভাল নহে? মেস্‌মেরিজমে মাত্র কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার শ্রাদ্ধ করিয়া যে তৃপ্তি—সে তৃপ্তি হইবে কোথা হইতে? শ্রাদ্ধে ভক্তিবন্ধনে বাঁধা পিতৃপুরুষগণকে আবাহন করতঃ যজমান ধন্য হয়েন। শ্রাদ্ধ-কাল উপস্থিত হইলেই পিতৃপুরুষগণ সন্তান-দত্ত অন্ন-জলের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করেন। ইচ্ছা মন্ত্র ও তড়িৎ-শক্তি বলে অন্তরীক্ষস্থ পিতৃগণ বায়ুভূত হইয়া মনোগতিতে শ্রাদ্ধ-স্থলে আগমন করেন; শ্রাদ্ধান্ন দৃষ্টি দ্বারা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হয়েন। কেহ যেন ভাবিবেন না, শ্রাদ্ধান্ন গিলিয়া খাইবার জন্য ভূতযোনিকে আহ্বান করা হয়!

স্মৃতিপুরাণকার কর্ত্তৃক সমাদৃত ও বেদমূলক বলিয়াই শ্রাদ্ধের এমত মাহাত্ম্য।

ইহা পিতৃ-যজ্ঞ। সন্তানের পক্ষে দেব-যজ্ঞ অপেক্ষা এই পিতৃ-যজ্ঞ অধিক পুণ্য-কার্য্য। "দেবকার্য্যাৎ পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে" প্রেতাবস্থা হইতে মুক্তির উপায় না করা সন্তানের পক্ষে অধর্ম্ম নহে কি?

স্বর্গস্থ দেহী, সংকল্পমূলক ভোগ করিয়াও শ্রাদ্ধান্নে লালায়িত হয়েন। শ্রাদ্ধান্ন "বালির পিণ্ডও" ব্যবহৃত হইয়াছিল। নরকস্থ দেহীর যাতনায় যদি আংশিক উপশমও হয়—তাহা হইলেও শ্রাদ্ধ কত প্রয়োজনীয়? কষ্টকর রোগযন্ত্রণার উপশমার্থই ঔষধ সেব্য।

সমস্ত দেশে এই শ্রাদ্ধপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই—ইহাতে আমাদেরই গৌরব বাড়িতেছে। পাশ্চাত্যগণ ত সবেমাত্র পরলোক-তত্ত্ব, মৃত আত্মার আগমনতথ্য মানিতেছেন, দেহান্তর-প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছেন। কালে শ্রাদ্ধ-বিজ্ঞানেরও যে সমর্থন হইবে—ইহা আশা হয়।

শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা বাচিক কায়িক ও মানসিক সংযম এবং পবিত্রতার সহিত শ্রাদ্ধ-কার্য্য করিবেন। শুদ্ধাচারে না থাকিলে, মন উদ্বিগ্ন বা ক্রুদ্ধ থাকিলে মন্ত্রশক্তি আপনার কার্য্য করিবে না। পবিত্র বসন পরিয়া মুণ্ডিতশির যজমানকে পিতৃগণের আবাহন-মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। আবাহন-মন্ত্র যথা—

আয়ান্ত নঃ পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভি র্দেবযানৈঃ।
অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধা মদন্তোঽধিব্রুবন্ত তেঽবন্ত্বস্মান্॥

অনন্তমনে সমন্ত্রক চিন্তার ফলে একটি শান্ত কোমল তড়িতের সৃষ্টি হয়। যাহাতে এই তড়িতের সত্বর কার্য্য হয়, তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা আছে। কুশ, তড়িৎ আকর্ষণের পক্ষে অমোঘ উপায়। শ্রাদ্ধেও কুশাঙ্গুরীর ব্যবহার—কুশ-ব্রাহ্মণ তৈয়ারী করা, কুশ দিয়া জল ছিটান, ও কুশের উপর পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে। মৃৎপাত্র তড়িদুৎপত্তির নিবারক বলিয়া শ্রাদ্ধে ইহা অব্যবহার্য্য। কলার খোলার পরিবর্ত্তে কদলীপত্র-ব্যবহার প্রশস্ত নহে। তিল, দুগ্ধ, পায়স, মধু, মাংস, আতপ তণ্ডুল, রম্ভা, গব্যঘৃত শ্রাদ্ধের সম্পৎ।

ব্রাহ্মণ-ভোজন শ্রাদ্ধের অঙ্গ। ব্রাহ্মণ-ভোজন ব্যবস্থিত বলিয়া কেহ যেন উপহাস করিবেন না। দেশে সেরূপ ব্রাহ্মণ নাই—কাজেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের সে সার্থকতা আর নাই। দীন দরিদ্র ব্রহ্মচারী যে কেহ শ্রাদ্ধের বাড়ীতে উপস্থিত হইবে, তাহাকেই পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

"অতিথির্যস্য নাশ্নাতি ন তৎ শ্রাদ্ধং প্রশস্যতে।"

আজিকালি কাঙ্গালী-ভোজনের প্রশংসা মিত্রভোজন অপেক্ষাও অধিক। "ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রং" মিত্র—ব্রাহ্মণ হইলেও তাহা ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে না। শ্রাদ্ধে কেহ অভুক্ত হইয়া ফিরিয়া গেলে, শ্রাদ্ধ নিষ্ফল।

শ্রাদ্ধের স্থল গঙ্গাতীরই প্রশস্ত। তীর্থের মধ্যে গয়াক্ষেত্রেই শ্রাদ্ধ করার অধিক ফল। গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দান করিলে প্রেতাবস্থায় সত্বর বিমুক্তি ঘটে। অপঘাত মৃত্যুর পিণ্ড প্রেতশিলায় প্রদান করিতে হয়। বহুসন্তান সংসারে দুঃখের

নিদান, কিন্তু এই বহু পুত্রও স্পৃহনীয়—যদি তাহার মধ্যে একজনও গয়াক্ষেত্রে যাইয়া শ্রাদ্ধ—পিণ্ডদান করে—

"এষ্টব্যাঃ বহবঃ পুত্রাঃ যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ"

নৈবেদ্য বিশুদ্ধ ফলমূল, আতপ তণ্ডুল ও মিষ্টান্নাদি শ্রাদ্ধে দেয়। বস্ত্র অভাবে অনেকে গামছা দেন, তাহা অত্যন্ত দোষের। বস্ত্রের কার্য্য কি গামছাদ্বারা হইতে পারে? আপনাকে যেমন গামছা পরাইয়া লোক-সমাজে বাহির করা যায় না—তদ্রূপ পিতা-পিতামহ মাতা-মাতামহী প্রভৃতিকে গামছা পরাণ কি কর্ত্তব্য? ইহাতে পুরোহিতকে ফাঁকি দিতে যাইয়া আপনার পিতৃপুরুষগণকেই ফাঁকি দেওয়া হয়।

শ্রাদ্ধ-কার্য্যে পিতা-পিতামহাদির নামোচ্চারণ করিতে হয়; ইহাতে সন্তানোচিত ভক্তিভাব সুন্দর পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ-সময়ে যখন পিতৃপুরুষগণের নাম করিয়া নিবেদন করি—সে নিবেদনে কত সুখ!

শ্রাদ্ধে প্রতিনিধি দেওয়া সৎকল্প নহে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রকৃত অক্ষম হইলেই তবে প্রতিনিধির ব্যবস্থা। উপবাসাদি তুচ্ছ কষ্টের জন্য পুরোহিতের উপর শ্রাদ্ধ-কার্য্যের ভারার্পণ বাস্তবিকই লজ্জাকর। সন্তান স্ব-হস্তে পিতৃপুরুষকে অন্ন দিবে—ইহা অপেক্ষা প্রীতির কার্য্য কি?

শ্রাদ্ধকর্ত্তার মুণ্ডিত মস্তক, তৈলহীন রুক্ষ অঙ্গ, অনাবৃত চরণ আর কচ্ছ-শোভিত পরিচ্ছদ যেরূপ শোক, দৈন্য ও সন্তানোচিত ধর্ম্মের অভিব্যক্তি করে; কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। পতিহীনা বিধবা চিকুর-জাল কাটিয়া, অলঙ্কার গুলি অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া, শুভ্রবস্ত্রে যখন বাহিরে আসেন—সে মূর্ত্তি দেবীত্বই পরিস্ফুট করে না কি? তাঁহার পুরুষের সতৃষ্ণ চক্ষুর বশবর্ত্তিনী হইয়া সংশয়িত জীবন লইয়া বাস করিতে হয় না।

শ্রাদ্ধ প্রধানতঃ আদ্যশ্রাদ্ধ। নিত্য নৈমিত্তিক (একোদ্দিষ্ট) কাম্য, বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পার্ব্বণ ও দৈব প্রভৃতি শ্রাদ্ধও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিত্য ও কাম্য এই দুইপ্রকার শ্রাদ্ধ কাহারও মত। নিত্য কাম্য ও নৈমিত্তিক এই তিনপ্রকার শ্রাদ্ধের কথাই মৎস্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মনু পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য বৃদ্ধি ও পার্ব্বণ।

প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা নিত্য। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ—একোদ্দিষ্ট বা নৈমিত্তিক। অভিপ্রেত-সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ—কাম্য। বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি মাঙ্গলিক কার্য্যের পূর্ব্বে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়—তাহা বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ। পর্ব্ব উপলক্ষে যে শ্রাদ্ধ—তাহা পার্ব্বণ।

এতদ্ব্যতীত দেবতার উদ্দেশ্যে দৈব—আর পৌষ্টিক-কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধের নামও পাওয়া যায়।

মৃত আত্মার উদ্দেশে অশ্রদ্ধাদত্ত কোন দ্রব্যই শ্রাদ্ধ-দ্রব্য হইবে না। "শ্রদ্ধয়া দীয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধং" ইহা যেন কেহই বিস্মৃত না হয়েন।

গবী—বৃষ শ্রাদ্ধে বড়ই প্রয়োজনীয়। শ্রাদ্ধের গুণেই ভারতে বৃষ-রক্ষা হইত। এই বৃষকে "ধর্ম্মের ষাঁড়" কহে। ধর্ম্মের ষাঁড় সাধারণ-সম্পত্তি। পূর্ব্বে গবী ও ভূমিই গৃহস্থের সম্পত্তি ছিল। গবী ও ভূমি-দান শ্রাদ্ধে অত্যাবশ্যক। এক্ষণে, হাসির কথা! অনেকে ভূমি-দানের বিনিময়ে চারি আনা পুরোহিতকে দেন। গবী-দান ভাঁড়া করিয়াও নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

বলিয়াছি, লিঙ্গশরীর বায়বীয়—এই কারণে উহার গুরুত্ব নাই, পার্থিব স্থূলতাও নাই। তবে পার্থিব বায়বীয় জলীয় তৈজস—সমস্তই ত্রিবৃৎকৃত বা পঞ্চীকৃত ধরিতে হইবে। খাঁটি জল পান-যোগ্য নহে, স্থূল পার্থিবাংশে জলীয় তৈজস ও বায়বীয় ভাগের আংশিক মিশ্রণ আছেই। পার্থিব তুলনায় গুরুত্ব নাই বলিয়া যে পাপপুণ্যময়ী বাসনা লিঙ্গশরীরের ভার-স্বরূপ হয় না—তাহা নহে। এই পাপ-পুণ্যরূপ গুরুত্বই ত চৈতন্যে বিলীন করে না,—যথেচ্ছ অনির্দ্দিষ্ট-গতির অধিকার দেয় না! সকল শরীরেরই বেষ্টনী-স্বরূপ কামকর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় স্থূল লিঙ্গ শরীরের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য নাই,—সংকল্পজ ভোগে পূর্ণ অধিকার নাই। তবে বায়বীয় দেহ—পার্থিব দেহ অপেক্ষা যে দ্রুতগতির অধি-কারী—তাহা নিঃসন্দেহ।

"পিতরঃ পশুন্তি শ্রাদ্ধান্নং বায়ুভূতা ন সংশয়ঃ"

শ্রাদ্ধে "স্বধা" শব্দই প্রযোজ্য "পিতৃভ্যঃ স্বধা"। "স্বধাকারঃ পরা হ্যাশীঃ সর্ব্বেষু পিতৃকর্ম্মসু।"

প্রাচীনকালে সোমরস, সমাংস মধুপর্কই শ্রাদ্ধের প্রকৃত সম্পৎ ছিল। রাক্ষসাদি বেদদ্বেষীরা পূর্ব্বে শ্রাদ্ধের বিঘ্ন করিত—এজন্য তাহাদিগের জন্য বলি আর বৈশ্বদেব-পূজা বিহিত আছে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃ-লোকের নিকট শ্রাদ্ধান্তে বর প্রার্থনা করিবেন—

দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নোমাব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥

হে, পিতৃগণ, আমাদের বংশে যেন দানশীলের বৃদ্ধি হয়, বেদশাস্ত্র যেন সম্যক্ আলোচিত হয়, আমাদের পুত্র পৌত্র যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, বেদের প্রতি শ্রদ্ধার যেন কখন অভাব না ঘটে, দানার্থ দেয় দ্রব্য অপ্রতুল না পড়ে।

এই শ্রাদ্ধবিজ্ঞান অলৌকিক তপো-মিশ্র সাধনার ফল। আমরা বিনা আয়াসে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। সামান্য শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও যৎসামান্য কষ্ট বা আলস্যের বিনিময়ে যেন আমরা না উঠাইয়া দিই। উহা "মরা গরুর ঘাস খাওয়ার মত নিষ্ফল—" ইহা সুন্দর প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শন হিন্দু-সন্তানের ধর্ম্ম নহে। "শ্রদ্ধা চ মাব্যগমৎ" শ্রদ্ধার না অভাব ঘটে, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে বিশ্বাস না বিলুপ্ত হয়—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীরামসত্য কাব্যতীর্থ।

তীর্থযাত্রা।

আগ্রা।

২৮শে চৈত্র বুধবার প্রাতে ৭টার সময়ে আগ্রা কোর্ট ষ্টেশনে গাড়ি পৌঁছিলে

আমরা নিকটবর্ত্তী এক হোটেলে আশ্রয় লইলাম। এখানে বিদেশীয় লোক আসিলেই হোটেলওয়ালার দল বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। কে ভাল, কে মন্দ, চিনিয়া লওয়া অসাধ্য। আমরাও এইরূপে বিব্রত হইয়া, যাহার সহিত প্রথমে কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ছিলাম, তাহার সহিত গেলাম। যে হোটেলে আমরা আহার করিলাম, সেই হোটেলটী একটি ধর্ম্মশালার উপর-তলে স্থাপিত। আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ৯॥০টার মধ্যেই আমাদের আহারাদি শেষ হইল। ১০টার সময়ে আমরা তাজমহল দেখিতে বাহির হইলাম। যমুনার ধারে ধারে বরাবর পাকা রাস্তা, তাহার পশ্চিমে ফোর্ট অবস্থিত। যে সময়ে এই ফোর্ট নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন উহার প্রাকার-মূল বিধৌত করিয়া যমুনা প্রবাহিতা হইত। এক্ষণে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। এই ফোর্টটী প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং বিশেষ-রূপ সুরক্ষিত। ফোর্টের ভিতর দেখিতে হইলে পাশ লইতে হয়। ষ্টেশন হইতে তাজমহল প্রায় এক-ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ফোর্টের সীমানা ছাড়াইয়া তাজমহলের রাস্তাটী বৃক্ষাবলি-পরিশোভিত, মধ্যে মধ্যে কুসুমস্তবক-ভূষিত বৃক্ষ ও লতায় পরম রমণীয়। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা তাজমহলের বাহির গেটে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে লুকোচুরি খেলিবার জন্য একটী ত্রিতল অট্টালিকা আছে। ইহার ভিতর প্রবেশ করিলে সহজে বাহির হওয়া যায় না। ইহার পর তাজমহলের প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণটী বিশেষরূপ সুসজ্জিত, যেন স্বর্গের নন্দন-কানন। চক্ষে না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ক্রমে তাজমহলে প্রবেশ করিলাম। তাজমহলের কারুকার্য্য অতুলনীয়। তাজমহল-নির্ম্মাণের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কত কবি, কত ভ্রমণকারী, কত ছন্দে ও কত ভাষায় তাজমহলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ও কারুকার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাজ-মহল শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, তদুপরি নানা-বিধ রঙ্গের প্রস্তরে লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদির কারুকার্য্য। শুনিয়াছি, পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে আগরার তাজমহল অন্যতম। সম্রাট সাজাহান, প্রিয়তমা মহিষীর সমাধির উপর এই তাজমহল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, দ্বাদশ সহস্র লোক দ্বাদশ বৎসরে এই তাজ-নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। মূল সমাধি মন্দিরের চারিদিকে, একটু দূরে, চারিটী মিনার আছে। এই মিনারের চূড়ায় উঠিবার সিঁড়ি আছে। এই মিনারের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য পরম রমণীয়। দূরে আগ্রানগরী, পার্শ্বে ফোর্ট, পশ্চাতে যমুনা, সম্মুখে পরম রমণীয় উদ্যান। এই মিনারের উপর ক্ষণকাল উপবেশন করিলে যমুনাশীকর-সম্পৃক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ-সেবনে শরীর ও মন সুশীতল হয়। মধ্যস্থানে প্রকাণ্ড গুম্বজ, তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নতলের প্রকোষ্ঠে মম-তাজমহলের ও তাহারই পার্শ্বে দক্ষিণ দিকে সম্রাট্ সাজাহানের সমাধি। এই ঘরটী অত্যন্ত ঠাণ্ডা। ইহার উপরি-তলের প্রকোষ্ঠে ও ঐ সমাধি ঘরের অনুরূপ

দুইটী সমাধি নির্ম্মিত আছে। এই সমাধি-প্রকোষ্ঠের চারিদিকে আরও কতকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। এই সকল প্রকোষ্ঠের ভিতর আরও সুন্দর কারুকার্য্য আছে। আমরা চারিদিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সকল দেখিলাম। দুইবার তিনবার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা দেখিলাম, তথাপি ফিরিতে ইচ্ছা করে না। বহুক্ষণ পরে তাজমহল হইতে বাসার প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই স্থানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। জয়পুর, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলের লোক গুলি বড়ই চতুর। প্রতি কার্য্যে ও প্রতি-কথায় পয়সা ছাড়া অন্য 'বুলি' নাই। এখানে ফেরিওয়ালার উপদ্রবে তিষ্ঠান দায়। প্রতিমুহূর্ত্তে এক একজন ফেরিওয়ালা বাসায় আসিয়া বিরক্ত করে। আমরা "তাহাদের জিনিষ দেখিবনা—লইবনা" বলা সত্ত্বেও দ্রব্যাদি সম্মুখে খুলিয়া দেখাইতে ছাড়ে না। আগ্রার সূক্ষ্ম প্রস্তর-শিল্প জগদ্‌-বিখ্যাত। আগ্রাকোর্টের মধ্যে দেওয়ানী-খাস, দেওয়ানী আম্‌ প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্য আছে। তাজমহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে আমরা উহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

অতঃপর :—৫৫ মিনিটের ট্রেণে আমরা আগ্রা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। এখান হইতে বৃন্দাবনের ভাড়া ।৶০ সাত আনা মাত্র। বৈকালে ৫টার পর মথুরা-ক্যাণ্টনমেণ্টে বৃন্দাবনের গাড়ির জন্ত আমাদিগকে দুই ঘণ্টা বিলম্ব করিতে হইল। রাত্রি ৭৷৷০টার সময়ে আমরা বৃন্দাবন পৌছিয়া, তথায় বাঙ্গালীটোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ইঁহার সহিত আমাদের বিশেষ জানা শুনা ছিল। আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চৌধুরী, কয়েক বার তীর্থভ্রমণে আসিয়া ইঁহার বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জামাতা আমাদিগকে থাকিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ আমরা গোবিন্দবাগে নরহরি দাসের কুঞ্জে বাসা লইলাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পতিব্রতা তু যা নারী ভর্ত্তৃশুশ্রূষণে রতা।
ন তস্যা বিদ্যতে পাপমিহলোকে পরত্র চ ॥ ৩৬১ ॥

যে নারী পতিব্রতা ও পতির সেবায় রতা, তাঁহার ইহকালে ও পরকালে পাপ থাকে না। ৩৬১।

পতিব্রতা ধর্ম্মরতা ভদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ।
নাস্যাঃ পরাভবং কর্ত্তুং শক্নোতীহ জনঃ কচিৎ। ৩৬২ ॥ (ত)

ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা সর্ব্বদা মঙ্গল লাভ করেন তাহাতে সংশয় নাই; তাঁহাকে কোন লোকেই পরাভব করিতে পারেনা। ৩৬২।

(ত) কূর্ম্মপুরাণে উপরিভাগে ৩৩ অধ্যায়।

এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনম্।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ ভর্তৃহিতমাচরেৎ॥ ৩৬৩॥

ইহলোকে রমণী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও যে পতির হিত আচরণ করেন ইহাই তাঁহার পরম শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ৩৬৩

যজ্ঞৈস্তপোভির্নিয়মৈর্দানৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
বিশিষ্যতে স্ত্রিয়া ভর্তুর্নিত্যং প্রিয়হিতেস্থিতিঃ॥ ৩৬৪॥ (খ)

সতত পতির প্রিয় কার্য্য করিলে যে ফল হয়, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও বিবিধদ্রব্য দান করিলেও সেরূপ ফল হয় না। ৩৬৪।

ন পৃথগ্‌ বিদ্যতে স্ত্রীণাং ত্রিবর্গ-বিধিসাধনম্।
ভাবতো হ্যতিদেশাদ্ বা ইতি শাস্ত্রবিধিঃ পরঃ। ৩৬৫।

স্ত্রীলোকদিগের ত্রিবর্গ-বিধি সাধন অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-প্রদায়ক অনুষ্ঠান পৃথক্ নাই। রাগতঃ অর্থাৎ অনুরাগাধীন বা অতিদেশ বশতঃ এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি আছে। ৩৬৫।

পত্‌ন্যাঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহ-শুদ্ধিং বিধায় চ
উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বাবেশ্ম বিশোধনম্॥ ৩৬৬

পত্নী পতির পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া বিমূত্র-পরিত্যাগ দ্বারা দেহ-শুদ্ধি করিয়া শয্যাদি উঠাইয়া শয়নগৃহ পরিষ্কার করিবেন। ৩৬৬।

মার্জ্জনৈর্লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং স্বমঙ্গণম্।
শোধয়েদগ্নিকার্য্যানি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেণ বারিণা॥ ৩৬৭

প্রোক্ষণৈরিতি তান্যেব যথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ।
দ্বন্দ্ব-পাত্রাণি সর্ব্বাণি ন কদাচিদ্ বিয়োজয়েৎ॥ ৩৬৮॥

তৎপরে তিনি অগ্নিশালায় গমন করিয়া মার্জ্জন ও লেপনদ্বারা উহা শুদ্ধ করিবেন; তদনন্তর স্বীয় অঙ্গণ পরিষ্কার করিবেন, পরে অগ্নিকার্য্যোপযুক্ত পাত্র সকল উষ্ণবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া যথাস্থানে রাখিবেন। যুগ্ম-পাত্র সকল কদাচিৎ বিযুক্ত করিবেন না—অর্থাৎ শীল নোড়া একত্র করিয়া রাখিবেন ইত্যাদি। তণ্ডুলাদি-পাত্র শোধন করিয়া তণ্ডুলাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিবেন। ৩৬৭। ৩৬৮।

শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ।
মহানসস্য পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বথা।
মৃদ্ভিশ্চ শোধয়েচ্চুল্লীং তত্রাগ্নিং বিন্যসেত্ততঃ ৩৬৯॥

রন্ধন-গৃহের আবশ্যকীয় ভোজন-পাত্রাদি সমুদায় বহির্গত করিয়া প্রক্ষালন দ্বারা শোধন করিবেন। মৃত্তিকাদ্বারা চুল্লী শোধন করিয়া, সেই চুল্লীতে অগ্নি সংযোগ করিবেন। ৩৬৯।

কৃতপূর্ব্বাহ্নকার্য্যা চ স্ব গুরূনভিবাদয়েৎ।
তাভ্যাং ভর্তৃ-পিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ।
বস্ত্রালঙ্কাররত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারয়েৎ।
মনোবাক্-কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥ ৩৭০॥

এইরূপে পূর্ব্বাহ্ন-কার্য্য সমাপন করিয়া গুরুজনকে অভিবাদন করিবেন; তদনন্তর পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, মাতুল ও বান্ধব-প্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিবেন। মন, বাক্য, কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধ হইয়া পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবেন॥ ৩৭০।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্তুঃ সদাভবেৎ। ৩৭১॥

ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা হইবেন, নির্ম্মলচরিত্রা হইয়া সখীর ন্যায় হিত-চেষ্টা এবং আজ্ঞা-প্রতিপালন বিষয়ে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। ৩৭১।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

(খ) মহাভারতে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

দৈব দুর্বিপাক। ভীষণ জলপ্লাবনে বঙ্গের বহুস্থলের নরনারী বিপন্ন। অনেকে আশ্রয়হীন হইয়াছে; অনেকে, জীবন হারাইয়াছে! গবাদি পশু অনেক মরিয়াছে। অনেকের আবাসস্থান শ্মশানে পরিণত হইয়াছে! প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট ও দেশের সহৃদয় জনগণ যথাসাধ্য বিপৎ-প্রতীকারের প্রয়াস পাইতেছেন! কিন্তু ক্ষতির তুলনায় প্রতীকার দুর্ব্বল! মা আনন্দময়ী আসিতেছেন; এ সময় জানিনা, কি দোষে দেশে এ বিষম অত্যাহিত-ঘটনার অবির্ভাব! দুর্গতিহারিণি! দুর্দ্দিন দুঃখ-দারিদ্র্য দূর কর মা! তোমার পদার্পণে দেশ শান্তিময় হউক্।

সহৃদয়তা। হাওড়ার সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ প্যাটারসন্ বাহাদুরের সাধু-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। হাওড়ার যে সমস্ত স্থানে প্লাবনপীড়নে শস্যনাশ ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থানে পুনরায় শস্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ময়মনসিংহ হইতে ধান্যবীজ ও ধানের চারা আনাইয়া প্রজাগণকে বিতরণ করিতেছেন। এই চেষ্টার ফলে শস্যহানির কথঞ্চিৎ প্রতীকার হইলেও মঙ্গল।

পরলোক। কুচবিহারের মহারাজ বাহাদুর সম্প্রতি ইংলণ্ডে পরলোকগত হইয়াছেন। মহারাজের বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল! এদেশের হিসাবেও ইহা অকালমৃত্যু। মহারাজের ভ্রাতা প্রিন্স জিতেন্দ্রনারায়ণ কুচবিহারের সিংহাসন লাভ করিবেন।

শ্রীমতীতত্ত্ব। ত্রিবাঙ্কুর রাজ-দরবার ঘোষণা করিয়াছেন, অতঃপর সরকারী কাগজে দেশীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাঁহাদের মাসিক আয় ৫০৲ টাকার অধিক, তাঁহাদেরই নামের পূর্ব্বে "শ্রীমতী" লেখা হইবে। অবাক্ কাণ্ড! ৫০৲ টাকা মাসিক আয় না থাকিলে "শ্রীমতী" হওয়ার বাধা কি?

সৎকর্ম্ম। সীতাকুণ্ডে "শম্ভুনাথ-চতুষ্পাঠী" নামে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছে। মোহান্ত-মহারাজই নাকি এই সৎকর্ম্মের মূল। অন্যান্য তীর্থস্থানের মোহান্ত-মহারাজেরা এই সাধু-দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবেন কি?

উদ্যম। পাশ্চাত্য-মনীষী ডাঃ ফিলিপি-প্রমুখ কতিপয় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি, ভারতে আসিয়াছেন। ইঁহারা আগামী গ্রীষ্মের শেষ পর্য্যন্ত হিমালয়ের কারাকুরাম পর্ব্বতশ্রেণীর আবিষ্কারে রত থাকিবেন। আমাদের "উত্তর শিয়রে" হিমালয়, সমুদ্র-পার হইতে বিদেশীয়গণ তাহার দুর্গম অনাবিষ্কৃতস্থল আবিষ্কার করিতে আসিতেছেন! আমাদের উদ্যম, ঔৎসুক্য ও ধৈর্য্যের অভাব। আমরা জড়ভাবাপন্ন। শুধু বচনে চলিবেনা।

পুরস্কার-প্রবন্ধ। স্বনামধন্য স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের যোগ্য-পুত্র "বিজ্ঞান"-সম্পাদক ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল্, এম্ এস্ প্রচার করিয়াছেন, কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা প্রবন্ধের লেখককে তিনি ১৫৲ পুরস্কার দিবেন। পুরস্কার মাত্র পঞ্চদশ-মুদ্রা হইলেও উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইন্ মতে রেজিষ্টারীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২০শ বর্ষ, ২০শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩২০ সাল, ১৮৩৫ শকাব্দাঃ।

বিসর্জ্জন ও বিজয়া।

জগদম্বার ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তির বিসর্জ্জন সম্পন্ন হইল। বিজয়া-দশমীর আলিঙ্গন-সম্ভাষণবহুল, প্রণাম-নমস্কার-শুভাশীর্ব্বাদ-জটিল আনন্দোৎসব সজলনয়নে অনুষ্ঠিত হইল। চিরদিনই যেমন হইয়া থাকে, এবারও তেমনি হইল। বোধন, পূজন, বিসর্জ্জন—একাগ্রতা, সমগ্রতা ও ব্যগ্রতার সহিত সম্পাদিত হইল। ভক্তের ভক্তির আকর্ষণে মা চিন্ময়ী বিশ্বময়ী মহাশক্তি মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া, তিন দিবস আনন্দের স্রোত বহাইয়া, দশমীর শুভলগ্নে সাধকের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। জননীর মৃন্ময়ী ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি, ভক্ত, অশ্রুজল-বিসর্জ্জনের সঙ্গে জলে বিসর্জ্জন করিলেন। পরে বিজয়ার উৎসবানন্দে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু কেন? সর্ব্বস্ব-স্বরূপিণী মাতৃমূর্ত্তি জলে ডুবাইয়া দিয়া, সন্তানের এত উৎসব আনন্দ কেন? যে জন মাতৃমূর্ত্তির দর্শনে বঞ্চিত, তাহার হৃদয়ে বিষাদের পরিবর্ত্তে আহ্লাদের উৎস খুলিয়া গেল কেন? ভাই শাক্ত ভক্ত! কিছু বুঝিলে কি? মায়ের বিসর্জ্জনে কিছু শিখিলে কি? ভুলিও না, তুমি সাধক! ভাই, তুমি কত কষ্টে কত পূরক-রেচক-কুম্ভক করিয়া, কত প্রণবনাদে চীৎকার করিয়া, মায়ের বোধন বা নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলে! তোমার সাধনায় কুলকুণ্ডলিনী জগজ্জননী জাগরিতা হইয়া, তোমার পূজায় পূর্ণতা লাভ করিয়া, আ'জ তোমারই কল্যাণকল্পে ইড়া--পিঙ্গলা—সুষুম্নারূপ ত্রিধারার মধ্য-স্রোতে ডুবিয়া অগাধ ব্রহ্মমার্গ দিয়া, আনন্দময়ের মহামিলনে যাত্রা করিয়াছেন। সে মহামিলন, তোমারই আনন্দের নিদান! আ'জ তুমি মাকে বিসর্জ্জন দিতে কাঁদিয়াছ,

কিন্তু মা আনন্দ-ধামে গেলে যখন সুধা-স্রোত বহিবে, যখন সন্তান তুমি, জননীর শুভ্রক্ষরিত পীযূষ-পানের অধিকার পাইবে, তখন তুমিই "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী" হইবে। সেই অকল্পিত শুভসংযোগ-সূর্য্যের অরুণ-রাগরূপ আনন্দ-প্রতিবিম্বে তোমারই ত অধিকার! তুমি আনন্দে মত্ত না হইবে কেন ভাই? তুমি তন্ত্রমার্গী শক্তি-সাধক! তোমার মঙ্গলের মূলেই মায়ের বিসর্জ্জন। ইহা স্থূলতঃ বিসর্জ্জন হইলেও মূলতঃ পরমানন্দের অর্জ্জন। তুমি জ্ঞানমার্গী হইলেও বিসর্জ্জনে তোমার সাধন-শিক্ষার প্রতিষ্ঠা। মাতৃমূর্ত্তির বিসর্জ্জনে তোমার কিসের বিসর্জ্জন, ভাবিয়া দেখ দেখি! ঋদ্ধিদেবতা কমলা, বিদ্যাদেবতা বাণী, মঙ্গলদেবতা গণপতি, বীর্য্যদেবতা কুমার আর অনন্ত-শক্তিময়ী সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা সুখদা শুভদা সর্ব্বপদা শারদা—এই সব দেব-মূর্ত্তিরই ত বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন অর্থ ত্যাগ। ধন-জন, বিদ্যা-বুদ্ধি, শৌর্য্য-বীর্য্য, কল্যাণ অকল্যাণের অভিমান না ছাড়িলে ত অমৃতের রাজ্যে যাওয়া যায় না! অমানুষী বীণার অমৃত-ময় নিক্কণ শ্রবণ করিয়াছ কি? ঐ শুন, ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেনা-মৃতত্বমানশুঃ। বিহিত কর্ম্মে নয়, পুত্র-পরিজনে নয়, ধনে নয়, কেবল ত্যাগে বা বিসর্জ্জনেই অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠিত। তুমি ভক্তিমার্গী হইলেও বিসর্জ্জনে তোমার বিশিষ্ট শিক্ষা-লাভ ঘটিবে। সুখদুঃখ ভালমন্দ সব আগেই ছাড়িবে। শেষে আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মনিবেদন সম্পন্ন হইলেই তোমার সুখস্বপ্ন সফল হইবে। তুমি কর্ম্মমার্গী হইলেও বিসর্জ্জন তোমার জীবনের মূলমন্ত্র হইবে। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান, যজ্ঞ, ব্রত প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ত্যাগের খেলা। অধিকন্তু সকলের শেষে অভীষ্ট দেবতার চরণে কর্ম্মফল-বিসর্জ্জন। বিসর্জ্জনই সাধনমার্গের সার-শিক্ষার সঙ্কেত। কে শিক্ষার্থী আছ, অবহিত হও; বিসর্জ্জনের এই অমৃতময়ী শিক্ষার উপেক্ষা করিও না। বর্ষের পর বর্ষে যোগী জ্ঞানী ভক্ত, কর্ম্মী সাধ-কের জন্য এই শিক্ষা—এই সঙ্কেত মায়ের বিসর্জ্জনে প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা সাধন-সলিলে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা ইহার রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছেন। আর সাধারণে ইহার বাহ্যভাব গ্রহণ করিতেছেন। তাই হিন্দু! বিজয়ার শুধু স্বজন-মিলনই যথেষ্ট নয়, এক মহামিলনে ইহার গূঢ়লক্ষ্য নিহিত। হায়! কবে খোসা ভুষি ছাড়িয়া শাঁসের সেবা করিবার অধিকার পাইব! জগদম্বাই জানেন! ওঁ শান্তিঃ।

ধন ও সাধন।

ধন-জন সংসারে প্রায় সকলেই চায়, না থাকাও এক দায়। ধন যেন সংসার-শরীরের রুধির। রক্তশূন্য দেহ আর ধনশূন্য গৃহ একই প্রকার। জন, সংসার-প্রান্তরের তরু। জন না থাকিলে সংসার যেন শুধু মরু! ধনজনশূন্য গৃহ শ্রীহীন প্রাণহীন। ধনজন সংসারের সৌন্দর্য্য। ধনজনের জন্যই গৃহস্থের গৃহ আনন্দ স্বাচ্ছন্দ্যে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত। ধন বিহনে জীবন দুর্ব্বহ। কবি গাহিয়াছেন

"মাতা নিন্দতি নিন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে। ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তাপি নালিঙ্গতে। অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ। তস্মাদর্থসমর্জ্জনং কুরু সখে হ্যর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।" অর্থহীন জনকে মাতা পিতা নিন্দা করেন, ভ্রাতাও সম্ভাষণ করেন না। ভৃত্য ক্রোধপ্রকাশ করে। পুত্রও অনুগমন করিতে চায় না। অধিক কি, পত্নীও সাদরে আলিঙ্গন করেন না। অর্থভিক্ষার ভয়ে সুহৃদ্‌গণও কথা কহিতে শঙ্কিত হয়। যখন অর্থের অভাবে এত অশান্তি হয়, তখন অর্থ অর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ, কারণ সংসারে সকলেই অর্থের বশ। শুধু আত্মসুখের বা স্বজনসন্তোষের জন্যই যে অর্থের আয়োজন তাও নয়; ধন বিনা পোষ্যপালন ঘটেনা। পক্ষান্তরে পোষ্যপীড়নে নরকপ্রদ পাপ আসিয়া জুটে। শাস্ত্র বলেন—"ভরণং পোষ্যবর্গানাং প্রশস্তং স্বর্গসাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্‌ যত্নেন তান্‌ ভরেৎ।" পোষ্যপালনে স্বর্গলাভ হয়, পোষ্যপীড়নে নরকে যাইতে হয়। শাস্ত্রে পোষ্যপালনার্থে ধনার্জ্জনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। যথা—তৃতীয়ে চ তথাভাগে পোষ্যবর্গার্থ-চিন্তনম্‌" অর্থাৎ দিনের তৃতীয়ভাগে পোষ্যপালনের জন্য ধনচিন্তা করিতে হয়। নির্ধনতা নিতান্ত নিন্দার কথা। কবি বলিয়াছেন "বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং,দ্রুমালয়ং পক্বফলাম্বুভোজনং, তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং, ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্‌।" ব্যাঘ্রাদিসেবিত বনে বৃক্ষতলে অবস্থান, ফলজলে প্রাণধারণ, তৃণশয্যায় শয়ন, বল্কলপরিধান—এসকলও শ্রেয়, তথাপি বন্ধুমধ্যে ধনহীন হইয়া জীবনধারণ শ্রেয়ঃ নয়। কবি আরও বলিয়াছেন, নির্ধন অপেক্ষা নিধন বা মরণও ভাল। 'ধনাদ্ধর্ম্মঃ' ইহাও ত শাস্ত্রমর্ম্ম। ধন যখন ধর্ম্মসাধন, তখন ভক্ত ধন চাহেন না কেন? গৃহী ভক্ত কি শাস্ত্রতত্ত্বে অনাদর প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে ভগবদ্‌বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন? শাস্ত্রে চারিটী পুরুষার্থের প্রসঙ্গ আছে; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থ যদি নিন্দিতই হয়, তবে ধর্ম্ম বা মোক্ষের মত পুরুষার্থরূপে গণ্য হওয়া সঙ্গত কি? ধনের প্রয়োজনীয়তার অনুকূলে এই সব কথা।

অপরদিকে বিবেকী] [বিরাগিবর্গ ধনের নিন্দায় নিরত। বিরাগীর কথা—"অর্থানামর্জ্জনে দুঃখং অর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্‌ ক্লেশকারিণঃ।" অর্থের অর্জ্জন, রক্ষণ, বিনাশ ও ব্যয় সবই দুঃখময়। এহেন ধনে ধিক্‌! উপার্জ্জনের উপায় কৃষি, বাণিজ্য, সেবা ও ভিক্ষা; সবগুলিতেই অসীম ক্লেশ; রক্ষণেও দুঃখের অবধি নাই; সময়বিশেষে অর্থরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া অনেকে দস্যুহস্তে নিহতও হন। আর অর্থনাশ যে কিরূপ মনস্তাপদায়ক ও প্রতিষ্ঠানাশক, তাহা বলা বাহুল্য। এমন কি, নীতিবিদেরা অর্থনাশ প্রকাশ করিতেও নিষেধ করেন। শতক্লেশে অর্জ্জিত, প্রাণপণে রক্ষিত অর্থ ব্যয় করিতে কৃপণের ত রক্ত শুকাইয়াই যায়--হৃৎপিণ্ড ছিন্নপ্রায় হয়, সাধারণেরও যে বেশ ক্লেশ বোধহয়, তাহাতে সংশয় কোথায়? বিরাগীরা বলেন—অর্থাঃ পাদরজোপমাঃ অর্থাৎ পয়সা কড়ি পায়ের ধূলার মত তুচ্ছ বস্তু। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ।” অর্থই অনর্থের মূল, সত্যই অর্থে সুখের লেশমাত্রও নাই। অর্থের জন্য দুর্দ্ধর্ষ পুত্র, ধনী পিতার প্রাণনাশেও যত্নবান্ হয়। যে ধনের জন্য লোকে দয়ামায়া স্নেহভক্তি প্রেমপ্রীতি বিসর্জ্জন দেয়, যে ধন নিধনের সাধন, হায়! সে ধনে শত ধিক্। এ এক বিষম সমস্যা! একদিকে ধনের গুণ-গরিমা, অন্যদিকে কলঙ্ক লঘিমা। কোন্ পথে যাই? অর্থের অভাবে দিননির্ব্বাহ অসম্ভব, আবার শুনি—অর্থ পরমার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী; কামিনী-কাঞ্চন সাধনের শত্রু। বিষয়সেবায় রত হইলে ভগবান্ দূরে যান! শ্রীভাগবতের ঘোষণা—"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু গচ্ছন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ?" অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে পশ্চিমদিকস্থ বস্তু পাওয়া যায় না, বরঞ্চ উহা অধিক দূরবর্ত্তী হয়, বিষয়-পরায়ণের পক্ষে কৃষ্ণভক্তিপ্রাপ্তিও তেমনি দূরবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। সুতরাং ধন, কৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল নয়।

এ সমস্যার মীমাংসায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং যে পন্থার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রসম্মত ও সাধুসম্মত। তিনি বলিয়াছেন—'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।" ধনের ন্যায্য ব্যবহার কর, কিন্তু উহাতে আসক্ত হইওনা। অনাসক্তভাবে বিষয় সেবায় দোষ হয় না। দ্রব্য নির্দ্দোষ, আসক্তিই দোষের আকর। শ্রীভগবানও গীতায় এই কথাই বলিয়াছেন। বিষয়ভোগের প্রধান সাধন ধন। আসক্তিশূন্য হইয়া অর্থের সাগরে ডুবিয়া থাকিলেও পরমার্থের হানি নাই। পাঁকাল মাছ, পাঁকের মধ্যেই বাস করে, কিন্তু তাহার গায়ে পাঁক লাগিতে পারে না। রাজর্ষি জনক, অনাসক্ত বিষয়ী ছিলেন। তিনি ধনজন গৃহক্ষেত্র সকলেরই যথোচিত ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত ছিলেন না। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন "মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।" অর্থাৎ মিথিলা পুড়িয়া গেলেও আমার কিছুই যায় না। জনক, ধনের কারবার করিয়াও পরমধনে বঞ্চিত হন নাই। উচ্চাধিকারী, অর্থ ও পরমার্থ দুইই রক্ষা করিতে সমর্থ। শাস্ত্র বলিতেছেন—"পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েক্ষণ-তৎপরোঽপি, ধীরা ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং। সঙ্গীতনৃত্যলয়তালবশঙ্গতাপি, মৌলিস্থ-কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব।" নিপুণা নটীর যেমন মুখে গান, হাতে তাল, পায়ে নাচ, অথচ মাথায় কলসীটী স্থির, ধীর সাধকেরও সেরূপ বাহিরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়সেবা, ভিতরে মুকুন্দ-পাদপদ্মে স্থির মনোযোগ! এও সম্ভব, তবে সহজ নয়! ধন লইয়াও সাধন চলিতে পারে। আবার সংসারস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দান, পরোপকার প্রভৃতিতেও ধন লাগে। এ অবস্থায় 'ধন চাই না' অর্থ "ধনে আসক্তি চাই না"। আবার যে উত্তম অধিকারী বিরাগাচারী নিষ্কাম সাধক অযাচিত দ্রব্যে প্রাণরক্ষা করেন, যিনি কামনার উপরে উঠিয়াছেন, তিনি বলিতে পারেন "ধন চাই না!" সকল সাধক ধনের ভাবনা ভাবেন না। সাধক চতুর্ব্বিধ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন! আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।" আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্ত সাধক। এক জ্ঞানী ভিন্ন সকলেই

সকাম। দেখা যায়—যখন চিকিৎসকের চেষ্টা বিফল হয়, তখন বিপন্ন রোগী ভগবানের ভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। তখন শান্তিস্বস্ত্যয়ন, পূজা পাঠ, হরির লুট, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। যদি ভগবৎকৃপায় উপশম হয়, তবে রোগী খাঁটী ভক্ত হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসু ভক্ত, ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় মত্ত; সে পুণ্য চায়, কৃষ্ণকৃপা হইলে সেও খাঁটী ভক্ত হয়। অর্থার্থী ভক্ত দুঃখদারিদ্র অতিক্রম করিয়া ধনে জনে সমৃদ্ধ হইবার প্রত্যাশায় ভগবানে অনুরক্ত। অর্থার্থী ভক্তই সংসারে বেশী। কেহ ধনের জন্য, কেহ রাজত্বের জন্য, কেহ বা দেবত্ব ইন্দ্রত্বের জন্য ভগবানের উপাসনা করে। ইহাদের ভক্তি আছে, সঙ্গে সঙ্গে "ধনং দেহি, সুখং দেহি, দেহি দেহি" উক্তিও আছে। জ্ঞানী ভক্ত নিষ্কাম। তিনি ধন-জন কবিতা-বনিতা রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই চান্ না; কেবল চান্—অহৈতুকী ভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আর্ত্তাদি ভক্তের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে—"যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ।" আর্ত্তভক্তের দৃষ্টান্ত গজেন্দ্র, বিপৎপতিত হইয়াই গ্রাহগৃহীত গজেন্দ্র ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিল, ও জন্মান্তরীণ সুকৃতিবলে কৃষ্ণকৃপায় ভক্তির অধিকার পাইয়াছিল। শৌনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসু ভক্ত, তাঁহারা ভগবৎপ্রসঙ্গ-জিজ্ঞাসায় কাল কাটাইয়া পুণ্যপুঞ্জবলে কৃষ্ণকৃপায় ভজনাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ধ্রুব অর্থার্থী ভক্ত, রাজৈশ্বর্য্যলাভের আশায় ভগবান্‌কে ডাকিয়া শেষে ভক্তপ্রবর নারদের কৃপায় ভজনপথে উপস্থিত হন। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার ভগবানের নিত্য কৃপাপাত্র। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভক্তের ধনের অপেক্ষা থাকে, কিন্তু জ্ঞানীর থাকে না। তিনি বলিতে পারেন "ধন চাই না, ভক্তি চাই।"

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

রহস্য।

এ জীবন দীর্ঘ দুঃস্বপন?
কবে তার হবে সমাপন?
　কে বলিতে পারে?
মৃত্যু,—সেকি অবসান তার?
অথবা সে স্বপন আবার
　স্বপন মাঝারে?
কর্ম্ম-বশে জনম, মরণ?
কর্ম্ম-কামী কেন তবে মন?
　কেন এ খেয়াল?—
প্রশ্ন কত উঠিছে মানসে;
কে ছিঁড়িবে বিচার-সাহসে
　সংশয়ের জাল?
এ সংসার দ্বীপের আকার,
ঘিরি' তারে রহস্য-পাথার
　অকূল, অগাধ;
সিন্ধু মাঝে আমি শ্রান্ত পাখী,
পথ-হারা কত আর ডাকি?
　দয়া কর নাথ!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী



নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদেব কৃতৈরন্নৈ র্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ ॥৩৭২

তদনন্তর অন্নাদি পাক করিয়া "পাক সম্পূর্ণ হইয়াছে" এই কথা পতিকে জ্ঞাপন করিবেন। পতি বৈশ্বদেবাদি কার্য্য সমাপন করিলে, সেই অন্ন দ্বারা বালক, বালিকা প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া পতিকে ভোজন করাইবেন ৩৭২

পত্যৈবৈতদনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমন্নাদ্যমাত্মনা।
ভুক্‌ত্বা নয়েদহঃ শেষমায়ব্যয়-বিচিন্তয়া ॥৩৭৩

পতি আজ্ঞা করিলে অবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বয়ং ভোজন করিয়া, আয় এবং ব্যয়ের চিন্তা দ্বারা দিবার শেষ ভাগ যাপন করিবেন। ৩৭৩।

পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ।
কৃতান্ন-সাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্ ॥
৩৭৪

নাতিতৃপ্ত্যা স্বয়ং ভুক্‌ত্বা গৃহ-নীতিং বিধায় চ।
আস্তীর্য্য সাধু শয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিম্ ॥
৩৭৫

সুপ্তে পত্যৌ তদভ্যাসে স্বপেৎ তদ্গত-মানসা।
অনগ্না চাপ্রমত্তা চ নিষ্কামা চ জিতেন্দ্রিয়া ॥৩৭৬

পুনরায় সায়ং কালে এ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবেন। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে গৃহশুদ্ধ্যাদি সমুদায় কার্য্য সমাপন করিয়া, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাধ্বী, পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবেন এবং আপনিও অনতিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করিয়া, গৃহনীতি (দীপালোক-প্রদান শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি) সম্পন্ন করিয়া, উত্তম শয্যা প্রস্তুত করিয়া পতি-শুশ্রূষা করিবেন। পতি নিদ্রিত হইলে, পতিগতচিত্তা হইয়া পতির নিকট নিদ্রিত হইবেন। নিদ্রাকালে উলঙ্গিনী হইবেন না। চৌরাদি বিষয়ে সাবধান থাকিবেন। অত্যন্ত কামাশক্তা না হইয়া জিতেন্দ্রিয়া হইবেন। ৩৭৫। ৩৭৫। ৩৭৬।

নোচ্চৈর্বদেন্ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রিয়ং।
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপ-প্রলাপিনী ॥৩৭৭

উচ্চ করিয়া কথা কহিবেন না; কটুক্তি করিবেন না; অতিরিক্ত কথা কহিবেন না; পতির অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কাহারও সহিত বিবাদ করিবেন না এবং অপলাপ ও বিলাপ ত্যাগ করিবেন। ৩৭৭।]

ন চাতিব্যয়শীলা স্যান্ন ধর্ম্মার্থ-বিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যাবঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্ ॥ ৩৭৮
পৈশুন্য-হিংসা-বিদ্বেষ-মদাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্য-সাহসস্তেয়-দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ ॥
৩৭৯

অত্যন্ত ব্যয়-শীলা হইবেন না; ধর্ম্ম-অর্থের বিরোধিনী হইবেন না। প্রমাদ (অনবধানতা) উন্মাদ (চিত্ত চাঞ্চল্য); রোষ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অত্যন্ত অভিমান (আমার পতি বা পুত্র গুণবান, রূপবান্ এইরূপ গর্ব্ব-প্রকাশ); পিশুনতা; হিংসা, বিদ্বেষ, মদ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, সাহস (দেবতা ও পরলোক নাই ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগ) অসন্তোষ, দম্ভ এই সকল দোষ, সাধ্বী স্ত্রী, পরিত্যাগ করিবেন। ৩৭৮। ৩৭৯।

এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতম্।
যশঃ সমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাম্ ॥৩৮০

এইরূপে পরমদেবতা পতিকে সেবা

করিলে ইহলোকে যশ এবং মঙ্গল ও পরকালে পতিলোকে বাস করিতে পারিবেন। ৩৮০

যোষিতোনিত্যকর্ম্মোক্তং নৈমিত্তিক-মথোচ্যতে।
রজোদর্শনিতো দোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ ॥ ৩৮১

রমণীগণের এই নিত্য-কর্ম্ম উক্ত হইল, অনন্তর নৈমিত্তিক কর্ম্ম কথিত হইতেছে। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন॥ ২৮১।

সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তর্গৃহে বসেৎ।
একাম্বরধরা দীনা স্নানালঙ্কার-বর্জ্জিতা ॥ ৩৮২।

হঠাৎ তাঁহাকে কেহ দেখিতে না পায়—লজ্জাবতী হইয়া, এইরূপ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবেন; এক বস্ত্র ধারণ করিবেন এবং স্নান ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া দাসীর ন্যায় অবস্থান করিবেন। ৩৮২।

মৌনিন্যাধোমুখী চক্ষুঃ-পাণি-পন্তিরচঞ্চলা।
অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃণ্ময়ভাজনে ॥ ৩৮৩।

বাক্যালাপ-শূন্য হইয়া চক্ষু, হস্ত এবং চরণের চাঞ্চল্য প্রকাশ না থাকে, এইরূপে অবস্থান করিবেন। রাত্রিকালে কেবল মাত্র মৃণ্ময় পাত্রে অন্ন ভোজন করিবেন। ৩৮৩।

স্বপেদ্ভুমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহস্ত্রয়ম্।
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচেলমুদিতে রবৌ ॥৩৮৪

অপ্রমত্তা হইয়া এইরূপে ত্রিরাত্র যাপন করিয়া ত্রিরাত্রান্তে সূর্য্যদেব উদিত হইলে, বস্ত্রাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্নান করিবেন। ৩৮৪

বিলোক্য ভর্ত্তৃবদনং শুদ্ধা ভবতি ধর্ম্মতঃ।
কৃতশৌচা পুনঃ কর্ম্ম পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥৩৮৫

পতির বদন দর্শন করিয়া ধর্ম্মতঃ শুদ্ধা হইবেন। শৌচজনক কার্য্য করিয়া পুনরায় গৃহ-কার্য্য করিবেন। ৩৮৫

রজোদর্শনতো যাঃ স্যুরাত্রয়ঃ ষোড়শর্ত্তবঃ।
ততঃ পুংবীজমক্লিষ্টং শুদ্ধে ক্ষেত্রে প্ররোহতি ॥ ৩৮৬

রজোদর্শন-দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল ঐ সকল দিন মধ্যে শুদ্ধক্ষেত্রে নিঃক্ষিপ্ত যে পুংবীজ তাহা অঙ্কুরিত হয়। ৩৮৫

চতস্রশ্চাদিমা রাত্রীঃ পর্ব্ববচ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গচ্ছেদ্ যুগ্মাসু রাত্রিষু পৌষ্ণপিত্র্যর্ক্ষরাক্ষসান্ ॥ ৩৮৭

গচ্ছাদিতাদিত্যগণে পুমান্ গচ্ছেৎ স্বযোষিতঃ
ক্ষামান্ধকদবাপ্নোতি পুত্রং পূজিতলক্ষণম ॥ ৩৮৮

প্রথম চারি রাত্রি, পর্ব্ব (১) দিনের ন্যায় নিষিদ্ধ। যুগ্ম রাত্রিতে গমন করিবে। রেবতী, মঘা, মূলা নক্ষত্র ও রবি ভিন্ন বারে স্বীয় পত্নীতে গমন করিবে, তাহা হইলে শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইবে। ৩৮৭ ৩৮৮

ঋতুকালেঽভিগমৈবং ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ।
গচ্ছন্নপি যথাকামং ন দুষ্টঃ স্যাদনন্যকৃৎ ॥৩৮৯

এইরূপে ঋতুকালে গমন করিলে, তাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না; অনন্যকার্য্য হইয়া যথাভিলাষতঃ গমন করিলেও কোন দোষ-ভাগী হইবে না। ৩৮৯।

ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি ঋতৌ ভার্য্যা পরাঙ্মুখঃ।
সাত্ববাপ্যান্যতোগর্ভং ত্যাজ্যা ভবতি পাপিনী ॥ ৩৯০

ঋতুকালে ভার্য্যার নিকট গমন না করিলে

---

(১) পর্ব্বদিন যথা—
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥

ভ্রূণ-হত্যার পাপে পাপী হইবে। রমণী, অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভ ধারণ করিলে সেই পাপিনী, পতির ত্যাজ্যা হইবে। ৩৯০

মহাপাতক-দুষ্টা চ পতিগর্ভ-বিনাশিনী।
সদ্‌বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্‌ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ।
মহাপাতকদুষ্টোঽপি নাপ্রতীক্ষ্যাস্তয়া পতিঃ॥৩৯১

যদি কোন রমণী, পতিকৃত গর্ভ নষ্ট করে, তাহা হইলে সে মহাপাতকে লিপ্ত হইবে। যদি কোন পুরুষ, বিনা দোষে সচ্চরিত্রা পত্নী পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে। পতি মহাপাতকাদি পাপ-যুক্ত হইলেও সাধ্বী স্ত্রী, তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। ৩৯১।

ব্যভিচারেণ দুষ্টানাং পত্নীনাং দর্শনাদৃতে।
ধিক্‌কৃতাস্তামবাচ্যামন্যত্র বাসয়েৎ পতিঃ ॥৩৯২

ব্যভিচারিণী পত্নীর মুখ-দর্শন ত্যাগ করিয়া, ধিক্কার পূর্ব্বক সেই নিন্দনীয়াকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিবে।

বিবর্ণা দীনবদনা দেহসংস্কার বর্জ্জিতা।
পতিব্রতানিরাহারা শোষ্যতে প্রোষিতে পতৌ॥
৩৯৩

পতিব্রতা স্ত্রী, পতি প্রবাসে থাকিলে বিবর্ণা, দুঃখিত বদনা হইবেন, এবং দেহ-পরিষ্কার না করিয়া, আহার ত্যাগ করিয়া, নিজ শরীরকে শুষ্ক করিবেন। ৩৯৩।

মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ
জীবন্তীচেৎ ত্যক্তকেশা তপসা শোধয়েদ্ বপুঃ।
৩৯৪

মৃত পতির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন; যদি জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে কেশ মুণ্ডন করিয়া তপস্যা দ্বারা শরীরকে শুদ্ধ করিবেন। ৩৯৪

সর্ব্বাবস্থাসু নারীণাং ন যুক্তং স্যাদরক্ষণম্।
তদেবানুক্রমাৎ কার্য্যং পিতৃ-ভর্তৃসুতাদিভিঃ॥
৩৯৫ (দ)

রমণীগণ কোন সময়েই অরক্ষণীয়া থাকিবেন না; অতএব ক্রমে পিতা, পতি ও পুত্রাদি দ্বারা রক্ষিতা হইবেন অর্থাৎ বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি ও বার্দ্ধক্যে পুত্রাদি দ্বারা রক্ষিতা হইবেন ৩৯৫।

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি চ্ছন্দোনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥
তয়াধর্ম্মার্থ-কামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
প্রাকাম্যে বর্ত্তমানাতু স্নেহান্নতু নিবারিতা।
অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাদ্ যথা ব্যাধির-পেক্ষিতঃ॥ ৩৯৬। ৩৯৭।

ভার্য্যাই পুরুষদিগের গৃহাশ্রমের মূল, যদি তিনি বশবর্ত্তিনী হন; ভার্য্যা যদি বশ-বর্ত্তিনী হন, তাহা হইলে গৃহাশ্রমের তুলনা নাই। তাহা হইলে পুরুষ পত্নীর সহিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ফল ভোগ করেন। যদি পুরুষের স্ত্রী যথেচ্ছাচারিণী হয়, কিন্তু (অত্যন্ত স্ত্রৈণতা হেতু) স্নেহ-বশতঃ তাহাকে না নিবারণ করা যায়, পরে সেই স্ত্রী, অবশা হইয়া উঠে; যেরূপ ব্যাধি, প্রথমে উপেক্ষিত হইলে পরে বিশেষ ক্লেশদায়ক হয় তদ্রূপ। ৩৯৬।৩৯৭।

অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ম্বদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী॥
৩৯৮।

যে রমণী পতির অনুকূলাচরণ করেন, যিনি বাক্যদোষ রহিতা, কার্য্যদক্ষা, সাধ্বী, প্রিয়ম্বদা, আপনাআপনি ধর্ম্ম রক্ষা করেন। এবং পতিভক্তা, তিনি মানুষী নহেন দেবতা। ৩৯৮।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

(দ) ব্যাস সংহিতা ২ অধ্যায়।

হিন্দুর আধুনিক কর্ম্ম।

চতুর্থ প্রস্তাব।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে অতীত ভারতের ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞের দীপ্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানযুগের তুলনা করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই,—পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ আশ্রমপ্রাণীর পিপাসা-পরিতৃপ্তির জন্য বৃক্ষমূলস্থ আলবাল জলপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। তপোবনস্থ প্রাণিবর্গ, জলপানে পিপাসার শান্তি করিত। আর, আজ তাঁহাদেরই বংশধর তুমি, তোমার পানীয় জলে মুখার্পণ করার অপরাধে তৃষ্ণাকাতর অবসন্নদেহ প্রাণীর প্রতি কঠোর অত্যাচারে কৃতসংকল্প! পূর্ব্বে যে অতিথির আগমনে মহর্ষিগণ আশ্রমকুটীর পবিত্র বোধ করিতেন, যাঁহাকে তাঁহারা দেবতার অধিক জ্ঞান করিতেন, আজ তোমার দ্বারদেশে সেই অতিথি শ্রান্ত দেহে দণ্ডায়মান হইয়া পিপাসাকুলিত প্রাণে ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, আর, তুমি হয়ত, মাধ্যাহ্নিক ভোজন শেষ করিয়া কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, ক্লান্ত অতিথির আকুল আহ্বানে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছ! আবার,—হয়ত তুমি, তোমার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অট্টালিকার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া উদ্যান-বিলাসের ব্যবস্থা করিতেছ—আর, এদিকে বহির্দ্বারে দায়গ্রস্ত প্রত্যাশিবৃন্দ তোমার দর্শনপ্রার্থী হইয়া দ্বারবানের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে! পূর্ব্বে পিতৃশ্রাদ্ধদিনে প্রাতঃস্নাত আর্য্য ঋষিগণ বেদিতে উপবেশন করিয়া শ্রাদ্ধের পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিতেন—তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনিশ্রবণে স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হইতেন—শ্রাদ্ধদত্ত পিণ্ডভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেন। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত সে মন্ত্রধ্বনিতে জগৎ পূত হইত। আর, আজ তোমার সেই পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত, তুমি হয়ত, সে শ্রাদ্ধে নৃত্যগীতের প্রচুর বন্দোবস্ত করিতেছ, অথবা উদ্যান-বাটিকায় ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরিবর্ত্তে অন্ত্যজ-ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত! অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানযুগের তুলনা করিতে গেলে আমরা, ধর্ম্মের অধঃপতন এইরূপই দেখিতে পাই। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমরা এই তিনটী যজ্ঞের ভিতর একটু দার্শনিক তত্ত্বের আভাস দেখিতে পাই। ইহা কেবল ঋষিপ্রদিষ্ট কর্ম্ম নহে—ইহা প্রাণের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণ ও জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

এই দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ করিতে হবে। আমরা মৃত্যুর পর কি প্রকারে জন্মান্তর-পরিগ্রহ করিয়া এই ধরাধামে আগমন করি, তৎসম্বন্ধে শিবগীতায় উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন,—

"পুনর্দেহান্তরং যাতি যথা কর্ম্মানুসারতঃ।
আমোক্ষাৎ সঞ্চরত্যেব মৎস্যঃ কুলদ্বয়ং যথা॥"

মৎস্য যেমন জলাশয়ের এক কূল হইতে অন্য কূলে গমন করে, সেইরূপ যাবৎ মোক্ষগতি না হয়, তাবৎ জীব, কর্ম্ম-বশে এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করে। আবার অন্যস্থলে দেখিতে পাই,—

"তত্রৈব কর্ম্ম-শেষেণ যথেতং পুনরাব্রজেৎ।
বপুর্বিহায় জীবত্বমাসাদ্যাকাশমেতি সঃ॥"

জীব কর্ম্মাবসানে পুনরায় চন্দ্রাদি লোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখন সে দিব্য দেহ বিসর্জ্জন দিয়া জীবত্ব লাভ করিয়া আকাশে আগমন করে আবার,—

"আকাশাৎ বায়ুমাগত্য বায়োরপ্ত্বাং ব্রজত্যথ।
অদ্ভ্যো মেঘং সমাসাদ্য ততো বৃষ্টির্ভবেদসৌ॥
ততো ধান্যাণি ভোজ্যাণি জায়ন্তে কর্ম্মচোদিতঃ।
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ॥
স্থাণুমন্যে হনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতঃ।
ততোঽন্নত্বং সমাসাদ্য পিতৃভ্যাং ভুজ্যতে পরং।
ততঃ শুক্রং রজশ্চৈব ভূত্বা গর্ভোঽভিজায়তে।
ততঃ কর্ম্মানুসারেণ ভবেৎ স্ত্রীপুন্নপুং সকং॥"

জীব আকাশ হইতে বায়ুতে আগমন পূর্ব্বক বায়ু হইতে জলে আগমন করে। তার পর জল হইতে মেঘে আসিয়া মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। অনন্তর, কর্ম্ম প্রেরিত হইয়া ধান্য এবং অন্যান্য ভোজ্য রূপে জন্মগ্রহণ করে। অনেক দেহী শরীর-ধারণার্থে অপরাপর যোনি প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ কর্ম্মফলানুসারে স্থাণুদেহও প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ অন্নত্ব প্রাপ্ত হইয়া পিতা-মাতা কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া পরে শুক্র এবং রজোরূপ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মানুসারে স্ত্রী পুরুষ বা নপুংসক হইয়া থাকে। এই জীবাত্মার গতি সম্বন্ধে গীতায় আমরা দেখিতে পাই, ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

এ বিষয়ে মনুতেও উক্ত হইয়াছে,—
"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্য-জাতিতাং॥"

জীব, শরীর দ্বারা কৃত কর্ম্মফলে স্থাবরতা প্রাপ্ত হয়। বাচিক কর্ম্মদোষে পক্ষি-মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করে, এবং মানসিক কর্ম্মফলে অন্ত্যজাতিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে।

এখন যদি এই শাস্ত্রীয় কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, যদি আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং জীবের জন্মান্তর-পরিগ্রহ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, এই পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণীর সহিত আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মিক সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এখন বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যাহার উপর অত্যাচারে কৃতসংকল্প হইয়াছিলে, যে অতিথির করুণ প্রার্থনা বিরক্তিকর বোধ করিতেছিলে, তাহারা তোমার বর্ত্তমান বা অতীত জন্মের সহায় স্বজন প্রভৃতির মধ্যে কেহ, বা তোমার আশ্রিত জন হইতে পারে কি না? যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধদিনে নিজের কর্ত্তব্য ছাড়িয়া ক্ষণিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত, তাহার সেই পিতা—পিতামহাদি এইরূপে কর্ম্ম-ফলানুসারে স্থাবরত্ব, বা অন্ত্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া দারুণ দুঃখানুভব করিতে পারেন কি না? এইজন্যই পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ নিরাশ্রয় প্রাণিদিগের প্রতি, বৃক্ষলতাদির প্রতি, দয়াপরবশ হইয়া নিজের কর্ত্তব্য বোধে আলবালে জলসেচন তণ্ডুলবিকীরণ প্রভৃতি করিতেন। এবং এই জন্যই পিতৃপুরুষের কষ্ট-লাঘব-হেতু, শ্রাদ্ধে পিণ্ডাদিদান-বিধি আছে।

পিতৃ-পুরুষগণ আমাদের দত্ত পিণ্ড ভোজন করেন কি না, তাহা আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাই না, সেজন্য হয় ত আমরা শ্রাদ্ধে

অনাস্থা পোষণ করি, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জীবের গতি এবং তাহাদের কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্বর্গগত পিতৃ-পুরুষগণ শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড ভোজন করিতে স্বর্গ হইতে অবতরণ করুন না করুন, তাঁহারা কর্ম্মফলাশ্রিত অন্য প্রাণিদেহ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পিণ্ড-ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন। শ্রাদ্ধের মন্ত্রানুসন্ধান করিলে আমরা শ্রাদ্ধরহস্য স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমরা পিণ্ড হাতে করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকি—"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং ॥ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধিঃ ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।" আমার বংশে যাঁহাদের মৃত দেহ দগ্ধ হইয়াছে এবং যাঁহাদের দেহ দগ্ধ হয় নাই, তাঁহারা মদ্দত্ত পিণ্ড-ভোজনে তৃপ্তি লাভ করুন এবং তৃপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করুন। এবং আমার কুলে যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, যাহারা বন্ধুবান্ধবশূন্য, যাহাদের অন্নসিদ্ধি নাই এবং যাহারা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি এই ভূমিতে পিণ্ড দান করিলাম, তাহারা লোকান্তরে গমন করুক্ এবং সুখী হউক্। ইহা আমাদের প্রাণের কামনা। এখন এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিলে, এই দার্শনিকতত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যাইবে, ঋষ্যাদি পঞ্চযজ্ঞ আমাদের প্রাণের কর্ত্তব্য কি না—এবং এই কর্ত্তব্যের অপালনে আমরা এতদূর অধঃপতিত কি না? সুতরাং বর্ত্তমানযুগে প্রত্যেক হিন্দুকেই যথাশক্তি এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এ বিষয়ে ইহাই হিন্দুর আধুনিক কর্ম্ম।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

হিন্দু নিরামিষাহারী কেন ?

(স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত)

"নিরীহ প্রাণিবর্গের মাংস আহার করিয়া যাহারা স্বীয় শরীরের মাংস বৃদ্ধি করে, তাহাদের অপেক্ষা স্বার্থপরায়ণ ও নিষ্ঠুর আর কে আছে?——মহাভারত।

"যাহারা উত্তম স্মৃতিশক্তি, সৌন্দর্য্য, দীর্ঘজীবন, উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য এবং শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, মাংসাহারে বিরত থাকা তাহাদের কর্ত্তব্য। —— ঐ

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম"। —— ঐ

মনুষ্যজাতির পক্ষে কি প্রকার খাদ্য স্বাস্থ্যপ্রদ—এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান যুগের প্রথিতনামা চিকিৎসক ও খাদ্যাখাদ্যের বিচারকগণ ঘোর ব্যতিব্যস্ত। ইহারা প্রতীচ্য দেশের খাদ্য সংস্কার করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। ইহাদিগের প্রযত্নে মার্কিণ দেশের সুধীমণ্ডলী নিরামিষাহারের স্বাস্থ্যকারিণী শক্তির বিষয় কতক ২ অবগত হইতে পারিয়াছেন এবং আপনারা নিরামিষাহারী হইবেন কিনা, এ বিষয়ে আলোচনাও করিতেছেন। এতদ্বিষয়িনী আলোচনায় অধুনা যেরূপ সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে পাশ্চাত্যদেশে সেরূপ আর কখনও হয় নাই। গ্রীস দেশের প্রাচীন

দার্শনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে পিথাগোরস্, প্লেটো, সক্রেটীস্, সিনেকা, প্লুটার্ক, টার্চ্চুলিয়ান্, পর্ফাইরী এবং আরও অনেকে নিরামিষাহারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিরামিষাহারী ব্যক্তিবর্গকে ঘৃণা এবং উপহাসের পাত্র মনে করেন। পিথাগোরসের জন্মের বহু দিন পূর্ব্বে, ভারতবর্ষীয় হিন্দু দার্শনিকগণ নিরামিষাহারের প্রাধান্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাবলীতে আমিষাহার ও জীবহিংসার প্রতিকূলে, ন্যায় এবং বিজ্ঞানানুসারিণী বিস্তর যুক্তিও আমরা দেখিতে পাই। বিস্তর ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যদেশীয় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করেন যে, অতি প্রাচীন কালে হিন্দুদার্শনিকগণ নিরামিষাহারের পক্ষপাতী থাকিয়া বিশুদ্ধভাবে নিরামিষাহার করিতেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতেই পিথাগোরস্ নিরামিষাহারের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছিলেন।

এই পৃথিবীতে মাত্র ভারতবর্ষেই বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু ব্যক্তির মধ্যে নিরামিষাহার-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুজাতিই নিরামিষাহার মতের তথ্য প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। হিন্দুজাতির নিকট হইতেই চৈনিক, জাপ, তিব্বতীয়, শ্যামবাসী, ব্রহ্মবাসী, সিংহলবাসী, পারস্যবাসী প্রভৃতি অন্যান্য জাতিগণ সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, খাদ্যের নিমিত্ত প্রাণীহত্যা করা অতীব নিষ্ঠুর ও গর্হিত কার্য্য। শারীরিক স্বাস্থ্য, আমাদিগের শারীর যন্ত্রাদির আবয়বিক গঠনাদি, খাদ্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণ, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মনীষী ও ঋষিগণ নিরামিষাহার-প্রথার অনুকূল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকগণ আমিষাহারের পক্ষপাতী নহেন। ইঁহারাও পাশ্চাত্য দেশবাসী ডাক্তারদিগের ন্যায় বলিয়া থাকেন যে, মাংসাহারই অজীর্ণ, বাত, হাঁপ, স্নায়বিক পীড়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রধান কারণ। হিন্দুবৈদ্যগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আহারোদ্দেশ্যে যে সকল প্রাণীকে পুষ্ট করা হয়, সেই সকল প্রাণী অস্বাভাবিকরূপে জীবনাতিবাহিত করা প্রযুক্ত এবং অস্বাভাবিক দ্রব্য আহার করিতে বাধ্য হওয়ায়, ন্যূনাধিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ইঁহারা আরও বলেন যে, মাংসাহার-কালে মাংসের সহিত পরশোণিতজীবি কীটাদি ও বিবিধ পীড়ার জীবাণু মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হয়। ইঁহারা ইহাও বলেন যে, যখন প্রাণীগণ অন্যান্য দ্রব্য আহার করিয়া পুষ্ট হয়, তখন মাংস মাত্রই মল মূত্রাদি কতিপয় দূষিত পদার্থের সংস্রবে দুষ্ট হইয়া থাকে, কেননা হত্যাকালে ঐ সকল দূষিত পদার্থের নিস্রাব হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হত প্রাণীর শরীরাভ্যন্তরেই থাকিয়া যায়। এই সকল পদার্থের কোন কোনটী—বিশেষতঃ মূত্রক ক্রয়েটীন্ নামক পদার্থটী অতীব বিষাক্ত। মাংসাহার-প্রযুক্ত রক্তে ফাইব্রিন্ নামক সৌত্রিক পদার্থ বহুলরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন দেহাভ্যন্তরে,

অস্বাভাবিক উত্তাপ উৎপন্ন হওয়ায় অস্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে; পরিণামে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আসিয়া দেখা দেয়। এই পীড়ায় বহু মাংসাহারী ব্যক্তিই ক্লেশ পাইয়া থাকেন। নিরন্তর মাংসাহার করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় অকালে জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। স্যর ইভারার্ড হোমের ন্যায় শারীর-বিদ্যাবিশারদ ও শরীর-ব্যবচ্ছেদপটু পণ্ডিতগণ মনুষ্যের দন্ত, পাকস্থলী, কণ্ঠনালী হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রভৃতি স্থানসমূহ, আনুবীক্ষণিক রক্ত কণিকা প্রভৃতির গঠন এবং পরিপাক-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যকে মাংসাহারী অপেক্ষা ফলাহারী প্রাণীর শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

যব-গোধূমাদি নানাপ্রকার শস্য, নানাবিধ ফল, অশেষপ্রকার উদ্ভিদ্ এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবের মাংস এই গুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে এবং জৈব মাংসের উপাদানের সহিত উদ্ভিদের উপাদানের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, মেদোবৃদ্ধিকর, স্নায়ুশক্তি-বর্দ্ধক এবং সমগ্রদেহের পুষ্টিকর যাবতীয় পদার্থই আমরা উদ্ভিদ্ রাজ্য হইতে অনায়াসে আহরণ করিতে পারি। দেহের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসাধন পক্ষে শ্লৈষ্মিক, অণ্ডলালিক ও সৌত্রিক পদার্থ, চর্ব্বি এবং ক্ষারজ ধাতু নিতান্ত আবশ্যক। ঐ সকল গুলি যেমন আমরা মাংসাহার হইতে পাইয়া থাকি, তদ্রূপ প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ্রাজ্য হইতেও পাইতে পারি। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদ্ হইতে আমরা শ্বেতসার ও শর্করা পাই। কিন্তু এই দুইটী দ্রব্য মাংসে নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—"তবে আমরা মাংস আহার করি কেন"? "পুষ্টির জন্য কি?"—না। উদ্ভিদ্ ডাউল ও নানাপ্রকার শস্য হইতেও ঠিক ঐরূপ পুষ্টিসাধন হইতে পারে। তবে কি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমরা মাংসাহার করি? না। কেননা, নিরামিষভোজীদিগের প্রত্যেকেই অধিকাংশ মাংসাহারীদিগের অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যবান্। তবে মাংস আহার করা হয় কেন? বংশ-পরম্পরাগত অভ্যাস বশতঃ এবং কুসংস্কার, কদাচার ও অজ্ঞতাপ্রযুক্তই ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন কালে, যখন কৃষিকার্য্য অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন মনুষ্যেরা নানাবিধ ফল, এবং অনায়াসলভ্য নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিত। কিন্তু কালক্রমে যখন ফলাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন ইতরপ্রাণীদিগের মত মনুষ্যদিগের মধ্যেও প্রকৃষ্টভাবে জীবন-সংগ্রাম আরব্ধ হইল। তখন, তাহারা যাহা পাইল, তাহাই খাইতে প্রবৃত্ত হইল। এবম্বিধ অবস্থায়, কিরূপে জীবনরক্ষা হইবে, সেই দিকেই লক্ষ্য হইল, খাদ্যাখাদ্যের বিচারের দিকে দৃষ্টি রহিল না। যে সকল অসভ্য জাতি কৃষিকার্য্য জানে না, এবং উপযুক্ত ফলাদিও পায় না, তাহারা প্রধানতঃ বন্যপ্রাণী, পক্ষী সরীসৃপ এবং পতঙ্গাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

মনুষ্য জাতি, মাংসাহার এইরূপেই আরম্ভ করিয়া ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, মাংস মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য, কিন্তু তাহা নহে। মাংসাহার অভ্যাস, নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই হইয়া ছিল। পরে পিতার নিকট হইতে পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। সভ্য জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই শৈশবকাল হইতেই মাংসাহার করিতে শিক্ষা করেন এবং পিতা মাতাই ইঁহাদের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকেন। এই রূপে ক্রমে ইঁহাদের একটী ধারণা হইতে থাকে যে, মাংস না হইলে আর চলে না। কোন কোন অসভ্য জাতি, প্রচুর পরিমাণে অন্য প্রাণীর মাংস না পাইয়া নরমাংসভোজী রাক্ষস পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে; ঐ রাক্ষস-দিগের আচরণ দেখিয়া কি বলিতে হইবে যে, নর-মাংসই মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য? অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে আদিম অধি-বাসীরা ঘৃণিত কীট ও সরীসৃপ আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। ভারতবর্ষে একশ্রেণী পাহাড়ী অসভ্য জাতি, বিষধর সর্প (অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত) আহার করিয়া থাকে। তবে কি বলিতে হইবে যে, এই সকল দ্রব্য মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য? রন্ধনের সাহায্যে মনুষ্য যে কোনও দ্রব্য আহার করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি বিবেচনা করিতে হইবে যে, মনুষ্য-জাতি শূকর-শিশুর মত স্বভাবতঃ সর্ব্বভুক্? কত অন্তরীপে গরুতে মাছের আঁইস্ প্রভৃতি পরিত্যক্ত অংশ আহার করে; অশ্বকে গোমাংস আহার করিতে শিক্ষা করান যায়; ভল্লুককে তামাক সেবন করিতে শিক্ষা করান যায়; বানর অনায়াসেই চা, কাফি মদ্য পান করিতে শিক্ষা করে। এই সকল অদ্ভুত অভ্যাসগুলি দ্বারা কি আমা-দিগের বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যের মাংসাহার অভ্যাস স্বাভাবিক?—নিশ্চয় না। মাংস মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য নহে। বিবিধ প্রকার শাক সব্জী, নানাপ্রকার ফল, শস্য প্রভৃতিই মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য। এবং ঐ সকল দ্রব্য পৃথিবীতে আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

হিন্দুসন্তানগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই মনুষ্যোচিত উৎকৃষ্ট দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। পরে যতই তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই তাহাদিগকে সর্ব্বজীবের প্রতি দয়ালু হইতে দেখা যায়। তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়:—"ইতর প্রাণীদিগের প্রতি দয়ালু হইবে। আহারের দ্রব্য মনে করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিও না। কেন না, প্রাণী মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য নহে"। আমি সংস্কৃতের প্রথম পুস্তকেই শিক্ষা করিয়া ছিলাম:—"পৃথিবীতে যে সকল দ্রব্য আপনা হইতেই জন্মিতেছে, সেই সকল দ্রব্য হইতে যখন যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ক্ষণিক রসনা-তৃপ্তির জন্য এবং উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত প্রাণীহত্যারূপ মহাপাপ কে করে? যে প্রাণীকে আহার করা যায়, উহার সহিত উহার খাদকের তুলনা করিবে। খাদকের সুখ কয়েক সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী; ইহারই জন্য একটী জীবের সারা জীবনের সুখ নষ্ট করা হয়।" সিনেকাও এইরূপ ভাবের

একটী কথা বলিয়াছেন :—"গাকস্থলীর পক্ষে উদ্ভিদ্ আহারই যথেষ্ট, অথচ কত মূল্যবান্ জীবন দ্বারা আমরা উহা পূর্ণ করিতেছি !"

আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে বা আহারের জন্য প্রাণীহত্যা করা পাপ কেন, একথাটি হৃদয়ঙ্গম করা পাশ্চাত্য-দেশবাসীদিগের পক্ষে নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। এইরূপ ব্যাপারে তাঁহাদিগের ধর্ম্মই বিঘ্নস্বরূপ। তাঁহাদের ধর্ম্ম বলে যে, ইতরপ্রাণীদিগের আত্মা, মন, চিন্তাশক্তি এ সব কিছুই নাই। তাহারা মনুষ্যের খাদ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। পরম কারুণিক জগদীশ্বরের প্রদত্ত এই আহার সামগ্রীগুলিকে ভক্ষণ করা এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। খৃষ্টধর্ম্ম-প্লাবিত দেশে, ঈশ্বর-সমীপে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিবার জন্য "থ্যাঙ্ক্স্ গিভিং" নামক একটী পর্ব্ব আছে। এই পর্ব্ব এবং খৃষ্টমাস পর্ব্ব উপলক্ষে বহু প্রাণী হত্যা করা হয়! যেন পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহার স্বীয় প্রাণীর হত্যা এবং মাংসাহার ব্যতীত খৃষ্টানদিগের উপাসনা গ্রহণ করিবেন না! উঁহাদিগের ধর্ম্মের উপরোক্ত শিক্ষাই এবম্প্রকার হত্যাকাণ্ডের প্রধান কারণ। যখন আমি একটী বন্ধুর সহিত নিরামিষাহার-প্রথা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে ছিলাম, তখন লণ্ডন-সহরস্থ উচ্চ-পদস্থ একজন ধর্ম্মযাজক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমার বন্ধুটীকে এইরূপ বলিলেন :—"ঐ সব মতে কর্ণপাত করিবেন না। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ঐ সকল মত শয়তানের মত।" তিনি তৎপর নিউটেষ্টামেণ্ট নামক ধর্ম্মপুস্তক হইতে এইরূপ বচন উদ্ধৃত করিলেন :—"ঐশ আত্মা এখন স্পষ্টই বলিতেছেন যে, উত্তর-কালে কতকগুলি লোক ধর্ম্মচ্যুত হইবে। তাহারা শয়তানের প্রলোভন-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া তদীয় ধর্ম্মমত গ্রহণ করিবে। যে মাংস, ঈশ্বর, আমাদিগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহা আহার করিতে করিতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করাই বিশ্বাসী ও ধর্ম্মাত্মাদের কর্ত্তব্য, সেই খাদ্য গ্রহণ করিতে শয়তান নিষেধ করিবে। ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রাণীই সৎ, কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না। সকলকেই লইতে হইবে এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে। ঈশ্বরীয় বাক্য ও উপাসনা দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীই পবিত্রীকৃত হয়।" (১টাই মথি ১ম অঃ, ১, ৩, ৪, ৫) যাহারা এবম্প্রকার বাক্যকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদের পক্ষে খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যা কার্য্যটি যে পাপজনক, এ কথাটি অনুধাবন করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? উক্ত প্রকার বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্ একজন খৃষ্টানের পক্ষে খাদ্যার্থে প্রাণীহত্যা-কার্য্য পাপজনক এ কথাটী বুঝা যেমন অসম্ভব, একজন হিন্দুর পক্ষে এটা বিশ্বাস করাও তদ্রূপ অসম্ভব যে, পরম দয়ালু জগদীশ্বর ইতর প্রাণীগুলিকে মাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন! ইতরপ্রাণীগুলি মনুষ্যের খাদ্যার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এই বিশ্বাসটী সম্পূর্ণভাবে মূলতঃ ইহুদী "সিমাইটী" প্রচারিত ধর্ম্মসম্ভূত। এবম্প্রকার ধর্ম্মমত হিন্দুজাতির নিকট ভয়াবহ; কেনা না,

হিন্দুধর্ম্মে এরূপ শিক্ষা নাই যে, একজন জগৎস্বতন্ত্র, মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট ভগবান্ এই পৃথিবীটা অকস্মাৎ সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন, স্বর্গের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন এবং সেখান হইতে মনুষ্যগণকে হুকুম দিতেছেন যে "তোমরা প্রাণীগুলিকে হত্যা করিয়া আহার কর, ঐ উদ্দেশ্যেই আমি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

যদিও বৈদিক ধর্ম্ম (ইহাকে ভ্রমবশতঃ ব্রাহ্মণধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে), বৌদ্ধধর্ম্ম জৈনধর্ম্ম প্রভৃতি ভিন্ন ২ মত হিন্দুধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ হিন্দুধর্ম্মটী একটী সাধারণ তথ্যের উপর স্থাপিত। সেই তথ্যটী এই যে, মনুষ্যজাতি ইতরপ্রাণীরই অভিব্যক্তি। হিন্দুধর্ম্ম বলে যে, একটী অবিচ্ছিন্ন জাগতিক জীবন-প্রবাহ ধাতু, উদ্ভিদ্, এবং প্রাণীরাজ্যে নানা আকারে প্রকট হইতেছে এবং যাবতীয় দৃশ্য বস্তুই একটী অতিদৃঢ় বিবর্ত্তন-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম জীবাণু হইতে মহিমাশালী পুরুষসিংহ পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্তরই অন্য স্তর হইতে মাত্র বিবর্ত্তনের ন্যূনাধিক্য সম্বন্ধেই পৃথক্, কিন্তু স্তরগুলির মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য নাই। হিন্দুধর্ম্ম এ কথা কদাচ বলে না যে, ইতরপ্রাণীদিগের আত্মা, মন ও চিন্তা-শক্তি নাই। হিন্দুধর্ম্মে বলে যে, জীবন ও মন যুগপৎ পরিব্যক্ত হইতেছে। যেখানেই জীবন, সেখানেই আনুষঙ্গিক মনের পরিস্ফুরণ, এবং এই পরিস্ফুরণের ক্রমেরই তারতম্য মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধাতুতে এই পরিস্ফুরণ অতীব সামান্য, উদ্ভিদে তদপেক্ষা একটু অধিক, এবং প্রাণীরাজ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক। এমন কি, মাত্র এককোষবিশিষ্ট অতিসূক্ষ্ম জীবাণুরও মন আছে। ইহারও বেদনা অনুভবের শক্তি আছে এবং সেও এবম্প্রকার অনুভূতি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমানযুগের প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এ কথা অস্বীকার করেন না। অধ্যাপক লিব, কিন্তু তদীয় কতিপয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অতি দৃঢ়তা-সহকারে এবম্বিধ মতেরই পরিপোষণ করিয়াছেন। জীব-রাজ্যে আমরা যতই উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হই, পূর্ণায়ত জীবশরীরে আমরা ততই একই জীবনী-শক্তি ও মনের অভিব্যক্তি অনুভব করিতে পারি, এবং পরিশেষে, মানবদেহের অতীব বিশিষ্ট ও জটিল শারীর-বিধানের অভ্যন্তরে এই জীবন ও মনের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাই। এই সকল প্রাণীর প্রত্যেকেরই আত্মা আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে, অহংবোধ আছে; সুখ-দুঃখ অনুভব আছে, মৃত্যুভয় আছে এবং বাঁচিবার জন্য জীবন-সংগ্রামও আছে। এই সকল প্রাণীর প্রত্যেকের জীবাণুই ক্রমান্বয়ে নানা প্রকার বিবর্ত্তন স্তরের মধ্য দিয়া গমন করিবে, এবং সর্ব্বশেষে মানবদেহে পরিস্ফুট হইবে। এতন্নিবন্ধন, হিন্দুজাতির দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে যে, আমাদিগের প্রাণ আমাদিগের নিকট যেরূপ প্রিয়, তদ্রূপ ইতরপ্রাণীদিগের প্রাণও তাহাদিগের নিকট প্রিয়; আমরা যেরূপ হত হইতে ইচ্ছা করি না, সেইরূপ তাহারাও মৃত্যুকে

ভয় করে। "আমোদ-প্রমোদ জন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করিও না। প্রকৃতির অভ্যন্তরে একত্ব অনুভব কর এবং সর্ব্ব-জীবকে সাহায্য কর", এই মহাবাক্যই হিন্দুশাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থে অর্থাৎ বেদে বলে :—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" অর্থাৎ খাদ্যার্থেই হউক, বা আমোদ-প্রমোদ জন্যই হউক, কোন প্রাণীর জীবন-হরণ করিও না।

হিন্দুদিগের মহাকাব্য রামায়ণে কিম্বা রামলীলায় আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, ইতরপ্রাণীদিগকে আমাদের ভ্রাতার মত জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জগতের মধ্যে ইতরপ্রাণীদিগেরও যে মূল্য আছে, এই কথাটী অতি সুন্দর কবিত্বের সহিত এবং নাটকাকারে ঐ মহাকাব্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাকাব্যে এইরূপ বর্ণনা আছে:—এই পৃথিবীতে রামচন্দ্র, জগদীশ্বরের পূর্ণ অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সীতা-দেবী তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। লঙ্কার রাক্ষসরাজ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য রামচন্দ্র ঐ রাক্ষসরাজের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সকল প্রকার ইতরপ্রাণী লইয়াই রামচন্দ্রের বিপুল সেনাদল গঠিত হইয়াছিল। বিবর্ত্তন-প্রথানুসারে, আবয়বিক পূর্ণতা হিসাবে বানরজাতিই মনুষ্যের অব্যবহিত নীচে পরিগণিত হইতে পারে। এই বানর-জাতির হনুমান্ রামচন্দ্রের সেনাপতি ছিল। ভল্লুক প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রাণীরা সেনা ছিল। গল্পটী এরূপ দক্ষতার সহিত বলা হইয়াছে যে, উহা পাঠ করিলে ইতর-প্রাণীদিগকে খাদ্যার্থে বধ করিবার ইচ্ছা দূরে থাকুক, উঁহাদের প্রতি সদয় না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।

প্রতীচ্যদেশবাসীদিগের একটী ভ্রম আছে যে, বুদ্ধ সংস্কারক ছিলেন এবং তিনিই হিন্দুদিগের মধ্যে নিরামিষাহার-প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এই ধারণাটি ভুল। বেদে অহিংসা-মত প্রচারিত ছিল। অল্পসংখ্যক ঋষিরা এই মতাবলম্বী ছিলেন। বুদ্ধ সাধারণের মধ্যে ঐ মতের বিস্তার করিয়াছিলেন মাত্র। পুরোহিতেরা যে প্রাণী বলি দিতেন, বুদ্ধ তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আহার করিবেন বলিয়া যে পুরোহিতেরা প্রাণী বলি দিতেন তাহা নহে; দেবতাদিগকে প্রসন্ন করাই পুরোহিতদিগের উদ্দেশ্য; কেন না, তাঁহারা ভাবিতেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া শত্রুনিধন করিতে সক্ষম হইবেন।

কেহ২ এরূপ বলেন যে, স্বভাবের নিয়মানুসারে, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার নিমিত্ত প্রাণীহত্যা নিতান্ত আবশ্যক; শীকারী পক্ষী, অন্য পক্ষী আহার করিয়া জীবিত থাকে এবং মাংসাশী জীব, অন্য জীব আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে; অতএব আমরাও মাংসাহার করিতে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মতঃ আদিষ্ট। সত্য বটে যে, হত্যা-ব্যাপারটী প্রকৃতির নিয়মান্তর্গত। কিন্তু মাত্র ইতরপ্রাণীর প্রকৃতিই ঐ নিয়মে নিয়মিত। ঐ নিয়মটীকে আমরা পাশবিক নিয়ম বলিতে পারি। আমাদিগের মধ্যে

সৎপ্রকৃতির উন্মেষ-সাধক নিয়মপুঞ্জও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিয়মগুলিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম বলা হয়। এইগুলি মাত্র মানবেই প্রকাশমান। ইতর-জীবের জীবনে ইহা পরিদৃষ্ট হয় না। যদি আমরা এই উচ্চতর গুণ গুলির অনুভূতি না করিতে পারি, তবে ইতরপ্রাণী হইতে কখনই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইব না। ইতর প্রাণীদিগের বৃত্তিগুলি অপেক্ষা মনুষ্যের বৃত্তিগুলি অধিকতর পূর্ণায়ত ও পরিস্ফুট—এই কারণেই যে মনুষ্য, প্রাণী-রাজ্যের শীর্ষস্থানে আরূঢ়, তাহা নহে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলে মনুষ্য ইতর-প্রাণীসুলভ বৃত্তিনিচয়কে দমন করিতে সক্ষম বলিয়াই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। যে ব্যক্তির চরিত্রে এবম্প্রকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের অভাব, সে ব্যক্তি নিম্নতম পশুশ্রেণী হইতে কিছুমাত্র উন্নত নহে। মনুষ্যগণ আপনাদিগকে অধঃপতিত করিয়া নিকৃষ্টতম পশুতুল্য করিতে পারে, আবার আধ্যাত্মিকতার চরমোৎকর্ষে উন্নত হইতেও সক্ষম। তাহারা সম্পূর্ণভাবে আপনাদিগের ঐশী প্রকৃতির উন্মেষ সাধন করিতে সমর্থ। সংক্ষেপতঃ তাহারা পৃথিবীতে যাবতীয় সদ্‌গুণের অবতার-স্বরূপ হইয়া কালাতিপাত করিতে পারে। একই মনুষ্য যেমন একদিকে সংহার, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিতে পৃথিবীকে পূর্ণ করিতে পারে, তেমনি অন্য দিকে পরোপকার, সদিচ্ছা, শান্তি, প্রেম ও সুখ পৃথিবীর পরে বিকীর্ণ করিতে সক্ষম। একই শক্তি, যখন ইতরপ্রাণী-সুলভ প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন সর্ব্বনাশকারিণী ও আসুরভাবময়ী হইয়া উঠে; আবার যখন উৎকৃষ্টতর বৃত্তি ও প্রেম দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন সকলের আনন্দবিধায়িনী হইয়া থাকে।

হত্যাগৃহের কষাইদিগের নৈতিক অবনতির কথাটা একবার অনুধাবন করিয়া দেখ। নিরন্তর হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত থাকা প্রযুক্ত তাহাদিগের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি অসাড় হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে তাহারা পশুতুল্য হইয়া উঠে। যে ছুরিকা দ্বারা তাহারা নিরপরাধ প্রাণীগুলিকে হত্যা করিয়া থাকে, পরিশেষে সেই ছুরিকাই স্বজাতির হৃদয়ে বিদ্ধ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। পৃথিবীর মধ্যে চিকাগো নগরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক হত্যা-গৃহ আছে। তথায় প্রতিমাসে শিক্ষিত কষাইগণ বহু সহস্র প্রাণীহত্যা করে। চিকাগো নগরের অধিকাংশ নরহত্যাকারীই কষাই শ্রেণীভুক্ত। তাহাদিগের নৈতিক অবনতির এবং আইন-বিগর্হিত অপরাধের জন্য কে দায়ী? মাংসাহারী ব্যক্তিবর্গ, মাংসাহারের এই পরিণতির কথাটা কি একবার ভাবিয়া থাকেন? তাঁহারা এবম্প্রকার বিষয় শ্রবণ বা চিন্তা করিতে অনিচ্ছুক। কেন না, এতদ্দ্বারা তাঁহারা কোমল প্রাণে আঘাত প্রাপ্ত হন। এবম্বিধ দৃশ্য ও বাক্যে, তাঁহারা চক্ষু—কর্ণ নিরোধ করিতে চান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই মাংসাহারী ব্যক্তিগণই দায়ী। ঐ কষাইগণ কর্ত্তৃক যে সমুদয় নিষ্ঠুর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ের গৌণ কারণই মাংসাহারী

ব্যক্তিগণ ; ইঁহারাই উহাদিগের নৈতিক অধঃপতনের কারণ। যদি কেহ মাংসাহারী না থাকিত, তবে কষাইও কেহ হইত না। একজন শিক্ষিতা মহিলা, একজন কষাই-এর রক্তাক্ত কর দর্শন করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ঐ কষাইটিকে অধঃপতিত ও পশুতুল্য করিবার জন্য তিনিও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। নিজের আহারের জন্য এই মহিলা যদি স্বহস্তে পশু-হনন করিতেন, তাহা হইলে সেই কার্য্যটী বোধহয় অধিকতর ভাল হইত ; কেন না, তাহা হইলে তাঁহার জন্য অপর এক ব্যক্তিকে নিষ্ঠুর হত্যাকারী হইতে হইত না। প্রত্যেক দেশের লোকেই কষাইদিগকে নিষ্ঠুর ও দয়ামায়াশূন্য বলিয়া জানে। ভারতবর্ষে তাহারা ভদ্র-সমাজে স্থান পায় না। হিন্দুগণ মনে করেন যে, কোনও ব্যক্তিকে "কষাই" সম্বোধন করা অপেক্ষা তীব্রতর গালাগালি আর নাই। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত কোন ২ প্রজাতন্ত্র রাজ্যে এই নিয়ম আছে যে, যে ব্যক্তি এবম্বিধ ব্যবসায়ে সংসৃষ্ট, তাহাকে খুনী-মোকর্দ্দমার বিচারকালে জুররূপে বসিতে দেওয়া হইবে না। কেন না, প্রাণীহত্যা-কার্য্যে সংলিপ্ত থাকা প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির চিত্ত, কোমল বৃত্তি ও সমগ্র নৈতিক প্রকৃতি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ঝাল-মসলাসংযুক্ত গোমাংস সম্মুখে রাখিয়া, টেবিলে খানা খাইতে বসিয়া, যদি কেহ একবার স্মরণ করেন যে, কি ভাবে হত্যাগৃহ হইতে রান্নাঘরে মাংস পৌঁছিয়াছিল, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, হৃদয়বান্ মাংসাহারীর বারো আনা ব্যক্তি অবিলম্বে মাংসাহার ত্যাগ করেন। আমার পরিচিত একজন মার্কিন-যুবক চিকাগো সহরের হত্যাগৃহগুলি দর্শন করিতে যাইয়া, তথাকার অমানুষিক পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়া এরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, সেইদিন হইতে তিনি আর কখনও মাংস স্পর্শও করেন নাই। কোন মাংসাহারী ব্যক্তিই নৈতিক দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পান না। তাঁহার স্বশ্রেণীভুক্ত ভ্রাতৃবৃন্দের নৈতিক অধঃপতনের জন্য তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে দায়ী হইতেই হইবে।

মাংসাহারী ব্যক্তিবর্গ, নিরামিষাহারের প্রতিকূলে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, প্রাণী আহার না করিলে ঐ সকল প্রাণীতে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যাইবে। গো, মেষ, শূকর-ছাগ গৃহপালিত পক্ষী প্রভৃতির সম্বন্ধে যেমন উপরোক্ত যুক্তিটী প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ অশ্ব, গর্দ্দভ, কুক্কুর, মার্জ্জার, মূষিক প্রভৃতির সম্বন্ধেও উহার প্রযোগ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে হিন্দুরা গোহত্যা করে না, কিন্তু গরুতে ভারত ছাইয়া পড়ে নাই। ইংরাজগভর্ণমেন্টই ভারতে হত্যাগৃহ স্থাপন করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে হিন্দুদের ঐ প্রকার কোন রূপ হত্যাগৃহ ছিল না। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি হিন্দুরাজ্য আছে, তথায় কঠোর আইন প্রচার দ্বারা বহু পশুপক্ষীদিগকে রক্ষা করা হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল রাজ্যগুলি বন্য প্রাণীতে ছাইয়া পড়ে নাই এবং উহাদের অবস্থা বৃদ্ধি

হওয়ায় তথাকার অধিবাসীদিগকে স্থানাভাবে দেশ ছাড়িয়াও যাইতে হয় নাই।

ডাক্তার জে, এইচ বারোস্ একজন মার্কিনবাসী। ইনি পূর্ব্বে চিকাগো সহরে ছিলেন। সম্প্রতি ইনি অল্পদিনের জন্য ভারত-ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক সহরে বক্তৃতাকালে ইনি এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, ইনি বারাণসী সহরের সদর পথে কতকগুলি ষাঁড় দেখিয়াছিলেন। খাদ্যার্থে যে সকল ষাঁড় পোষা হয়, তাহারা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। উহাদের সহিত তুলনা করিলে, বারাণসীর ষাঁড় রোগা ও কাহিল। তাঁহার হৃদয়, ষাঁড়গুলিকে রোগা দেখিয়া দয়া ও করুণায় গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন যে, এই প্রাণীগুলিকে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে জীবিত থাকিতে দেওয়া অপেক্ষা উহাদিগকে হত্যা করিয়া আহার করা অধিকতর দয়ার কার্য্য! এবম্প্রকার দয়ার কার্য্য কি অদ্ভুত! ডাক্তার ব্যারোস্ আরও বলিয়াছেন যে, আমরা যদি মৎস্য আহার না করি, তবে শীঘ্রই ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদ্রগুলি মৎস্যে একবারে পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রকৃতির নিয়ম বশতঃই উৎপাদন এবং যথাযথ সংরক্ষণ হইয়া থাকে। এই প্রকৃতির নিয়ম-বলেই মৎস্যেরও ধ্বংস-সাধন হইতেছে। তাহা যদি না হইত তবে, মৎস্য-সংখ্যা হ্রাস করিতে মনুষ্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইত। কিন্তু মাংসাহারে অভ্যস্ত বন্ধুবর্গের নিকট হইতে এবম্প্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা নূতন কথা নহে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, মাংসাহার না করিলে তাঁহারা দুর্ব্বল, কর্ম্মে অপটু এবং সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি গুণে বঞ্চিত হইবেন। এটী একটী মস্ত ভুল। তোমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দু শিখসৈন্যের কথা শ্রবণ করিয়াছ। ইংরাজ-সৈন্যদলের মধ্যে উহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী এবং বলবান্ যোদ্ধা। সমরক্ষেত্রে উহারা শত্রুকে কখন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে জানে না। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে একজন শিখ সৈন্য, তিন জন গোমাংসাহারী সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। কিন্তু এই শিখসৈন্যেরা মাছ-মাংস কদাপি স্পর্শও করেনা। কদাপি মদ্যপান কিম্বা তামাক-সেবন করেনা। ইঁহারা খাঁটী নিরামিষভোজী। লক্ষ লক্ষ স্কটল্যাণ্ডবাসী জোলার ছাতু আহার করিয়া বলবান্, স্বাস্থ্যবান্, কর্ম্মঠ ও জ্ঞানবান্ হইয়াছিলেন। জার্ম্মানি দেশে সাত জন মল্লের একটী দৌড়-বাজী হইয়াছিল, তন্মধ্যে একজন নিরামিষাহারী; দেখা গেল—বল-পরীক্ষা ক্রীড়া-কৌতুকেও নিরামিষাহারী ব্যক্তিই মাংসাহারীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল। নিরামিষাহারে বিপুল সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি হয় এবং নিরামিষভোজী ব্যক্তির চিত্ত স্থির থাকে। সাধারণতঃ সকলে উগ্র, চঞ্চল, গোঁয়ার প্রকৃতিকে সাহস এবং শক্তি বলিয়া মনে করে। ইহারা বলে যে, একটী বাঘ কিম্বা নেকড়ে বাঘ, অশ্ব, মহিষ কিম্বা হাতী অপেক্ষা বলবান্। ইহারা উগ্র-প্রকৃতিকে শক্তির পরিমাপক মনে করে। সত্য বটে, একটী বাঘ একটী অশ্বকে হত্যা করিতে পারে, কিন্তু যে দৈহিক বলে একটী অশ্ব একটা ভারি বস্তু বহু দূরে

লইয়া যাইতে পারে, ঐ দৈহিক বল বাঘের আছে কি ? একটা ব্যাঘ্র একটা হাতীকে বধ করিতে পারে, কিন্তু শত শত পাউণ্ড ওজনের একটা কামান তুলিবার শক্তি উহার আছে কি ? উগ্রতা এক জিনিষ এবং দৈহিক বল স্বতন্ত্রপ্রকার জিনিষ। উভয়ের পার্থক্য আমাদের বুঝা কর্ত্তব্য। রক্ত-মাংস শক্তি-দায়ক নহে; উদ্ভিদ্‌রাজ্যই শক্তির প্রস্রবণ। যদি মাংসাহারই দৈহিক শক্তির নিদান হইয়া থাকে, তবে মাংসাহারীগণ উদ্ভিদ্‌ভোজী-দিগের মাংসই অধিকতর রূপে আদর করেন কেন ? এবং মাংসাশী প্রাণীর মাংসই বা তদ্রূপ আদর না করেন কেন ? কোন কোন মাংসাহারী ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে, জৈব মাংসে অন্নায়তনের মধ্যে অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ্‌শক্তি নিহিত থাকে। মাংসাহার অভ্যাসের যদি ইহাই কারণ হয়, তবে ব্যাঘ্র, নেকড়ে বাঘ, গৃধ্র, শ্যেন-পক্ষী প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

নিম্ন প্রাণী-জগতে যেরূপ উদ্ভিদ্‌ভোজী-দিগের অপেক্ষা মাংসভোজীরা চঞ্চলচিত্ত, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যেও নিরামিষাহারী অপেক্ষা মাংসাহারী অধিকতর চঞ্চল ও অজি-তেন্দ্রিয়। শান্তিপূর্ণ, সুপ্রতিষ্ঠিত, আত্ম-বশীকৃত প্রকৃতিই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম লক্ষণ; সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির পক্ষে জৈব খাদ্য ততটা অনুকূল নহে। এই কারণেই কোন বিষয়-বিশেষে চিত্ত স্থির করা, মাংসাহারী-দিগের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। আপনাদিগের আধ্যাত্মিকী ও ঐশী প্রকৃতি-বিদ্বেষিণী চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়াও তাঁহা-দের পক্ষে অসম্ভব। হিন্দুরা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার গুপ্ত মন্ত্র জানেন এবং ঐ কারণেই তাঁহারা মাংসাহারের পরি-পন্থী। যে সকল হিন্দু, আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য সারাটী জীবন ও মানসিক শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে যোগী কহে। ইঁহাদিগের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবার একটি উপায় অহিংসা। খাদ্য ও আমোদ জন্য প্রাণী হত্যা কার্য্যটীকে ইঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—"কৃত" "কারিত" "সম্মত"। উদাহরণ যথা, আমি স্বহস্তে একটী প্রাণীহত্যাই করিলাম। যোগী-দিগের মতে এইটী "কৃত"। দ্বিতীয়তঃ আমি অন্যের দ্বারা হত্যা করাইতে পারি; এবং তৃতীয়তঃ, কসাইয়ের নিকট হইতে মাংস খরিদ করিবার মত অন্যান্যকৃত হত্যায় আমি সম্মত থাকিতে পারি। যোগী-দিগের মতে, যিনি অহিংসাধর্ম্ম পালন করি-বেন, তিনি নিজে হত্যা করিবেন না, অন্যের দ্বারাও হত্যা করাইবেন না, এবং অন্যের হত্যাতেও সম্মত থাকিবেন না। যখন একজন যোগীর এই প্রকার অহিংসা-ধর্ম্মটী সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, তখন কেহই তাঁহার ক্ষতি করিবেনা, এমন কি ব্যাঘ্র সর্পও না। ব্যাঘ্র ও সর্প আমা-দিগের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, কেন না তাহাদিগের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছাও আমা-দিগের অন্তঃকরণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয় যোগীগণ উৎকৃষ্ট দৈহিক

নিয়ম যথার্থরূপে পালন করিয়াছেন। ইঁহারা ইতরপ্রাণীর উপরও এই নিয়মটির প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এইরূপে উহাকে সার্ব্বজনীন নিয়মে পরিণত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। যোগীগণের সম্মুখে হিংস্র প্রাণীরাও শান্তভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম যোগী ও যোগিনীগণের মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতিতে এবম্বিধ অবস্থাটী সুন্দর আদর্শরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। পরমযোগী শিবের শরীর মস্তক ও অংশোপরে অত্যুগ্র বিষধর অলঙ্কারের ন্যায় ন্যস্ত আছে। পরমা যোগিনী দুর্গা, হিংস্র-স্বভাব সিংহের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা। প্রকৃতপ্রস্তাবে এবম্বিধ যোগীদিগের পৃথিবীতে কোন শত্রুই নাই।

আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত হিন্দু যে কেন মাংসাহার করেন না, তাহার আর একটী কারণ এই যে, যেখানে মাংসাহার সেখানেই সুরাপান। ইহা একটী সুপরিচিত সত্য ঘটনা যে, সুরাপানের সাহায্যে মাংস পরিপাক করিতে যাইয়া অনেক ব্যক্তি সুরাপান অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন। সুরাপান হইতে সকল প্রকার পাপই চরিত্রে সংক্রামিত হইতে পারে। এই কারণেই হিন্দুরা বিবেচনা করেন যে, খাঁটী নিরামিষ আহার করিলে ঐ সকল পাপের হাত হইতে সহজেই মানব নিস্তার পাইতে পারে। হিন্দুরা সুরাপানের ঘোর বিরোধী। যদি একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, সুরার দোকানে প্রবেশ করেন বা প্রকাশ্যতঃ সুরাপান করেন, তবে তাঁহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়। হিন্দুরমণীরা সুরাস্পর্শও করেন না। প্রতীচ্যদেশে যেমন সদর পথে সুরাপানে উন্মত্ত স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুসমাজে কোন স্ত্রীলোককে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সমৃদ্ধশালী নগরেও হিন্দুদিগের সুরার দোকান ছিল না; কিন্তু এখন ইংরাজগভর্ণমেণ্টের সুরা-ব্যবসায়ের অনিষ্টকারিণী শক্তির প্রভাবে কোনও কোনও সহরে শত শত দোকান স্থাপিত হইয়াছে। কিরূপে একটী সভ্যজাতি আফিং ও সুরা-ব্যবসায়ের অনুমোদন করিতে পারে, কিরূপে পল্লীগ্রামে সুরার দোকান খুলিয়া সুধীর ব্যক্তিবর্গকে দুশ্চরিত্র করিতে চেষ্টিত হইতে পারে; এবং কিরূপেই বা সামান্যমূল্যে সুরা বিক্রয় করিয়া, দরিদ্র শ্রমজীবিদিগকে সুরাপানে প্রবৃত্ত করাইয়া সুরাপান অভ্যাসটী তাহাদের মজ্জাগত করিয়া দিতে পারে, একথা হিন্দুজাতির বুদ্ধির অগম্য। বিস্তর ব্যক্তি আমাদের পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইংরাজ শাসনাধিকারে হিন্দুরা অধিকতর চরিত্রবান্ হইয়াছেন কি না? যদি তাঁহারা ভারতবর্ষে আফিং ও সুরাব্যবসায়ের দুর্নীতিপ্রসারিণী শক্তির বিষয় অবগত থাকিতেন, এবং যদি তাঁহাদের স্মরণ থাকিত যে, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগেরসঙ্গে সঙ্গে সুরার বোতল গমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত প্রকার প্রশ্ন করিতেন না। নিরামিষাহারী হিন্দুগণ, ঔষধরূপেও সুরাস্পর্শ করেন না।

এ কথাও বলিতে পারি যে, প্রেমবশতঃ হিন্দুরা নিরামিষ আহার করিয়া থাকেন। "প্রেম" শব্দের অর্থ একত্ববোধ। একত্ববোধহেতু হিন্দুরা, ইতরপ্রাণীদিগকে আত্ম

বাসেন। তাঁহাদের ধর্ম্মের আদর্শভাব এই যে, এক আধ্যাত্মিক বিরাট পুরুষ যাবতীয় সজীব প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া প্রকট হইতেছেন। যে ঐশ আত্মা আমাদিগের দেহাভ্যন্তরে বাস করিতেছেন এবং যিনি জ্ঞান ও চৈতন্যালোকে আমাদিগের সূক্ষ্ম-প্রকৃতিকে প্রদীপ্ত করিতেছেন, সেই ঐশ আত্মাই ইতরপ্রাণীদিগের দেহাভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। "ভ্রাতৃত্ব" শব্দের মত হিন্দুদিগের ঐ আদর্শভাবটী অনিশ্চিত অর্থশূন্য কথা নহে। ইতরপ্রাণীদিগের এবং প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর আত্মা ও আমাদিগের আত্মা যে এক, ইহা হিন্দুরা প্রত্যক্ষতঃ হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে বলে—"প্রত্যেক সজীব প্রাণীকেই আত্মবৎ ভাল বাসিবে। কেন না, একই আত্মা সর্ব্বজীবে বিরাজমান। তোমার দেহাভ্যন্তরে যে আত্মা আছেন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে; তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে; একই আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। যিনি সর্ব্বত্র একই বিরাট আত্মা প্রত্যক্ষ করেন, তিনি আত্মা দ্বারা আত্মার বিনাশ-সাধন করিতে পারেন না"। তিনি যথার্থই নিঃস্বার্থ হইয়া থাকেন। তিনি সকলকেই সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। আমরা স্বার্থান্ধ হইয়া আমোদ-প্রমোদ বা খাদ্যার্থে প্রাণীহত্যা করিয়া থাকি। ঘোর স্বার্থপরতা-নিবন্ধনই আমরা অন্য প্রাণীর জীবনাধিকারে উদাসীন থাকি, এবং এতদ্ধেতুই নিরীহ প্রাণীগুলিকে হত্যা করিয়া বা তাহাদের ক্ষতি করিয়া কিংবা তাহাদের অধিকারে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া আমরা আপনাদিগকে পুষ্ট করিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমরা আমোদের জন্যও ঐরূপ করিয়া থাকি। এবম্বিধ স্বার্থপরতাই যাবতীয় কুচিন্তা ও কুকার্য্যের প্রসূতি। যদ্দ্বারা আমরা স্বার্থপর হইয়া উঠি ও কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া থাকি, তাহাই অনিষ্টকারী ও নিন্দনীয়। যদ্দ্বারা আমরা ক্রমে ক্রমে নিঃস্বার্থ হইতে থাকি, তাহাই উন্নতি-কারক ও ধর্ম্মসম্মত। আত্মার একত্ব-প্রত্যক্ষ বিষয়ে যাহা আমাদিগের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়, তাহাই নিন্দনীয়। যদ্দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং যদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ইতর-প্রাণীদিগের মধ্যেও ঐশ আত্মা বিরাজ করিতেছেন, অতএব উহাদিগকে আত্মবৎ ভালবাসিতে হইবে, (যে বৃত্তির প্রভাবে আমাদিগের এবম্প্রকার জ্ঞান হয়) সেই বৃত্তিই সৎ এবং ঈশ্বরোন্মুখী!

আমরা যে কোনও খাদ্য শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করি, তাহাতেই দেহের ভিতর একটী শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। মাংসাহার-নিবন্ধন চিত্তে যেরূপ একটা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া অনুভব করিয়াছেন, এবং যাঁহারা আত্মসংযম অভ্যাস করিবার জন্য কখনও চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে মাংসাহার পরিত্যাগ না করিলে চিত্তের পাশবিক প্রবৃত্তি, উগ্র-প্রকৃতি ও চাঞ্চল্য দমন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নানাবিধ্বিনী আলোচনা করিয়া হিন্দুরা নিরামিষাহারী হইয়াছেন ও মাংসাহার অনুমোদন করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছেন।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

ভারতের ভবিষ্যৎ।

বাণিজ্যপোত ও বিদেশ-ভ্রমণ।

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের পরিণতি এবং বর্ত্তমানও অতীতের পরিণতি মাত্র। প্রত্যেক দেশের ভবিষ্যৎ তদ্দেশীয় লোকের বর্ত্তমান-কার্য্যের উপর নির্ভর করে। আমরা অতীতে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহারই ফলসমষ্টি বর্ত্তমানে ভোগ করিতেছি এবং আমরা বর্ত্তমানে যে কার্য্য করিব, তাহারই ফলসমষ্টির দ্বারা ভবিষ্যৎ নিয়মিত হইবে। "যেমন বুনিবে বীজ ফলিবে তেমন" এ কথাটী নূতন নয়, ইহা একটী চিরন্তন সত্য। খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশু খৃষ্ট, এই সত্যটী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধদেব এই সত্যটীকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ভিত্তি-স্বরূপ ধরিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে ভারতের ঋষিগণ, এই সত্য বহুস্থানে বহু ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ভারতবাসী যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, ভবিষ্যতে তদনুসারে ফলভোগ করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কার্য্য দেখিয়াই তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

বিগত ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে সভ্য-সমাজের মধ্যে জাপানের কোন স্থান ছিল না। আমাদের জাতীয় কবি সুপ্রসিদ্ধ হেমচন্দ্র যখন "ভারত-সঙ্গীত" রচনা করেন, তখনও জাপানকে "অসভ্য" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতিদের মধ্যে স্বীয় আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুসভ্য প্রাচীন চীন এবং প্রবলপরাক্রান্ত রুশ "অসভ্য" জাপানের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সাগরাধিশ্বরী ব্রিটেনিয়াও ঐ অসভ্য জাপানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে জাপান এতদূর উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এ দিকে আমাদের নিজের গৃহের কথা চিন্তা করুন। একসময়ে ভারত, সভ্য-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিত। কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, কি মনোবিজ্ঞানে, প্রাচীনকালে কোন বিষয়ে কোন জাতিই ভারতের সমকক্ষ ছিল না। ভারতের জ্ঞানালোকের দ্বারা এসিয়া ইউরোপ প্রভৃতি সমস্ত মহাদেশই আলোকিত হইত। ভারতীয় আচার্য্যগণ চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত ঋষিপ্রসূত জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। যে সমুদ্রযাত্রা এখন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সমুদ্র পথে ভারতবাসীগণ যবদ্বীপ, সুমাত্রাদ্বীপ—এমন কি সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত গমন করিতেন। ঐ সমস্ত দেশে এখনও ভারতবর্ষের সভ্যতার জাজ্জ্বল্যমান চিত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সেই দিন স্মরণ করুন এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও স্মরণ করুন। আমরা নূতন কিছু ত অর্জ্জন করিতে পারিই নাই—অপিচ যাহা ছিল, তাহাও রক্ষা করিতে পারি নাই। আমরা যোগক্ষেম উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমাদের কার্য্যের জন্য আমরা এখন অসভ্য বর্ব্বরের মধ্যে পরিগণিত। আফ্রিকার নিগ্রো এবং আমরা উভয়ই coloured race এবং ট্রান্সভাল, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, প্রভৃতি দেশে আমরা

অসভ্য জাতির সহিত আমাদেরও প্রবেশ ও বাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদায় স্থানে ও অন্যান্য দেশে আমরা কুলি-স্বরূপ যাইতে পারি মাত্র।

এইক্ষণ দেখা যাউক, বর্ত্তমানে আমরা এমন কি কার্য্য করিতেছি, যাহাতে আমাদের ভবিষ্যতে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করতঃ একটী মাত্র বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্।

কলিকাতায় গেলে দেখা যায় যে, প্রায় সর্ব্বদেশের জাহাজই বাণিজ্যার্থে কলিকাতার বন্দরে আসিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের জাহাজ অন্যদেশে যাওয়ার কথা কি কেহ আ'স্কা'ল শুনিয়া থাকেন? চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের মুসলমান্ নাবিক বা লস্করগণ জাহাজ-পরিচালনে সুদক্ষ বটে, কিন্তু ইহারা সকলেই বিদেশীয় জাহাজে চাকরী করিয়া থাকে। এই নাবিকগণেরও অষ্ট্রেলিয়ায় যাইবার অধিকার নাই।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে, ভারত-বাসীদিগের এইরূপ জাহাজ প্রস্তুত করার ও বাণিজ্যার্থে বিদেশে প্রেরণ করার বাধা কোথায়? একজনে না পারি, দশজনে একত্র মিলিয়া কোম্পানী করিয়া এইরূপ জাহাজ কি আমরা করিতে পারি না? সকল দেশের লোকেরা বাণিজ্যের দ্বারা আমাদের দেশ হইতে ধন উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা কি বিদেশে যাইয়া বাণিজ্য দ্বারা ধন-সংগ্রহ করতঃ স্বীয় দেশে আনিতে পারিনা? দেশে এমন অনেক ধনী লোক আছেন, যাঁহারা একাকীই এই কার্য্য করিতে সক্ষম। আর যদি এরূপ ধনী নাও থাকেন, তাহা হইলে যৌথ মূলধন দ্বারা এইরূপ করা যাইতে পারে। আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। বীমা করিলে জাহাজ ডুবি বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে জাহাজের মূল্য পাইবার বাধা হয় না। জাহাজের মালও ঐরূপ বীমা করা যায়। বিদেশীয় বণিকগণ এই প্রথাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবাসী-গণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, বিদেশে যাইয়া এইরূপ বাণিজ্য করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। বিদেশ-গমন এবং সমুদ্র-যাত্রা ত দূরের কথা, নদীতে ষ্টীমার চালানের ব্যবস্থা করিতেও দেখা যায় না। আমাদের জাতীয় জীবন নিশ্চেষ্ট, নিষ্পন্দ ও নিরুদ্যম। যদি আমাদের মধ্যে কেহ কোন নূতন কার্য্যের অবতারণা করেন, তবে আর দশজনে তাহাতে বাধা দেন এবং "এ কার্য্য হইবার নয়" বলিয়া প্রথম হইতেই নিরুৎসাহ করিয়া দেন, কিন্তু কার্য্যে যোগ দিয়া সুপরিচালনের ব্যবস্থা করেন না।

এতদ্ব্যতীত সামাজিক কু-সংস্কার আমা-দিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। "বিদেশে গেলে জাতি যাবে; সমুদ্রযাত্রা করিলে জাতি নষ্ট হবে, কেহ ছুইয়া দিলে আর খাওয়া হবে না," এইরূপ সমুদায় কু সংস্কারই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বাড়ী বসিয়া না খাইয়া মরিব, তবু বিদেশে বাহির হইব না! আর যদি বেশী কিছু করি, তবে চাতকের ন্যায় চাকরীরূপ মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকি—যদি একটু বর্ষণ হয়, তবে কণ্ঠ ভিজাইয়া জীবন বাঁচাই।

কেবল কান্নাকাটি করিলে কিছু হবে না। কাজ করা চাই। পুরুষকার ভিন্ন কেহ কখনও সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না। কাপুরুষেরাই কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

কাপুরুষতা যে কেবল ব্যক্তিগত হয় তাহা নহে, জাতিগতও হইয়া থাকে। আমাদের এই জাতিগত কাপুরুষতা দূর করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ নৈরাশ্য ও অন্ধকারময়।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে জাপানের না ছিল রণপোত, না ছিল বাণিজ্যপোত। কিন্তু অনেকেই জানেন, এইক্ষণ রণপোত ও বাণিজ্যপোত উভয়ই তাঁহাদের যথেষ্ট হইয়াছে এবং সে সমুদায় নিজের দেশে নিজেরাই প্রস্তুত করিতেছেন। জাপানী বর্ত্তমানে স্বীয় বাণিজ্যপোতের দ্বারা ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকেন এবং Nippon pusen kaisha, Japanese mail steam ship company র জাহাজ (যাহার কলিকাতার এজেন্ট Andrew yule & Co.) কলিকাতা হইতে জাপান যাতায়াত করে। ইহাদের বড় বড় জাহাজ আছে, যাহাতে ৫০০০।৬০০০ টন্ মাল বোঝাই হইতে পারে। ঐ সমুদায় জাহাজের নাম Ceylon Maru, Kirin Maru, Kanagawa Maru, Hokata Maru, Tosha Muru প্রভৃতি। এই সমস্ত জাহাজ কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন, পেনাং সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংঘাই দিয়া জাপানে গমন করে। হায় ভারত! তুমি "অসভ্য" জাপানেরও পিছনে পড়িয়া গিয়াছ! তোমার বিদেশীয় বাণিজ্য ত নাই-ই, দেশের মধ্যের বাণিজ্যও বিদেশী জাহাজের সাহায্যে হইয়া থাকে।

ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানেই কোন সময়ে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিতের যুগ ছিল। তৎপরে ক্ষত্রিয়ের বা যোদ্ধার যুগ ছিল। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের আর আধিপত্য নাই। ভূমণ্ডলের ভবিষ্যৎ বৈশ্য বা বণিকের হাতে। জাপানে যতদিন ক্ষত্রিয়ত্বের প্রাদুর্ভাব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত জাপান নগণ্য ছিল। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাপান ক্ষত্রিয় রুশকে পরাভব করিতে সমর্থ হইয়াছে। বণিগ্‌বৃত্তির দ্বারাই ইংলণ্ড ভারতের সম্রাট্ হইয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন টোগো, কুরকী প্রভৃতি, জাপানের প্রধান্য স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা মহা ভ্রমের মধ্যে রহিয়াছেন। টোগো কুরকী প্রভৃতি, জাপানের বণিক্‌সম্প্রদায়ের যন্ত্র মাত্র। বণিকেরাই প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। ক্ষত্রিয় জার্ম্মণী অনন্যোপায় হইয়া বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কু-সংস্কার সহজে যায় না। বিদেশ-ভ্রমণই কুসংস্কার নষ্ট করার প্রধান উপায়। বিদেশীয় লোকের সংস্রবে আসিয়াই নিদ্রিত জাপান জাগরিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই জাপানবাসী দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভারতবাসী কূপমণ্ডুকের ন্যায় পড়িয়া আছে এবং স্বীয় কূপকেই প্রকাণ্ড সমুদ্র বলিয়া মনে ভাবিতেছে। বিদেশীয় জাতির সংস্রবে আসিলেই প্রত্যেকে নিজ নিজ বলাবল বুঝিতে পারে; নিজেদের খুটিনাটি দূর করিতে সক্ষম হয়। আমরা পৃথিবীর কোন খবর রাখি না, অথচ মনে করি—আমরা খুব বড়।

পাড়াগাঁয়ের কোন জমিদার কলিকাতায় গেলে তাঁহার ধনগর্ব্ব, চূর্ণ হয়। আমাদের বৃথা আত্মগরিমা চূর্ণ করিবার জন্যও বিদেশ-ভ্রমণ বিশেষ আবশ্যক। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহাই করিতেন। সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে

যে নিষেধবাক্য দেখা যায়, তাহা প্রকৃত-পক্ষে বাণিজ্যার্থে সমুদ্র গমন-নিষেধ নহে, প্রায়োপবেশনের ন্যায় একবিধ আত্মহত্যার বিরুদ্ধে নিষেধ মাত্র। অশ্বমেধযজ্ঞাদির ন্যায় এই আত্মহত্যার উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রাই কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যখন কাহারও আত্মহত্যার প্রয়োজন হইত, তখন সে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় সামান্য কিছু আহার্য্য লইয়া সমুদ্র-যাত্রা করিত, এবং খাদ্যাভাবে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এইরূপ সমুদ্রযাত্রাই কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দুই এক জন করিয়া নয়, দুই এক শত করিয়া নয়, দুই এক সহস্র করিয়া নয়, লাখে লাখে যখন ভারতীয় যুবকগণ বিদেশ-ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন, তখনই আমাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে। বর্ত্তমানে মুষ্টিমেয় লোক ইংলণ্ড ও জাপানে যাইতেছেন। সেও বাণিজ্যাদির জন্য নহে। পূর্ব্বের ন্যায় ভারতবর্ষ যদি পুনরায় বিদেশে বাণিজ্য-পোত প্রেরণ করিতে পারেন, তবে ভারতের সুদিন ফিরিয়া আসিবে। বোম্বে হইতে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য জাহাজ-কোম্পানী হইয়াছে। বাণিজ্যাদি বিষয়ে বোম্বাইবাসীরা বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত। কলিকাতাতেও ভাগ্যকুলের স্বদেশবৎসল "রায়" জমিদার মহাশয়েরা কলিকাতা হইতে চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে ষ্টীমার চালাইতেছেন। কারখানাও করিয়াছেন। যশোহরেও "ষ্টিমনাভিগেশান্ কোম্পানী" হইয়াছে। নিশান্তে অরুণের কিরণ দেখা দিতেছে। জাগিবার এই সময়। ইংলণ্ডের সুশাসনে ভারতবর্ষ এখন শান্তির ক্রোড়ে। এই সুবিধার সময় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

যেদিন ভারতবাসীরা নিজেরা জাহাজ প্রস্তুত করিয়া, নিজেরা উহা পরিচালন করিয়া, বিদেশে যাইতে পারিবে এবং বিদেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে, সেই দিন ভারতবর্ষের পক্ষে একটী চির-স্মরণীয় দিন হইবে। কিন্তু সেই দিন আসিবে কি না, তাহা ভারতবাসীর উপরই নির্ভর করে। যেরূপ কার্য্য করিবে, সেরূপ ফলভোগ করিবে। "যেমন বুনিবে বীজ ফলিবে তেমন।" একথা পূর্ব্বেও যেরূপ সত্য, এখনও সেরূপ সত্য।

হাত পা গুটাইয়া কেবল আর্ত্তনাদ করিলে কোনও ফল হইবে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এরূপ করিতেন না। পুরুষ-কারের দ্বারাই তাঁহারা ভারতকে পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের একবিন্দু রক্তও যদি আমাদের ধমনীতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের সচেষ্ট হইয়া বর্ত্তমান জাতীয় কলঙ্ক অপনয়ন করিতে হইবে।

একতা স্থাপন করিতে হইবে; যৌথ কারবার করিয়া, তাহার সুপরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। খুঁটীনাটি ছুঁৎছাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে আবার ভারতের সুদিন ফিরিয়া আসিবে। আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, কাফ্রি প্রভৃতি জাতির ন্যায় আমাদেরও বিদেশে "কুলি" বলিয়া পরিগণিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই উপদেশটী আধ্যাত্মিক বিষয়েও যেমন প্রযোজ্য, বৈষয়িক বিষয়েও তদ্রূপ। বস্তুতঃ পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হয়, বৈষয়িক উন্নতির সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম্মাদির উন্নতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইংলণ্ড,

জাপান, জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেমন বৈষয়িক উন্নতি দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম্মাদি বিষয়েও উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে দরিদ্রতা দোষদুষ্ট নহে, কিন্তু জাতির পক্ষে উহা দোষাবহ। পৃথিবীর সমুদয় অসভ্য জাতিই দরিদ্র; তাহাদের ধনও নাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানও নাই।

আমাদের দেশে অনেক সময় ধনের অযথা নিন্দা শুনা যায়, কিন্তু আমাদের জানা উচিত, যখন ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে "সুবর্ণদেশ" বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই সময়েই আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম্মাদির উচ্চসোপানে আরোহণ করিতে পারিয়া ছিলাম। বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ করিলে অযোধ্যারাজ্যের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। উহা কবির মানস কল্পিত নহে। অযোধ্যারাজ্য ঐরূপ সমৃদ্ধশালী না হইলে মহর্ষি বাল্মীকি কখনও অযোধ্যার ঐরূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন না। আমাদের বেদ—উপনিষৎ—দর্শন—বিজ্ঞানের যুগে আমরা দরিদ্র ছিলাম না। ঐ যুগ আবার দেশে আনিতে হইবে,—এবং তাহা আনার একমাত্র উপায় পুরুষকার—পুরুষকার—পুরুষকার।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা,
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

ন্যায়দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৩৯ সূত্র। হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনং।

ব্যাখ্যা। "হেত্বপদেশাৎ" (হেতু-কথনং বিধায়) প্রতিজ্ঞায়াঃ (প্রতিজ্ঞাবাক্যস্য) পুনর্ব্বচনং (পুনঃকথনং) "নিগমনং" (নিগমন-নামকোঽবয়বঃ)

তাৎপর্য্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত "হেতু"-কথন-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃকথনই নিগমন।

টীকা। নিগমন বুঝিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত হেতু এবং প্রতিজ্ঞাকে মনে করিতে হইবে। সেই হেতুকে বলিয়া প্রতিজ্ঞাটীকে বলিলেই নিগমন-বাক্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে ধূম-হেতুক বহ্নির অনুমান-স্থলে "বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ং" এই ভাবে উপনয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া—শেষে যে "তস্মাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই নিগমন।

এই বাক্যের "তস্মাৎ" এই অংশ হেতু-কথন। অপর অংশ পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞারই পুনর্ব্বচন। তৎ শব্দের দ্বারা যোগ্যতা-বলে উপনয়বাক্যস্থ বহ্নিব্যাপ্য ধূমই বুঝা যাইবে সুতরাং উহার দ্বারাই হেতুকথন হইয়াছে। ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায়—"তস্মাৎ ধূমাৎ" এইভাবে "ধূমাৎ" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যকেই আনুপূর্ব্বীক্রমে উল্লেখ করিতে হইবে এবং "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ বাক্য না হইয়া "বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপ বাক্যই প্রতিজ্ঞা হইবে।

"তস্মাৎ ধূমাৎ বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপ বাক্যই ঐ স্থলে নিগমন হইবে। এ বিষয়ে নব্যগণের কথা আমরা পরে বলিব। এখন নিগমনের লক্ষণের কথাই বলি। সিদ্ধ-নির্দ্দেশই নিগমন এবং সাধ্য-নির্দ্দেশই প্রতিজ্ঞা, সুতরাং নিগমন এবং প্রতিজ্ঞায় ভেদ আছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞায় যেটী সাধ্য ছিল, নিগমনে সেইটীই সিদ্ধরূপে উক্ত হয়, এজন্য নিগমনকে প্রতিজ্ঞাত্মক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আর এজন্যই "প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং" এখানে পুনর্ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যে যেটী সাধ্য থাকে, নিগমনে হেতুকথনপূর্ব্বক সেইটাই সিদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র। সুতরাং নিগমন, হেতুকথনপূর্ব্বক পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞারই পুনর্ব্বচন। প্রতিজ্ঞাবাক্যে হেতুকথন নাই সুতরাং নিগমনের লক্ষণ প্রতিজ্ঞায় যাইবে না। নিগমনে পূর্ব্বোক্ত স্থলে "তস্মাৎ" এই কথার প্রতিশব্দ "বহ্নিব্যাপ্য ধূমাৎ।" "ধূমাৎ বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপ না বলিয়া "তস্মাদ্ বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপ বাক্যকেই নিগমন বলিবার কারণ এই যে—তৎ শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোপস্থিত পদার্থই বুঝা যায়, সুতরাং উপনয়-বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোপস্থিত বহ্নিব্যাপ্য ধূমই নিগমনে "তৎ" শব্দের দ্বারা বুঝা যাইবে। "তস্মাৎ" এই স্থলের পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপ্যত্ব। বহ্নিমান্ এই কথার একদেশ বহ্নিপদার্থে উহার অন্বয় হইবে। তাহা হইলে ঐ নিগমনবাক্যের দ্বারা বহ্নিব্যাপ্য-ধূম-জ্ঞাপ্য যে বহ্নি, সেই বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত, এইরূপ বোধ হইবে। নব্যগণ বলেন—বহ্নি ধূমের জ্ঞাপ্য নহে। উহা ধূমজ্ঞানের জ্ঞাপ্য। সুতরাং "ধূমাৎ বহ্নিমান্" ইত্যাদি স্থলে লক্ষণার দ্বারা ধূম শব্দের অর্থ ধূমজ্ঞানই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও একথা কোন স্থানে লিখিয়াগিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অতদূর যান নাই। তিনি বহ্নি প্রভৃতিকে ধূম প্রভৃতি হেতুরই জ্ঞাপ্য বলিয়াগিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মরূপ যে হেতু, সেই হেতুজ্ঞাপ্য যে সাধ্য, সেই সাধ্য-বিশিষ্ট পক্ষবোধক অথবা তাদৃশ সাধ্যবোধক যে ন্যায়াবয়ব, তাহাই নিগমন। বিশ্বনাথের মতে এই সূত্রের "হেতু" বলিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্ম ধূম প্রভৃতি পদার্থ। "প্রতিজ্ঞা" বলিতে প্রতিজ্ঞা-প্রতিপাদ্য বস্তু অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ। (বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত প্রভৃতি।) এই মতে কথা এই যে, ধূম প্রভৃতি পদার্থের আদেশ অর্থাৎ কথন সহজে সংগত হয় না। পদার্থের কথন বলিলে তাহার দ্বারা সেই পদার্থবোধক শব্দ প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যেরই পুনর্ব্বচন সংগত হয়। প্রতিজ্ঞাপ্রতিপাদ্য বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত প্রভৃতি বস্তুর পুনর্ব্বচন—কথাটা সহজে সঙ্গত হয় না। তাহা বলিলে, ঐ বস্তুবোধক শব্দের পুনঃকথন—ইহাই আবার ব্যাখ্যা করিতে হয়। পরন্তু অবয়বপ্রস্তাবে মহর্ষির হেতু ও প্রতিজ্ঞাশব্দের দ্বারা যথাক্রমে তাঁহার কথিত "হেতু" নামক অবয়ব ও "প্রতিজ্ঞা" নামক অবয়বই বুঝা উচিত। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যের কথন-পূর্ব্বক

প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনঃকথন অর্থাৎ পুনরুচ্চারিত প্রতিজ্ঞাবাক্যই নিগমন, ইহাই সূত্রার্থ বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞাবাক্যে যেটী সাধ্য থাকে, নিগমন-বাক্যে সেইটীই সিদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং হেতু-কথন-পূর্ব্বক পুনরুচ্চারিত প্রতিজ্ঞাই নিগমন। তাই মহর্ষি "প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং" বলিয়াছেন "প্রতিজ্ঞায়াঃ বচনং" বলেন নাই। যদি হেতু-কথনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা-প্রতিপাদ্য বস্তুর বোধজনক শব্দের পুনঃ-প্রয়োগ করিলেই নিগমন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে "তস্মাৎ হুতাশনবান্ অদ্রিঃ" এইরূপ বাক্যও নিগমন হইতে পারে। হুতাশনত্ব ও বহ্নিত্ব একই পদার্থ। অদ্রিত্ব ও পর্ব্বতত্বও অভিন্ন। সুতরাং ঐ বাক্যেও পর্ব্বতত্ব রূপে পর্ব্বতে বহ্নিত্ব-রূপে বহ্নি, বিশেষণভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পূর্ব্বে ঠিক্ যে শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে সেই শব্দ দ্বারাই নিগমন করিতে হইবে। তবে কেহ বলেন—"বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" রূপে প্রতিজ্ঞা হইবে, "তস্মাৎ ধূমাৎ বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপে নিগমন হইবে। কেহ, বলেন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইরূপে প্রতিজ্ঞা এবং ঐরূপেই নিগমন হইবে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্ব্বমতের লোক বলিয়াই বুঝা যায়। তিনি প্রতিজ্ঞা দেখাইয়াছেন "অনিত্যঃ শব্দঃ"। হেতু—উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ। নিগমন দেখাইয়াছেন—"তস্মাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ অনিত্যঃ শব্দঃ"। ভাষ্যকারের উদাহৃত নিগমন-বাক্যে কেবল "তস্মাৎ" এই টুকুই হেতু-কথন নহে। তিনি উহার পরে "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বাৎ" এই সম্পূর্ণ হেতুবাক্যেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতেও বুঝা যায়, তিনি সূত্রের "হেত্বপদেশাৎ" এই স্থলের "হেতুবাক্যের কথন-পূর্ব্বক" ইহাই ব্যাখ্যা করেন। তবে "তস্মাৎ" এই অংশের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধ্যব্যাপ্য বলিয়া নিশ্চিত হেতুই নিগমনে হেতু-বাক্যের প্রতিপাদ্য, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে উপনয়বাক্যে যে হেতুকে সাধ্য-ব্যাপ্য বলিয়া পক্ষে তাহার বিদ্যমানতা বুঝাইলাম, সেই হেতুবশতঃ আমার প্রকৃত পক্ষ প্রকৃত সাধ্যবান্, ইহাই নিগমনবাক্যের মূল প্রতিপাদ্য। চিন্তাশীল পাঠকগণ, মহর্ষি-সূত্রটীর পর্য্যালোচনা করিয়া সূত্রার্থ-নির্ণয় করিবেন। সূত্রের "হেতু" ও "প্রতিজ্ঞা" শব্দটী কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা বিশ্বনাথের কথাও লিখিলাম।

যাঁহারা "উপনয়" ও "নিগমন" নামক অবয়বের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই তিনটীকেই অবয়ব বলেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—এই প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি উপনয় পর্য্যন্ত বাক্যসমূহে প্রত্যক্ষাদি চারিটী প্রমাণ মিলিত হইয়া, পরস্পর সম্বন্ধ বশতঃ পদার্থ সাধন করে। তন্মধ্যে প্রতিজ্ঞা, শব্দপ্রমাণ। উহা লৌকিক শব্দ বলিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা উহার প্রতিপাদ্যটী বুঝিয়া লইতে হইবে, এ জন্য প্রতিজ্ঞার পরেই হেতু, অনুমান-প্রমাণ। হেতুবাক্যের দ্বারা হেত্বাদ্যনু

হয়। হেতুজ্ঞান বা জ্ঞায়মান হেতুই অনুমান প্রমাণ—ইহা ভাষ্যকারের মত বলিয়া এ কথার দ্বারা ধরা যাইতে পারে। উদয়নাচার্য্যের উহাই মত। উদাহরণটী প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থ সিদ্ধ হয়। উহার মূলে প্রত্যক্ষ আছেই। উপনয়টী "উপমান"। কেননা "তথা" এইরূপে উপসংহার করা হয়। (ভাষ্যকারের মতে উপনয়-বাক্য "তথা" এই শব্দের প্রয়োগ নিয়ত।) এই সমস্ত প্রমাণের একার্থ-প্রতিপাদনে সামর্থ্য-প্রদর্শনই নিগমন। ভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন "উপনয়" ব্যতীত সাধক হেতুর পক্ষে উপসংহার হয় না, সুতরাং হেতু, পদার্থ সাধন করিতে পারে না। বিশেষতঃ হেতুর সহিত সাধ্যধর্ম্মের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্র অবস্থানের উপপাদন উপনয়ের প্রয়োজন। নিগমন না থাকিলে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটীর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় না। যাহাদিগের মধ্যে চারিটী প্রমাণ রহিয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই একার্থ-প্রতিপাদনে সামর্থ্য, নিগমনের দ্বারাই প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ কি জন্য ঐ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটী বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহা নিগমন-বাক্যই বুঝাইয়া দেয়। পরন্তু প্রতিজ্ঞা-বাক্যে যেটি সাধ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট, তাহারই সিদ্ধরূপে পুনর্ব্বচনরূপ নিগমন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা এ ফল হয় না। কারণ, উহা সাধ্যবোধক, সিদ্ধ-বোধক নহে। উদাহরণস্থ ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধন-ভাব বুঝিলেও পক্ষে তাহার বিপরীত শঙ্কা হইতে পারে, তাহার নিবৃত্তি, নিগমনের দ্বারাই হইয়া থাকে। পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পাঠ করিলে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের দুরূহ কথা ক্রমশঃ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।৩৯ অতঃপর "তর্ক" উঠিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

ব্রাহ্মণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমান-কালের ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উপর্য্যুক্ত কথায় আসলে আস্থা প্রদর্শন করা যায় না। তাহা না হইলে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই! গঙ্গা—ভাগীরথীরূপে যে ভাবে লোকদিগকে পবিত্র করিবার জন্য, ব্রহ্ম-লোক হইতে, নরলোকে অবতরণ করিয়াছেন, তাহার তিনটী ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গঙ্গোত্তরীতে, হৃষীকেশে এবং হরিদ্বারে। তন্নিম্নে কাণপুরে, আসিয়া আর সে গঙ্গা চিনিতে পারা যায় না। সুনির্ম্মল-পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, যে ভাবে গঙ্গোত্তরীতে প্রবাহিতা, সে ভাব হৃষীকেশ দেখা যায় না। তাহার পর হরিদ্বারে নামিয়া যে রূপে বিকলাঙ্গা হইয়াছেন, তাহাতে আর সেই গঙ্গা বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাহার পর কাণপুরের ঘোলাগঙ্গা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এইরূপ যত কাল ব্রাহ্মণগণ উত্তরকুরু বর্ষ হইতে (যে কারণে হউক) আসিয়া পঞ্চনদ মধ্যগত হইয়া

অধিবাস করিতেন, তৎকালে তাঁহাদিগের হোমাগ্নি, ভারতের আকাশ পবিত্র রাখিতেছিল। তাহার পর তাঁহাদিগের বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ব্রহ্মর্ষিদেশ পশ্চাতে ফেলিয়া সরস্বতীর কূল ধরিয়া মধ্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। পুরাণে এই মধ্যদেশের কাহিনী যে রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সে কালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সংঘর্ষে, যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। দাশরথি রাম, ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা ভার্গব পরশুরামকে বিধ্বস্ত করিতেছেন, ; মহারাজ বেণ, ঋষিদিগকে ভারবহনে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের পৃষ্ঠে পদাঘাত করিতেছেন ; যযাতি, শুক্রনন্দিনী দেবযানীর পাণিপীড়ন করিতেছেন। তাহার পর দীন-হীন কাঙ্গালের অবস্থায় পতিত হইয়া ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি, কুরুকুলের দাসত্ব করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ভারতসমরে যার পর নাই অপদস্থ হইয়া পড়িলেন। এই স্থান হইতেই মহাপ্রভাবশালী ব্রাহ্মণগণের প্রভাব ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়। তাহা দেখিয়া, ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, উগ্রভাব ধারণ করিয়া ভারতাকাশে যে ঝটিকা তুলিয়াছিল, তাহাতেই মহামারী রূপ বুদ্ধদেবের উৎপত্তি হয়। এই বুদ্ধই প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ-বংশের উচ্ছেদসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া জাতিবিচার লোপ করিয়া, একাকার-ভাবের প্রসার বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-কুমার কুমারীল এবং শঙ্কর, তাহার পর আবির্ভূত না হইলে, এতদিনে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম কালের কুক্ষিগত হইয়া যাইত। তাহা না হইলেও যে ভাবে এখন বর্ণধর্ম্ম দণ্ডায়মান, তাহার রক্ষাসাধন সুদূরপরাহত।

এই বর্ণধর্ম্ম-রক্ষার সমস্যা লইয়া হিন্দুজগৎ এখন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোথায় দাঁড়াইলে তাহার উদ্ধার হইবে, কেহই তাহা অবধারণ করিতে পারিতেছেন না। পূর্ব্বে যাঁহারা একছত্র হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে যত্ন পাইতেছিলেন, এখন তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন, যে, জাতি-বর্ণ ব্যবসায়াত্মক, তাহার লোপ হইলে, সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। একের নির্দ্দিষ্ট অন্ন, বহুলাংশে বিভক্ত করিতে গিয়া উভয়ই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। সেরূপ নিঃস্বভাবে সমাজ আপ্লুত হইয়া পড়িলে, আর কাহাকেও রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। ইহা ভাবিয়াই নিম্নস্তরের সকল বর্ণ, বদ্ধপরিকর হইয়া নিজ নিজ জাতি-বর্ণের উদ্ধার সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয়-জাতি স্বধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া রাজ্য-পালন, শস্ত্রচালন-শিক্ষা, ও ন্যায়-নীতি-পালন করত চলিতে চাহিতেছেন।

বৈশ্যজাতি, বহুবিস্তৃত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ হইতে চাহিতেছেন, কিন্তু অপর দিকে ইহার অন্তরায় অস্তভাবে দাঁড়াইতেছে।

শূদ্রজাতি, শিক্ষা-দীক্ষার প্রাবল্যে, দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, উপরিতন জাতির আচার-ব্যবহার অবলম্বন করতঃ তত্তৎসমাজে মিশিবে বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে।

জাতিতত্ত্ব যে যৌন-বিচারে বিধিবদ্ধ, অতিবুদ্ধি বশতঃ সেদিকে তাহারা দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছে না। এটা জাতির দোষ নহে, বর্ত্তমান কালের শিক্ষা ও সংসর্গের দোষ। তাহারা বুঝে না যে, আত্মা অমর; এই বিশ্বরাজ্যে, কেবল তাহারাই আইসে নাই। কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া, বহুজন্ম গ্রহণ করতঃ এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। সকলেই সেই মহাপুরুষ পদ্মযোনি ব্রহ্মার সন্তান। কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জাতিগত পার্থক্যে পতিত হইতেছে, আবার শুভকর্ম্ম-ফলে পরজন্মে সদ্‌জাতি প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপেই চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে বলীয়ান্ হইয়া সনক সনাতনাদি ঋষিগণ পার্থিব সুখে বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করত অমরধামে চলিয়া গেলেন। তৎপরে ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, অত্রি এবং মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ প্রাজাপত্য ব্রত গ্রহণ করিয়া, জগতে মানব-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। এই মানবধর্ম্ম যে চারিবর্ণে বিহিত, তাহার প্রথমস্তর—ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়স্তর—ক্ষত্রিয়, তৃতীয়স্তর—বৈশ্য এবং চতুর্থস্তর শূদ্রবর্ণে সমাবৃত। ইহার বৈপরীত্য কি রূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? পারে না বলিয়াই, বর্ণ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে।

আজি কালি অন্যান্য সাধারণ জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণজাতিও সমাজবদ্ধ হইয়া জাতীয় উন্নতি-সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, এইবার আমরা তাহাই বিচার করিব। ব্রাহ্মণ—সমস্ত ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণজাতি বৈদিককাল হইতে, চারিটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন—ঋগ্‌বেদী, যজুর্ব্বেদী, সামবেদী এবং অথর্ব্ববেদী। তাহার পর দেখিতে পাই, তাঁহারা পৌরাণিককালে আবার পাঁচটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব। পরে এখন দেশভেদে আচার ব্যবহারভেদে আবার তাঁহারা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখন তাঁহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায় না। আবার তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া যে বহু আকার ধারণ করিয়াছেন, তাহাতেও বিভিন্নতা বিস্তর। তাঁহাদিগের মধ্যে—কেঁহ গৌড়ে যাইয়া গৌড়ীয়, দক্ষিণাপথে যাইয়া দাক্ষিণাত্য; কান্যকুব্জে কনোজী, মিথিলায় মৈথিলী, ব্রহ্মাবর্ত্তে সারস্বত, দ্রাবিড়ে দ্রাবিড়ী, উৎকলে উৎকলী, কশ্যপপুরে কাশ্মিরী; কেহ আসামী, কেহ নেপালী, কেহ পাহাড়ীয়। ইঁহারা সকলেই সেই পুরাতন এক ওঁ-কারের উপাসক; এক গায়ত্রী, এক সন্ধ্যা। বেদ-ভেদে তাহাতে সামান্য বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও একভাবাপন্ন। সেই বেদের সার ওঁকার-মন্ত্রে সকলেই দীক্ষিত। সুতরাং সকলেই যে, সেই এক "ব্রাহ্মণ" তাহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু সে সকল শাখা ও উপাসক-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ আধুনিক। তথাপি সামবেদী, ঋগ্‌বেদী, যজুর্ব্বেদী, অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ এখনও সমাজে বহুল বর্ত্তমান। ইহার পরেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিগণের সন্ততি, প্রবরাখ্যার

চিহ্নিত। এই চিহ্নানুসারেই ব্রাহ্মণবর্ণ বহুসংখ্যায় বিভক্ত। বৈবাহিক ক্রিয়ায় ইহার ব্যবহার সর্ব্ববাদী-সম্মত। কুলাচার-প্রসঙ্গে যৌন বিচার, ইহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। ইহা সত্বেও ব্রাহ্মণ-জাতিতে বর্ত্তমানকালে যে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা করা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ব্রহ্মর্ষি-দেশ হইতে, বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-জাতি, সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইয়া পড়িলে, দেশভেদে তাঁহাদের আচার-ব্যবহার বিভিন্ন হইয়া পড়িল। এই আচার-ব্যবহারসমূহ নীতিমূলক হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মমূলক কদাচ নহে। তাহা না হইলেও দেশাচার, লোকাচার এত বলবান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অনুল্লঙ্ঘনীয় ধর্ম্মাচার বরং পরিত্যক্ত হইতে পারে, তথাপি দেশাচার লোকাচার কখন লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না! পারিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়! প্রায় পঞ্চ শত বর্ষ অতীত হইল, পাঞ্জাবের—অমৃতসর নগরীতে অবস্থিতিকালে বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মহাসমারোহে ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হয়। তৎকালে, নগরস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হইয়াছিল। ভোজনের সামগ্রী প্রস্তুত হইলে, পাতা পাতিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সারি সারি বসাইয়া, আমরা প্রায় ১০। ১২ জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, পক্কান্নের বাজরা লইয়া পরিবেশন করিতে বাহির হইলাম। তাহা দেখিয়া তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের কয়েকজন নেতা অগ্রসর হইয়া কহিলেন "এমন কাজ কদাচ করিবেন না, আমরা ভিন্নদেশীয় ব্রাহ্মণের হস্তে ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করি না। আমাদের পল্লীর "নরসুন্দর" বা নাপিতেরাই সে কার্য্য সমাধা করিবে"। এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ পল্লীস্থ নাপিতদিগকে ডাকাইয়া পরিবেশন-কার্য্য সমাধা করিলেন।

কাশ্মীর-প্রদেশে অবস্থিতিকালে দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে মুশলমান্ ভৃত্য (Domestic servant)। তাহারা রন্ধন ব্যতীত সংসারের সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যষ্টিতে আবদ্ধ করিয়া ভোজ্যান্ন আফিসে লইয়া যায়। ক্ষীরভবানী-তীর্থক্ষেত্রে দেখিলাম, একগৃহে হিন্দু-মুশলমান্ দুই ভ্রাতা, একান্ন হইয়া বাস করিতেছে। সমস্ত পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণেরাই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের গৃহ হইতে ভোজ্যবস্তু (দাল্-রোটীকা) ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। চাম্বারাজ্যে দেখিলাম, ব্রাহ্মণেরা নিম্নস্তরের সকল বর্ণের কন্যাই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সমস্ত উত্তর-হিমাচলে এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত। সুদূর উত্তরাখণ্ডে এক স্ত্রী, বহু ভ্রাতায় ভোগ করিয়া থাকে।

উৎকলে মাতুলীকন্যার পাণিগ্রহণ অশাস্ত্রীয় নহে। দাক্ষিণাত্যেও এই প্রথা বিরল নহে। কিন্তু তাঁহারা অপর-দেশীয় ব্রাহ্মণের পক্ক অন্ন স্বীকার করেন না। পাক-শাক প্রস্তুত হইলে স্নানান্তর ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া, আহার করিয়া থাকেন। মধ্যপ্রদেশে "যত বামুন তত চুলা"—কেহ কাহারো পক্ক অন্ন গ্রহণ করেন না। চুল্লীর চৌকা স্বতন্ত্র,—

গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া, স্নানানন্তর বিশুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া, চৌকার প্রবেশ করতঃ যতক্ষণ রন্ধন, পানভোজন শেষ না হয়, ততক্ষণ সেই চৌকা মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। মাতা এবং স্ত্রী ব্যতীত আর কেহই চৌকার আসিয়া রন্ধন-কার্য্যে সাহায্য করিতে পারে না। মিথিলা-প্রদেশে এই বিধি কথঞ্চিৎ শিথিলভাব ধারণ করিলেও বঙ্গপ্রদেশে আহার-ব্যবহারের বিধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের গৃহে পাকশালা পৃথক্ থাকিলেও ভোজ্যান্ন, বাহিরে আনিয়া ঠাকুরসেবায় এবং পংক্তিতে পরিবেশিত হইতে পারে। তাঁহাদের চারি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের মধ্যে পান-ভোজন ও আদান প্রদান চলিত নহে। তাঁহারা যে সকলেই ঋষি-সন্তান, গোত্রপরিচয়ে তাহা প্রকাশিত হইলেও দেশভেদে (রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক) এত পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা কেহ কাহাকে আপনার জন বলিতেও কুণ্ঠিত হন্। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, শাক্তাচার্য্যের চক্রে বসিলে সকল বর্ণ এক হইয়া যায়।

এখন এই ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে পুরাকালের মত একতা-বর্দ্ধন কতদূর সম্ভব বিচার করিয়া দেখ!

সৌভাগ্য-ক্রমে ইংরাজ-অধিকারে ইংরাজীবিদ্যা শিক্ষার বলে, সকল জাতি কৃতবিদ্য ও কৃতী হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নস্তরে থাকিতে চাহে না। শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে তাহারা বুঝিতে পারিতেছে যে, আজি কালি কোন জাতির জাতীয় গরিমা অক্ষুণ্ণ নহে; তখন তাহারা আর নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিবে কেন? "Regenaration of the Depressed classes" সেই সূত্রেই আন্দোলিত হইতেছে। উপধর্ম্মাবলম্বী সংস্কারকদিগের তাহাই চেষ্টা। এই চেষ্টা কার্য্যতঃ ব্যবহারতঃ সর্ব্ববাদী-সম্মত হইয়া উঠিলে অচিরাৎ আর্য্যদিগের জাতীয় ধর্ম্ম, বহু শঙ্কর জাতিতে পরিচিত হইয়া যাইবে।

প্রয়াগের কায়স্থ-পাঠশালার পৃষ্ঠপোষক মহানুভব রাজা কালীপ্রসাদ বাহাদুর, এক কায়স্থ-মহাসমিতিতে (Conferenceএ), মধ্যপ্রদেশের সমস্ত কায়স্থজাতিকে আমন্ত্রণ করিয়া, এইরূপ একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রথম চারি ঘরের সকলেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। অপর আট ঘরের প্রধান সূর্য্যধ্বজ সম্প্রদায়ের দলপতি, সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা চিত্রগুপ্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করতঃ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যদি চিত্রগুপ্ত সত্য-সত্যই ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হন, তাহা হইলে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি, ক্ষত্রিয় উপাধিলাভে লালায়িত না হইয়া, সর্ব্বোচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণজাতিতে উন্নীত হইতে কেন না চেষ্টা করেন? এখন কালও সকলেরই অনুকূল।

অন্য দিকে হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা বাহাদুর—যদি নবাবকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে পারেন, তবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সমস্ত ভারতের ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইতে কেন না অগ্রসর হইতে পারিবেন?

কায়স্থ-কুলপাবন শ্রীমান্ সারদাচরণ মিত্র যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের সমস্ত কায়স্থ-মণ্ডলীকে একমঞ্চে দণ্ডায়মান দেখিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা যদি সুসঙ্গত হয়, তবে ভারতের সমস্ত ব্রাহ্মণ-জাতি কেন না এক হইতে পারিবেন? কার্য্যতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণেরাও এ বিষয় অমুৎসাহী নহেন।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা বহুকাল হইতে নিম্নপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া, এত দিনের পর কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণদিগের সহিত পুরাতন সম্পর্ক ঝালাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন। পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণগণ, পাঞ্জাবে একযোগ রক্ষা করিতে যত্ন পাইতেছেন। মধ্য প্রদেশে, দোবে, চোবে, তেওয়ারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের প্রত্যেক সমাজে একতা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মিথিলার মহারাজ বাহাদুর শ্রীমান্ রামেশ্বর সিংহ, উন্নতি কল্পের কোন বিষয়েই পশ্চাৎ-পদ নহেন। বঙ্গেও ব্রাহ্মণসভা ব্রাহ্মণ-সম্মিলন প্রভৃতি দেখা দিয়াছে।

আজি কালি, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের অনেকেই কৌলীন্য প্রথার বিদ্বেষী। কৌলীন্যের উদ্দেশ্য যে সুমহৎ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। মহারাজ বল্লাল সেন যে সময়ে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন, স্পষ্টতঃ অনুমিত হইতেছে যে, সে সময়ে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের ক্ষুণ্ণ ভাব হইয়া পড়িয়াছিল। উচ্চাধিকারী আচার্য্যগণের অসদ্ভাব হইয়া দাঁড়াইলে, যে নির্ব্বাচনবিধি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যে তৎকালে সর্ব্ববাদী-সম্মত ও মঙ্গলদায়ক বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পরিচায়ক প্রণালী কি সুন্দর! আচার, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা আবৃত্তি তপঃ ও দান, এই সকল গুণ যে ব্রাহ্মণে পরিপুষ্ট, তাঁহাকেই পূর্ব্বজগণ কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতেন। অভিধানে কুলীন শব্দের তাহাই অর্থ:—(কুলীন-পুং)—সজ্জন, উত্তম ব্রাহ্মণ, সদ্বংশ-জাত, সদ্বংশীয় বংশীয় এবং সদ্বিষয়ে লিপ্ত। এই সকল লক্ষণ নির্ব্বাচন করিয়া, ব্রাহ্মণ-কুল উদ্ধার করা, সমাজপতি রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা যিনি করিয়াছিলেন, তিনি এক অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মদোষে তাহার মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছেন। কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়া ধনরত্নের সহিত সুযোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করিতে পারিলে, সেই সৎসংযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার সৌষ্ঠব সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে, ইহা বিজ্ঞানবিৎ সকল জাতিই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ-জাতির উন্নতিকল্পে সেই পুরাতন প্রথা আবার প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। সেকালে এই প্রথা প্রচলিত থাকায়, সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠতা, অবাধে রক্ষা পাইত। মহর্ষি কর্দ্দম, দেবহূতির পাণি-গ্রহণ করিয়া যে দৃষ্টান্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মণ-কুলে অতুলনীয়।

হিমারণ্যবাসী জনৈক পরিব্রাজক।

বেদ ও বেদভাষ্য।

বরুণ।

পুরাণকারগণ বরুণ-দেবকে আধিভৌতিক বারিধির অধিপতি সুর্যদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য সকল ভাষ্যকারগণই সেই পথ ধরিতে চাহেন। কাজেই ভাষ্যকারগণকে কষ্ট-কল্পনা দ্বারা বেদার্থ সংঘটন করিতে হইয়াছে। সেই কষ্টকল্পিত অর্থ বেদাধ্যায়ীকে মানিয়া লইতে হইতেছে। সায়ণাচার্য্যের অনুসরণ না করিলে হিন্দুয়ানী বজায় থাকে না!

আমরা বেদোক্ত দেবগণকে পুরাণকারগণের পল্লবগ্রাহিতার ভাবে দেখিতে চাহি না এবং পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণের সহিতও বলিতে চাহি না যে, ইন্দ্র বরুণ স্বর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছেন। বরুণ-দেব তদীয় "ধ্রুবে সদসি উত্তমে" (২। ৪১। ৫ ঋক্) অধিষ্ঠিত আছেন। এই বরুণালয় নির্ণয় করিলেই বরুণ-দেবের নির্ণয় হইবে।

তারা বৃশ্চিক, বৃশ্চিক রাশি এবং তুলা ও ধনু রাশির অংশ অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ আছে। রাশিত্রয়বিস্তীর্ণ তারা বৃশ্চিক, "ত্রিত" নাম ধারণ করে। যে মণ্ডলাকার স্বর্গপদ্ধতি ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাতে অদিতি দেবী "সোমধারা সন্তঃ সরিৎ" "সপ্ত স্বসা" আকাশসরস্বতী এবং আকাশ-গঙ্গা সকলেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ত্রিত দেব, এই সোমধারা-মধ্যে বসতি করেন।

গঠনে এই স্বর্গপদ্ধতি প্রকাণ্ড কলসের মত। প্রকাণ্ড তারা-কলস অধোমুখে অবস্থিত। উহার মুখে অগস্ত্য তারা এবং উহার তলে বসিষ্ঠ তারা (Vega)।

স্বর্গ-পদ্ধতির এক শাখা দেবযান এবং অপর শাখা পিতৃযান নামে খ্যাত।

অর্থাৎ দেবযান, কলসের এক পার্শ্ব এবং পিতৃযান অপর পার্শ্ব গঠন করে।

সুমেরুবাসী প্রাচীন ঋষি দেখিতেন যে, দেবযানস্থিত দ্বারদেবীর মধ্যে তেজোহীন অর্থাৎ যম-সূর্য্যের উদয় হয় এবং পিতৃযান-স্থিত সোমধারার মধ্যে বৃশ্চিক-মুখে—তেজোহীন অর্থাৎ যম সূর্য্যের অস্ত হয়। তাই তিনি যমসূর্য্যকে "মিত্র" নামে দেবযানে এবং বরুণ নামে পিতৃযানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সোমধারার পূর্ণ এই প্রকাণ্ড তারা-কলসে মিত্র ও বরুণ-দেবকে স্থাপিত করিয়া বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় ব্রতী হইলে বেদার্থ বিশদ ও সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৭। ৩৩। ১৩ ঋক্ *

"যজ্ঞে জাত মিত্র ও বরুণ অর্চ্চিত হইয়া একত্র কলসে রেতঃ সেচন করিলে কলস-মধ্য হইতে মান (অগস্ত্য) উঠিলেন এবং ঐ কলস হইতে বসিষ্ঠ উদ্ভূত হইলেন। *

---

* মন্ত্র-পাঠ-কালে আকাশে বা তারা-চিত্রে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

* সত্রে হ জাতা বিষিতা নমোভিঃ
কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্
ততো হ মানঃ উদ ইয়ায় মধ্যাৎ
ততঃ জাতম্ ঋষিম্ আহুঃ বসিষ্ঠঃ।

৫।৮৫।৩ ঋক্

রোদসী অন্তরিক্ষে বরুণ দেব অধোমুখ কলস বিস্তৃত করিলেন *

৮।৪১।২ ঋক্

'বরুণ (নভঃ) সরিতের গোঁড়ায় থাকেন; সপ্তস্বসা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে।

সপ্তের উপর তিনি রাজত্ব করেন।

৪।১৬।৭ ঋক্

স্বর্গপদ্ধতি বরুণের কথা। *

দেব-দিনের অবসানে সুমেরুবাসী প্রাচীন ঋষি দেখিতেন যে, বরুণ দেব, তারা বৃশ্চিকের নখর-পুট মধ্যে স্থিত শারদীয় গুহায় ডুবিতে আরম্ভ করিলে ত্রিত যম-সূর্য্য বরুণকে নখর-পুটে ধারণ করিয়া রাখিল *

৫।৯।৫ ঋক্। বিমানে ত্রিত অগ্নিকে উদ্দীপিত ও প্রখর করেন।

আমরা পাইলাম যে, অস্তগামী সূর্য্য বৃশ্চিকের নখর-পুট স্থিত শারদীয় ক্রান্তিপাতে নিমজ্জিত হইতেছেন। সেই যম-সূর্য্য আমাদের বরুণ দেব। তিনি ক্রান্তিপাতিক বৃষ্টির অধিপতি এবং তিনি নভঃ সরিৎ সপ্তস্বসা সরস্বতীর অধিপতি ও সরস্বান্ নাম ধারণ করেন।

এখন বরুণ-সূক্ত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা কর, সহজেই বোধগম্য হইবে। কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হইবেনা।

১।২৫।১৮ ঋক্। আমি তাহাকে দেখিয়াছি। তিনি বিশ্বজনের দর্শনীয়। আমি তাহার রথ ভূমি-পরে দেখিয়াছি। (১)

৭।৮৮।ঋক্। বরুণের কিরণ অগ্নির ন্যায়। ভাষ্যকারগণের "মানস চক্ষুর" দরকার কি? অস্তশীল সূর্য্যের রথ, ক্ষিতিজের উপরে, সকলেই চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পায়।

১০।১২৩।৬ ঋক্। বরুণের দূত হিরণ্যপক্ষ ধারণ করে। (২)

সন্ধ্যাকালে হংস-গণ কলরব করিয়া যম সূর্য্যের আগমন ঘোষণা করে। সপ্তস্বসা দিব্য সরস্বতী—মধ্যে তারা হংস (Cyghus) বিরাজমান আছে।

৬।৪৮।১৪ ঋক্। বরুণ মায়ী। বরুণ মায়াবলে নক্ষত্রভূষিত গগন বিস্তার করেন।

ইন্দ্র কোন দেব-বিশেষের নাম নহে। একেশ্বরবাদী ঋষিগণ, ভিন্ন ভিন্ন ঐশী শক্তির বিকাশকে এক এক দেব নাম দিয়া অর্চ্চনা করিতেন এবং ঐ দেব-গণের মধ্যে সকল প্রধানপক্ষকে "ইন্দ্র" (রাজা) উপাধি দিয়া, ইন্দ্র নামে পূজা করিতেন।

যথা বরুণ রাজা "ইন্দ্র" উপাধিতে পরিচিত। বৃহস্পতি রাজা "ইন্দ্র" উপাধিতে পরিচিত।

(১।১০৩।৪ ঋ)

রুদ্র দেব "ইন্দ্র" উপাধিতে পরিচিত।

(৮।১৩।২০ ঋ)

সূর্য্যদেব "ইন্দ্র" উপাধিতে পরিচিত।

(১।১০২।৪ ঋ)

---

* নীচীন বারম্ বরুণঃ কবন্ধম্
প্রসসর্জ্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্।

* দ্র। এই স্বর্গপদ্ধতি অশ্বিদ্বয়ের মধু-কথা।

* ত্রিতং বিভর্ত্তি বরুণস্ সমুদ্রে।

(১) দর্শন্ নু বিশ্বদর্শতম্ দর্শম্ রথম্ অধি ক্ষমি।

(২) হিরণ্যপক্ষম্ বরুণস্য দূতম্।

ঋষি "ইন্দ্র" উপাধিতে পরিচিত।
বিষ্ণু "ইন্দ্র" উপাধিতে পরিচিত।
আবার "ইন্দ্র" বলিতেছেন (৪।২৬।১ ঋক্)
আমি মনু, সূর্য্য কক্ষিবান্ ও উশনা।

তারাদর্শক।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বঙ্গের সান্ত্বনা। রোগ-শোকে দুঃখ-দারিদ্র্যে প্লাবন-পাড়নে বঙ্গদেশ সম্প্রতি বিষাদগ্রস্ত। ইহার মধ্যে দুই একটী সংবাদে সময় সময় আনন্দ-লাভ ঘটে। কিছু দিন পূর্ব্বে নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণীতলায় এক সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে স্থিরীকৃত হয় যে, "নবদ্বীপই অমর কবি কালিদাসের জন্ম-স্থান"। এই সভায় নাকি কবিবর কালিদাসের নামে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কথাও হইয়াছে। আবার কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য পুরস্কারও ঘোষিত হইয়াছে; বার্ষিক স্মৃতি-সভার সংকল্পও হইয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে সুখেরই বটে। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে প্রমাণপর্য্যালোচনার প্রতি অনুরাগেই প্রকৃত সুখ।

সাহিত্য সম্মিলনী। বর্ত্তমান মাসের প্রথম তিন দিন শিলচরে "সুরমা সাহিত্য-সম্মিলনীর" অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনীতে প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভাবে অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিতে থাকিলে কালে দেশের প্রকৃত ইতিহাস প্রণীত হইবার আশা করা যায়।

ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী। সম্প্রতি ঢাকা-মুন্সীগঞ্জে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় অনেক ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হইয়া ছিলেন। ভাহিরপুরের রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণের কথাই নাকি সভায় আলোচিত হইয়াছিল। কথা অনেক শুনা গিয়াছে, এখন কাজ না দেখিলে তৃপ্তি নাই।

পীরের দৌরাত্ম্য। পত্রান্তরে প্রকাশ মুর্শিদাবাদ গোকর্ণ গ্রামের এক পীর, নাকি দুইজন অসহায়া স্ত্রীলোকের সতীত্ব-নাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রমণীদ্বয় পলাইয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে, পীরের "আস্তানায়" শান্তি-রক্ষকের শুভাগমন বাঞ্ছনীয়।

সুসংবাদ। ময়মনসিংহের যে দশমহা-বিদ্যা-মন্দির বিগত ভীষণ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার সংস্কারকল্পে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে এক বিরাট্ সভাধিবেশন হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য বদান্য ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি এই দেবালয়ের সংস্কার-কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধুচেষ্টা ফলবতী হইলেই আমাদের আনন্দ।

মুসলমানের দুর্গোৎসব। পত্রান্তরে প্রকাশ—পাবনা জেলার অধিবাসী জয়ান্দী-ফকীর নামক এক মুসলমানের গৃহে নাকি এবার দুর্গোৎসব হইয়াছে! জয়ান্দী মুসলমান হইলেও দেবীভক্ত, তাই একজন ব্রাহ্মণই নাকি এই পূজার পৌরোহিত্য করিয়াছেন! স্বসমাজের শাসনদণ্ড জয়ান্দীর মস্তকে পড়িয়াছে। তবু নাকি সে "বাসন্তী" পূজা করিতে মনস্থ করিয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে বিচিত্র!

পণ্ডিতের কাশী-লাভ। যশোহর পাঁজিয়ার পণ্ডিত রামলাল তর্করত্ন মহাশয় বিগত ৩০শে আশ্বিন কাশীক্ষেত্রে সজ্ঞানে তনুত্যাগ করিয়া বিহিত গতি লাভ করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। এই বয়সেও তিনি সক্ষম হইলে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমরা ৫।৬ মাস পূর্ব্বেও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-সভায় দেখিয়াছি। তিনি অমায়িক সদাচারসম্পন্ন ও তেজস্বী ছিলেন। অসাধারণ-প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও যে তিনি একজন ব্যুৎপন্ন তার্কিক ছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। যৌবনে তিনি নবদ্বীপের নব্যন্যায়ের বা তর্কশাস্ত্রের প্রচুর চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যশোহরের পণ্ডিত—সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যশোহরে এখন এরূপ প্রাচীন পণ্ডিত বিরল। ক্রমে দেশে ঘনান্ধকার অধিকার বিস্তার করিতেছে!

আশার কথা। যশোহর নড়াইলের উকিল শ্রীযুক্ত হীরালাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যশোহর-খুলনার ইতিহাস লিখিতেছেন। অচিরে তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং পাটনা-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় অনেক দিন হইতেই স্বতন্ত্রভাবে দুইখানি "যশোহরের ইতিহাস" লিখিতেছেন। অনেক দিন হইতেই অনেকে সেই দিকে তাকাইয়া আছেন। কৃতী সাহিত্যিক অভিনেতাদ্বয়ের নেপথ্য-সজ্জা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যদি উদ্যমশীল হীরালাল বাবু দর্শকগণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারেন, তবে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বই প্রকাশ পাইবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বাসন্তী। নূতন ক্ষুদ্র মাসিক পত্র। নড়াইল ইউনিয়ন্ ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত। মূল্য—বার্ষিক দেড় টাকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোমণি এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। আমরা বাসন্তীর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ় সংখ্যা মাত্র সমালোচনার্থ পাইয়াছি। বৈশাখ-সংখ্যা 'ক্রাউন' আকারে ২৮ পৃষ্ঠায় এবং জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ় যুগল সংখ্যা ডিমাই আকারে ৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ গুলি বিশেষত্ববর্জ্জিত হইলেও ছাত্রবর্গের মধ্যে ইহার প্রচার বাঞ্ছনীয়। সম্পাদক মহাশয়ের দায়িত্ব, কতিপয় পংক্তি পদ্য-রচনায় পরিশোধিত হওয়া সঙ্গত কি? বাসন্তীর উন্নতি, আমরা হৃদয়ের সহিত কামনা করি।

হিন্দু-পত্রিকা মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

১৩২০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে গ্রাহকের নিকট যে মূল্য আদায় হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রাহক নং	নাম	সাল।
১ ৫৪	বাবু ক্ষেত্রমোহন বানার্জি	২০
১১৭৪	" কালীকৃষ্ণ মজুমদার	১৯
১২২৭	" কামাখ্যা নাথ ভট্টাচার্য্য	২০
১২৯৬	" খগেন্দ্রনাথ চাটার্জি	"
১৩৭১	" কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য	"
১৪৫৫	" মথুরালাল নাগ	"
১৪৯০	" মহাতপ চন্দ্র ঘোষ	"
১৬৪২	রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি	"
১৯৫৮	বাবু রাম যদু রায়	"
২৭২০	" উমেশ চন্দ্র চাটার্জি	"
২৪৯৭	আশুতোষ মুখার্জি	"
২৭২১	নিতাগাল মুখার্জি	"
৩৪৬০	নৃসিংহ চন্দ্র বানার্জি	"
৫০৫৭	ধ্রুবনাথ দত্ত	"
৫০৮১	মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য	"
	যদুনাথ রায় মোক্তার	"
৫৮১	দেবেন্দ্রনাথ দাস	"
৯২১	হরেন্দ্র কান্ত চক্রবর্ত্তী	"
১০৭৬	লক্ষ্মণ চন্দ্র রায়	১৯
১৫৬৮	অনারেবল জাষ্টিস নলিনী রঞ্জন চাটার্জি	২০
১৮১২	বাবু রেবতী মোহন দাস	"
২২৫৫	" তারিণী চরণ দাস	"

গ্রাহক নং	নাম	সাল।
২৩১৯	রাজা উদ্ধব চন্দ্র সিংহ দেও বাহাদুর	২০
১৩৮৫	বাবু সুরেন্দ্র মোহন বিদ্যারত্ন	
২৬১০	" বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত	"
৩১১৫	" ত্রৈলক্য নাথ নন্দী	"
৩১৮২	" শীতল চন্দ্র চাটার্জি	"
৩৫৬৪	" বামাচরণ বানার্জি	"
৩০৬৭	" ভুবনেশ্বর ধর	"
৩৫৭৭	" রমণীমোহন ধর	"
৫০৮৪	" দুর্গাচরণ মজুমদার	"
৬১৭	" দুর্গাচরণ দাস	"
৯৯৩	" যদুনাথ দাস	"
১১৪৫	" ক্ষিতিশ চন্দ্র দেব রায়	"
১১৬৩	মহারাজ কুমুদ চন্দ্র সিংহ	"
১২৫৩	বাবু কালীপদ হাজরা	
১৩৬৮	" কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী	
১৪৭৩	" মহিম চন্দ্র ঘোষ	
১৫০১	" মতিলাল মুখার্জি	
১৫৩১	" মতিলাল কর	
১৫৪২	" নন্দকুমার ঘোষ	
১৫৫৩	" নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ	
১৫৬৭	" প্যারীমোহন সরকার	
১৭৯৫	" রাজেন্দ্র নারায়ণ নন্দী	

গ্রাহক নং	নাম	সাল ।
[illegible]	[illegible]ারী কর	২০
[illegible]	" পরমানন্দ সাহা	"
৩৩২৫	" অম্বিকা চরণ বানার্জি	"
৩৫৭৮	" রসময় প্রামাণিক	"
৪০০০	" সুরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী	"
১৬৯৭	" প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	"
২৪৯৩	" শৈলেন্দ্র বন্ধু রায়	১৬
২৬৬৮	" কামদা চরণ দাস	২০
৩৪৭০	দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী	"
৩৪৭৭	" অবিনাশ চন্দ্র মিত্র	"
৩৫৪৩	" অবিনাশ চন্দ্র মুখার্জি	"
৩৫৭৩	" সারদা নাথ দত্ত	"
৩৫৮৯	" সেক্রেটারী বিজ্ঞানন্দকাটী হাইস্কুল	"
৩৫৯০	" যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী	"
৩৬৭৮	" আশুতোষ ঘোষ	"
৩৬৮৬	" হরিপদ বানার্জি	"
৩৭৪৫	" বরদা চরণ বানার্জি	"
৩৭৬৭	" উত্তম লাল মুখার্জি	"
৩৪	" অভয় চরণ মজুমদার	"
১৪১৫	" মতিলাল ভট্টাচার্য্য	"
১৪৩৬	" মহেন্দ্র চন্দ্র চাটার্জি	"
১৪৯৫	" মন্মথনারায়ণ দাস	"
১৫০৭	" মতিলাল দাস	"
১৬৫২	যষ্টিশ পতুল চন্দ্র চাটার্জি	"
১৭২৪	বাবু রামেশ্বর মজুমদার	"
২৪৭৩	" কৃষ্ণবল্লভ পিয়	"
২৪৮৫	" দিনেশ চন্দ্র রায়	"
৩৪৫৯	" অবিনাশ চন্দ্র সরকার	"
৩৫৭০	" ব্রজেন্দ্র কুমার ঘোষ	"
৩৬১৯	" আশুতোষ মুখার্জি	"

গ্রাহক নং	নাম	সাল ।
৩৬৬০	বাবু উমেশ চন্দ্র নেওগি	২০
৩৭৫৭	" নন্দলাল ভট্টাচার্য্য	"
৩৭৮১	" জীবন চন্দ্র মুখার্জি	"
৩৯৬৪	" জ্ঞান প্রসন্ন রায়	১৯
৪০৮৫	" অঘোর নাথ ভট্টাচার্য্য	২০
৬০৭৯	" বংশীবদন বিশ্বাস	"
৬০৮০	" কমলকৃষ্ণ কুন্তিরত্ন	"
১৭৮৯	" রামলাল দাস	"
১৮৯১	" রুক্মিণীকান্ত শর্ম্মা	"
৩৫২৬	" অধর চন্দ্র দাস	"
৩৬৩২	" বৈদ্যনাথ তরফদার	"
৫০৭১	সেক্রেটরী ইউনাইটেড বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব	"
১১৬৯	কে, পি, চক্রবর্ত্তী	"
১৪৯৭	বাবু মহীধর ভুইয়া	"
২০২০	" সতীশ চন্দ্র রায়চৌধুরী	"
২২৯১	" উমাচরণ সেন	"
২৬৭০	" পূর্ণচন্দ্র রায়	"
৩০১২	" প্রমথ নাথ ভাদুরী	"
৩৪০৬	" শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র শর্ম্মা	"
৩৫০৯	রাম নাথ দাস	১৯
৩৫৮৭	" শশীভূষণ বানার্জি	২০
৫০৫৩	সেক্রেটরী সারস্বত লাইব্রেরী	"
৫৭৪	" নর্ম্মদাস পালিত	"
২৫৫০	" রসিক চন্দ্র হাজারী	"
৩৫৩৯	" নারায়ণ চন্দ্র মিশ্র	"
৬০৫৪	" গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"
৬০৮১	প্রেসিডেন্ট ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ান ক্লাব	"
২৫৫২	চৌধুরী শ্রীপতি নাথ কর মহাপাত্র	"

গ্রাহক নং		নাম	সাল
৩৫৮১	বাবু	বিজয়কৃষ্ণ মুখার্জি	২০
৩৫৯৯	"	রামপ্রসাদ নন্দী	"
৩৮০৬	"	দ্বিজপদ বিশ্বাস	"
৩৮১৭	"	বৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র	১৯
১৮০৬	"	রজনীকান্ত বসু চৌধুরী	২০
৬০৪৮	"	রামনাথ ভট্টাচার্য্য	১৯
১৭৪৬	"	পদ্মকান্ত বড়ুয়া	২০
৩২২৩	"	পাচকড়ী মুখার্জি	"
৩২৪৩	"	যদব চন্দ্র রায়	"
৩৭১১	"	সুরেন্দ্রনাথ সেন	"
৩৯৯৬	"	উমাচরণ স্মৃতিতীর্থ	১৯
৪০০৬	"	মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৯
৪০৯৪		মহারাজকুমার অমীন্দ্র নারায়ণ	২০
৫০২১	বাবু	ভুবন মোহন মিত্র	"
৫০৭৯		পাঠক গঙ্গাহরি গোস্বামী	১৯
৬০২২	বাবু	সুরেন্দ্র নাথ বানার্জি	১৯
১৮৪৪	"	রবীন্দ্রনাথ বাগচী	২০
৫০৫৪	"	হরিলাল দত্ত	"
৩৬০৭	"	দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়	"
৫০২৪	"	মহেন্দ্র নাথ অধিকারী	১৯
১২০	"	অম্বিকা নাথ রায়	২০
৪০৫১	"	আনন্দ লাল মান্না	১৯
৫৫১	"	দ্বারিকা নাথ সিংহ রায়	২০
২১২৭	"	সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য	২০
৫০৫৬	"	ভোলানাথ চাটার্জি	১৯
৫৯৮	"	ধরণীধর শর্ম্মা	২০
১৩২০	"	কুঞ্জবিহারী লাহিড়ী	"
৩৬৬৫	"	সুরেন্দ্র নারায়ণ নন্দী	"
৩৯০৭		চৌধুরী রাম নারায়ণ প্রচরাজ	১৯২০

গ্রাহক নং		নাম	সাল।
৫০৫৩	বাবু	রমেশ চন্দ্র শীল	২০
৬০৮৭		সেক্রেটরী ষ্টুডেণ্ট লাইব্রেরী	"
১২৫২	বাবু	কুঞ্জবিহারী গোস্বামী	"
৩৯৮৬	"	পরেশ চন্দ্র চৌধুরী	১৯
৫০০১		কবিরাজ নবগৌরাঙ্গ গুপ্ত	"
৫০০৪	বাবু	চারু চন্দ্র সিংহ	"
৬০৮৮	"	রঘুনাথ ইন্দ্র	২০
৯৮৮		রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"
৫০৪১	বাবু	ক্ষিতিনাথ ঘোষ	"
৬০৮৯	"	শশীভূষণ সিংহ	"
৩৯৬৬	"	ইন্দ্রকুমার দে	"
৬০৯০	"	শরৎ চন্দ্র গাঙ্গুলি	"
২৭৭২	"	শিবনাথ মিত্র	"
৩৬৫৬	"	চিন্তামনী ত্রিপাটীসরদার	"
৩৪২১	"	বিশ্বেশ্বর সেন	"
৬০২১	"	গোবিন্দ চন্দ্র রায়	"
২৫৮৬	"	নবকিশোর কর	"
৬০৯২	"	অধর চন্দ্র মুখার্জি	"
৯৬২	"	ইন্দু ভূষণ বসু	"
৫১৩৭	"	লালমোহন পাকড়াশী	"
১৪৭৬	"	মদন মোহন গুপ্ত	"
৫০৪৪	"	ভূপতি রঞ্জন রায়	১৯
৮৮২	"	বীরেন্দ্র নাথ দত্ত	২০
৪০৭৩	"	রাস বিহারী গুপ্ত	"
৬০৮২	"	রাজেন্দ্র নাথ বোস	"
৩৮৪৬	"	যুগলকিশোর খান	"
৫০১৭	"	মহেন্দ্র নাথ কাওয়াল	১৮।১৯
৬০৯৩	"	গিরিজা ভূষণ দেবরায়	১৯

(ক্রমশঃ)

খাঁটী কাবুলী কাশ্মিরী এবং লাহোরী পশমী বস্ত্র।

লাহোরী ধোসা।

গরম এবং কোমল সাদা, নীল, বাদামী ধুসর প্রভৃতি রংএর।

৩¼ গজ × ৫০" মূল্য ১৩৲ টাকা হইতে ১৫৲

৬½" × ৫৮ মূল্য ২৬৲ হইতে ৩০৲

আলোয়ান (নক্সা বিহীন)

গরম এবং কোমল।

৩¼ গজ × ৫৪, "৫৬" মূল্য ৮৲ টাকা হইতে ১০৲

৩ গজ হইতে ৩¼ গজ × ৫৪ "৫৬" মূল্য ৬৲ টাকা হইতে ৮৲

কাশ্মিরী ধোসা।

অত্যন্ত গরম, কোমল, দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং কারুকার্য্য বিশিষ্ট পাড় বসান।

৩¼ × ৫৩, "৫৬" মূল্য ১১৲ টাকা হইতে ১২৲

কাবুলী আলোয়ান।

সুন্দর কাশ্মিরী পাড় সংযুক্ত, গরম এবং কোমল সাদা, ধুসর, বাদামী, নীল প্রভৃতি রং।

৩¼ গজ × ৫৮" মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে ২০৲

স্ত্রিলোকদিগের শাল।

সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট ৩ গজ × ১½ গজ ৮৲ টাকা হইতে ১১৲ এবং ১১॥০ হইতে ১৮৲ টাকা।

সাচ্চা জরির পাড় দেওয়া শাল।

৩ × ১½ গজ ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲

কাশ্মিরী দোরোখা শাল।

দুই পিঠে সমান কাজ, অতি সুন্দর পাড়।

৩¼ × ৫৪, "৫৬" মূল্য ২০৲ হইতে ২৫৲

মলিদা চাদর।

অত্যন্ত গরম এবং কোমল, ধুসর, বাদামী প্রভৃতি রং।

৩½ গজ × ৫৮" মূল্য ১৬৲ টাকা হইতে ১৮৲

৩¼ × ৫৮" মূল্য ১৩৲ (সুন্দর এবং পাতলা)

শাল জোড়া।

নানা বর্ণের অতি সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট। ১৮৲ টাকা হইতে ১৯৲ এবং ১৯॥০ হইতে ২৫৲ জোড়া; কাল পাড় দেওয়া (চিনি কর) ২৩৲ টাকা হইতে ৩০৲ জোড়া।

বালকদিগের শাল একখানি ৭৲ হইতে ১২৲

সাচ্চা জরির কাজ শাল একখানি ২৫৲

স্ত্রীলোকদিগের শাল একখানি ৮৲ হইতে ১৫৲

সর্ব্বপ্রকার জোড়া শাল ১৬৲ হইতে ১৫০৲

অর্দ্ধেক মূল্যে একখানি পাওয়া যায়।

আমীর চাঁদ এণ্ড সন্। শাল মার্চ্চেণ্ট, লাহোর।

কর্জ্জদাদনের সুদের অন্যূন হার—

হ্যাণ্ডনোটে অথবা খতে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক শতকরা ১ টাকা তদূর্দ্ধ ১০০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৸৶০ তদূর্দ্ধ ৸০ আনা।

সোণা রূপার জিনিষ, জহরত, কোম্পানির কাগজ, ও জীবনবীমা ব্যতীত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৷৶০ তদূর্দ্ধ ৫০০০ পর্য্যন্ত ৷৷/০ তদূর্দ্ধ ৷৷৮

এই কোম্পানির আমানত বন্ধকে ৷৷৬ স্থাবর সম্পত্তি ও পোলিসি বন্ধকে—
১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৸৶০ তদূর্দ্ধ ২৫০০ টাকা পর্য্যন্ত ৸/০ তদূর্দ্ধ ৫০০০
৸০ তদূর্দ্ধ ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৷৷৶, তদূর্দ্ধ ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৷৷৵০, তদূর্দ্ধ ৫০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৷৷/৪, তদূর্দ্ধ ১০০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৷৷/০, তদূর্দ্ধ ৷৷৮

বিজ্ঞান।

কৃষি, শিল্প, ও বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র একমাত্র মাসিক পত্র।

(২য় বর্ষ)

ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রথম পথ-প্রদর্শক, ভারতীয় বিজ্ঞানমন্দির (Indian Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠাতা ৺ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, বিজ্ঞানমন্দিরের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার অমৃত লাল সরকার, এফ, সি, এস্, মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই পত্রিকা পরিচালনে, বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ লেখনী ধারণ করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন, ও বঙ্গদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসার বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য। বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল (অগ্রিম) ২ মাত্র। এখনও প্রথম বর্ষের কয়েক খণ্ড বিজ্ঞান অবশিষ্ট রহিয়াছে। নূতন গ্রাহকগণ ইচ্ছা করিলে ১ম বর্ষের বিজ্ঞানও ক্রয় করিতে পারেন। সমগ্র খণ্ডের মূল্য ২ টাকা।

৫১নং শাঁখারী টোলা, কলিকাতা। মানেজার, বিজ্ঞান

কাট্‌তি এবং যোগানের

উপরই প্রত্যেক জিনিষের মূল্য নির্ভর করে এই নিয়ম কিন্তু আমাদের

আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা

সম্বন্ধে খাটে না। ইহা নষ্ট পরিপাক শক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে রক্ত পরিষ্কার করে, মেহ রক্তস্রাব বহুমূত্র মূত্রকৃচ্ছ্রতা শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি জননেন্দ্রিয়ের ও শুক্রসম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া আরোগ্য করে যদিও ইহার কাটতি দিন দিনই বাড়িতেছে তথাপি মূল্য একরূপই আছে। প্রতি কৌটার মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

ক্যাটেলগের জন্য পত্র লিখুন।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী। ২১৪ বৌবাজার কলিকাতা।

হিন্দু-পত্রিকা-সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি এম্, এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত

শাণ্ডিল্য-সূত্র

বা

ভক্তি-মীমাংসা।

(২য় সংস্করণ।)

কয়েক বৎসর মধ্যে প্রথম সংস্করণের পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে। ভক্তিপ্রাণ গ্রাহক-বর্গের আগ্রহে আবার এক সহস্র খণ্ড পুস্তক অভিনব প্রকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করি মাত্র ১৲ টাকার বিনিময়ে এমন সাধক-সমাজের হৃদয়ের ধন ভক্তিসূত্রের অমৃত-রস-আস্বাদন কেহই ক্ষতিকর মনে করিবেন না।

ইহাতে কি আছে ?

আছে—

ভক্ত-সাধক-সমাজের হৃদয়ের ধন, ভক্তিবীর শাণ্ডিল্য ঋষির শতসংখ্যক ভক্তিসূত্র। (প্রয়োজনীয় টীকা টিপ্পনিসহ বিস্তৃত এবং বিশদভাবে ইংরাজীতে ব্যাখ্যাত ও অনুবাদিত।)

এ গ্রন্থ সমস্ত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। কতিপয় প্রশংসা-পত্রের অংশ-বিশেষ এ স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে—

Prabuddha Bharata Almora বলেন :—

"The Sandilya Sutras is a very ancient work on Bhakti both philosophy and practice. Mr. Mozoomdar has translated it beautifully, giving a running commentary, mostly drawn from Swapneswara the commentator of Sandilya and explaining difficult passages and referencee in foot notes. The book is dedicated to Swami Vivekananda and opens with an able and learned introduction by the translator. It is prettily got up.

ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ বলেন—

The Book makes an important addition to the religious publications of the day."

"ট্রিবিউন্ বলেন—"* * Babu Jadu Nath has been devoting much of his time and thought to the popular exposition of abstruse Sanskrit works, and his facile pen and cultured under standing cast a peculiar glow on all his writing in the department of religious and philosophical enquiry" * *

জর্ণাল অব মহাবোধি সোসাইটী বলেন —"* * The book is an interesting study throughout." *

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী।

১। চণ্ডিকাবিজয় মহাকাব্য—উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি কমললোচনকৃত, ডিমাই ৮ পেজী ৪২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ অর্দ্ধমূল্য ॥০ আনা, বাঁধান ৸০ আনা। মাশুল ।০ আনা।

২। গৌড়ের ইতিহাস (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত খণ্ড ১ম হিন্দু (রাজত্ব) মূল্য ৸০ আনা, বাঁধান ১ টাকা। ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

HINDU FAMILY ANNUITY FUND.

No. I, Mirzapore Street, Calcutta

ESTABLISHED A. D. 1872,

For Hindus either by Nationality Bengali or Domiciled in Bengal proper

ACCUMULATED FUNDS EXCEED Rs. 11,00,000, (11 Lacs)

Maximum pension for a single Relative Rs. 30.

Do. foı more than two Relatives Rs. 80 per month.

ADVANTAGES.

1. Directors (including the Secretary) are elected annually by the subscribers.

2. All receipts are deposited with the Government of India and funds are held in Government Paper.

৭3। Suscriptions are received at all Government Treasuriesand those of Govt. servants & Pensioners, can be deducted, from their salaries and pensions respectively.

4. Subscribers of five years' standing and over are entitled to partial refund in the event of the death of their nominee.

5. Remission to the extent of one fourth of their annual subscription is granted to all subscribers on the rolls of the Fund on 31st March 1885

6. Subscribers of over ten years' standing are entitled to special benefits

TABLE OF RATES.

Age of Subscribers.	Age of wife or widowed relative	Monthly subscription for a pension of Rs 5 per month Rs.	As.	P.
18	12	1	6	0
30	22	1	10	6
40	34	2	3	0

No person above the age of 50 is elligible.

For rates for children, parents and other relatives see the table attached to the Rules of the Fund, For other informations and terms for application please apply to:—

U. L. Banerji M. A.

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২০শ বর্ষ, ২০শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩২০ সাল, ১৮৩৫ শকাব্দাঃ।

ধর্ম্মতত্ত্বে মনু ও উশনা।

নানা মুনির নানা মত চিরকালই আছে। মত-প্রচারকের স্বতন্ত্রতা বা বিশেষত্বের উপরই মতের বিশেষত্বের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং আচার্য্যগণের বিভিন্ন ধারণা বশতঃ একমতে যাহা ধর্ম্ম, অন্য-মতে তাহা উপধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে। সংসারে ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ধরিতে গিয়া সকলে যদি একই প্রণালীতে অগ্রসর হইতেন, তবে বোধ হয়, ধর্ম্ম-তত্ত্বে নানা মত ও নানা পথের কথা শুনিতে হইত না। কিন্তু স্বতন্ত্রতার দিকে দৃক্‌পাত করিলে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, "সকলের এক প্রণালী দিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইতে পারে না, আবার ইচ্ছা হইলেও সামর্থ্য থাকিতে পারে না। ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বা প্রতিভাবৈচিত্র্যের প্রখর-স্রোতে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী-পথের পথিক হইতে বাধ্য হন। যেখানে দুই বা ততোধিক জন দৈবযোগে এক প্রণালীতে যা'ন, সেখানেও কেহ দক্ষিণ কূলের নিকট দিয়া, কেহ বাম কূলের নিকট দিয়া, কেহ বা মধ্য পথ ধরিয়া যাইতে বাধ্য হন।" এই জন্য পরস্পরের বর্ণনায় অবিকল মিল থাকে না। (ঠিক্ ঠিক্ মিল না থাকিলেও সমন্বয় থাকিতে পারে, এ কথা কিন্তু মনে রাখিতে হইবে।) নিপুণ সমন্বয়কারী, এই বর্ণনা-ভেদে বিস্মিত হন না, ব্যথিতও হন না। কাজেই আপাত বিরোধ দেখা গেলেও আশঙ্কার কারণ নাই। এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে মহর্ষি মনু ও উশনার বর্ণনা আলোচিত হইবে।

ভারতীয় আর্য্য সন্তানের সাধারণ ধারণা—"বেদ-প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

সনাতন বেদ-শাস্ত্রে প্রতিপাদিত কর্ম্মই ধর্ম্ম, আর যাহা উহার বিপরীত অর্থাৎ বেদ-বোধিত নয়, তাহাই অধর্ম্ম। বেদে উপদিষ্ট অগ্নিহোত্র জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি হোম, যাগ ইত্যাদি ধর্ম্ম, আর বেদ-বিরুদ্ধ চৈত্যবন্দনাদি অধর্ম্ম। এখানে বেদকে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের বাক্য মনে করিয়া, অথবা অভ্রান্ত আপ্তবাক্য স্থির করিয়া বেদোক্ত কর্ম্মকে ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম্ম বা অভ্রান্ত-বাক্যবোধিত কর্ম্ম বুঝিয়াই 'ধর্ম্ম' নাম দেওয়া হইয়াছে। বেদবাদিদিগের মধ্যে যাঁহারা বেদকে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে সুতরাংই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব দাঁড়াইল—ঈশ্বরের আদেশ উপদেশ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার নির্দ্ধারণ অবিচারিত ভাবে গ্রহণ-যোগ্য, সুতরাং প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে (বেদে) যে ঐশ্বরিক সিদ্ধান্ত গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই "ধর্ম্ম" বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। নিজ প্রতিভার সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্বে উপনীত হইবার চেষ্টা বৃথা। বেদে, বাইবেলে, কোরাণে ঈশ্বরের আদেশ উপদেশ বিবৃত আছে; সংসারের সভ্য-মানবের অনেকে অর্থাৎ হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান্ সম্প্রদায় এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন। হিন্দু-দার্শনিক গণের মধ্যে মীমাংসকগণ, বেদকে ঈশ্বরপ্রণীত মনে করেন না, অভ্রান্ত অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" বেদ-বিধি-বোধিত ইষ্ট-সাধক অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ধর্ম্ম। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত বেদের সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া, বেদকে স্বতঃ-প্রমাণ বাক্য বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্বের মূলে এক অনাদি অভ্রান্ত জ্ঞান-প্রবাহের কল্পনা আছে, কিন্তু উহা পরম পুরুষ ঈশ্বর নহেন, অনন্তা অলৌকিক-তথ্যময়ী নিত্যা বেদবাণী। এখানে ধর্ম্মতত্ত্বের নির্ভর-স্থান এক নিত্য-জ্ঞান, তাহা ঈশ্বর নামক পুরুষের নিজস্ব নয়। এক ভাবে অনাদি অনন্ত বলিয়া উহাকে অনেকটা অবিজ্ঞেয় করিয়াই রাখা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও ধর্ম্মতত্ত্ব-বিচারে মানব-প্রতিভার স্থান বা মূল্য নাই।

এই বেদমূলক ধর্ম্মতত্ত্ববাদ অর্থাৎ মানব-প্রতিভার পরপারবর্ত্তী অলৌকিক জ্ঞানরাজ্যের সাহায্যে মানবের ধর্ম্ম-নির্ণয়ের মতবাদ একভাবে জগতের সাধারণ সম্পত্তি। তবে দেশ-কাল-ভেদে উহার আকার-প্রকার-ভেদ ঘটিয়াছে মাত্র।

মনু প্রভৃতি বেদমার্গী মহর্ষিগণ, অধুনাতন সময়ে বিদ্যমান বেদে পাওয়া যায় না, এমন কতকগুলি কর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' নাম দিয়াছেন এবং ঐগুলি গ্রন্থাকারে লিপীবদ্ধ করিয়া স্মৃতশাস্ত্র নামে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা স্বরচিত স্মৃতিশাস্ত্রকে স্বতন্ত্র ভাবে ধর্ম্মের মূলে দাঁড় করাইতে চাহেন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে যে বেদের আদেশ উপদেশই গ্রথিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। লোকে বলিতে পারে "তোমার স্মৃতি-শাস্ত্র মানিনা, কারণ উহা মানব-প্রতিভার অবদান।" এই জন্য তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "বেদের অনেক অংশ এখন বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সকল অংশে যাহা

ছিল বলিয়া জানিতাম, তাহাই স্মৃতি-শক্তির দ্বারা উদ্ধার করিয়া এই স্মৃতি-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। বেদের ঐ সব অংশের উপদিষ্ট কর্ম্মগুলি মনে আছে, কিন্তু ভাষাটা মনে নাই, এই জন্য জিনিষটা তাহাই থাকিল, ভাষাটা রচিত হইল।” এই রূপে পরবর্ত্তী সময়ে মানব-বুদ্ধি, যাহা কিছু করিয়াছে, সে—সঙ্কলন মাত্র, তাহাতে নিজস্ব কিছুই নাই—এ কথা বলিয়াই আচার্য্যগণ দাঁড়াইয়াছেন। স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র সবই বেদের দোঁহাই দিয়া চলিয়াছেন।

মহর্ষি মনু “সদাচার” ও “আত্মতুষ্টি” নামক ছুটী সামগ্রী ধর্ম্মতত্ত্বের মূলে জুড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু, তাহারা অতিসন্তর্পণে বেদের গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদে মিলিল না, স্মৃতিতে কুলাইল না, অথচ আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিভাবান্ শিষ্টজনেরা সেরূপ কতকগুলি ধর্ম্মের আচরণ করেন, সুতরাং উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, আচার্য্যগণ, মানব-প্রতিভার সম্মান খর্ব্ব করিয়া লিখিলেন,“শিষ্টগণের আচার দেখিয়া অনুমান হয়, ইহা কোনও স্মৃতিতে ছিল; সে স্মৃতির মূলেও বেদ নিশ্চয়ই ছিল। বলা বাহুল্য, সে স্মৃতি এবং সে বেদ আর নাই; কেবল শিষ্টজনেরা তাহার উপদিষ্ট কর্ম্মের আচরণ করেন মাত্র।” অবশ্য একথা মানিয়া লইতে হইবে, যে, বেদে না থাকিলে স্মৃতি হয় না, স্মৃতিতে না থাকিলে শিষ্টেরা এমন আচরণ করিতেই পারেন না। এখানে আমরা বুঝিলাম, প্রতিভার সম্পৎ, অলৌকিকতার আবরণে চাপা পড়িল। এই একটী পংক্তিকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল সূত্র বলা যাইতে পারে। “আত্মতুষ্টি” ধর্ম্মের মূলে আসিলে মানব-প্রতিভার জয় হয়। যে কর্ম্ম করিলে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করেন—অর্থাৎ যাহা বিবেকের নিকষে পরীক্ষিত, যাহা গতানুগতিকতা বা অলৌকিকতার আবরণে আচ্ছাদিত নয়, এমন কর্ম্মই ধর্ম্ম। এইভাবে আত্মতুষ্টির ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বেদের মূল্য কমিয়া যায়; চিন্তাস্রোত অলৌকিকতার পাষাণভিত্তি ভেদ করিয়া স্বাধীন উন্মুক্তগতি লাভ করিতে পারে; তাহাতে মানব-প্রতিভার প্রতি জনসমাজের দৃষ্টি পড়িতে পারে। তাহার ফল সমাজের পুরাতন শৃঙ্খলের শৈথিল্য কিম্বা উচ্ছৃঙ্খলতা! দৃঢ় বাঁধ, সাবধান হইয়া ভাঙ্গিতে হয়, নচেৎ দেশ ডুবিয়া যায়, জীবজন্তু মরিয়া যায়, মন্দির-প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। কাজেই মহর্ষি মনু স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে অন্য একজন ঋষি, স্রোতের ভয়ে পূর্ব্ব হইতে বাঁধ দৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করিয়া “আত্মতুষ্টি”কে বেদের গায়ে লাগাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “বৈকল্পিকে আত্মতুষ্টিঃ প্রমাণম্।” বেদে যেখানে বিকল্প আছে, সেখানেই আত্মতুষ্টিকে ধর্ম্মের মূলে ধরিতে হইবে। বেদে আছে—“ব্রীহিভির্ব্বজেত যবৈর্বা” “পুরোডাশ” নামক যজ্ঞীয় পিষ্টক, ব্রীহি (ধান্য) দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা যাগ করিবে, অথবা যব দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা যাগ করিবে। এই বিকল্পস্থলে কর্ত্তার যাহাতে

তুষ্টি হয়, তদ্রূপ করিবে। একজন সুরসিক হিন্দুস্থানী বন্ধু বলিতেন "আমরা অবশ্যই 'যব' লইব, আর তোমরা 'ব্রীহি' লইবে, ইহা স্থির, কিন্তু যজমানের ইচ্ছানুসারে হইবে বা ঋত্বিক্‌গণের ইচ্ছামত হইবে ইহাই চিন্তার কথা! বাঙ্গালী যজমানের গৃহে হিন্দুস্থানী বা দাক্ষিণাত্য ঋত্বিক্ আসিয়া থাকেন; সে সব যজ্ঞের কথা ভাবা উচিত ছিল। আত্মতুষ্টির ব্যাখ্যা সুতরাংই বিপদের মধ্যে!"

মনু যে আত্মতুষ্টির কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রতিভার পূজা আরব্ধ হইয়াছে। আমরা আচার্য্য গৌড়পাদের মুখে শুনিয়াছি "প্রাতিভং জ্ঞানং ঋষীণাং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রমাণম্" ঋষিদিগের প্রতিভা-জাত জ্ঞানই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রমাণ। 'প্রতিভা' বলিতে যোগজ শক্তিই বল, আর বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানলব্ধ সামর্থ্যই বল, মোট কথা প্রতিভা—"প্রতিভা"ই। ইহার সূচনা মনুতে, পরিপূর্ণতা উশনায়।

মহর্ষি উশনা, তাঁহার অমূল্য নীতি-শাস্ত্রের পঞ্চমাধ্যায়ে বলিয়াছেন "বহুভির্যঃ স্মৃতোধর্ম্মো নিন্দিতোঽধর্ম্ম এব সঃ।" যে কার্য্য বহু লোকের দ্বারা প্রশংসিত, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা বহু লোকের নিকট নিন্দিত, তাহাই অধর্ম্ম। আপাততঃ বোধ হয়, ঋষি স্থূলবুদ্ধি ছিলেন,—কেবল গতানুগতিকতার উপরই নির্ভর করিয়া ছিলেন। কিন্তু যাঁহারা দৈত্যগুরু উশনার জটিলতাময় জীবন-রহস্য অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন, উশনা গড্ডালিকা-প্রবাহে আত্মসমর্পণ করেন নাই বলিয়া সমাজের স্নেহাঞ্চল-ছায়ায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আজীবন তিনি স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া কেবল দশজনে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানে তাহাই অপরীক্ষিত রূপে নতমস্তকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা উশনার প্রকৃতি-সঙ্গত নয়। এই নিমিত্ত এই ঋষি বাক্যের বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

লোকের ভাল মন্দ স্থির করিবার মানদণ্ড কি? প্রথমতঃ নিজেকেই ধরা যাউক্। আমার যাহা সুবিধাজনক, আমার কাছে তাহাই ভাল। কিন্তু শুধু এইটুকু হইলেই চলে না; কারণ আমার যাহাতে সুবিধা হয়, অন্যের তাহাতে অসুবিধা হইতে পারে। স্বার্থসংঘর্ষ দাঁড়াইলে, হয় ত আমি যাহাতে সুবিধা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই আমার দারুণ অসুবিধা সৃষ্টি করিল। এক্ষেত্রে বুঝা গেল, কেবল আমারই অসুবিধা যথার্থ "আমার অসুবিধা" নয়। যাহা অন্যের সুবিধার অবিরোধে আমার সুবিধা, তাহাই আমার প্রকৃত সুবিধা। নিজেকে অন্যের স্থানে দাঁড় করাইয়া নিজের তুলনায় জগতে ভালমন্দ স্থির করিতে হয়। জগদারাধ্যা জানকী রাবণকে বলিয়াছিলেন--"আত্মানমুপমাং কৃত্বা চর ধর্ম্মং নিশাচর।" অর্থাৎ নিজের তুলনায় বিচার করিয়া ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ভাবার্থ এই যে, যদি কেহ তোমার বনিতা হরণ করে, তাহাতে তোমার যেরূপ বোধ হয়, তুমি আমাকে হরণ করায় আমার স্বামীরও তাদৃশ ভাব ঘটিয়াছে, সুতরাং অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর না,

অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও না; অতএব পরনারী সংস্পর্শের কলুষিত কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, অন্যের সুবিধার অবিরোধে স্বদারসেবারূপ ধর্ম্ম্য কর্ম্মে নিবিষ্টচিত্ত হও। ফলতঃ শাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে অন্যের অহিতকর নহে অথচ নিজের হিতকর, এরূপ কার্য্যই প্রশংসনীয় সাধু-কার্য্য। যে কার্য্য বহুলোকের দ্বারা প্রশংসিত, তাহা নিশ্চয়ই বহুলোকের হিতকর ও প্রীতিকর। তাৎপর্য্যতঃ যাহাতে আত্মতুষ্টি বিরাজ করে এবং যাহা বিশ্ব-তুষ্টির অপ্রতিকূল, তাহাই ধর্ম্ম, ইহার বিপরীত অধর্ম্ম। নিজাত্মায় যে আত্মপ্রেম বিরাজিত, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া, যাহা সকলের অভীপ্সিত, সেই সার্ব্বজনীন পরপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম পর্য্যন্ত না গেলে, উশনার মতের মর্ম্ম বুঝা যাইবে না। উশনার মতের মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে, "বিশ্বের তৃপ্তি ব্যতীত আত্মতৃপ্তি নাই, একথা বুঝিলে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাই ধর্ম্ম—কর্ম্ম।" নীতিজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ কেহই এ তত্ত্বের উপরে যাইতে চাহিবেন না। উশনা "সর্ব্বৈঃ" না লিখিয়া "বহুভিঃ" লিখিয়াছেন, ইহারও হেতু আছে! তিনি জানিতেন, মানব-প্রতিভা যাহাকে "সর্ব্ব" বলিবে, তাহাতে কেবল বহুত্বেরই বিকাশ। বিশ্বহিতকর কর্ম্মই যে ধর্ম্ম, তাহা হিন্দু প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝেন। এ প্রতিভার মর্য্যাদাও বেদের ভাণ্ডারে আছে, সুতরাং সমন্বয়বাদীর চিন্তা নাই।

শ্রীঃ——

ন্যায়দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪০ সূত্র। অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।

ব্যাখ্যা। "অবিজ্ঞাত-তত্ত্বে" (অনিশ্চিত-যাথার্থ্যে) "অর্থে" (পদার্থে) তত্ত্বজ্ঞানার্থং (যাথার্থ্য-নির্ণয়ার্থং) "কারণোপপত্তিতঃ" (প্রমাণসম্ভবাৎ) উহঃ (মানস জ্ঞান-বিশেষঃ "তর্ক" (তর্কশব্দেন পরিভাষিতঃ।)

তাৎপর্য্যানুবাদ। যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান থাকিলেও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সন্দিগ্ধ, তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য প্রমাণের সম্ভব প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে যে উহ, তাহাকে তর্ক বলিয়া জানিবে।

টীকা। অবয়ব-নিরূপণ হইয়াছে। সুতরাং ন্যায় নিরূপিত হইয়াছে। তর্ক, ন্যায়ের সহকারী হইয়া একই নির্ণয়-কার্য্যে পরম সহায়, তাই অবয়বসমূহ রূপ ন্যায়-নিরূপণের পরে মহর্ষি তর্ক নিরূপণ করিতেছেন। প্রথমসূত্রেও অবয়বের পরেই তর্ক উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

তর্ক বলিলে সাধারণ-জ্ঞানে অনেকে ভালমন্দ-বিচার মাত্রই বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার কলহও বুঝিয়া থাকেন। যাঁহারা একটু বেশী বুঝেন, তাঁহারা তর্ক বলিলে অনুমান বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তর্ক শব্দ, অনুমান অর্থে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রযুক্ত আছে। হেতু, তর্ক, ন্যায়, অন্বীক্ষা, এই শব্দগুলিকে প্রাচীন-গণ অনুমান অর্থেও প্রয়োগ করিয়া

গিয়াছেন। আবার তর্ক বলিতে তর্ক-শাস্ত্রকেও বুঝায়, ইহারও প্রমাণ আছে।

কিন্তু মহর্ষি, তাঁহার ষোড়শ পদার্থের মধ্যে যে তর্ক বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত কোন তর্ক নহে। উহা অনুমানও নহে। বিচারবাক্যও নহে। কলহও নহে, তর্ক-শাস্ত্র ও নহে।

উহা এক প্রকার মানস জ্ঞান। নৈয়ায়িকগণ উহাকে 'উহ," "প্রসঙ্গ," অথবা "আপত্তি" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহর্ষি গোতম, সূত্রে উহ শব্দের দ্বারাই সেই তর্কের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বলেন, সূত্রে "তর্কঃ" এই অংশ লক্ষ্যনির্দ্দেশ। "কারণোপপত্তিত উহঃ" এই অংশ লক্ষণ। "অবিজ্ঞাত তত্ত্বেহর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থং" এই অংশ তর্কের প্রয়োজন-কথন। তর্কের সহজ অর্থ আপত্তিবিশেষ। মনের দ্বারা ঐ আপত্তি আত্মাতে জন্মে। তার্কিক বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করেন। তার্কিকের সেই কথা গুলি "তর্ক" নহে। তার্কিকের সেই উহ অর্থাৎ সেই মানস প্রত্যক্ষ রূপ আপত্তিই তর্ক। উহা প্রমাণ নহে। যেখানে উভয় পক্ষের প্রমাণ উপস্থিত, কিন্তু পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয় হইতেছে না, সেখানে তর্ক, এক পক্ষের যুক্ততা ও অপর পক্ষের অযুক্ততার বিচার করিয়া প্রমাণের সাহায্য করিয়া থাকে। তখন তর্ক-সহায় প্রমাণ বলশালী হইয়া প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় সাধন করে। তর্ক নিজে প্রমাণ না হইলেও তাহার মূলীভূত প্রমাণ (অনুমান) আছে। তাহার প্রামাণ্যেই তর্ক, প্রমাণের সহায়।

সংশয়-নিবৃত্তিতে অনেক স্থানে এই তর্কেরই মুখের দিকে তাকাইয়া আশ্বস্ত হইতে হয়। চার্ব্বাক বলেন, তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিতে অবিশ্বাসী হইলে (সংশয় করিলে) তাহাতেও আবার তর্কের অবতারণা করিতে হইবে। তাহার মূল ব্যাপ্তিতে সন্দিহান হইলে, আবার তাহাতেও তর্কের অবতারণা করিতে হইবে। এইরূপে চিরকাল সন্দেহ করিলে আর তর্ক কিছু করিতে পারেন না। অনুমানের হেতুতেও সাধ্যের ব্যভিচার-সংশয় হওয়ায় কোন দিনই অনুমান হইতে পারে না। সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য অসম্ভব। ন্যায়াচার্য্যগণ ইহার বিশদ বিচার পূর্ব্বক উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাদের মূল কথা এই যে, যিনি অনুমান মানেন না, তিনি ঐরূপ সংশয়ও করিতে পারেন না। কারণ, সংশয়ের সামগ্রী চাই। সামগ্রীর অভাবে যেখানে সেখানে যে সে বিষয়ে সংশয় করিলে, চার্ব্বাক মহোদয়ের নিজস্ব পদার্থসমূহেও সংশয় অনিবার্য্য। সুতরাং দেখিতে হইবে যে, সংশয়ের কারণ কি? ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে। চার্ব্বাক ইহাতে সংশয় করিলে দেশান্তর ও কালান্তরে ধূমে বহ্নি সম্বন্ধের সংশয় করিবেন। কিন্তু ঐ দেশান্তর ও কালান্তর চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। সুতরাং দেশান্তরীয় কালান্তরীণ ধূম, বহ্নি-ব্যভিচারী কিনা, এরূপ সংশয় কি করিয়া হইবে? দেশান্তর প্রভৃতির জ্ঞান না থাকিলে সেরূপ সংশয় হইতে পারে না। অনুমান দ্বারা উহা মানিয়া লইয়া, উহারই দ্বারা পুনরায় অনুমান খণ্ডন করা যায় না।

ফলতঃ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে চার্ব্বাকের কথা বলাই সম্ভব নহে। তবে "ব্যভিচার-সন্দেহে অনুমানের প্রতি আস্থা হয় না, তর্কের মূল ব্যাপ্তিতে ঐরূপ সংশয় হওয়ায় তর্কের প্রতি আস্থা হয় না।" চার্ব্বাকের এ কথার উত্তর দিতে হইবে। তাহাতে ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন যে, সর্ব্বত্র সন্দেহ হয় না। এরূপ হেতু প্রচুর আছে, যাহাতে কাহারও সাধ্য-ব্যভিচার-সংশয় হয় না, ইহা অনুভব সিদ্ধ। ইহা স্বীকার না করিলে, চার্ব্বাকেরও রক্ষা নাই। তিনি বিপক্ষকে তাঁহার মতটী বুঝাইবার জন্য বাক্যপ্রয়োগ করেন। বিপক্ষ বুঝে নাই বা ভুল বুঝিয়াছে, ইহা তিনি বিপক্ষের কথা শুনিয়াই অনুমান করেন। নচেৎ তাহা বুঝিবার তাঁহার অন্য উপায় নাই। এসব কথা অনুমান-সূত্রে কিছু বলিয়াছি। যথাস্থানে আরও বলিব। ফলকথা, সর্ব্বত্র হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার-সংশয় হয় না। যেখানে সংশয় হয়, সেখানে তর্কের দ্বারা সংশয়-নিবৃত্তি হয়। তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিতেও সংশয় হইলে তাহা তর্কান্তরের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। যে পর্য্যন্ত সংশয় হইবে, সে পর্য্যন্ত তর্ক তাহার নিবৃত্তি করিবে। তর্ক শেষে এমন স্থানে গিয়া দৃঢ়মূল হইয়া দাঁড়াইবে যে, সেখানে আর সংশয় হইতেই পারিবে না। সুতরাং তর্কের অনবস্থা-দোষের আশঙ্কা নাই। উদয়নাচার্য্য-প্রমুখ ন্যায়াচার্য্যগণ, বহু বিচার পূর্ব্বক চার্ব্বাকের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। "খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য" গ্রন্থে শ্রীহর্ষ মিশ্র উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের কারিকার শব্দ-পরিবর্ত্তন করিয়া উপহাসের সহিত উদয়নের কথার যে খণ্ডন করিয়াছেন, "তর্ক" গ্রন্থে চিন্তামণি-কার গঙ্গেশ, তাহার উল্লেখ করিয়া নৈয়ায়িক-পক্ষের সমাধান করিয়াছেন। সে সব কথাও পরে বলিব।

উহ বা আপত্তি করিলেই তাহা তর্ক হয় না, তাহা প্রমাণমূলক হওয়া চাই। প্রমাণ-শূন্য আপত্তি তর্ক নহে। তাই মহর্ষি সূত্রে বলিয়াছেন "কারণোপপত্তিতঃ"। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে এখানে কারণ শব্দের অর্থ প্রমাণ। উপপত্তি শব্দের অর্থ সম্ভব। তাৎপর্য্য-টীকাকার মিশ্রমহোদয় বলিয়াছেন যে "যে বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা হইলে প্রমাণ প্রবৃত্ত হয় না। অনিষ্ট আপত্তির দ্বারা সেই বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা অপনীত না হইলে সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হয় না। সেই আশঙ্কার অপনয় এবং তত্ত্ব-বিষয়ে প্রমাণের সম্ভব—এই দুইটীকে উপপত্তি বলে"। ফলতঃ প্রাচীনগণের মতে যে বিষয়ের তত্ত্ব অর্থাৎ যাথার্থ্য জানা যাইতেছেনা, তদ্বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রমাণের উপপত্তি অনুসারে একতর পক্ষে উহ অর্থাৎ অভ্যনুজ্ঞা বা সম্ভাবনার নাম তর্ক। যে বিষয়ের তত্ত্ব জানা যাইতেছেনা, তাহার তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হওয়া লোকের স্বাভাবিক। তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইলেই পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের আলোচনা হয়—অর্থাৎ ইহা এই প্রকার, কি এই প্রকার নহে, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। যদিও সংশয়ের

পরেই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও স্থলবিশেষে ও সময়বিশেষে জিজ্ঞাসার পরেও সংশয় হয়। সন্দিহ্যমান ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে যে ধর্ম্মের প্রমাণের উপপত্তি হয়, তাহার অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা হইয়া থাকে—অর্থাৎ ইহা এইরূপ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা বা অনুজ্ঞা হইয়া থাকে। এই সম্ভাবনাই তর্ক। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন যে, সামান্যতঃ জ্ঞাত আত্মার তত্ত্বজিজ্ঞাসা হইলে প্রথমতঃ "আত্মা অনুৎপত্তিধর্ম্মক অথবা উৎপত্তিধর্ম্মক" এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। পরে প্রমাণের উপপত্তি অনুসারে এইরূপ তর্কের অবতারণা হইয়া থাকে যথা—"আত্মা অনুৎপত্তিধর্ম্মক হইলে এ জন্মের পূর্ব্বেও আত্মা ছিল, সুতরাং তাহার দেহান্তরও ছিল। ঐ দেহান্তরে কর্ম্মও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব্বদেহে কৃতকর্ম্মের ফলভোগের জন্য বর্ত্তমান দেহপরিগ্রহ, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ, এবং একই আত্মার নানা দেহসম্বন্ধ হইতে পারে এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা শরীরাদির আত্যন্তিক বিয়োগও সম্ভবপর। এইরূপে আত্মা অনুৎপত্তিধর্ম্মক হইলে তাহার সংসার ও অপবর্গ উভয়ই হইতে পারে। আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক হইলে তাহার সংসার অপবর্গ কিছুই হইতে পারে না। কারণ উৎপন্ন আত্মার বর্ত্তমান দেহের সহিতই সম্বন্ধ। ইহার পূর্ব্বে আর সে আত্মা ছিল না, বর্ত্তমান দেহও অভিনব উৎপন্ন আত্মার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল হইতে পারে না। পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম ভিন্ন অভিনব-দেহসম্বন্ধ-নিবন্ধন সুখদুঃখ-ভোগ হওয়াও অসম্ভব। আর শরীরের সহিত উৎপন্ন আত্মা, শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইবে। সুতরাং আত্মার অপবর্গও হইতে পারে না। অতএব আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক নহে। আত্মা অনুৎপত্তিধর্ম্মক ইহাই সম্ভব।" ভাষ্যকার তর্কের এই উদাহরণ দেখাইয়াছেন। প্রমাণ বিষয়ের যুক্তাযুক্তবিচারই তর্ক। তর্ক তত্ত্বজ্ঞান নহে। তর্ক, তত্ত্বনিশ্চায়কও নহে। তর্ক প্রমাণের অনুগ্রাহক মাত্র। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন, জ্ঞাততত্ত্ব পদার্থে যখন পূর্ব্বানুভূত তত্ত্বের উহ হইবে, তখন তাহা তর্ক নহে, তাই "অবিজ্ঞাততত্ত্বেহর্থে" ইহা বলা হইয়াছে। যদিও "কারণোপপত্তিতঃ" এই অংশের দ্বারাই "জ্ঞাততত্ত্ব পদার্থের উহ তর্ক নহে" ইহা বুঝা যায়, তথাপি "অবিজ্ঞাততত্ত্বেহর্থে" এই কথা না থাকিলে "কারণোপপত্তিতঃ" এই অংশের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা বুঝা যায় না। ফলতঃ প্রাচীনগণের মতে সূত্রের প্রথমাংশও লক্ষণ—ঘটক। আমরা নব্যমতেই তর্কের স্বরূপ দেখাইয়াছি; তবে "কারণোপপত্তিতঃ" এই অংশের ব্যাখ্যা প্রাচীন মতেই দেখাইয়াছি। এখন নব্যমতে উহার ব্যাখ্যা বলিব। বৃত্তিকার নবীন ন্যায়াচার্য্য বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন "কারণং ব্যাপ্যং" বস্তুতঃ অনুমানে সৎহেতু ব্যাপ্যই হয়। সুতরাং কারণ শব্দে হেতু বুঝিয়া তাহার দ্বারা ব্যাপ্য অর্থ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। উপপত্তি শব্দের অর্থ—আরোপ। আরোপ বলিতে ভ্রমজ্ঞান। ভ্রমজ্ঞান আবার দ্বিবিধ। আহার্য্য ও অনাহার্য্য। আহার্য্য শব্দের

অর্থ কৃত্রিম। ফলতঃ যেখানে জানিয়া বুঝিয়া প্রতিবন্ধক জ্ঞান সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রম হয়, সেখানে সেই ভ্রমকে ন্যায়াচার্য্যগণ আহার্য্য বলেন। যেমন জলে বহ্নি নাই জানি, কিন্তু একজন "জলে বহ্নি আছে" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছে; তর্ক করিয়া লোককে বুঝাইতেছে; তখন আমি জল বহ্নিশূন্য জানিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক "যদি এই জল বহ্নিযুক্ত হয়, তবে হস্ত দগ্ধ হউক" এই রূপ আপত্তি করিলাম। ঐ স্থলে এই জল যদি বহ্নিযুক্ত হয় এই রূপে জলে বহ্নির আরোপ করিয়াছি। আমার ঐ জ্ঞান আহার্য্য ভ্রম। কারণের অর্থাৎ ব্যাপ্যের উপপত্তি অর্থাৎ আহার্য্য আরোপ বশতঃ ব্যাপকের যে উহ অর্থাৎ আহার্য্য আরোপ, নব্যগণ তাহাকেই তর্ক বলেন। উহা আপত্তি-বিশেষ। উহা মানস প্রত্যক্ষ। যেথানে ব্যাপক নাই বলিয়া স্থির আছে, সেখানে ব্যাপ্যের আহার্য্য আরোপ বশতঃ ব্যাপকেরই আহার্য্য আরোপ হইয়া থাকে; সুতরাং "কারণোপপত্ত্যা উহঃ" এই অংশের দ্বারাই তর্ক-লক্ষণের অন্য অংশ পাওয়া যাইবে। উদাহরণ দেখুন—ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। বহ্নি, ধূমের ব্যাপক। কোন স্থানে বহ্নি-রূপ ব্যাপক নাই, ইহা স্থির আছে; সেখানে কেহ "বহ্নিব্যাপ্য ধূম আছে" বলিলে, "যদি ধূমবান্ স্যাৎ তদা বহ্নিমান্ স্যাৎ" এই ভাবে আপত্তি হয়। ঐখানে ব্যাপ্য ধূমের আহার্য্য আরোপ বশতঃ ব্যাপক বহ্নির আহার্য্য আরোপ হইতেছে। কারণ, ঐরূপ তর্ককারীর সে স্থানে ধূম ও বহ্নি উভয়েরই অভাবনিশ্চয় আছে। এই রূপে বর্ণিত লক্ষণাক্রান্ত আরোপই তর্ক। অবশ্য যাহার তাহার আরোপ বশতঃ যাহার তাহার ঐ রূপ আরোপ তর্ক নহে। তাই ব্যাপ্য ও ব্যাপকের কথা বলা হইয়াছে। তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান বশতঃই ঐরূপ তর্ক করিতে পারা যায় না। নচেৎ আপত্তি করিলেই তাহা গ্রাহ্য হয় না। তাহা তর্কও হয় না।

কেহ "এই গৃহে হস্তী আছে" বলিলে, "যদি হস্তী থাকে তবে অশ্বও থাকুক" এই রূপ আপত্তি তর্ক নহে। কারণ হস্তী, অশ্বের ব্যাপ্য নহে—অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই সেখানে অশ্ব থাকিবে, এরূপ নিয়ম নাই। যদি হস্তী থাকে, তাহার বন্ধনস্তম্ভও থাকুক, এই রূপ আপত্তি তর্ক হইতে পারে। কারণ, হস্তী যে গৃহে থাকে, সে গৃহে তাহার বন্ধন-স্তম্ভ থাকেই। বন্ধনস্তম্ভ হস্তীর ব্যাপক। ঐ ব্যাপক বন্ধনস্তম্ভ যদি সে গৃহে না থাকে অর্থাৎ যদি ঐ গৃহ, হস্তীর বন্ধনস্তম্ভশূন্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, তখন সেখানে ব্যাপ্য হস্তীর আহার্য্য আরোপ বশতঃ ব্যাপক বন্ধনস্তম্ভের আহার্য্য আরোপ তর্ক হয়। আর যদি হস্তীর বন্ধনস্তম্ভ সে গৃহে থাকে, তবে ঐ আপত্তি তর্ক হয় না। কারণ ঐ আপত্তি তখন ইষ্ট। ঐরূপ আপত্তিকে দার্শনিকগণ ইষ্টাপত্তি বলেন। আপত্তি স্থলে আপাদ্য ও আপাদক দুইটী পদার্থ চাই। যাহাকে আপত্তি করা হয়, তাহাকে আপাদ্য বলে। যে পদার্থের আরোপে আপত্তি হয়, তাহাকে আপাদক বলে। যেমন, হস্তী আপাদক।

তাহার বহ্নিজন্যত্ব আপাদ্য। ধূম আপাদক, বহ্নি আপাদ্য। আপাদ্যটী ব্যাপক হইবে। আপাদকটী তাহার ব্যাপ্য হইবে। ব্যাপকের অভাব-নিশ্চয় হইলে তাহার দ্বারা ব্যাপ্যের অভাব অনুমিত হয়, সুতরাং প্রকৃত তর্ক স্থলে আপাদ্যের অভাবকে হেতু করিয়া আপাদকের অভাবকে অনুমান করা হয়। ইহাই তর্কের শেষ ফল। যেখানে আপাদ্যটী আছেই সেখানে আপাদ্যের অভাব না থাকায় তাহাকে হেতু করা যায় না। তাই ইষ্টাপত্তি স্থলে তর্ক বলা যায় না। এজন্যই ব্যাপকের অভাব-বিশিষ্ট বলিয়া নির্ণীত স্থানে ব্যাপ্যের আহার্য্যারোপ প্রযুক্ত ব্যাপকের আহার্য্য আরোপই তর্ক, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কিনা, এই রূপ সংশয় হইলে "ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ তদা বহ্নি-জন্যো ন স্যাৎ" এই রূপ তর্কের দ্বারা ঐ সংশয় নিবৃত্ত হয়। ধূমে বহ্নিজন্যত্ব সর্ব্বসিদ্ধ। কোন স্থানে ধূম আছে কিন্তু বহ্নি নাই, ইহা বলিলে, ধূমে সর্ব্বসিদ্ধ বহ্নি-জন্যত্বের অভাবকে আপত্তি করা যায়। বহ্নিব্যভিচারী পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ বহ্নিশূন্য স্থানেও জন্মে বা থাকে, তাহার প্রতি বহ্নিকে কারণ বলা যায় না। অথচ ধূম ও বহ্নির কার্য্য-কারণ-ভাব সর্ব্বসম্মত। বহ্নিলিঙ্গ ধূম পদার্থ, বহ্নি ব্যতীত কখনই হইতে পারে না, সুতরাং ধূমে বহ্নিজন্যত্ব সিদ্ধ। ঐ বহ্নি-জন্যত্বের অভাবই এখানে আপাদ্য। বহ্নিব্যভিচারিত্ব আপাদক। আপাদ্য বহ্নিজন্যত্বাভাব, আপাদক বহ্নিব্যভিচারিত্বের ব্যাপক। ঐ ব্যাপকের অভাব বহ্নিজন্যত্ব। বহ্নিজন্যত্ব-বিশিষ্ট-বলিয়া নিশ্চিত ধূমে বহ্নি-ব্যভিচারিত্ব রূপ ব্যাপ্যের আহার্য্য আরোপ করিয়া অর্থাৎ "যদি ধূম বহ্নিব্যভিচারী হয়," এই রূপ জ্ঞান করিয়া, ধূম বহ্নিজন্য না হউক এই রূপে ব্যাপকের অর্থাৎ বহ্নিজন্যত্বা-ভাবের আহার্য্য আরোপ করিলে, তাহা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত "তর্ক" হইল। ঐস্থলে আপাদ্যের অভাব বহ্নিজন্যত্বকে হেতু করিয়া, ধূম পক্ষে আপাদক বহ্নিব্যভি-চারিত্বের অভাবকে শেষে অনুমান করা হইবে। "ধূমো ন বহ্নিব্যভিচারী বহ্নিজন্য-ত্বাৎ" ইত্যাদি ক্রমে ন্যায় প্রদর্শন করিয়া প্রতি-পক্ষকে বুঝাইতে হইবে। তাহাতেও সংশয় করিলে তর্কান্তরের দ্বারা তাহারও নিবৃত্তি করিতে হইবে। সে কথা পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি।

একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে সংশয় হয় না; সেখানে তর্কের প্রসঙ্গ অলীক; তাই মহর্ষি "অবিজ্ঞাতেঽর্থে" না বলিয়া "অবিজ্ঞাত তত্ত্বেঽর্থে" এই রূপ বলিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, সূত্রে ঐস্থলে ষষ্ঠীর স্থানে সপ্তমী প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তত্ত্ব-জ্ঞানের কর্ম্মকারক বলিয়া "অবিজ্ঞাততত্ত্ব-স্যার্থস্য" এই রূপ প্রয়োগই হয়। কণাদ-সূত্রেও এই রূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় বার্ত্তিক-কার দেখাইয়াছেন। অবিজ্ঞাততত্ত্ব শব্দ বহুব্রীহিনিষ্পন্ন হইলে অজ্ঞাততত্ত্ব পুরুষ-কেও বুঝায়, এখানে কিন্তু যাহার তত্ত্ব অজ্ঞাত—এমন পদার্থ বুঝিতে হইবে।

তাই অর্থ-ভ্রান্তি-নিবারণের জন্য বলিয়াছেন "অবিজ্ঞাততত্ত্বেহর্থে"। অর্থ শব্দের প্রয়োগ না থাকায় "অবিজ্ঞাতং তত্ত্বং যস্য" এই রূপেই বহুব্রীহি—সমাস বোধগম্য হইতেছে। অর্থ-ভ্রমের কারণ নাই। তর্কের প্রকারভেদ ও উদাহরণ প্রভৃতি যথাস্থানে বলিব। তর্ক সম্বন্ধে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাই নব্যনৈয়ায়িকগণের মত। প্রাচীন কথাও বলিয়াছি। লাঘব গৌরব প্রভৃতি আপত্তি-স্বরূপ না হওয়ায় তর্ক নহে। তবে তর্কের ন্যায় প্রমাণের সহকারী হইয়া তত্ত্ব-নির্ণয়ে সহায়তা করে, তাই তাহারা তর্কের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৪০।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

কর্ম্মতত্ত্ব।

পৌরাণিক মতে ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্টি, রাত্রে প্রলয়। দিবস কর্ম্ম করিবার জন্য। রাত্রি বিশ্রাম করিবার জন্য। কর্ম্ম ও বিশ্রাম, মনুষ্যজীবনে দুইই আবশ্যকীয় বস্তু। নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রান্তি, অবসাদ; সেই শ্রান্তি ও অবসাদ দূরীকরণার্থই বিশ্রাম। যে কর্ম্ম করে না, তাহার বিশ্রাম প্রয়োজন নাই। বিশ্রামের সুখ কর্ম্মীর, নিষ্কর্ম্মীর বিশ্রাম, আলস্য বা জড়তার নামান্তর মাত্র।

কর্ম্ম-জন্য শ্রান্তি—নাশ যেমন বিশ্রাম দ্বারা ঘটে; তদ্রূপ কর্ম্মজ আসক্তি, আসক্তি-জন্য বন্ধন, বন্ধন-ফলে দুঃখ অবসাদ—কর্ম্ম-ত্যাগ দ্বারাই দূর হয়। কর্ম্মের পর বিশ্রাম, বিশ্রামের পর আবার কর্ম্ম—এইরূপ কেহ কেহ যৌবনে কর্ম্ম করিতে থাকেন, বার্দ্ধক্যে কর্ম্মত্যাগ করেন। কেহ কেহ চক্র-ভ্রমণের মত কর্ম্ম করিয়া বিশ্রাম লয়েন, বিশ্রাম-লাভ করতঃ পুনরায় কর্ম্ম করেন—এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ—উভয়েরই সেবা করিয়া যান। ইহাদের জীবনের সমগ্রাংশ উভয়াত্মক (কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ-পূর্ণ)।

কর্ম্ম—কর্ম্ম, বিশ্রাম—কর্ম্মত্যাগ। জীবনের প্রথমাংশে কর্ম্ম, অপরাংশে কর্ম্মত্যাগ অথবা প্রথম ও অপরাংশে কর্ম্ম ও ত্যাগ উভয়ই।

কর্ম্মত্যাগ দ্বিবিধ। কর্ম্মের ত্যাগ, কর্ম্মফলের ত্যাগ। কর্ম্মের ত্যাগ—সন্ন্যাস। কর্ম্মফলত্যাগ—ত্যাগ। কর্ম্মফলত্যাগ কর্ম্ম-ত্যাগ বটে, আবার বিশুদ্ধ কর্ম্ম বা "ধর্ম্ম" নামেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় কর্তৃত্ব ও অহঙ্কারের আধিপত্য না থাকায়, মানসিক সুখ-দুঃখ, উল্লাস-বেদনা, তৃপ্তি-অতৃপ্তির ঘাতপ্রতিঘাত সম্ভব হয় না। কর্ম্মফল-ত্যাগীর কর্ম্মের বন্ধকত্ব নাই; দগ্ধ বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে না। কর্ম্মফলত্যাগীর কর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্ম, ত্যাগ অথবা বন্ধকত্ব-শক্তি-শূন্য কর্ম্ম। ইহাই বিশ্রাম। এই কর্ম্ম আর বাসনা-চালিত মুগ্ধ মানবের কর্ম্মে প্রভেদ যথেষ্ট।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী স যোগী॥

এই সন্ন্যাসীকেই ত্যাগী বলিতেছি।

সৃষ্টি কর্ম্মময়ী। বলিয়াছি, ব্রহ্মার দিবা-ভাগে সৃষ্টি—রাত্রিভাগে প্রলয়। দিবাভাগে

জাগরণ, কর্ম্ম করিবার জন্য দিবাভাগ। এই দিবাভাগের দৃষ্ট যাবতীয় বস্তু মাত্রেই সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় নহে। কেহ স্বতঃ কেহ বা পরতঃ সক্রিয়। পরতঃ সক্রিয় "নিষ্ক্রিয়" নামে অভিহিত হয় মাত্র। কর্ম্ম, জগৎ-চক্রের মূল। কর্ম্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক। কর্ম্মবশে সংসারচক্র নিয়তই পরিভ্রমিত হইতেছে বলিয়া, "ভবের খেলা" ঠিকই চলিতেছে। সূর্য্য চন্দ্র তারকা, বায়ু মেঘ জল—তাবৎ পদার্থই কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কর্ম্মেই নিরন্তর রত। এই সকল পদার্থ যে দিনে কর্ম্মশূন্য হইবে, সেই দিনেই মহাপ্রলয়। ইহাই ব্রহ্মার নিদ্রা মায়ার অব্যাকৃতাবস্থা। যাবতীয় পদার্থ যে ভাবে কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত ও কর্ম্মে রত; মানব সে ভাবে কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত ও কর্ম্মে রত নহে।

পদার্থকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিব। প্রথম স্থাবরাদি। দ্বিতীয় মনুষ্যেতর প্রাণী। তৃতীয় মনুষ্য।

স্থাবরাদির কর্ম্ম স্বভাব-নিয়ত। *এই স্বভাব আমাদের জন্মান্তরীণ কৃত কর্ম্মফলের অভিব্যক্তি-স্বরূপ নহে। এ স্বভাব নাস্তিকের স্বভাব। স্থাবরাদি স্বভাবতঃ ক্রিয়াবান্, একবিধ ক্রিয়া করিয়া যাওয়াই ইহাদের ধর্ম্ম। আবহমান কাল হইতে নদীর কুল কুল ধ্বনি, বাতাসের শন শন শব্দ, মেঘের গুড় গুড় নিনাদ, বৃষ্টির টুপটাপ রব একবিধ। গতি, চেষ্টা, পরিবর্ত্তন ক্রমবিকাশ—সকল স্থাবরাদির পক্ষে সমানই। একভাবে এক নিয়মেই চলিয়া আইসে।

পশু পক্ষী প্রভৃতির কর্ম্ম স্বভাব-নিয়ত। তবে মনুষ্য-সাহচর্য্যে উহাদের পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হয় বলিয়া, সময় সময় স্বভাব নিয়ত বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন মানবও কৃতকর্ম্ম-বশে স্থাবরাদি ও পশু পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং॥

বাচিক পাপে পশু পক্ষী, কায়িক পাপে স্থাবরাদি। সেই পশু-পক্ষি-জন্মের কর্ম্ম মানসীয় অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সে কর্ম্ম, স্বভাব-নিয়ত বলা যায় না। যদিও পশুপক্ষি-জন্মোচিত কৃত কর্ম্মের তাহারা দায়ী নহে, সে কর্ম্মের পাপ বা পুণ্যফল লাভ করে না, বা পাপ-পুণ্যাত্মক অদৃষ্ট লইয়া যায় না; তবে মানব-জন্মোচিত পাপ, ঐ পশুপক্ষি-জীবনেই ক্ষয় পাইয়া থাকে।

মানবের স্থাবরাদি জন্মের একটু পার্থক্য আছে। মানবের আত্মা, মনুষ্য-শরীরে হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যস্থ। (হৃদয় পুণ্ডরীক কণিকাকার, অঙ্গুষ্ঠসমানাকৃতি বলিয়া জীবচৈতন্যের আকারও কণিকাকার, অঙ্গুষ্ঠাকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে)। পশুপক্ষি-শরীরেও তাহাদের হৃদয়পুণ্ডরীকই অবস্থান-স্থান। মানব যখন কায়িক পাপ-দোষে স্থাবরাদি জন্ম লাভ করে, সে স্থানে হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ নহে। মানব ঠিক স্থাবর হইয়া যায় না, তবে স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়। স্থাবর—স্থাবরই। সৃষ্টির আদি কাল হইতে প্রাণী ও স্থাবর পৃথগ্‌বিধ। তবে জীবাত্মা স্থাবরাদির ভিতর অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া কৃতকর্ম্মের দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এই স্থাবরাদির

*বুঝিবার সুবিধার্থ কৃত কর্ম্মফলাভিব্যক্তি-স্বরূপ স্বভাবকে "প্রকৃতি" পদে অভিহিত করিব।

ভিতর অন্তঃ-প্রবিষ্ট থাকারই নাম স্থাবর-ভাব-প্রাপ্তি। মানবের সংশ্লেষ মাত্র স্থাবরাদিতে দৃষ্ট হয়। এই যে বৃক্ষ লতা—তাহাদের মধ্যে কত মানব আছে—কে তাহার নির্ণয় করিবে? ফল-ভোগের শেষ হইয়া আসাই যথোচিত কাল। এই যথোচিত কাল উপস্থিত হইলে, স্বানুরূপ দেহ-ধারণের উপযোগী অবস্থায় আসিলে, স্থাবর-সংশ্লেষ ত্যাগ করিয়া জীবাত্মা, মানব বা মানবেতর প্রাণী হইয়া থাকে। শস্যের মধ্য দিয়া প্রাণিশরীরে প্রবিষ্ট হয়; রক্ত-বিন্দুর মধ্য দিয়া শুক্রকীটরূপে পরিণত হয়।

স্থাবরাদির সংশ্লেষে জীব মূর্চ্ছিতবৎ থাকে। সবিজ্ঞান হইয়াও ইন্দ্রিয়বেদ্য দুঃখাদি সে অবস্থায় ভোগ করিতে হয় না। মাতৃগর্ভে অবস্থান সময়ে ক্রমে ক্রমে চেতনা হইতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হইলে পর সম্পূর্ণভাবে প্রাণি-ভাবের অধীন হইতে দেখা যায়। ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, মস্তিষ্ক চিন্তায় অক্ষম, মন স্তিমিত, শরীর অবশ থাকে বলিয়া, বার্দ্ধক্যে রোগের যন্ত্রণা অল্পই অনুভূত হয়, কিন্তু যৌবনে সমস্ত ইন্দ্রিয় মন প্রাণ মস্তিষ্ক সমস্তই কর্ম্ম-ক্ষম থাকে বলিয়া, এই সময়ে রোগের যন্ত্রণা অপরিসীম। আবার মূর্চ্ছা হইলে যন্ত্রণা অন্তর। এই প্রকার পশু পক্ষী আদি জন্ম, মানব ও স্থাবর-ভাবের জন্মে যন্ত্রণার পার্থক্য আছে। অবিকৃত অবস্থার যন্ত্রণা সম্পূর্ণ অনুভবে আইসে বলিয়া অধিক কষ্টকর; তবে মানসিক সংস্কার বশে অবিকৃত অবস্থায়ও দারুণ যন্ত্রণা ভোগ যে হইতে পারে না, তাহা নহে।

স্থাবর ও পশুপক্ষী হইতে মানব স্বতন্ত্র মানবের কর্ম্ম স্বভাব-নিয়ত নহে। মানবের পূর্ব্ব কৃত পাপ-পুণ্যের তারতম্যানুসারে মানবীয় প্রকৃতি। এই জন্য পুণ্যকর্ম্মার প্রকৃতি পুণ্যময়ী, পাপকর্ম্মার প্রকৃতি পাপময়ী হইয়া থাকে। জন্মান্তরীণ কৃত কর্ম্মানুযায়িক প্রকৃতি না আসিলে প্রকৃতির এই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অসীম পার্থক্য অহেতুক হইয়া পড়ে। পিতা মাতার প্রকৃতি অনুযায়িক সন্তানের প্রকৃতি—ইহাও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না।

মানবীয় প্রকৃতি জন্মান্তরলভ্য। পূর্ব্ব-জন্মোচিত বাসনানুযায়িক প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি-গঠনে পিতা মাতার রক্তসম্বন্ধ, সাহচর্য্য, শিক্ষা, সংসর্গ প্রভৃতি অপেক্ষিত? পিতামাতার রক্তসম্বন্ধ জন্মান্তরীণ প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয় না; শিক্ষা-সংসর্গাদিও সাধারণতঃ অনুকূল হয়।

সকল মানবই স্বপ্রকৃতি-বশে কর্ম্ম করে। প্রকৃতি-চালিত হইয়া কর্ম্ম করাই মানবের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলা, দৃঢ়চেতা মহাসংযমী মহাত্মার অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। প্রখরস্রোতা গিরি-নদীর বিপরীত স্রোতঃপথে তরণি লইয়া যাওয়াও এরূপ দুঃসাধ্য নহে। প্রকৃতিকে অপেক্ষা না করিয়া মানব কর্ম্ম করিতে পারে না বলিয়া, মানব স্বতন্ত্র নহে। আবার প্রকৃতিকে কথঞ্চিৎ বিপরিবর্ত্তিত করা মানবেরই মহা-আয়াসসাধ্য বলিয়া মানব স্বতন্ত্র। তুমি ভাবিতেছ "আমি ইহা করিলে করিতে পারি, নাও করিতে পারি—অতএব কর্ম্ম আমার অধীন", এই কর্ম্ম পুরুষাধীন, পুরুষসাধ্য বটে, কিন্তু এই কর্ম্ম তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ

হইলে তুমি "এই কর্ম্ম করিব" এরূপ ইচ্ছাই করিতে না, ইচ্ছা হইলেও সেরূপ যত্ন করিতে না। এই ইচ্ছা, যত্ন, কার্য্য, ফল—সবই প্রকৃতির অবিরুদ্ধ।

কর্ম্মে মানবের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা উভয়ই বর্ত্তমান। প্রকৃতিবশে প্রারব্ধ ভোগে মানবের স্বাধীনতা কিছুই নাই, কিন্তু ক্রিয়মান কর্ম্মে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে। মানব অসংযমী—তাই সাধারণতঃ পরাধীন। নচেৎ মনে করিলে, সেরূপ অনুশীলন করিলে, স্বাধীন হইতে পারে। মানবের স্বাতন্ত্র্য আছে বা থাকিতে পারে বলিয়াই পশুপক্ষী হইতে পার্থক্য। ইচ্ছা করিলে মানব, দেব-দানব হইতে পারে। স্বর্গ নরক মানবেরই করতলে। মুক্তি সংসার দুইটি ফল; এ উভয় ফলে মানবেরই অধিকার। অসঙ্গ-শস্ত্র দ্বারা সংস্কারের উচ্ছেদ, আসক্তিরজ্জু দ্বারা সংসারে বদ্ধ হওয়া, মানবের আয়ত্তের মধ্যে। অবশ্য এই স্বাতন্ত্র্য, কারণ-নিরপেক্ষ নহে। আকস্মিক কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলানুযায়ী যে জাতীয় প্রকৃতি লইয়া মানব, জন্ম-গ্রহণ করে, শিক্ষা সংসর্গাদি, সাধারণতঃ তদনুরূপই পাইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা অন্যথা যে হয় না, তাহা নহে।

মানবের সৃষ্টি, কর্ম্ম করিবার জন্য। মানব কর্ম্ম করুক—ইহাই ভগবানের ইচ্ছা ও আদেশ। এই কর্ম্মের প্রতিষ্ঠানার্থ কর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ। শ্রমসাধ্য কর্ম্মে বীতরাগ ব্যক্তির বিশ্রামে ভগবানের আদেশ নাই। কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধির জন্যই বিশ্রাম। কর্ম্মাসক্তি জন্মানই (দ্বিতীয়োক্ত ত্যাগ) কর্ম্মত্যাগের উদ্দেশ্য। নিষ্ফল হইলেও তথাপি কর্ম্মে আসক্তি সমান ভাবেই থাকুক, এই উদ্দেশ্য-জন্যই ফলাভিসন্ধিত্যাগের বিধান; নচেৎ (প্রথমোক্ত) কর্ম্মত্যাগ (সন্ন্যাস) সকল মানবই যদি করে, তবে জগৎ-কার্য্য চলে না; লীলা-খেলা শেষ হইয়া যায়। আর এই প্রথমোক্ত কর্ম্মত্যাগ (সন্ন্যাস) কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য। এইরূপ সন্ন্যাসী দণ্ডী পরমহংস ব্যক্তির জীবন-রক্ষার্থ কর্ম্মী বা দ্বিতীয় কর্ম্মত্যাগীর অপেক্ষা আছে। কর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম-ত্যাগীদের চলিতে হয়।

কর্ম্মী কর্ম্মফলত্যাগী আর সন্ন্যাসী, ইহা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ চিরদিনই হইয়া আসিতেছে। কর্ম্মীর প্রশংসা, পুরাণ-সংহিতা, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড স্মৃতি প্রভৃতিতে, কর্ম্মফলত্যাগীর উৎকর্ষ, ভগবদ্গীতা পুরাণাদি দ্বারা স্বীকৃত। সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠতা বেদান্তে বিশেষ ভাবে উদ্ঘোষিত।

কর্ম্ম স্বার্থপরতা-মূলক। কর্ম্মফল-ত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম, পরার্থপরতামূলক। সন্ন্যাস স্বার্থপরার্থ-সংস্পর্শ-শূন্য। পরার্থপরতা যে কর্ম্মের প্রয়োজক, তাহাতে স্বার্থপরতা-মূলক ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান (কর্ম্ম-ফল-ত্যাগকে কর্ম্ম ও ত্যাগ—উভয়ভাবেই, বুঝিয়া লওয়া যায়) চিত্তশুদ্ধির জনক হয়, সত্ত্বগুণের উৎপাদক ও বর্দ্ধক হয়। পরি-শেষে ঐ জাতশুদ্ধ ব্যক্তি, পারমার্থিক উন্নতি লাভ করেন। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ও রজস্তমোগুণের নাশে জ্ঞান।

কোন মতে উপাসনাত্মক কর্ম্মই ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ, মুক্তি-লাভের প্রয়োজক।

উপাসনাত্মক কর্ম্ম অমৃত। ইতর কর্ম্ম (বিষয়-কামনা-পঙ্কিল) মৃত্যু অবিদ্যা। সাধারণ ব্যক্তিরা সন্ন্যাস-আশ্রমের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আমরা সাধারণশ্রেণী-ভুক্ত—কাজেই আমাদিগকে কর্ম্মফল ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মী বা ত্যাগী হইয়া সংসারাশ্রম পালন করিতে হইবে। কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে না পারিলেও আমরা কর্ম্মী হইব। তবে ঐ কর্ম্ম, যাহাতে আমাদিগকে পাপ-পথে লইয়া যাইতে না পারে, তাহার জন্য চেষ্টিত থাকা উচিত। প্রথম বাল্যকাল হইতেই সন্তানকে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে অনুরক্তি ও আসক্তি-সম্পন্ন করিতে হইবে; নিয়মের সরল বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে হইবে; সংযমের ভিতর দিয়া মনোবৃত্তিকে ছুটাইতে হইবে।

কাহারও কাহারও মত এই যে, নিয়মের বন্ধনে বদ্ধ করিলে বালকের মনোবৃত্তির সঙ্কোচ-সাধন করা হয়, বিস্তার-সম্পাদন করা হয় না। এই মতটি যে সর্ব্বাংশে অমূলক, এমন বলিনা। কিন্তু আমরা যেরূপ নিয়ম বন্ধন চাহিতেছি বা আমাদের ঈপ্সিত যে বন্ধন, তাহা মনোবৃত্তির সঙ্কোচসাধক নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি—আমরা একটি পক্ষীর পক্ষে সূক্ষ্মসূত্র বাঁধিয়া তাহাকে শূন্য-পথে ছাড়িয়া দিয়াছি। সে সূক্ষ্মসূত্র যাহাতে পক্ষীর কোন কষ্টের কারণ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমাদের হাতে সেই সূত্রটি যদিও ধরিয়া রাখিয়াছি, তথাপি পক্ষীর স্বেচ্ছামত ভ্রমণের কোন ব্যাঘাতই হইতেছে না। সেই সূত্রটি এমত দীর্ঘ যে, পক্ষী, শত যোজন দূরেও যাইতে পারে। পক্ষীকে বন্ধন করা দোষের হইতে পারে, কিন্তু মানব-শিশুকে বন্ধনে আবদ্ধ করা দোষের নহে। মানব বন্ধনের অধীন, কারণ পক্ষীর মত মানব-শিশু, উধাও হইয়া সংসার-পথে বিচরণ করিতে পারিবে না। তাহাকে গৃহে শিক্ষা—দীক্ষা—সংসর্গ—ধর্ম্ম-নিয়মে বাঁধিতেই হইবে। স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ না করিলে শিশু উৎসন্নই যাইবে। মানব-সন্তান প্রথম হইতে সংযম শিক্ষা না করিলে পশুর মত হইয়া পড়িবে। কাজেই তাহাকে নিয়ম বন্ধনে আবদ্ধ, ধর্ম্ম-শাসনে অনুশাসিত না রাখিতে পারিলে, কোন মানব-সন্তান প্রকৃত মানবত্বের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হয় না। যদিও আমরা শিশুকে একরূপ সূক্ষ্মসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু (সসীমের মধ্যে) মনোবৃত্তির বিস্তৃতি সাধন করিবার চেষ্টায় বিরত নহি। সীমা-হীন বাধাহীন পথে মনোবৃত্তির চালনায় যে সুফল ফলে, তাহা মহাকবির কল্পনায় আসিতে পারে, কিন্তু আমাদের মত বাস্তব-জগতের লোকের নিকট উহা কবি-কল্পনা। আমরা জানি ও বেশ উপলব্ধিও করি যে, বালককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে, তাহার ইচ্ছা-স্বরূপ কার্য্যে বাধা না দিলে, স্বেচ্ছাচারকে আদর করিলে, সে বালক সমাজের স্তম্ভ, দেশের অবজ্ঞাস্পদ, ধর্ম্মহীন পশুবৎ হইবে। অতএব দেখা গেল; কর্ম্মী হইতে হইলে, ধর্ম্ম, নিয়ম, আচার, সমাজ—ব্যবহারাদির বন্ধন স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইহাও সত্য যে, সুদৃঢ় বন্ধন হিতকর না হইয়া কোন কোন স্থলে অহিতকর হয়। অতিরিক্ত প্রহার খাইয়া ছেলে নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।



ভগবদ্ভক্ত—ও ভাব।

গুরূপদেশ শ্রবণ ও দেবদ্বিজে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ম্মফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়া, আমি সাধন-মার্গে পদার্পণ করিলাম। করিয়াই, মনে কর, অভীষ্ট সিদ্ধ না হইতেই, অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন না হইতেই বা নিষ্ঠাভক্তি প্রভৃতি না হইতেই, আমার দেহান্তর ঘটিল। তাহা হইলে আমার অবস্থা কিরূপ হইবে? তাহাতে আমার কিছু সুবিধা আছে কিনা? সাধন-মার্গে যাইতে যাইতে যদি দেহান্তর হয়, তবে তাহার কি দশা হইতে পারে? ভগবান্ এ প্রশ্নের কি উত্তর করিয়াছেন, শুনঃ—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥"
গীতা ২য় অঃ, ৪০।

"এই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের ফল বিনষ্ট হয় না। ইহাতে প্রত্যবায় নাই; বরং যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতা, মহাভয় অর্থাৎ জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন।"

"পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিংতাত গচ্ছতি॥"
"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥
"তত্র তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্ব্ব-দেহিকম্।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
গীতা ৬ষ্ঠ অঃ, ৪০।৪১।৪২।৪৩।

"হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, ইহলোক ও পরলোকে বিনষ্ট হন না। হে তাত! শাস্ত্র-বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিরই দুর্গতি হয় না।"

"যোগভ্রষ্ট পুরুষ, পুণ্যাত্মা দিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া, তথায় বহুবর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।"

"অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ, ব্রহ্মবিদ্যা-বিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; তদ্রূপ জন্ম, অতি দুর্লভ।"

"হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ, জন্ম-গ্রহণ করিলে, তাঁহার পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞান-সাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন; এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন।"

অতএব, শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-পঙ্কজ-বিগলিত অমৃতময় বাক্যে আমরা ইহাই বুঝিলাম যে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, পরজন্মে ব্রহ্ম-সাধিনী বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া ধনীর গৃহে, বা ভক্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্ম-যোগই হউক, আর জ্ঞান-যোগই হউক, আর ভক্তিযোগই হউক, কোন যোগের সাধকেরই—ধর্ম্ম পথের কোন পথিকেরই পতন নাই। মরি! মরি! এমন সুন্দর সুব্যবস্থা আর কোথায় আছে! পতিতপাবন

অধম-তারণ, দীনবন্ধু, কৃপা-সিন্ধু, ভগবান্ বৈকুণ্ঠ-বিহারীর কি অপূর্ব্ব দয়া দেখ দেখি! মনে হইলেই, আনন্দে চক্ষে অশ্রু বহিতে থাকে, শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। মরি! মরি! এত দয়াই যদি না থাকিবে, তবে হে ভগবন্, লোকে তোমাকে কাঙ্গালের ধন, দয়াময় হরি বলিবে কেন? আমরা মূঢ়, তাই তোমাকে ভুলিয়া আছি। তোমার অনন্ত করুণা, সঞ্জীবনী সুধার মত আমাদের উপর নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। দয়াল হরি! তোমার দয়ার অবধি নাই; আমরা অন্ধ, তাই অনুভব করিতে পারি না। তাই বলিতে ছিলাম, কেমন সুব্যবস্থা! সাধন-মার্গে একবার পদার্পণ করিলেই, আর ভয় নাই! হয় এ জন্মেই পাইবে, নয় পর জন্মে পাইবার মত অবস্থায় ও সুযোগে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে। ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?

বুঝিলাম, ভগবদ্ভক্তের কি ইহ জীবনে কি পরজীবনে, সর্ব্বত্রই সুবিধা। কিন্তু, এত সুবিধা সত্ত্বেও সকলেই কেন তাঁহার ভক্ত হয় না? ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে,—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ"
গীতা

"যাহারা পাপকর্ম্মা, মূঢ় ও নরাধম, যাহাদের জ্ঞান মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, যাহারা দম্ভদর্পাদি দ্বারা আসুর-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আমার ভজনা করে না।"

যাহাদের মনে দম্ভ, দর্প, মোহ প্রভৃতি নিন্দনীয় বৃত্তিনিচয় নিরন্তর বিরাজ করিতেছে, তাহারা ভক্ত হয় না। ভগবানের ভক্ত হইতে হইলে, অহঙ্কার প্রভৃতিকে মন হইতে দূর করিতে হইবে। তাই, বৈষ্ণব ভক্তেরাও বলেন যে, "তৃণের অপেক্ষাও নীচ হইবে"। মরি! মরি! ভগবদ্বাক্যের সহিত বৈষ্ণব-চূড়ামণি দিগের কথায় কি সুন্দর সাদৃশ্য! বুঝিলাম, ভক্তের অশেষ প্রকার সুখ থাকিলেও, সাধারণে দম্ভ-দর্পাদি আসুর-ভাবদৃপ্ত হইয়াই, ভগবচ্চিন্তা করে না বা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ও হয় না। কেবল চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি ভগবদর্চনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"
গীতা ৭ম অঃ, ১৬।

"হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজনা করে।"

এই ভক্তশ্রেণীর মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার অর্থাৎ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ইহারা সকাম ভক্ত; কিন্তু, জ্ঞানী নিষ্কাম ভক্ত। চতুর্ব্বিধ ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু, ভগবান্ নিষ্কাম ভক্তেরই অধিকতর প্রিয়। এ কথা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন, :—

"উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥"
গীতা ৭ম, ১৮।

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক-ভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥"

গীতা ৭ম, ১৭।

"উক্ত চারি প্রকার ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত, আমার আত্মার স্বরূপ; জ্ঞানী সদাই আমাতে সমাহিত থাকেন ও আমা ভিন্ন উৎকৃষ্ট-ফল-কামনা তাঁহার নাই।"

"এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই উৎকৃষ্ট; কেননা, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

বলা বাহুল্য, জ্ঞানী অর্থে "আত্ম-জ্ঞানী" বুঝিতে হইবে। জীবে ও ব্রহ্মে যাহার অভেদ জ্ঞান হইয়াছে, সে—ই জ্ঞানী। ধ্রুব সকাম ভক্ত; তিনি এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে "অর্থার্থী" শ্রেণীভুক্ত। রাজ্যৈশ্বর্য্যে তাঁহার কামনা ছিল। কিন্তু, ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ নিষ্কাম, জ্ঞানী ভক্ত। প্রহ্লাদের ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন আর কিছুর আকাঙ্খা ছিল না। তাই, গোলোকবিহারী সাধের গোলোক ত্যাগ করিয়াও আ'জ প্রহ্লাদের সঙ্গে২ কখন অনলে, কখন সমুদ্র-জলে, কখন বা হস্তীর পদতলে বিচরণ করিতেছেন। মরি! মরি! ধন্য নিষ্কাম ভক্তি, আ'জ তোমার আকর্ষণে গোলকবিহারীও আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে উপস্থিত! ধন্য প্রহ্লাদ! ধন্য তোমার সাধনা! নিষ্কাম ভক্তদের ভক্তি-ডোরে ভগবান্ স্বয়ং বাঁধা থাকেন। কিন্তু তিনি সকাম ভক্তদের কামনা পূর্ণ করিয়া, অন্তিমে মুক্তি প্রদান করেন। এখন কথা এই যে, ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি? গীতা-শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ ভক্তের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই;—

"দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনি রুচ্যতে॥"
"যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

গীতা ২য় অঃ, ৫৬।৫৭।

"যাঁহার চিত্ত, দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না এবং বিষয়-সুখেও নিস্পৃহ, এবং যাঁহার রাগ (অনুরাগ) ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ।"

"যাঁহার দেহাদি পদার্থে আদৌ স্নেহ নাই, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে যিনি প্রশংসা বা দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।"

যাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ জ্ঞানী ভগবদ্ভক্ত। তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইল যে, যিনি জ্ঞানী নিষ্কাম ভক্ত, তাঁহার চরিত্রে উপর্য্যুক্ত গুণের পরিস্ফুরণ নিশ্চয়ই হইবে। মহাত্মা প্রহ্লাদ, তাঁহার একজন নিষ্কাম জ্ঞানী ভক্ত। দেখ দেখি, কি সুন্দর রূপে উপর্য্যুক্ত গুণ গুলি তাঁহার চরিত্রে বিকশিত হইয়াছে। প্রহ্লাদ যখন স্নেহে পালিত, তখনও তাঁহার যে-ভাব, আবার যখন নিপীড়িত, তখনও সেই ভাব। উদ্বেগের লেশও নাই। কোন প্রকার

সুখস্পৃহাও নাই। ক্রোধও নাই। আবার অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে বা বিষ-ভক্ষণ-কালে বা অন্য বিপদের সময়ে ভয়ের চিন্তা মাত্রও নাই। শরীরের উপর মায়া-মমতাও নাই। এক ভাব! শুভ অশুভ উভয় অবস্থাতেই একভাব! আনন্দও নাই, দ্বেষও নাই। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ গুলি কি সুন্দর ভাবে কড়ায় গণ্ডায় মিলিয়া গেল। না মিলিবে কেন? প্রহ্লাদ কি তোমার আমার মত ভক্ত? তিনি যে ভক্ত-চূড়ামণি!

শ্রীভগবান্ ভগবদ্ভক্তের আরও লক্ষণ বলিয়াছেন, শুন:—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃকরুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
"অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়॥"
"যোন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥"
"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ॥"
"তুল্যনিন্দাস্তুতি র্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥"

গীতা ১২শ অঃ, ১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮ ১৯।

"সর্ব্বভূতেই যাঁহার অদ্বেষ-বুদ্ধি, মৈত্রী ও করুণা, যিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার, দুঃখ সুখে যাঁহার সমান ভাব ও যিনি ক্ষমাশীল।"

"যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিত-চিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়-নিশ্চয়; এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন; মদ্ভক্তি-পরায়ণ, ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।"

"যাঁহার দ্বারা কোন ব্যক্তি সন্তপ্ত হয় না এবং নিজেও যিনি অন্য কোন ব্যক্তি হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না; যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়।"

"নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন; ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়।"

"যিনি হৃষ্ট হয়েন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না; যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি শুভাশুভ-পরিত্যাগী; সেই ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয় পাত্র।"

"যাঁহার শত্রু ও মিত্রে এক-দৃষ্টি; মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার কাছে সমান; শীত উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গ-রহিত।"

"নিন্দা ও স্তুতি—এতদুভয়ই যাঁহার তুল্য, যিনি মৌনী, যিনি—যে কোন প্রকারেই হউক, অন্নবস্ত্র-লাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবর্জ্জিত ও স্থির-মতি, সেই ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয়।"

এতল্লক্ষণাক্রান্ত ভক্ত অতি দুর্লভ। ইঁহাদিগকে দর্শন করিলেও মনুষ্য-জন্ম

সার্থক হয়। ইঁহাদিগের আবির্ভাবে ধরা পবিত্র হয়।

উপর্যুক্ত ভগবদ্বাক্যেই আমরা ভগবদ্ভক্তের উৎকৃষ্ট লক্ষণ অবগত হইতে পারিলাম। ভগবৎ-সাধনার পথে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, যাহাতে আমরা ভক্তলক্ষণাক্রান্ত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে নিরন্তর যত্নবান্ হইতে হইবে। সুখের বেলায় আনন্দে বিহ্বল হইব, হাসির তরঙ্গে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিব; আর দুঃখের বেলায় পেচক-গম্ভীর বদনে, অশ্রু-ধারায় বক্ষস্থল সিক্ত করিব; তাহা হইলে চলিবে না। চরিত্রের নির্ম্মলতা হইলেই বুঝিব যে, ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতেছি। "আর্ক-ফলা" মাথায় আছে; কণ্ঠে "নয় পেঁচী"; সর্ব্বাঙ্গ নামেশ্বরী বাঘের মত চিত্রিত; মাথাটীও ভাদ্রের ওলের মত মুণ্ডিত; মালাও জপ করি, শাস্ত্র-গ্রন্থও পাঠ করি; সাধু সঙ্গও করি; সংকীর্ত্তনে, "দয়া ক'রে এস হরি" বলিয়া চীৎকারও করি, সবই করি, কিন্তু পানের থেকে চুণ টুকু খসিলেই ক্রোধান্ধ হইয়া 'ফোঁস্' করিয়া ফণা ধরিয়া উঠি! এমনটী হইলে চলিবে না। ক্রোধ-সম্বরণ করিতে হইবে। শুধু বাহ্য ভাবে "ভক্ত" সাজিলে হইবে না। ভগবান্ যে লক্ষণ গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ লক্ষণ গুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। বাহিরে ভক্ত সাজিবার পূর্ব্বে, অন্তরে ভক্ত সাজিতে হইবে। তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। তিনি অন্তর্যামী; অন্তরের ভাবই দেখেন। বাহ্যিকের ভাবে মানুষ ভুলিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বর ভুলেন না। ঈশ্বরকে ভুলাইতে হইলে, অন্তরের ভাব চাই। অন্তরটা রাগদ্বেষ ভয়-ক্রোধ-শূন্য হইলেই, আর কিছুর প্রয়োজন নাই।

কোন কোন সংমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি ভাবিতে পারে যে, এত আয়াস স্বীকার করিয়া, সাধনার পথে যাইবার প্রয়োজন কি? ইহজীবনে কষ্ট করিয়া, পর-জন্মে সুখী হইব, তাহার প্রমাণই বা কি? একটা অনিশ্চিত সুখের কল্পনায়, ইহজীবনের সুখভোগে জলাঞ্জলি দিই বা কেন? যে কামিনী-কাঞ্চন অতীব সুখের সামগ্রী, তাহা ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের খাঁতিরে দীন দরিদ্র সাজিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে যাইব কেন? এবম্প্রকার সন্দেহরাশি সংমূঢ়চিত্ত ব্যক্তির অন্তরে উদিত হইতে পারে। কিন্তু, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই, সংশয়ের নিরাকরণ হইবে। ধর্ম্মপথে থাকিলে, ইহজীবনে কষ্ট করিতে হয়, আর পরজীবনে সুখী হওয়া যায়, একথা কে বলিল? ধর্ম্মপথে, ইহজীবনেও সুখ, পরজীবনেও পরমসুখ। পরজীবন আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; সুতরাং, সম্প্রতি তদ্বিষয়িনী আলোচনা ত্যাগ করিয়া, আমরা ইহজীবনের কথাই ভাবিয়া দেখিব। এখন দেখা যাউক্, পার্থিব 'সুখ' বলিতে আমরা কি বুঝি! মনের উৎকণ্ঠা-শূন্য ভাবকেই আমরা "সুখ" বলি। তোমার অতি সুন্দরী স্ত্রী আছে; কিন্তু, সেই স্ত্রীটির উপর গ্রামের জমিদারের লক্ষ্য আছে। তুমি দরিদ্র ব্যক্তি; সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত, পাছে স্ত্রীটিকে জমিদার মহাশয় বলপূর্ব্বক লইয়া যান! এ অবস্থা কি তোমার সুখের? কখনই না।

তোমার প্রচুর অর্থ আছে ; দস্যুভয়ে তুমি সতত উৎকণ্ঠিত! তুমি জমিদার ; আজ এখানে বিদ্রোহ, কা'ল সেখানে। মহলের সদর খাজানা বাকী পড়িল ; মহাল খাজানার বাকীতে হয়ত নিলাম হইবে! মহাভাবনা। গভর্ণমেণ্ট আ'জ এ চাঁদা ধরিলেন, কা'ল সে চাঁদা। "জমিদার" সুতরাং চাঁদা না দিলেও পসার-প্রতিপত্তি থাকে না। তোমার উৎকণ্ঠার বিরাম নাই, বিশ্রান্তি নাই। সর্ব্ববিষয়িনী উৎকণ্ঠা—নানাবিষয়িনী দুশ্চিন্তা, প্রিয়তমা ভার্য্যার মত তোমার কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে! এ অবস্থাটি কি তোমার সুখের? কখনই না। মনের উৎকণ্ঠা-শূন্য অবস্থাকে শাস্ত্র, "শান্তি" বলিয়াছেন। মাত্র ধর্ম্মপথে থাকিলেই, তদবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মপথ-বিচ্যুত হইলে, কদাচ সে সুখ বা শান্তি লাভ করা যায় না। "ধর্ম্ম" যদি দুঃখের হইত, তবে কেহই আত্মহারা হইয়া, একাল-সেকাল ধরিয়া, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিয়া ছুটিত না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"
গীতা ২য় অঃ, ৮১।

"যে ব্যক্তি কামনাত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।"

তোমাকে কামিনীকাঞ্চন প্রভৃতি উপভোগের বস্তু পরিহার করিবার কথা বলা হয় নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে সুন্দরী ও রূপৈশ্বর্য্য অর্থ ভোগ কর, তাহাতে বাধা নাই ; কেবল, তত্তদ্বিষয়িনী কামনা, মমতা প্রভৃতি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়া, ভোগ কর ; তা হইলেই মহাসুখ, মহতী শান্তি পাইবে। তবেই দেখ, ধর্ম্মপথটী সুখের কি দুঃখের? যদি তোমার আসক্তিই না থাকিল, তবে এই সকল উপভোগ্য বস্তুর ধ্বংসেও তোমার আক্ষেপ, আশঙ্কা বা উৎকণ্ঠা হইবে না। সুতরাং দেববাঞ্ছিত মানসিক শান্তি, তোমার করায়ত্ত হইবে। ধর্ম্মপথ ব্যতীত আর কুত্রাপি এবম্প্রকার প্রাণতোষিণী শান্তি, তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। যদি অক্ষয় সুখ চাও, তবে ধর্ম্মপথেই পাইবে। অন্যত্র নয়।

ভগবদ্ভক্তদিগের সম্বন্ধে আর একটু প্রণিধান করিয়া বুঝা আবশ্যক। সাধন-মার্গের যেমন ক্রম আছে, ভক্তভাবেরও তদ্রূপ ক্রম আছে। শ্রীমদাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ দিয়াছেন যে,—ভক্তভাবের চারিটী ক্রম ; প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। যাঁহারা ভগবদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে মাত্র, তাঁহারা "প্রবর্ত্তক"। যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি বৈধ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা "সাধক", যাঁহারা এতদপেক্ষাও আর একটু উঠিয়াছেন তাঁহারা সিদ্ধ, যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ "ক্রমে" পৌছিয়াছেন, তাঁহারা "সিদ্ধের সিদ্ধ"। এতন্মধ্যে প্রবর্ত্তক ও সাধক এই দুই ক্রমের ব্যক্তিরা ভগবানের কোন খোঁজ খবরই পান না। তৃতীয় "ক্রম" অর্থাৎ "সিদ্ধ" ব্যক্তিরা মাত্র

ভগবানের অস্তিত্ব অনুভূত করেন; কিন্তু দর্শন বা মিলন ঘটে না। যাঁহারা "সিদ্ধের সিদ্ধ" তাঁহারা ভগবানের রূপ সন্দর্শন করেন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি এই শ্রেণীভূক্ত। পূর্ব্বদৈহিক পুণ্যপুঞ্জ বশতঃ যাঁহারা একেবারে বিনা সাধন-ভজনেই ভগবদ্দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "নিত্য সিদ্ধ" বা "ঈশ্বর-কোটি" বলা হয়। আর, যাঁহারা সাধন-পথের পথিক মাত্র, তাঁহাদিগকে "জীব-কোটী" বলা হয়। পরমহংস বলিয়াছেন যে, জীবকোটীরা এই জীবনেই "ভাব" পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। যখন "ভাব" উদিত হয়, তখন, হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি হইতে থাকে। তখন, সাধক কতকটা মৌনী হইয়া থাকেন এবং অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া সেই সুখেই ব্যস্ত থাকেন। ঈশ্বর-কোটীরা ভাবাবস্থা হইতে আর একটু অগ্রসর হইয়া মহাভাব, প্রেম, সমাধি প্রভৃতি উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় যাইয়া উঠেন। তদবস্থায় হৃদয়ে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ বিকাশ হইতে থাকে। যে সকল ভাগ্যবান্ ভগবদ্ভক্ত, সচ্চিদানন্দের এবম্প্রকার নির্ম্মলরূপ সন্দর্শন করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিয়াছেন, তাঁহাদের চারিটী অবস্থায় অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। কখন বালকাবস্থা অর্থাৎ সরল, মায়া-মমতাশূন্য ভাব, কখন পিশাচ-প্রকৃতি পূরীষাদিতে ঘৃণাশূন্য, কখন উন্মত্তবৎ কখন বা মৌনী।

ভগবদ্ভক্তেরা যদিও ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া, সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তথাপি সাধনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে তাঁহাদিগকে একটী না একটী ভাব আশ্রয় করিতে হয়। ভগবদারাধনা কল্পে যতগুলি ভাব নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে এই কয়টীই প্রধান—শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর ও বীর [১]

এতাবদ্ভাবগুলির মধ্যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতে বাৎসল্য বা "মাতৃভাবই" সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কেননা, ইহাতে পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অপিচ, এভাবটী অতি পবিত্র। "দাস্য" ভাবটী যত সহজ মনে করা যায়, বস্তুতঃ তত সহজ নহে; কেননা, এতদ্ভাবাশ্রয় করিলে হনুমানের মত সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। সেটী এখনকার লোকের পক্ষে কার্য্যতঃ হওয়া সুকঠিন। কোন্ লোকটী ভগবানের জন্য মরিতে প্রস্তুত! এত নিষ্ঠা কয়জনের আছে? "শান্ত ভাবটী"ও কঠিন; কেননা একেবারে নিষ্কাম না হইলে, এই ভাবাশ্রয় হইতে পারে না। যাঁহারা মুক্তসঙ্গ কর্ম্মযোগী, তাঁহারাই এতদ্ভাবে সাধনা করিতে সমর্থ। আমরা "ধনং দেহি" "পুত্রং দেহি" বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি। এখনকার দেবীদিগের কেবল "দেহি দেহি" রব। সুতরাং এক্ষণে শান্তির আশ্রয় লইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। "সখ্য" ভাবটীও কঠিন; একেবারে চিত্তশুদ্ধি না হইলে, এই ভাবাশ্রয় হইতে পারে না। "মধুর ভাব" সুকঠিন ব্যাপার। ইহাতে পদস্খলন হওয়া

(১) এ প্রসঙ্গে লেখক যাহা বলিতেছেন, তাহা নির্দ্দোষ নহে। হিঃ পঃ সঃ।

খুবই সম্ভব। "বীর-ভাবে"ও পদস্খলন অনেকাংশে অপরিহার্য্য।

ভগবদ্ভক্তের ভাবগুলি আমরা বুঝিলাম। এতন্মধ্যে, মহাত্মা রামকৃষ্ণানুমোদিত "মাতৃভাবটী"ই উৎকৃষ্ট। ইহাতে ভক্ত, যাবতীয় স্ত্রীতে মাতৃজ্ঞান করিয়া চলিতে থাকিলে, তাঁহার মনের কলুষ-কলাপ বিদূরিত হইয়া যায়; মন পবিত্র হইয়া উঠে। এবম্প্রকারে চিত্তশুদ্ধি হইলে, ভগবদ্দর্শনও স্বতঃই ঘটিয়া থাকে।

এতাবদালোচনায় আমরা ভগবৎ-সাধনক্রমে ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির প্রকৃতি অবগত হইলাম। কিন্তু এত শুনিয়াও, এত জানিয়াও, আমাদের মনের সন্দেহ যায় না; উন্মার্গগামী মন, কিছুতেই বশে আইসে না। ধর্ম্মপথে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। এ রোগের ঔষধ কি? ভগবানই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সংশয় জিনিসটী অতি ভয়ানক। সংশয়যুক্ত ব্যক্তির সাধন-মার্গে কোন আশাই নাই; সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সুতরাং হৃদয় হইতে সংশয়ের মূল উৎপাটন করিতে হইবে, ভগবদ্বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশে আনিতে হইবে। ধন-সম্পত্তিতে বৈরাগ্য-যুক্ত হইলেই, তত্তদ্বিষয়িনী আসক্তি ক্রমশঃ হীন হইবে। ধর্ম্মপথে মতি হইবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যই ঔষধ। ভগবান্ "সংশয়" সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুন:—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"
গীতা ৪র্থ অঃ, ৪০।

"অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক নাই। তাহার সুখও নাই।"

অতএব, ভগবদ্বাক্যে আমরা বুঝিলাম, চঞ্চল-চিত্ত, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিও অভ্যাস এবং বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক, ভক্তিমান্ হইয়া ভগবৎ-সাধন-মার্গের পথিক হইতে পারে এবং পরিশেষে ভগবদ্দর্শন করতঃ মনুষ্য-জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥১

অন্বয় ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। (হে) সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছবঃ) মামকাঃ (মদীয়াঃ) পাণ্ডবাশ্চ এব সমবেতাঃ (সন্তঃ) কিং অকুর্ব্বত। (কৃতবন্তঃ)।১

বঙ্গানুবাদ। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী (মৎপক্ষীয়গণ) আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ সম্মিলিত হইয়া কি করিলেন?১

আলোচনা। কৌরব-পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ ও আলোচনা করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র জানিতেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য। বিশেষতঃ সংপ্রতি তাঁহারা বহুসংখ্যক রথ, অশ্ব, গজ, অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন

হইয়া অস্ত্রত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন ; এমত অবস্থায় "মৎপক্ষীয়গণ (অর্থাৎ কৌরবেরা) এবং (পাণ্ডুপুত্র) পাণ্ডবেরা ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া কি করিলেন" সঞ্জয়ের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের এবম্প্রকার প্রশ্ন, যেন সময়োচিত সঙ্গত বোধ হয় না। অথচ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এইটীই প্রথম শ্লোক। ভগবান্ বেদব্যাস, ব্যর্থ বাক্য-প্রয়োগের ব্যক্তি নহেন। অবশ্য ইহার গূঢ় রহস্য আছে।

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" এখানে "ধর্ম-ক্ষেত্র" শব্দ "কুরুক্ষেত্র" শব্দের বিশেষণ। ধর্মক্ষেত্র রূপ কুরুক্ষেত্র-ভূমিতে। যেখানে গমন করিলে ধর্মবুদ্ধিহীন লোকের মনে ধর্মভাবের উদয় হয়, যেখানে গমন করিলে অন্তর্নিহিত ধর্মপ্রবৃত্তি পরিপুষ্ট ও প্রবল হয় এবং মানব, ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেখানকার পবিত্র-সত্ব-প্রকৃতির প্রভাবে তমোগুণী পুরুষেও সত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহাই ধর্মক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র তাহার মধ্যে প্রধান। কুরুক্ষেত্রের ধর্মক্ষেত্রত্ব সম্বন্ধে জাবালোপনিষদে ও শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে—

"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব-যজনং, সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম সদনং" জাবালোপনিষৎ।

"দেবাহ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সোমো বিষ্ণুর্বিশ্বে দেবাঃ। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেব-যজনম্।" শতপথ-ব্রাহ্মণ।

কুরুক্ষেত্র দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান ও প্রাণিবর্গের ব্রহ্ম বা মোক্ষলাভের নিকেতন।

স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যে মানবের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? শ্মশানক্ষেত্রে শবদাহনার্থ সমাগত হইলে, কাহার মনে না মানব-দেহের নশ্বরতা, বিলাসভোগের ক্ষণিকতা, সংসারের অসারতা অনুভূত হয়? কর্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া আবার সেই সব শ্মশান-বৈরাগ্য-সম্পন্ন পুরুষেরাই পুত্রোদ্বাহাদি মহোৎসবে পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া, সংসার-ব্যাপারে মহানন্দ ভোগ করেন।

ভগবানের মায়া-রচিত মনুষ্য, তাঁহার মায়া-প্রভাবে কখন যে কোন পথে পরিচালিত হয়, তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। তাই ধৃতরাষ্ট্র ভাবিতেছিলেন যে, কুরুপাণ্ডবেরা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের স্থান-মাহাত্ম্যে পূর্ব্ব-বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া, ধর্মভাবযুক্ত হইয়া, জীবহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইতেও পারেন ; পরন্তু উভয় পক্ষ, সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইয়া পরস্পর সৌখ্য সূত্রে আবদ্ধ হইতেও পারেন। তাই সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৎপক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবেরা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়া কি করিলেন?"

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধন স্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীত্॥২

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ (কথয়ামাস)। পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ় (ব্যূহিতং) দৃষ্ট্বা তু রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যং (দ্রোণং) উপসংগম্য বচনং (বক্ষ্যমাণং পশ্যৈতাম্ ইত্যাদি রূপম্) অব্রবীত্। ২

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন—"পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণকে ব্যূহবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান

দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য—সমীপে উপস্থিত হইয়া, পরিবর্ত্তি কথা গুলি বলিলেন।" ২

আলোচনা। ধৃতরাষ্ট্রের সংশয়-নিরাকরণার্থ সঞ্জয় বলিলেন—উভয় পক্ষের সেনা, ব্যূহিত হইয়া কেবল সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে;—এই সময় দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা (পরবর্ত্তি শ্লোকোক্ত) বলিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, ধৃতরাষ্ট্র যে সন্ধি বা সম্মিলনের সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহা অমূলক; বরং পরবর্ত্তী উক্তি দ্বারা দুর্য্যোধনের অন্তরের কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতাই সূচিত হইতেছে। ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদ-পুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩

অন্বয়। (হে) আচার্য্য! তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদ-পুত্রেণ (ধৃষ্টদ্যুম্নেন) ব্যূঢ়াং (ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতাম্) পাণ্ডু-পুত্রাণাং এতাং মহতীং চমূং (সেনাং) পশ্য। ৩

বঙ্গানুবাদ। হে আচার্য্য! আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ব্যূহাকারে অবস্থিত, পাণ্ডবগণের এই বিপুল বাহিনী দর্শন করুন। ৩

আলোচনা। দুর্য্যোধনের এ প্রকার বলিবার দুইটী তাৎপর্য্য আছে। প্রথম দ্রোণাচার্য্যকে অপর পক্ষের বল আলোচনা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে বলা; দ্বিতীয় পাণ্ডব-পক্ষীয় সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধ উৎপাদন করা। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র-শিষ্য। গুরুর প্রতিকূলে অস্ত্র-ধারণ, শিষ্যের অধর্ম্ম ও ধৃষ্টতা। তাই দুর্য্যোধন বলিলেন যে, "আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য, আপনার বধের জন্য যে ব্যূহ রচনা করিয়াছে, তাহা অবলোকন করুন।" ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬

অন্বয়। অত্র মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধরাঃ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুন-সমাঃ শূরাঃ (বর্ত্তন্তে) (তে চ) মহারথঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ) বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ, কাশিরাজশ্চ, পুরুজিত্ কুন্তিভোজশ্চ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যশ্চ বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুঃ) দ্রৌপদেয়াশ্চ এতে সর্ব্বে এব মহারথাঃ। ৪।৫।৬

বঙ্গানুবাদ। এই সেনা মধ্যে স্থিত মহাধনুর্ধারী বীরগণ যুদ্ধে ভীম ও অর্জ্জুনের সমান। মহারথী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিত, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, পরাক্রমশালী রাজা উত্তমৌজা, সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ইহারা সকলেই মহারথী। ৪৫৬

আলোচনা। উপরোক্ত যোদ্ধৃগণের নাম উল্লেখে দুর্য্যোধন আচার্য্যকে জানাইতেছেন যে, পাণ্ডব-পক্ষে কেবল যে এক ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহা নহে, আরও মহাপরাক্রমশালী

বীর্য্যবান্ মহারথী অনেক আছেন, তাঁহারা সকলেই স্বনামখ্যাত। আপনি তদ্বিবর স্মরণ রাখিয়া সৈন্য-পরিচালন করুন।৪ ৫ ৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজো-
ত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি
তে।৭

অন্বয়। (হে) দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ (প্রধানাঃ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ (অবগচ্ছ) তে (তব) সংজ্ঞার্থং (সম্যক্জ্ঞানার্থং) তান্ ব্রবীমি।৭

বঙ্গানুবাদ। হে দ্বিজোত্তম! আমাদের মধ্যেও যে সকল প্রধান সেনাপতি আছেন, আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৭

আলোচনা। যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের বল সমালোচনা করা, রণনিপুণের কর্ত্তব্য। তদনুসারে দুর্য্যোধন, শত্রুপক্ষীয় বীরগণের নাম উল্লেখ করিয়া, আপন পক্ষের সেনাপতিগণের নাম বলিতেছেন। অপরন্তু কেবল শত্রুপক্ষের নাম উল্লেখে পাছে দুর্য্যোধনের মনের ভীতিভাব প্রকাশ পায়, তজ্জন্য নিজপক্ষের সেনাপতিগণেরও নাম বলিতেছেন।৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিঃ জয়দ্রথঃ ॥৮
অন্যেচ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানা-শস্ত্র-প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯

অন্বয়। ভবান্ (আচার্য্যঃ) ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ (সমর-বিজয়ী) কৃপশ্চ, অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিঃ (ভূরিশ্রবাঃ) মদর্থে ত্যক্ত-জীবিতাঃ (মৎপ্রিয়ার্থং জীবনং ত্যক্তুমুদ্যতাঃ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ অন্যেচ বহবঃ শূরাঃ (সন্তি) সর্ব্বে (এতে) যুদ্ধ-বিশারদাঃ (রণনিপুণাঃ)।৮।৯

বঙ্গানুবাদ। হে আচার্য্য! আপনি, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধ-বিজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ প্রভৃতি, আর আমার জন্য জীবন-পরিত্যাগে প্রস্তুত বহু শস্ত্রধারী যুদ্ধ-বিশারদ অনেক বীর আছেন।৮।৯

আলোচনা। অভিমানী মহাবীর দুর্য্যোধন, বিপক্ষ-সেনা পরিদর্শন করিয়া ভীতি-বিচলিত চিত্তে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সতর্ক ও উত্তেজিত করিবার জন্য পাণ্ডব-সেনানায়কগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পাছে নিজের ভীতি-ভাব প্রকাশ পায়, এজন্য আপন পক্ষের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের নাম করিয়া, "আমার জন্য প্রাণদিতে প্রস্তুত অনেক বীর আছেন," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্ম-পক্ষের গৌরব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া, নিজের দাম্ভিকতা রক্ষা করিয়াছেন।৮।৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষি-
তম্ ॥ ১০

অন্বয়। ভীষ্মাভিরক্ষিতং অস্মাকং তৎ বলং অপর্য্যাপ্তং, তু (কিন্তু) ভীমাভি-রক্ষিতং এতেষাং ইদং বলং পর্য্যাপ্তং।১০

বঙ্গানুবাদ। আমাদের পক্ষে ভীষ্ম-রক্ষিত সৈন্য অপর্য্যাপ্ত এবং পাণ্ডব পক্ষে ভীমরক্ষিত সৈন্য পর্য্যাপ্ত।১০

আলোচনা। কুরুক্ষেত্র-সমরে উভয় পক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাবেশ হইয়াছিল। কৌরব-পক্ষে ১১ একাদশ অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডব—পক্ষে ৭ সাত অক্ষৌহিণী। এ স্থানে পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত শব্দের দুই প্রকার অর্থ হয়। যথা—গণনায় অপর্য্যাপ্ত, যাহা পর্য্যাপ্তের অধিক অর্থাৎ পাণ্ডব-পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী, তত্তুলনায় কৌরব-পক্ষে ১১ অক্ষৌহিণী, দেড় গুণের অধিক, সুতরাং পর্য্যাপ্তের অধিক অপর্য্যাপ্ত। পাণ্ডব-পক্ষে ৭ সাত অক্ষৌহিণী, উহার তুলনায় কম। অন্য অর্থে ভীষ্মাভি-রক্ষিত সৈন্য গণনায় একাদশ অক্ষৌহিণী হইলেও তাহা অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পর্য্যাপ্ত নহে। পর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ যথেষ্ট, সম্যক, উপযুক্ত। যাহা পর্য্যাপ্ত নহে, তাহাই অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ কৌরব-পক্ষের সৈন্য, সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহারা সম্যক্ উপযুক্ত নয়। ভীমাভিরক্ষিত সৈন্য, সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহারা পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সম্যক্ উপযুক্ত। দুর্য্যোধন গর্ব্বিত ও অভিমানী হইলেও তাঁহার কথায় তাঁহার অন্তরের ভীতি-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, রথী সর্ব্বপ্রকারে কৌরব-পক্ষে ২৪০৫৭০০ এবং পাণ্ডব-পক্ষে ১৫৩০৯০০ উপস্থিত হইয়াছিল। ১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এবহি। ১১

অন্বয়। (অতএব) সর্ব্বেষু অয়নেষু (ব্যূহ-প্রবেশ-মার্গেষু) যথাভাগং অবস্থিতাঃ (সন্তঃ) সর্ব্বে এব ভবন্তঃ ভীষ্মং এব অভিরক্ষন্তু। ১১

বঙ্গানুবাদ। আপনারা এক্ষণে ব্যূহ-প্রবেশের পথে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে অবস্থিত থাকিয়া পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে থাকুন। ১১

আলোচনা। দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্যের নিকট কোন সদুত্তর না পাইয়া; অবশেষে বলিলেন "পিতামহ ভীষ্ম আমাদের সেনাপতি। সেনাপতিকে নিরাপদ্ করাই যুদ্ধের প্রধান ও প্রথম কার্য্য। অতএব আপনারা নির্দ্দিষ্ট বিভাগ অনুসারে ব্যূহদ্বারে (যাহার যে স্থান রক্ষা করিবার ভার আছে, তিনি সেই স্থানে) অবস্থিত হইয়া, সেনাপতি পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন। যেন অতর্কিত ভাবে শত্রু, ব্যূহ-ভেদ করিয়া সেনাপতির অনিষ্ট করিতে না পারে।"১১

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

গীতার কর্ম্মবাদ।

অনেকের মনে এই সন্দেহ হইতে পারে যে, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন—কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; তথাপি তাহাকে কর্ম্ম করিতেই উপদেশ দিলেন কেন?" ভগবদুক্তিতে পরস্পর-বিরোধ থাকিতে পারে না। ভগবদ্বাক্য সন্দেহ-জনক হইলে লোকের শ্রদ্ধায় হীন হইতে পারে। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সংসারের সেই সন্দেহ নিরাকরণ

করিয়াছেন। ভগবানের কথার মূল মর্ম্ম এই যে,—যদিও কর্ম্মকাণ্ড বিষের ভাণ্ড, তথাপি কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) ও জ্ঞানের লক্ষ্য একই, সুতরাং ইহারা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর-বিরুদ্ধ নহে। কাম্য কর্ম্ম মাত্রেই দোষযুক্ত ও বন্ধের কারণ; তাঁহাদ্বারা কদাচ চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত কদাচ আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিও হয় না। "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" পাপক্ষয় ব্যতীত দেহীর জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। যে উপায়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, তাহার নামই যোগ। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা মনোমালিন্য দূর হয় বলিয়া উহার নাম "কর্ম্মযোগ।" আবার "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" কর্ম্মসু কৌশলং কার্য্যে কৌশল, নৈপুণ্য, অথবা সুকৌশলং কর্ম্ম কৌশল-সমন্বিত কর্ম্ম, যোগ নামে অভিহিত হয়। যদিও সন্ন্যাস, জ্ঞানের কারণ বটে, তথাপি চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস অসম্ভব। অতএব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম-কর্ম্ম করাই ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য।

ভোগের প্রবর্ত্তক বিধায় কাম্য কর্ম্ম, সংসার-প্রবর্ত্তক বা বন্ধের কারণ। কর্ম্ম-ফলানুরাগ—বর্জ্জন ব্যতীত সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য অসম্ভব। কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকে পণ্ডিতগণ "সন্ন্যাস" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কর্ম্মত্যাগ বিহিত নহে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদ্রেক হয় না; তাহা না হইলেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় না। সুতরাং তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম ত্যাগ করাও বিহিত নহে। একারণই ভগবান্ আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিতে ও অনাসক্তভাবে বিষয়োপভোগ করিতে বলিয়াছেন। কামনার নিবৃত্তি ব্যতীত চিত্ত স্থির হওয়া সুকঠিন। চিত্ত স্থির না হইলে উহাতে পাপ-সংকল্প-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। অনাসক্তভাবে বিষয়-ভোগ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় বশীভূত হওয়া চাই। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত-পদাদি সংযত করিয়া মনে মনে "মনকলা খায়," তাহাকে বকধর্ম্মী বৈড়ালব্রতিক বা ভণ্ড বলিয়া জানিবে। আর আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও বাসনার তাড়না না থাকায় শান্তি-লাভের পথ প্রশস্ত হয়। বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির রোধ বা উচ্ছেদ-সাধন সঙ্গত নয়। কামনা ছাড়িলেই সকল গোল যায়।

অনেকে মনে করেন, ফলানুসন্ধান ব্যতীত মানবের কর্ম্মে প্রবৃত্তিই অসম্ভব। এসিদ্ধান্ত সমীচীন নহে; যেহেতু আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুজনের আজ্ঞা বা রাজাজ্ঞা, ফলানুসন্ধান ব্যতীতও আমরা প্রতিপালন করি। জয়—পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়াই ক্রীড়া-কৌতুকে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কর্ত্তব্য-বোধে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে প্রার্থিত ফল পাওয়া যায়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। কামনার অতৃপ্তিতে হৃদয়ে শত বৃশ্চিক-দংশন যাতনা অনুভূত হইয়া থাকে; নিষ্কাম-কর্ম্ম-সেবায় সে দোষ নাই। বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ—এই দুই বৃত্তির উপশম

করিতে পারিলেই জীব, প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রার্থ-বিচার-সম্ভূত জ্ঞান-প্রভাবে স্বভাবিক রাগ-দ্বেষ নিবৃত্ত হইয়া যায়। কাম, মনুষ্যের প্রবল শত্রু, উহা রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, উহা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। উক্ত দুই প্রবল রিপু, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মানবকে কুপথে পরিচালিত করে এবং জ্ঞানকে আবৃত করে। প্রবল সত্ত্ব গুণের প্রভাবে ঐ দুই রিপু, বশীভূত হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীগণ প্রাক্তন কর্ম্ম প্রভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া জ্ঞান-বলে মুক্তি-পথে অগ্রসর হন। কর্ম্ম-যোগীরা ফলাভিসন্ধিশূন্য ভগবদর্পণ-লক্ষণ কর্ম্ম-প্রভাবে বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিমার্গে উপনীত হন। কর্ম্ম ও জ্ঞান দুইটি পন্থা। উভয়েরই ফল, অবসানে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় একই রূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জ্ঞান-ভূমিকার উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিষ্কাম-কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। এজন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি যোগযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মী, শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের আত্মায় নিজাত্মভাবাপন্ন, তিনি কর্ম্ম করিলেও নির্লিপ্ত। কর্ম্ম, বন্ধের অর্থাৎ সংসার-কারাগারের হেতু হইলেও উহা নিষ্কামকর্ম্মীকে বাঁধিতে পারেনা। অতএব বুঝা গেল, যে, বন্ধের কারণ সকাম কর্ম্ম, সদোষ বিধায় নিকৃষ্ট, আর অন্তঃকরণ-শুদ্ধির হেতু বলিয়া নিষ্কাম-কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ফলানুরাগ-বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণের সঞ্চার হইলে, কালে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানই জীবের মুক্তির কারণ হইতে পারে।

ভগবান্ প্রিয়সখাকে যথাক্রমে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিন বিষয়েরই উপদেশ দিয়াছেন এবং পরপর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বুঝাইয়াছেন। অর্জ্জুনের প্রথম কথা,—স্বজন ও গুরু-বধে মহাপাপ হইবে, সুতরাং যুদ্ধ করা অকর্ত্তব্য। ভগবান্ এই ভুলের মূল তুলিয়া দিলেন; বলিলেন—"আত্মা অবিনাশী, সুতরাং বিষাদ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ অধর্ম্ম হইবে"। ইহার পর অর্জ্জুন বলিলেন, "স্বজন—গুরুজনবধ ও রাজ্য-লাভ, এই উভয়ের কোনটি শ্রেয়, নিশ্চিত বুঝিতে পারি না, আপনি বুঝাইয়া দিন।" ভগবান বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-যুদ্ধে অধর্ম্ম হইবে না। বৃথা নরহত্যা বা পররাজ্যাপহরণ প্রভৃতি অধর্ম্মকর উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। ছলে অপহৃত স্বরাজ্য লাভের জন্যই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়ার্জ্জিত রাজ্য আহরণ করিতে যদি স্বজন, গুরুজন বা অপর কেহ পরিপন্থী হন, তবে তাঁহাকে বিনাশ করিলে বীর ক্ষত্রিয়ের কোন দোষ-স্পর্শের ভয় নাই। বরং স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন না করিলেই নিন্দনীয় হইবে এবং নরকভাগী হইবে। যাহা যে জাতির ধর্ম্ম, তাহা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক হইলেও ত্যাগ করিবে না; ইহাই মহাত্মগণের উপদেশ। যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম্য কর্ম্ম, তুমিও কর্ম্মের অধিকারী। জীবন-রক্ষার

জন্তও মনুষ্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য। তুমি মনুষ্য, সুতরাং তুমিও কর্ম্ম করিতে অবশ্য বাধ্য। যখন কর্ম্ম ত্যাজ্য নয়, তখন অবশ্য কর্ত্তব্য, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম-পালন রূপ কর্ম্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না।"

ভগবান দ্বিতীয়স্তরে দেখাইলেন যে, কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তাহাতে অর্জ্জুনের সন্দেহ হওয়ায় সংশয়-নিরাকরণার্থে বলিলেন "সখে! কর্ম্ম করিতে থাক, উহার প্রভাবে জ্ঞানের উদয় হইলে, তোমার সর্ব্ব-সংশয় তিরোহিত হইবে।" অর্জ্জুন বলিলেন "কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম বলিলেন 'কর্ম্ম ব্যতীত জীবন-ধারণ পর্য্যন্ত চলিবে না, সুতরাং কর্ম্ম কর।' এখন বলিতেছেন যে, 'জ্ঞান হইতে কর্ম্ম নিকৃষ্ট।' তবে কি অপকৃষ্ট কার্য্যে আদিষ্ট হইতেছি?" ভগবান বলিলেন—"সন্দেহ-জনক বাক্য বলি নাই। কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা নিশ্চিত। কিন্তু কর্ম্ম ব্যতীত চিত্ত-শুদ্ধি হয় না, এই কারণেই জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াও তোমায় কর্ম্ম করিতে অনুমতি করিয়াছি। নিষ্কাম-কর্ম্ম-প্রভাবে চিত্ত-শুদ্ধি হইলে বিমল হৃদয়াকাশে জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইবে। সখে! জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ আর একটি জিনিষ আছে, যাহা আমার পরম প্রিয়। সেটির নাম, ভক্তি। ভক্তির অন্য নাম প্রেম। জ্ঞানে মাত্র জানা, প্রেমে চেনা ও মাখামাখি ভাব—অখণ্ড আনন্দাস্বাদ। জ্ঞান পুরুষ, কাছারি-বাড়ীতেই থাকে; ভক্তি নারী, অন্তঃপুর-চারিণী, ভিতরকার সমস্ত সংবাদ রাখে। যে বেশী অন্তরঙ্গ, সে তত প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। এজন্যই জ্ঞান হইতেও ভক্তি মুখ্যতমা বলিয়া কথিত আছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে ভক্তি বা প্রেমের উদয় হয়। ভাগ্যবান্ জীব, ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়া মুক্তিকেও দাসী বলিয়া মনে করেন।" অবশেষে যখন অর্জ্জুন বলিলেন, "সখে! আমি ধর্ম্মের মীমাংসা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, উপায় কি হইবে বলুন!" ভগবান বলিলেন "তোমার কোন শঙ্কা নাই, তুমি সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমায় সমস্ত বিপদ্ হইতে নিস্তার করিব।"

এ কথাটী শুধু অর্জ্জুনের প্রতি প্রযোজ্য নয়, জগতের প্রতিই প্রযোজ্য। গীতোক্ত ধর্ম্ম, জগতের সকলেরই সম্পৎ। উহা বিশ্বমানবের বিশ্বাসের সামগ্রী। এমন উদার ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অন্য কোন দেশেই প্রচারিত হয় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ভয়ঙ্কর লোক-ক্ষয়-কর যুদ্ধে অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন তাহা নয়। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, তিনি পূর্ব্বাপর বিরোধভঞ্জনেরই পক্ষপাতী ছিলেন; তজ্জন্য স্বয়ং দৌত্য স্বীকার করিয়া হস্তীনায় গমনও করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সারথ্যে ব্রতী হইয়া, অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সংশয়াপন্ন দেখিয়া, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম-যুদ্ধই শ্রেয়, ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। নীতি বা ধর্ম্মের অনুরোধে কখনও স্বীয় পুত্রের মস্তক-ছেদনও কর্ত্তব্য হইয়া উঠে; নচেৎ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। গীতোক্ত ধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধী নহে; উহা মানব-মণ্ডলীর পরম হিতকর, যেহেতু

উহা আত্মোন্নতি-জনক। আত্মোন্নতি, প্রত্যেক ব্যক্তিরই অভিপ্রেত। মনুষ্য-শরীরে যে সমুদয় পাশবিক বৃত্তি আছে, তাহা স্বভাবতই স্ফূর্ত্তি পায়, কিন্তু সদ্বৃত্তি গুলি অনুশীলন ব্যতীত স্ফূর্ত্তি পায় না। এ জন্যই অনুশীলন কর্ত্তব্য। 'সুখ' বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুশীলনেই আছে; পশুত্বে ঘোর দুঃখ। জীবের সদা প্রার্থিত যে সুখ শান্তি, তাহা সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলনেই হইতে পারে। ক্ষণিক বা দুঃখপরিণামী সুখ, প্রকৃত সুখ নহে; উহা দুঃখের নাম স্বরূপ। আত্ম-প্রীতিই লক্ষ্য, কিন্তু আত্মা ব্যাপক, সুতরাং বিশ্ব-প্রীতি ব্যতীত যথার্থ আত্মপ্রীতি হইতেই পারে না। এই মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওয়ায় জীব-জগতে চারি দিকে দুঃখ-শোকের হাহাকার! সার ফেলিয়া খোঁসা লইয়া কাড়াকাড়ি চলিতেছে—বলিয়াই মনুষ্যের দারুণ দুঃখ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্য, পশুধর্ম্মী হইয়া জগতে দুঃখ ও অশান্তি আনয়ন করিতেছে! ভগবদুক্ত ধর্ম্মই বেদোক্ত ধর্ম্ম, উহার অপ্রচলনই অধঃপাতের প্রধান কারণ। বাহ্য সম্পদ, জড়বিজ্ঞান লইয়া যে মানব-মণ্ডলী এক্ষণে স্পর্দ্ধা করিতেছে, উহা ধ্বংসের অতি নিকটবর্ত্তী। কারণ, উহা দ্বারাই মানব-মণ্ডলী অতৃপ্ত আকাঙ্খার পশ্চাৎ পরিধাবিত হইতেছে। সে বুভুক্ষা দুর্নিবার, সুতরাং তাহাতে সুখ-শান্তির আশা নাই। তাই বলি "যদি সুখ চাও, তবে বাহ্য ছাড়িয়া অন্তর পানে চাও। দেখ, খুঁজিলে তথায় অক্ষয়-সুখের প্রস্রবণ মিলিবে। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি পাইবে" ইহাই গীতাশাস্ত্রের মহান্ উদার উপদেশ। জ্ঞান এবং ভক্তির মূলেও কিন্তু 'কর্ম্ম', এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

শ্রীআত্তনাথ কাব্যতীর্থ।

রাজনীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উতথ্য ঋষি, মান্ধাতা রাজাকে কহিয়াছিলেন যে, হে ভরতর্ষভ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই সমুদায়ই রাজবৃত্ত, তজ্জন্য রাজাই যুগ রূপে কথিত হইয়া থাকেন। যখন রাজা প্রমাদগ্রস্ত হয়েন, তখন চাতুর্ব্বর্ণ্য, চারি বেদ ও চারি আশ্রম এই সমুদায়ই মুগ্ধ হইয়া থাকে। রাজাই প্রাণী সকলের কর্ত্তা ও বিনাশকারী, কিন্তু যে রাজা ধর্ম্মাত্মা, তিনিই কর্ত্তা এবং যিনি অধর্ম্মাত্মা, তিনিই বিনাশকারী হইয়া থাকেন। যখন রাজা প্রমাদগ্রস্ত হয়েন, তখন তাঁহার ভার্য্যা, পুত্র, বান্ধব এবং সুহৃদ্‌গণ সকলেই এক সময়ে শোকাতুর হইয়া থাকে। নৃপতি অধার্ম্মিক হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকল জন্তুই অবসন্ন হইয়া থাকে।

হে মান্ধাতঃ! বিধাতা দুর্ব্বল প্রাণিগণের রক্ষার জন্যই বলবানের সৃষ্টি করিয়াছেন; কারণ তাহাতেই দুর্ব্বল প্রাণি সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে পার্থিব! রাজা অধার্ম্মিক হইলে, তিনি যাহাদিগকে অন্নাদি দ্বারা পালন

করেন ও যে সকল প্রাণী রাজবংশীয়, তাহারা সকলেই শোক করিয়া থাকে। দুর্ব্বল, মুনি ও আশীবিষের চক্ষুকে আমি অত্যন্ত অবিষহ্য বিবেচনা করিয়া থাকি, তজ্জন্য তুমি দুর্ব্বলকে অবসন্ন করিও না। হে তাত! তুমি দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে নিয়ত অবিমানিত বোধ করিবে; যেন দুর্ব্বলের চক্ষু, সবান্ধবে তোমাকে দগ্ধ না করে; কারণ যে ব্যক্তি দুর্ব্বল কর্ত্তৃক দগ্ধ হয়, তাহার কুলে কিছুই অঙ্কুরিত হয় না, বরং সমূলে দগ্ধ হইয়া থাকে; তজ্জন্য তুমি দুর্ব্বলকে কখনও পীড়ন করিও না। অতিশয় বলবান্ হইলেও বলহীন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে; কারণ বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বল কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে তাহার কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। বিমানিত হত বা আক্রুষ্ট ব্যক্তি যদি কোন ত্রাণকর্ত্তাকে লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে, অমানুষ-কৃত দণ্ড, নরপতিকে নষ্ট করিয়া থাকে। হে তাত! তুমি প্রতিপক্ষ হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ভোগ করিও না; আশয়-বিনাশী অগ্নির ন্যায় দুর্ব্বলের চক্ষু, যেন তোমাকে দগ্ধ না করে। মনুষ্য মিথ্যা অভিশপ্ত হইয়া রোদন করিলে, তাহাদের চক্ষু হইতে যে সকল অশ্রু পতিত হয়, তাহাদের মিথ্যাবাদ বশতঃ সেই সকল অশ্রু, তাহার পুত্র ও পশু সকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। গো যেরূপ সদ্যঃ ফলদায়ক হয় না, সেইরূপ পাপ কর্ম্ম, যদি সদ্য আপনাতে না ফলে, তাহা হইলে পুত্রে, না হয় পৌত্রে, না হয় দৌহিত্রে ফলিয়া থাকে। যে স্থানে দুর্ব্বল ব্যক্তি, বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, কোন পরিত্রাতাকে প্রাপ্ত না হয়, সেস্থানে দেবকৃত দারুণ দণ্ড পতিত হইয়া থাকে। জনপদবাসীরা সকলে একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ভিক্ষা করিতে থাকিলে, তাহারা ভিক্ষুরূপে সর্ব্বদা রাজাকে নিহত করিয়া থাকে। যদি জনপদ-মধ্যে রাজার বহু রাজপুরুষ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে রত হয়, তাহা হইলে রাজার অত্যন্ত পাপ হইয়া থাকে। যদি তাহারা কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া অযুক্তি দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তিগণের ধন হরণ করে, তাহা হইলে রাজার নিতান্ত বিনাশ হইয়া থাকে। যেমন বড় বৃক্ষ জন্মিয়া অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে, প্রাণিগণ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং সেই বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে, তাহারা আশ্রয়শূন্য হয়, রাজা বর্দ্ধিত বা বিনষ্ট হইলে প্রজাগণের ও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। যদি রাজপুরুষগণ রাজ্য মধ্যে রাজার গুণ ও মনের ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া, উৎকৃষ্ট ধর্ম্মও আচরণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সুকৃত দূরীভূত হইয়া যায় এবং যদি ধর্ম্ম ভ্রমে অধর্ম্ম আচরণ করে, তাহা হইলে দুষ্কৃতও পলায়ন করে। যদি রাজ্য-মধ্যে পাপীলোকেরা রাজার জ্ঞাত-সারে সাধুসকলের নিকট বিচরণ করে, তাহা হইলে কলি, সেই রাজাকে আশ্রয় করেন; কিন্তু যদি রাজা অশিষ্ট লোক সকলকে শাসন করেন, তাহা হইলে ভূমিপতির রাজ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রাজা ব্যক্তি-সকলের সুভাষিত-বাক্য শ্রবণ এবং সুকৃত-কর্ম্ম দর্শন করিয়া তাহার সম্মাননা করিলে, অনুত্তম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন রাজা, খাদ্য দ্রব্য-সংবিভাগ করিয়া ভোজন করেন, অমাত্যগণের

অপমান না করেন এবং বলদর্পিত ব্যক্তির দমন করেন, তখন তাহাই রাজার ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া হইয়া থাকে। যখন রাজা, কায় বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা সকলকে পরিত্রাণ করেন এবং পুত্রের পতিও ক্ষমা না করেন, তখন তাঁহার তাহাই ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নৃপতি, দুর্ব্বল-ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইয়া যখন নিজে ভোজন করেন ও তজ্জন্য তাহারা বলশালী হয়, তখন তাহা রাজার ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন রাজার প্রিয়জনও বাক্য কিম্বা কর্ম্ম দ্বারা পাপাচরণ করিলে, রাজা তাহাকে ক্ষমা না করেন, তখন তাহা রাজার ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন রাজা শরণাগত মনুষ্যগণের মর্য্যাদা-ভেদ না করিয়া, তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন, তখন তাহা রাজার ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন রাজা, কৃপণ, অনাথ ও বৃদ্ধ মনুষ্যগণের ক্লেশ-জন্য অশ্রুজল মার্জ্জন করিয়া হর্ষ উৎপাদন করেন, তখন তাহা রাজার ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন রাজা, মিত্র সকলকে বর্দ্ধিত, শত্রু সকলকে অবনত এবং সাধু সকলের পূজা বা সম্মান করিয়া থাকেন, তখন তাহা রাজার ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন রাজা, সত্যপালন, প্রীতিপূর্ব্বক নিত্য ভূমি দান, অতিথি-সৎকার ও ভৃত্য সকলের ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন, তখন তাহা রাজার ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাঁহাতে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই রাজা ইহলোকে উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে মান্ধাতঃ! ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-সংযমই উত্তম কার্য্য; কারণ তাঁহারা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সংযম করিতে পারিলে ঈশ্বরত্ব-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে না পারিলে স্বাশ্রয়দাহী হইয়া থাকেন। যেরূপ যম অর্থাৎ বিরতি সকল জীবকেই নির্ব্বিশেষে সংযত করে, তদ্রূপ রাজা, প্রজা সকলকে যথাবিধি সংযত করিয়া রাখিবেন। হে পুরুষর্ষভ! যখন লোকে ইন্দ্রের সহিত রাজার তুলনা দেয়, তখন সেই রাজা, যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। তুমি সর্ব্বদা প্রমাদশূন্য হইয়া ক্ষমা, বুদ্ধি, ধৃতি, মতি, প্রাণিগণের বিষয়-জিজ্ঞাসা, সাধুতা ও অসাধুতা এই সমুদায় শিক্ষা করিবে। সৈন্য-সংগ্রহ করিবে, সকলকে দান করিবে, সকলকে মধুর বাক্য কহিবে এবং পৌর ও জনপদবাসী সকলকে যথাসুখে পালন করিবে। অক্ষম নৃপতি, কখন প্রজা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না; কারণ রাজ্য-রূপ মহাভার বহন করা অতি দুষ্কর। যে নৃপতি দণ্ডবিৎ, প্রাজ্ঞ ও শূর, তিনিই রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু দণ্ডজ্ঞানশূন্য, ক্লীব ও বুদ্ধিহীন নৃপতি, কদাচ তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। তুমি সৎকুলজাত, ভক্ত, বহুশ্রুত, দক্ষ ও অভিরূপ অমাত্যগণের সহিত তাপসাশ্রমী-গণেরও সর্ব্ব প্রকার বুদ্ধি পরীক্ষা করিবে। যদি তুমি এইরূপে সকল জীবের পরম ধর্ম্ম অবগত হইতে পার, তাহা হইলে স্বদেশে বা বিদেশে কোথাও তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। অর্থ ও কাম হইতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন, এবং ধর্ম্মাত্মা মানবই

ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। যে মনুষ্যগণ, দারা ও পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা সকলের নিকট পরিপূজিত হইয়া থাকেন। হে মহাত্মন্! ভৈক্ষ্য-সংগ্রহ, দান, মধুরবাক্য, অপ্রমাদ ও শৌচ—এই সকল রাজার অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যকর হইয়া থাকে; তজ্জন্য এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইবে। রাজা অপ্রমত্ত হইয়া আপনার ও পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবেন; কিন্তু অন্যে রাজার ছিদ্র দর্শন করিতে পারিবে না; যেহেতু আত্মছিদ্র গোপন করিয়া পরছিদ্র দর্শন করাই রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥

রাজা ধর্ম্ম-মার্গে অবস্থান করিবেন; কখনও অধর্ম্মপথে গমন করিবেন না। এ বিষয়ে রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্মদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, রাজা কিরূপ ধার্ম্মিক হইবেন?" তদুত্তরে ভীষ্মদেব উত্তর করিয়া ছিলেন যে, বামদেব নৃপতি বসুমনাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর—

বামদেব উবাচ।।

ধর্ম্মমেবানুবর্ত্তস্ব ন ধর্ম্মাদ্ বিদ্যতে পরম্।
ধর্ম্মে স্থিতা হি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্॥
অর্থসিদ্ধেঃ পরং ধর্ম্মং মন্যতে যো মহীপতিঃ।
বৃদ্ধাঞ্চ কুরুতে বুদ্ধিং স ধর্ম্মেণ বিরাজতে॥
অধর্ম্মদর্শী যো রাজা বলাদেব প্রবর্ত্ততে।
ক্ষিপ্রমেবাপযাতোঽস্মাদুভৌ প্রথমমধ্যমৌ॥
অসৎ পাপিষ্ঠসচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা।
সহৈব পরিবারেণ ক্ষিপ্রমেবাবসীদতি॥
অর্থানামননুষ্ঠাতা কামচারী বিকত্থনঃ।
অপি সর্ব্বাং মহীং লব্ধ্বা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥
অথাদদানঃ কল্যাণমনসূয়ুর্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বর্দ্ধতে মতিমান্ রাজা স্রোতোভিরিব সাগরঃ॥
ন পূর্ণোঽস্মীতি মন্যেত ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
বুদ্ধিতো মিত্রতশ্চাপি সততং বসুধাধিপঃ॥
এতেষ্বেব হি সর্ব্বেষু লোকযাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
এতানি শৃণ্বন্ লভতে যশঃ কীর্ত্তিং শ্রিয়ঃ প্রজাঃ॥
এবং যো ধর্ম্ম-সংরম্ভী ধর্ম্মার্থ-পরিচিন্তকঃ।
অর্থান্ সমীক্ষ্যারভতে ন ধ্রুবং মহদশ্নুতে॥
আদাতা হ্যনভিজ্ঞো দণ্ডেনাবর্ত্তয়ন্ প্রজাঃ।
সাহস-প্রকৃতী রাজা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥
অথ পাপকৃতং বুদ্ধ্যা নচ পশ্যত্যবুদ্ধিমান্।
অকীর্ত্ত্যাভিসমাযুক্তো ভূয়ো নরকমশ্নুতে॥
অথ মানয়িতুর্দাতুঃ শ্লক্ষ্ণস্য বশবর্ত্তিনঃ।
ব্যসনং স্বমিবোৎপন্নং বিজিঘাংসন্তি মানবাঃ॥
যস্য নাস্তি গুরুর্ধর্ম্মে ন চান্যানপি পৃচ্ছতি।
সুখ-তন্ত্রোঽর্থলাভেষু ন চিরং সুখমশ্নুতে॥
গুরুপ্রধানো ধর্ম্মেষু স্বয়মর্থান্ববেক্ষিতা।
ধর্ম্ম-প্রধানো লাভেষু স চিরং সুখমশ্নুতে॥

মহাভারতে শান্তি-পর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি বামদেবগীতাসু।

বামদেব কহিয়াছিলেন, রাজন্! আপনি কেবল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হউন। ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; রাজাগণ এক মাত্র ধর্ম্মে থাকিয়াই এই পৃথিবীকে পরাজয় করিয়া থাকেন। যে মহীপতি অর্থসিদ্ধি অপেক্ষা ধর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া, নিজ বুদ্ধিকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই ধর্ম্ম দ্বারা বিরাজিত হইয়া থাকেন। যে রাজা অধর্ম্মদর্শী হইয়া বলপূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি শীঘ্রই ধর্ম্ম হইতে অপসৃত হয়েন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ—উভয়ই তাঁহা হইতে অপগত হইয়া

থাকে। যাঁহার সচিব সকল অসৎ ও পাপিষ্ঠ এবং যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম-হানি করেন, তিনি শীঘ্রই সপরিবারে অবসন্ন হইয়া লোকের নিকট বধ্য হইয়া থাকেন। যে রাজা অর্থানুষ্ঠান না করেন, কামচারী হন, আত্মশ্লাঘা করেন, তিনি সমুদায় পৃথিবী লাভ করিয়াও শীঘ্র বিনষ্ট হয়েন। যে রাজা কল্যাণ-গ্রাহী, অসূয়া-শূন্য, জিতেন্দ্রিয় ও মতিমান্, তিনি স্রোত দ্বারা প্রবৃদ্ধ সাগরের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়েন। বসুধাধিপতি এই রূপ মনে করিবেন যে, আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বুদ্ধি ও মিত্র কিছুতেই পরিপূর্ণ নহি। এই সকলেই লোকযাত্রা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল শ্রবণ করিলে যশ, কীর্ত্তি, শ্রী ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। যে রাজা ধর্ম্মসংরক্ষী ও ধর্ম্মার্থ-চিন্তক হইয়া এই রূপে অর্থ-দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন, তিনি নিশ্চয় প্রচুর অর্থ ভোগ করিতে পারেন। যে রাজা কৃপণ, স্নেহ-শূন্য, এবং সাহসপ্রকৃতি হইয়া প্রজাগণের প্রতি প্রকৃষ্ট দণ্ড বিধান না করেন, তিনি সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকেন। যে বুদ্ধি-হীন রাজা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকারী পুরুষকে উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তিনি অকীর্ত্তি সমূহে সমাযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ নরক-ভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা দাতা, স্নিগ্ধ, এবং বশবর্ত্তী সকলের সম্মানকারী, তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত হইলে, মানবগণ, আপনার বিপদের ন্যায় তাঁহার সেই বিপদ্ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন। যাঁহার ধর্ম্ম-উপদেশক গুরু নাই এবং যিনি অর্থ-লাভে সুখ-পরতন্ত্র হইয়া অন্য কাহাকেও ধর্ম্ম-বিষয় জিজ্ঞাসা না করেন, তিনি চিরকাল সুখ ভোগ করিতে পারেন না। যাঁহার ধর্ম্ম-উপদেশক প্রধান গুরু আছেন, যিনি স্বয়ং সমুদায় কার্য্য আলোচনা করেন এবং ধর্ম্মানুসারে অর্থ-লাভের চেষ্টা করেন, তিনিই চিরকাল সুখ ভোগ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

জীবন-মরীচিকা।

জীবন-প্রান্তরের শেষ প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ কখনও আনন্দে পূর্ব্ব-জীবনের কথা ভাবিতে পারে নাই। যাত্রা করিবার সময় দূরে যে মনোরম উদ্যান দেখা গিয়াছিল—যেখানে বিকশিত কুসুম, আপনার সুবাস-সম্পদ্ বিস্তার করিয়া হাসি-মুখে বিরাজমান ছিল, আসিবার পথে তাহা দেখা যায় নাই। বস্তুতঃ মানুষের নবযৌবনের অধিকাংশ আশালতায় ফুল ধরেনা। এমন কি, যাহারাই অধিকতর সুন্দর, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে শুকায়। যাঁহারা ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, জীবন মরীচিকা-ময়।

প্রথমতঃ—আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণই আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করে। জগতে যাহা দূর হইতে গোলাকার দেখায়, নিকটে আসিলে তাহা অন্য রূপ ধারণ করে। দূর হইতে যাহা সামান্য বোধ হয়, নিকটে আসিলে তাহা অদ্ভুত বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায়। এখানে সুখদুঃখে কাঁদি

শস্পে সর্প। প্রাচীন কালে নক্ষত্রগুলিকে লোকে বর্ত্তিকা-শ্রেণী মনে করিত। কত সুদৃশ্য ফল কত বিষাদ! অধিক কি, প্রথম দৃষ্টিতে সূর্য্যই গতিশীল ও পৃথিবী নিশ্চলা বলিয়া মনে হয়। জীবনের অভিজ্ঞতাই সকল ধারণা-বিনাশের নামান্তর মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ—আমরা যে স্বাভাবিক আশা গুলি পোষণ করি, তাহাও খুব কম পূর্ণ হয়। জীবনের প্রারম্ভে আশা-উজ্জ্বল হৃদয় মানবের কয়টী আশা ফলবতী হইয়া থাকে! যখন সহস্র কষ্ট সহ্য করিয়া মানব, সুখের জন্য কোন নূতন পথ অবলম্বন করে—রমণী যখন সুখের জন্য পরিণীতা হয়—তখন প্রথম জন জীবনের কত সিদ্ধির স্বপ্ন দেখে, দ্বিতীয় জন প্রকৃত প্রণয়ের মধুর সোনালী স্বপ্নে ভবিষ্যৎ জীবন রঞ্জিত করে, কিন্তু শেষে তাহাদের উভয়েরই এই ধারণা জন্মে যে, বাস্তবিকই জীবন, যাহা ভাবা যায়, তাহা নহে। জীবনের প্রারম্ভের নবযল মানবের মনের ভাবের সহিত, শ্রান্ততনু জীবন-পথের শেষভাগের যাত্রীর মনের ভাবের তুলনা করিয়া দেখিলে, জীবনটা কি অসার ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়!

যাহা মানব, পূর্ব্বে মন্দান্দোলিত কুসুম-রাজি-সুশোভিত, সুচ্ছায় শস্প-কোমল, উৎসশীকর-শীতল উপবন বলিয়া মনে করে, তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে, মানব দেখে যে, যাহারা সেই পূর্ব্বক্ষণ চারুদৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা কেহই বিদ্যমান নাই; শুধু কণ্টকাঘাতে চরণ আহত হইয়াছে। তপন-তপ্ত হইয়া তখন সে অত্যন্ত

হয়। বন্ধুর মৃত্তিকার উপর ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার আর দাঁড়াইবার শক্তি থাকে না।

জীবনের এই মরীচিকার অর্থ কি? সাধারণে বলিবে, জীবন অতি তুচ্ছ পদার্থ। অরুণোদয়ের পূর্ব্বের কুজ্ঝটিকার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, সিন্ধুবক্ষে বিম্ব-বিন্দুবৎ নিতান্তই অসার, কিন্তু বিশ্বাসীর নিকট জীবনের একটা গূঢ় অর্থ আছে। জীবন মরীচিকাময় বলিয়াই মানব আছে। বিশ্ব নয়ন্তার প্রতি বিধিই যে কত অসীম জ্ঞানের পরিচায়ক, তাই ভাবিয়া তিনি বিস্ময়ে আপ্লুত ও ভক্তিতে দ্রবীভূত হন।

এই মরীচিকাই আমাদিগকে জীবনের পথে অগ্রসর করে। যদি কোন মানব দেখে যে, সম্মুখের সারাটা পথ তপ্ত বন্ধুর, তাহা হইলে তাহার আর এক পদ অগ্রসর হইবার ইচ্ছা থাকে কি? কিন্তু কত আশা পোষণ করিয়া আমরা পথ অতিক্রম করি! ভাবি—পথের এ অংশটা খুব কষ্ট-দায়ক বটে, কিন্তু দূরে ঐ স্থানে যেখানে পথটা একটু উঁচু—ঐ যেখানে পথটা একটু ঘুরিয়া গিয়াছে—সেই স্থানে গেলেই আমরা পথের যত মধুর দৃশ্য, যত সুখ, সকলের সম্মুখীন হইব। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তপ্ত হইয়া ক্ষতচরণ মানব, যখন আর চলিতে পারে না, তখন এই আশাই আবার মানবের কর্ণ-কুহরে এক অভয়-মন্ত্র প্রদান করে—আশার সে মৃদু মধুর বাণী তাড়িত-বল-বিধায়িনী।

সমগ্র জীবনই একটী শিক্ষা। পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য মানব তাহাকে শিক্ষার

যে উচ্চ উদ্দেশ্য আছে,—তাহার কথা প্রথমে কিছুই বলেনা, কারণ সে তাহা বুঝিতে পারে না এবং তজ্জন্য ক্লেশ-স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় না—তাহাকে বলিতে হয় পারিতোষিকের কথা, শ্রেণীতে উচ্চ স্থানের কথা—তবেই ত সে সকল কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত হয়।

শিক্ষার এই সব প্রকৃত সিদ্ধি নহে, এবং ইহাদের কাম্যবস্তু মনে করা নীচতা ও অনেক স্থলে অহিতকর। কিন্তু, তবুও ইহার আশায় ছাত্র যে কার্য্য করিয়া যায়, তাহা অজ্ঞাত-সারে তাহার জীবনকে যে কত উচ্চ করিয়া দেয়, তাহা সে জানে না। সেই রূপ জীবনের অগণ্য বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার যে একটা কি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সেটী এই মরীচিকার দ্বারা পূর্ণ হয়। হতাশ হইয়া কি কেহ কখনও জীবনের স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করে? আ'জ যে বিফল-মনোরথ, সে হয়ত কল্পনায় ভবিষ্যতের সিদ্ধির স্বর্ণসৌধ রচনা করিতেছে।

বিফলতার তীব্র বেদনা ভুলাইয়া দেয়, এই জীবন-মরীচিকা। ভবিষ্যৎ-সিদ্ধির আশা, যেন কোমলাঙ্গী করুণাময়ী তরুণীর ন্যায় তাহার স্নেহ-শীতল কর-স্পর্শে বেদনা-কাতর মানবের সকল ক্ষতের জ্বালা জুড়াইয়া দেয়। তাহার মধুর কণ্ঠস্বর, পূর্ব্ব জীবনের যত নৈরাশ্য, সব ভুলাইয়া দেয়। এই রূপে আমরা চলি গৃহ যদি অনেক দূরে হয়, আর অল্পবয়স্ক পুত্র যদি পিতার সঙ্গে থাকে, তখন তিনি যেমন তাহাকে পথশ্রম ভুলাইবার জন্য এক বার পথ-পার্শ্বের ফুলটী তুলিতে বলেন, এক বার প্রজাপতির রঞ্জিত পাখা ধরিতে বলেন, ঘটনাও তদ্রূপ। স্পর্শ মাত্র ফুল ঝরিয়া যায়—প্রজাপতির চিত্র পক্ষের বর্ণ বিনষ্ট হয়, কিন্তু সন্তানের সে সব আশা পূর্ণ না হইলেও পিতার যে প্রধান আশা অর্থাৎ গৃহে পৌঁছান তাহা যেমন পূর্ণ হয়, সেইরূপ জীবনে আমাদের ক্ষুদ্র আশা পূর্ণ না হইলেও, আমাদের পরমপিতার যে অভিলাষ—তাহা এই পথ—অতি-ক্রমণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

জীবনের এই অসিদ্ধিই একভাবে ধরিতে গেলে জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি। যদি জীবনের শেষ এখানে হইত, তাহা হইলে "জীবনের অতৃপ্তি" আমাদিগকে পথ চলিতে সাহায্য করে, এ কথা বলিলেও ভগবানকে বাস্তবিক প্রবঞ্চক বলা হইত; কারণ অতৃপ্তির ফল যাহাই হউক না কেন, অতৃপ্ত রাখা ত প্রবঞ্চনা!

জীবন মরীচিকা বটে, কিন্তু জীবন প্রবঞ্চনা নহে। এখন দেখা যা'ক্ মরীচিকায় ও প্রবঞ্চনায় প্রভেদ কি?

যদি আমরা বৃক্ষকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করি যে, তাহা প্রস্তরের ন্যায় দেখায়, তবে উহা প্রবঞ্চনা, কিন্তু বৃক্ষকে বৃক্ষের ন্যায় চিত্রিত করিলাম, প্রকৃত বৃক্ষ না হইলেও প্রকৃত বৃক্ষ আমাদিগের মনের উপর যাহা কিছু কার্য্য করে, ইহা তাহাই করিল—ইহাই মরীচিকা। ইহা প্রবঞ্চনা করে না, কিন্তু কল্পিতকে বাস্তব রূপে দেখাইয়া আপনার কার্য্য সারিয়া লয়।

শিশুর নিকট ইন্দ্রধনু একটী প্রকৃত

বস্তু। সে হয়ত ইহার স্তরে স্তরে কত অগণ্য মণি-মুক্তার কল্পনা করে! সে মনে করে, দূরের ঐ শৈলশিখর হইতে কে বুঝি রত্ন ছড়াইতে ছড়াইতে গিয়াছে, বা বিমান পথে কোন সুরসুন্দরীর চরণের অলক্তকরাগ মুছিয়া গিয়াছে! যখন সে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে, তখন সে বুঝে যে, ইহা প্রবঞ্চনা।

কিন্তু শিক্ষিতের নিকট ঐ ইন্দ্রধনুই মরীচিকা। তিনি জানেন, ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই, তবুও ইন্দ্রধনু-জীবনের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে তাঁহার হৃদয়েই তাহা অনুভূত হইয়া থাকে! তিনিই সেই অপূর্ব্ববর্ণ-সুষমার কথা স্মরণ করিতে যাইয়া সকল সৌন্দর্য্যের আধার চির-সুন্দর ভগবান্‌কে মনে করেন।

জীবন এই ভাবেই মরীচিকা। যাহার আশা করি, তাহার অস্তিত্ব শুধু কল্পনা-নেত্রেই প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তবু সেই বাঞ্ছিতের আশায় কাজ করি। সে আশা পূর্ণ হয়, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিতের যাহা কিছু মঙ্গলময় ফল, তাহা পাইয়া থাকি। যে বণিক্, সমগ্র জীবন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় ধনশালী হয়, তাহার পক্ষে ধনই কি প্রকৃত সিদ্ধি? বিকলেন্দ্রিয় মরণোন্মুখের ধনের কি প্রয়োজন! দীর্ঘ কালব্যাপী পরিশ্রমের ফল হৃদয়ের যে মহৎ শিক্ষা, সেই তাহার কঠোর জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি। এ স্থানে ধন মরীচিকা মাত্র, কিন্তু কি অপূর্ব্ব কৌশল, এই ধনলাভ করিতে যাইয়া এক পরমধন-লাভ হয়।

সেই রূপ যে যোদ্ধা, আজীবন দেশের কার্য্য করিয়াছে, মৃত্যুর ভৈরব ভ্রূকুটীকে তুচ্ছ করিয়া সমরে বিজয়-লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিয়াছে, জীবনের শেষ ভাগে সে হয়ত বলিতে পারে, "জীবন অতি অসার, এত সাধনা—ইহার বিনিময়ে অর্থ সম্মান কিছুই পাইলাম না," কিন্তু জীবনের যে প্রকৃত সিদ্ধি—তাহা তাহার সেই যোদ্ধৃ-হৃদয়ের বিপুল সাহস ও আত্মোৎসর্গে দেখা দিয়াছে।

সেই রূপ আমরা বলি—সাধুতাই শ্রেষ্ঠ নীতি, কিন্তু জগতে যদি ধনে বা সম্মানে উচ্চ হইতে চাওয়া যায়, তবে সাধুতা, আমাদের খুব কম সাহায্য করে, কিন্তু সাধুর ন্যায় জীবন-যাপন করিবার সামর্থ্য-প্রদানেই সাধুতার শ্রেষ্ঠতা।

আমাদের জীবন প্রবঞ্চনা নহে। বিশ্বাসীর হৃদয় বলিবে—"প্রভু আরও কষ্ট দেও; প্রভু, সে সকল সহ্য করিতে শক্তি দেও।" এখানে প্রতি আশাই পূর্ণ হয়। তুচ্ছ ফানুসের আশায় ধাবিত হইয়া আমরা যে রূপ ভাবে আশাতীত উচ্চ স্থানে উঠি থাকি, তাহা পরমেশ্বরের অসীম করুণার ও জ্ঞানের নিদর্শন।

শ্রীরাখালচন্দ্র সেন

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনুকূলকলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈবহি।
প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ॥ওঁ॥

যে পুরুষের পত্নী বশবর্ত্তিনী, তাহার

ইহলোকেই স্বর্গভোগ হয় এবং যে পুরুষের স্ত্রী অবশ্যা, তাহার ইহলোকেই নরকভোগ হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ৩৯৯

স্বর্গেঽপি দুর্লভং হ্যেতদনুরাগঃ পরস্পরম্।
রক্ত একো বিরক্তোঽন্যস্তস্মাৎ কষ্টতরং নু কিং॥
৪০০

স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ—স্বর্গেও দুর্লভ। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একজন অনুরাগযুক্ত, আর একজন বিরক্তিযুক্ত, ইহা অপেক্ষা কষ্টজনক আর কি আছে? ৪০০

গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্।
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী॥
৪০১

গৃহস্থাশ্রমে বাস করা কেবল সুখের নিমিত্ত, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে পত্নীই সুখের মূল; যে স্ত্রী বিনয়যুক্তা, যে মনোগত ভাব বুঝিতে পারে ও বশবর্ত্তিনী, সেই স্ত্রী যথার্থ পত্নীপদ-বাচ্যা। ৪০১।

দুঃখায়ান্যা সদা খিন্না চিত্তভেদঃ পরস্পরম্।
প্রতিকূলকলত্রস্য দ্বিদারস্য বিশেষতঃ॥ ৪০২

ইহার অন্য স্বভাব হইলে স্ত্রীলোক কেবল দুঃখ ভোগ করে; সর্ব্বদা খেদযুক্ত হয়। পুরুষের স্ত্রী যদি প্রতিকূলাচারিণী হয়, তাহা হইলে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য হইতে থাকে, বিশেষতঃ যদি পুরুষের দুই পত্নী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য সর্ব্বদাই হয়। ৪০২।

যোষিৎ সর্ব্বা জলৌকেব ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি॥
৪০৩।

স্ত্রী সকল জলৌকার তুল্য; অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অন্ন প্রভৃতির দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও সর্ব্বদা পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। ৪০৩

জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী।
ইতরা তু ধনং বিত্তং মাংসং বীর্য্যং বলং সুখম্॥
৪০৪।

জলচরী জলৌকা মনুষ্যের কেবল রক্ত শোষণ করে; কিন্তু স্ত্রী, ধন, মাংস, বীর্য্য, বল, সুখ সমুদায় হরণ করে। ৪০৪

সশঙ্কা বাল-ভাবেতু যৌবনে বিমুখী ভবেৎ।
তৃণবন্মন্যতে পশ্চাদ্ বৃদ্ধভাবে স্বকং পতিম্॥
৪০৫

স্ত্রীলোক বাল্যকালে সশঙ্কিত থাকে, কিন্তু যৌবন কালে পতির প্রতি অনুরাগিণী হয় না অর্থাৎ তদিচ্ছা মত চলে না, পতি বৃদ্ধ হইলে তাঁহাকে তৃণের মত জ্ঞান করে। ৪০৫

অনুকূলা ন বাগ্ দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ॥
৪০৬।

যে স্ত্রী পতির বশীভূত, বাক্য-দোষ-শূন্য, কর্ম্মদক্ষা, সতী, সে পতিব্রতা। এই সকল গুণ যে স্ত্রীলোকের আছে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্মীস্বরূপা ইহাতে সংশয় নাই। ৪০৬

যা হৃষ্ট-মানসা নিত্যং স্থানমান-বিচক্ষণা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা হীতরা জরা॥ ৪০৭

যে স্ত্রী সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তা, গৃহোপকরণ দ্রব্য সমূহের অবস্থান এবং পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞা, সর্ব্বদা পতির প্রীতিকরী সেই স্ত্রী স্ত্রীপদ-বাচ্যা; যাহার এ সমুদায় গুণ নাই, সে কেবল শরীরক্ষয়কারিণী জরা-স্বরূপা। ৪০৭ (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

পণ্ডিতের পরলোকপ্রয়াণ। গত শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিন, যশোহর ভুগীলহাটের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শশধর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয়, বঙ্গদেশের নব্যস্মৃতি-(স্মার্ত্তভাগীশ রঘুনন্দন প্রণীত) শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল স্বগৃহে চতুষ্পাঠী-স্থাপন পূর্ব্বক বহু বিদ্যার্থীকে অন্নদান ও জ্ঞান-দানে তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যশোহর-খুলনার পণ্ডিত-সমাজের সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। নিয়তির উপর বক্তব্য নাই।

বঙ্গবীরের গৌরব। বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক বঙ্গসন্তান গোবর বাবু (শ্রীমান্ যতীন্দ্র চরণ গুহ) ইউরোপের প্রধান প্রধান পালোয়ানগণকে পরাস্ত করিয়া গৌরব লাভ করিয়াছেন। অচিরে শ্রীমান্ আমেরিকায় যাইবেন। এই বঙ্গবীর বিদেশে দুর্ব্বল বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হউন।

বঙ্গকবির সম্মান। বঙ্গের কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবার পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার কবি-প্রতিভার যোগ্য পূজা পাইয়াছেন। এবার তিনি নোবেল পুরস্কার (১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) পাইয়াছেন—এ সংবাদ বাঙ্গালীর কাছে বড় মধুর। কবিবর রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"র ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াই পাশ্চাত্য সাহিত্য-সেবীগণ রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গালী কবি আ'জ ইউরোপের সালি প্রুধোম, থিওডোর মমসেন, বোর্ণষ্টার্ণ বোর্ণসন, ফ্রেডরিক মিষ্ট্রাল, যোসে একেগ্যারে, হেনরিক সিঙ্কিভিচ, গিয়োসুয়ে কার্দুচি, রুডিয়ার্ড কিপলিঙ, মরিস্ মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি প্রথিতনামা পাশ্চাত্য কবির পার্শ্বে সগৌরবে উপবিষ্ট। বঙ্গের গৌরবের নয় কি?

বঙ্গমনীষীর মর্য্যাদা। বঙ্গগৌরব স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় "ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের" "ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট" হইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের অনুপস্থিতে ইনিই ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের কর্ণধার-রূপে আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন। গুপ্ত মহাশয়ের এরূপ উচ্চমর্য্যাদা-লাভ, বাঙ্গালীর স্মরণীয়, সন্দেহ নাই। একবার এই গুপ্ত মহাশয়কেই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোট লাট করিবার কথা হইয়াছিল। "জীবন্ নরো ভদ্রশতানি পশ্যেৎ।"

বিবাহ-বিলাস। পত্রান্তরে প্রকাশ, পাশ্চাত্য-দেশের জর্জ্জ উইজফ নামক এক ব্যক্তি, এক একটী করিয়া এক শত রমণীর পাণি-পীড়ন করিয়াছে। এক সপ্তাহ কালের মধ্যে এই ব্যক্তি নাকি আটটী বিবাহ করিয়াছে। রুশিয়ার এক রমণী নাকি একে একে ৮০টী বরের সহিত উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছে এবং এই কর্ম্মের ফলে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে, অপর এক রমণী নাকি বহু বিবাহ করার অপরাধে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে যাঁহারা ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচলন করিতে চাহেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন।

বিবাহে বিদ্বেষ। পত্রান্তরে দেখা যায়—বিলাতে অবিবাহিতা রমণীর সংখ্যা প্রতিশতে পঞ্চসপ্ততি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই সংখ্যা মাত্র পঞ্চদশ ছিল। হয়ত কোন দিন শুনিতে হইবে—দেশের সকল রমণীরই বিবাহে অরুচি হইয়াছে। দেখা যা'ক।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টারীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২০শ বর্ষ, ২০শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩২০ সাল, ১৮৩৫ শকাব্দাঃ।

ঈশ্বরের মাতৃভাব।

(স্বামী অভেদানন্দের ইংরেজী বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত)

"আমি বিশ্বের পিতা ও মাতা"

গীতা ৯ম অঃ, ১৭ শ্লোক।

"ঈশ্বর-প্রেমিক ব্যক্তি ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া এত সুখ পান কেন? কারণ, সন্তান মায়ের নিকট অধিকতর স্বাধীনভাবে থাকে; কাজে কাজেই, তাঁহার নিকট অন্যাপেক্ষা মাতা অধিকতর প্রিয়।"

—এফ্ মোক্ষমূলার প্রণীত
"রামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ"
১১৮ পৃষ্ঠা।

ঈশ্বরকে জগদম্বারূপে, আমাদিগের জগৎ জননীরূপে, ধারণা ও অর্চনা করা, পাশ্চাত্যদেশীয়গণের নিকট এক নূতন ব্যাপার।* ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকাল হইতে যাবতীয় পুরোহিত ও ধর্ম্মাত্মারা উপদেশ দিয়া আসিতেছেন যে, ঈশ্বরকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পিতা বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশু, ঈশ্বরকে স্বীয় পিতা—স্বরূপে পূজা করিতেন ও ব্রহ্মাণ্ডের পিতা বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। কাজে কাজেই যীশুর মতাবলম্বীরা তাঁহাদের গুরুকৃত সম্পর্কানুসারেই ভগবান্কে ভজনা করিয়া থাকেন। প্রভু-ভৃত্য, কিম্বা সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টজীব সম্বন্ধ অপেক্ষা পিতা—পুত্র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। যতই আমরা ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হই, এবং যতই ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ করি, ততই তাঁহার সহিত আমাদিগের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া আইসে। সেব্য-সেবকের

* আমেরিকার থিওডোর পার্কার, ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রথমে প্রচার করেন।

মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক না করিয়া লইলে, ঈশ্বরার্চ্চনা সুসম্ভব হওয়া কঠিন।

য়িহুদী-ধর্ম্মে ঈশ্বর (জেহোবা) বিশ্বের নির্ম্মাতা, বিধাতা ও শাসনকর্ত্তা রূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন। যেন তিনি একজন পরাক্রান্ত স্বেচ্ছাচারী সম্রাট্। জেহোবার সহিত সমস্ত জীবের যেন রাজা-প্রজা সম্বন্ধ। যেমন, শাসনকর্ত্তা তাঁহার অবাধ্য প্রজাকে শাস্তি দেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি জেহোবাকে কিম্বা তাঁহার বিধিব্যবস্থা অমান্য করে, তাহাকে তিনি শাস্তি দেন। একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে তাহার মনিবের যেরূপ সম্বন্ধ, ইহা কতকটা সেইপ্রকার; কর্ত্তব্যও প্রায় তদ্রূপ। ক্রীতদাস যেরূপ ভয়-প্রযুক্ত মনিবের সেবা করে, য়িহুদীরাও তদ্রূপভাবে জেহোবাকে সেবা করিত। এবম্প্রকার সম্পর্ক হইতে পিতা-পুত্র-সম্পর্ক স্থাপন, বাস্তবিকই একটী মহৎকার্য্য হইয়াছিল। ক্ষমতা ও শক্তির সহিত আর বাহ্যিক সম্বন্ধ রহিল না; কিন্তু পার্থিব পিতা-পুত্রের মত একটা রক্তের সম্বন্ধ বা আন্তরিক আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা স্নেহ-বন্ধন আছে এবং এবম্প্রকার বন্ধন বশতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা ব্রহ্মাণ্ড-পতির সামীপ্য লাভ করিয়া থাকে। পার্থিব পিতা, সন্তানকে উৎপাদন করেন এবং অনস্তিত্ব হইতে তাহাকে অস্তিত্বের রাজ্যে আনেন বলিয়া যেমন তাঁহাকেই সাধারণতঃ সন্তানের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়, তদ্রূপ বিশ্বসৃষ্টি—বিষয়ে ধারণা করিতে যাইয়া অপরিপক্ক মানব-বুদ্ধিতে ইহাই বিবেচিত হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে কিছুই ছিলনা, সৃষ্টিকর্ত্তা এই ব্রহ্মাণ্ড একেবারে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলেন। কাজেকাজেই সৃষ্টিকর্ত্তাই বিশ্বের পিতা-স্বরূপে অনুমিত হইলেন।

আমাদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সকল ধারণাই প্রথমাবস্থায় "সগুণ", পরিশেষে নির্গুণ—অর্থাৎ প্রথমে আমরা ঈশ্বরকে মানব-সুলভ গুণের চরমোৎকর্ষে বিভূষিত বলিয়া ধারণা করি; শেষে গুণাতীত মনে করি। ভগবদ্ধারণার প্রথমে মনে হয় যে, তিনি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র একজন প্রাণী। মনে হয়, পুত্রের জন্মদাতা পিতা যেরূপ পুত্র হইতে পৃথক্, কিম্বা সূত্রধর তাহার নির্ম্মিত চেয়ার্ বা টেবিল্ হইতে যেরূপ পৃথক্, বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাও তদ্রূপ বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে স্বতন্ত্রভাবে বাস করেন। য়িহুদীদিগের জেহোবা সম্বন্ধীয় ধারণা সম্পূর্ণভাবে সগুণ মানবীয় ভাবের। তিনি জগৎ-স্বতন্ত্র প্রাণী; বিশ্বের বহির্ভাগে স্বর্গে তিনি বাস করেন এবং তাঁহার সকল প্রকার মনুষ্য-সুলভ গুণ আছে। প্রথমে কিছুই ছিলনা, তিনিই বিশ্ব-সৃষ্টি করিলেন; বিধি-ব্যবস্থা করিলেন এবং শাসনকর্ত্তা হইয়া বসিলেন। আবার, ঐ জেহোবাই যখন যীশু ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক পিতা বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন, তখনও তাঁহার জগৎস্বতন্ত্র—ভাবের বিলোপ হইল না। আজ পর্য্যন্ত অধিকাংশ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি, ঈশ্বরের এই জগৎ-স্বতন্ত্র ভাবের অতিরিক্ত ধারণা রাখেন না। তাঁহারা সেই জগৎ-পৃথক্ জেহোবাকে পিতা এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পূজা করেন জেহো

পুরুষ। কখনই তাঁহাকে প্রকৃতিরূপে বর্ণনা করা হয় নাই।

য়িহুদীদিগের মতে জগতের পুরুষ-উপাদানগুলিতেই সকল প্রকার কার্য্য-কারিতা, শক্তি ও ক্ষমতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষভাবকে "জনক" বলিয়া স্বীকার করা হইয়া ছিল। প্রকৃতির স্ত্রী-ভাবটীকে নিম্নতর, সামান্য, শক্তিশূন্য এবং গৌণ মনে করা হইয়াছিল। পুরুষভাবটী সৃষ্টি করে, স্ত্রী-ভাবটী সেই সৃষ্টবস্তু ধারণা ও প্রকাশ করে। কাজে কাজেই, স্ত্রীত্বাত্মক প্রত্যেক বস্তুই অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ইহাতেই প্রতীত হইতেছে যে, প্রাচীন ও নূতন টেষ্টামেণ্ট নামক খৃষ্টধর্ম্মপুস্তকের লেখকগণ কর্ত্তৃক, বিশেষতঃ জেন্‌টাইল্‌স্‌ জাতির প্রধান ব্যক্তিদ্বারা স্ত্রীত্ব এতই নীচ বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। জেনেসিস্‌ নামক ধর্ম্ম-বিধান অনুসারে পৃথিবীতে স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় ও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পুরুষের পঞ্জরাস্থির উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মব্যাখ্যা-কালে য়িহুদীরা যদিও সৃষ্টি-কর্ত্তাকে সর্ব্বশক্তিমান্‌ ও পুরুষভাব-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা বলিতে ভুলেন নাই যে, স্ত্রী-উপাদান বলিয়া একটী উপাদান আছে এবং এই উপাদান সৃষ্টিবিষয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার সাহায্যকারক। শ্রীমৎ মোজেজ কৃত জেনেসিস্‌ বিবরণে আমরা দেখি,—"ঈশ্বরের শক্তি জলোপরি বিচরণ করিয়াছিল"। (জেনেসিস্‌ ১ম অঃ। ২) ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা জল অর্থাৎ প্রকৃতির স্ত্রী-উপাদানে গর্ভাধান করিয়াছিলেন। ঈশ্বর অর্থাৎ পুরুষ-উপাদান জগৎ-স্বতন্ত্র, প্রকৃতি-বহির্ভূত এবং সকল প্রকার কার্য্যকারিতা ও শক্তির আধার বলিয়া পূজার্হ হইলেন। স্ত্রী-উপাদান বা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হইল। প্রত্যেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই প্রকৃতির অর্থাৎ স্ত্রী-উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু এই প্রকৃতি কখনও পূজিতা বা সম্মানিতা হন নাই। পিতৃ-ভাবই প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, আর মাতৃভাবটী গৌণ ও শক্তিশূন্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে একেবারেই পরিত্যক্ত হইল। যতদিন ঈশ্বরের অনুভূতি, গৌণ—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও জগৎ-স্বতন্ত্র-ভাবময়ী থাকিবে, ততদিন ঈশ্বরকে মাত্র পিতা বলিয়াই বোধ হইবে। যতই আমরা ঈশ্বরকে প্রকৃতিবাসী, ও প্রকৃতির সহিত জড়িত বলিয়া জানিব, ততই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর আমাদিগের মাতা ও পিতা উভয়ই। যখন আমরা দেখি যে, প্রকৃতি বা স্ত্রী-উপাদান, পুরুষ বা পুং-উপাদানের সহিত অভিন্নরূপে জড়িত, যখন আমরা ধারণা করিতে পারি যে, প্রকৃতি গৌণা এবং শক্তি-শূন্যা নহে, কিন্তু ভাগবতী শক্তি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বর এক সুবিরাট্‌ পূর্ণ বস্তু এবং স্ত্রী-পুরুষ উপাদান, তাঁহারই বিভূতি, তখন আর আমরা প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ মনে করিনা। কিন্তু আমরা প্রকৃতিকে অভিব্যক্ত ভাগবতী শক্তির অংশ বলিয়া স্বীকার করি।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৌড়ও এই দিকে। বিবর্ত্তন-বাদ, শক্তি-সম্বন্ধ, শক্তির

বিকাশ-প্রকাশ প্রভৃতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দৃশ্য এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জগতের শক্তি-বৈচিত্র্য একমাত্র অনাদি অনন্ত শক্তিরই অভিব্যক্তি মাত্র। সেই সনাতনী শক্তি কিরূপ প্রণালীতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রসব করিলেন, বিবর্ত্তন-বাদ কেবল তাহাই ব্যক্ত করিয়া থাকে। প্রাচীন সৃষ্টিমত অর্থাৎ "কিছুই ছিলনা, তারপর অকস্মাৎ একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বরের আদেশ-প্রভাবে সৃষ্টি হইল"—এই মত বিজ্ঞানানুযায়ী নহে। বিজ্ঞানে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, যদি কিছু না থাকে, তবে তাহা হইতে কিছু হইতে পারে না। বিজ্ঞানে বলে, জগৎ সেই শক্তিতে সূক্ষ্মাবস্থায় নিহিত ছিল এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র সূক্ষ্মাবস্থা বিবর্ত্তনপ্রণালী-ক্রমে ব্যক্তাকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সনাতনী শক্তি অচেতনা নহে, কিন্তু চৈতন্যময়ী। জড় জগতেই হউক্, কিম্বা মনোজগতেই হউক্, যেদিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই আমরা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য-চালিত বিধিব্যবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হই। সে পরিচয় জড় এবং যান্ত্রিক শক্তির আকস্মিক বা দৈবসমাবেশ-সম্ভূত নহে। এই বিশ্ব, বিশৃঙ্খলার খিচুড়ী নহে। ইহা একটী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ জগৎ, সর্ব্ববিষয়ে সুব্যবস্থিত অখণ্ড বস্তু। যাহাকে আমরা বিবর্ত্তন বলিয়া থাকি, উহা একটী উদ্দেশ্য-বিহীন পরিবর্ত্তন—শৃঙ্খল নহে। বিবর্ত্তনের প্রত্যেক স্তরে একটী সুশৃঙ্খলা-সংগত লুক্কায়িত উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অতএব, সেই শক্তি চৈতন্যময়ী। আমরা এই সনাতনী, চৈতন্যরূপিণী, অনন্তা জাগতিক শক্তিকে "জগদম্বা" নামে অভিহিত করিতে পারি। তিনি অনন্ত শক্তি ও অনন্ত দৃশ্যের প্রস্রবণ। সংস্কৃত ভাষায়, এই অনন্তশক্তিকেই প্রকৃতি বলে; লাটীন্ ভাষায় ধাতু "প্রক্রয়েত্রিক্স্" অর্থ—বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী শক্তি।

ত্বম্ পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ
ত্বত্তো জাতম্ জগৎ সর্ব্বম্ ত্বম্ জগজ্জননী-
শিবে।

তুমি পরা প্রকৃতি পুরুষোত্তমের ঐশী শক্তি। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুই তোমা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব, তুমি জগজ্জননী। সকল প্রকার নৈসর্গিক শক্তিই এই ঐশীশক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া, ইঁনি সর্ব্বশক্তিমতী নামে অভিহিতা। এই বিশ্ব মধ্যে যেখানেই কোন প্রকার শক্তি বা ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়, বুঝিতে হইবে সেইখানেই এই অনন্ত শক্তি বা ভাগবতী জননীর আবির্ভাব হইয়াছে। সেই শক্তিকে পিতা না বলিয়া "মাতা" বলাই অধিকতর যুক্তি-যুক্ত। কারণ, বিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ঐশীশক্তি, মায়ের মত স্বীয় উদরে দৃশ্যমান জগতের বীজ ধারণ করতঃ উহাকে জীবিত রাখিয়া পুষ্ট করেন, পরে প্রসব করেন এবং প্রসবান্তে রক্ষা করেন। সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা, এই ত্রিমূর্ত্তির তিনিই জননী। তিনি সকল প্রকার ক্রিয়াশীলতার নিদান। তিনিই শক্তি বা কার্য্যানুরাগিণী বৃত্তি। সৃষ্টি-কর্ত্তা যদি সৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন, তবে আর তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। সৃষ্টিকারিণী শক্তি, অনন্তশক্তির একটী স্ফুরণ বলিয়া, হিন্দুরা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে ভগবতী

জগদম্বার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পালনকর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা সম্বন্ধেও ঐরূপ। হিন্দুরা এই অনন্তশক্তিকে জগজ্জননী রূপে বুঝিয়াছেন ও তাঁহাকে ইতিহাসাতীত বৈদিক যুগ হইতে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে য়িহুদীরা ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা যে ক্ষমতাশূন্য গৌণ প্রকৃতিকে অবহেলা এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এই ঐশী শক্তি তাহা নহেন। এই ভাগবতী জননীর পূজা, কেহ প্রকৃতির পূজা বলিয়া ভুল বুঝিবেন না। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদে আছে, জননী পরমেশ্বরী বলিতেছেন, "আমি বিশ্বরাণী, কর্ম্মফল ও সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যদায়িনী। আমি চৈতন্যরূপিণী এবং সর্ব্বজ্ঞানময়ী। আমি অদ্বিতীয়া হইলেও স্বীয় ক্ষমতা প্রভাবে বহুরূপে বিরাজ করি। মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য আমি যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটাই। শত্রুবিনাশ করিয়া পৃথিবীতে শান্তি-সংস্থাপন করি। আমি আকাশ ও পৃথিবী বিস্তার করিয়াছি। আমি পিতার ও জন্মহেতু। বাতাস যেরূপ নিজেই প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ আমি স্বীয় ক্ষমতায় সমুদয় জাগতিক দৃশ্যের অভিনয় করি। আমি স্বাধীনা, কাহারও অপেক্ষা করি না। আমি আকাশ ও পৃথিবীর অতীতা। পরিদৃশ্যমান জগত আমার ঐশ্বর্য্য। স্বীয় ক্ষমতায় আমি এইরূপ।* এইরূপে ভাগবতী জননীকে "সর্ব্বেসর্ব্বা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই ভাগবতী জননীর ক্রোড়েই আমরা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করিতেছি। সেই অনাদি-অনন্তা শক্তির আবির্ভাব ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে এমন কে আছে? আমাদিগের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক কার্য্যশীলতা, তাঁহার উপর নির্ভর করে। যাহা তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। তিনি স্বাধীনা। তাঁহা হইতে কেহই গরিষ্ঠা নাই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা-কিছু ঘটিতেছে, তিনি সেই ঘটন-পটীয়সী। তাঁহার ইচ্ছায় কেহ সাত্ত্বিক, ধার্ম্মিক এবং দেব-ভাবসম্পন্ন, আবার কেহ বা অসৎ ও পাপ-পরায়ণ। তাঁহারই প্রভাব বশতঃ পুণ্যকার্য্য ও পাপকার্য্য করিতেছি। কিন্তু তিনি সদসতের ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীতা। তাঁহার শক্তিনিচয় সৎ ও নহে, অসৎ নহে। কিন্তু যখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি ও পরস্পরের তুলনা করি, তখনই ঐ শক্তিগুলি আমাদের নিকট ভাল মন্দ বলিয়া বোধ হয়। যখন সেই সর্ব্বব্যাপিনী ঐশী শক্তির আবির্ভাব হয়, তখন দুইটী বিপরীত ভাবের পরিস্ফুরণ দৃষ্ট হয়। একটি ভাব ঈশ্বরমুখী; ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় "বিদ্যা" কহে। অপরটী বিষয়মুখী; ইহাকে অবিদ্যা কহে। একটী মুক্তি ও সুখের নিকট লইয়া যায়, অপরটী বন্ধন ও দুঃখের নিকট আনয়ন করে। একটী জ্ঞান, অপরটী অজ্ঞান। একটী আলোক, অপরটী অন্ধকার। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মিক কেন্দ্রে এই বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত ভাব, নিয়ত কার্য্য করিতেছে ও পরস্পর বিরোধ করিতেছে। যখন বিদ্যা বা ঈশ্বর-মুখী শক্তি জয়লাভ করিতেছে, তখন আমরা ঈশ্বর-পরায়ণ, অধ্যাত্মভাবসম্পন্ন ও নিঃস্বার্থ হইতেছি। কিন্তু যখন অবিদ্যা-শক্তি বলবতী হইতেছে, তখন

* ঋগ্বেদ ১০, শ্লোক ১২৫।

আমরা বিষয়াসক্ত, স্বার্থপর ও অহিতাচারী হইতেছি। একটী শক্তি বলবতী হইলেই অপরটীর হীনতা হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়েই এই শক্তিনিচয় অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে উহাদের প্রভাবের তারতম্য আছে। স্ত্রী হউন, পুরুষই হউন, যাঁহার হৃদয়ে পূর্বটি (ঈশ্বর-মুখী শক্তি) বলবতী, তিনি ভক্তি উপাসনা ও ধর্ম্মকার্য্যে সতত ব্যস্ত থাকেন। বস্তুতঃ এই গুণগুলি আমাদের হৃদয়ের বিদ্যাশক্তির স্ফুরণ। এই উচ্চতর শক্তিগুলি সকলের হৃদয়েই নিহিত আছে। এমন কি, যাহারা উহাদের পরিচয় দেয় না, তাহাদের হৃদয়েও আছে। সকল ব্যক্তিই ধ্যান-ধারণা, উপাসনা, ধর্ম্মকার্য্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ ভাবের অনুশীলন দ্বারা ঐ সকল নিদ্রিত গুণগুলিকে জাগরিত করিতে পারেন। বিদ্যাশক্তির অর্চ্চনাই এই সকল গুণ-লাভের সহজ উপায়। বিদ্যাশক্তিই ভাগবতী জননী বা ঐশী শক্তির সেই মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তিতে আধ্যাত্মিক ভাবের চরমোৎকর্ষ লাভের অনুকূল শক্তি বিরাজমানা। পূজা বা ধ্যান বলিলে আমরা সেই মূর্ত্তির সার্ব্বক্ষণিক স্মরণ বুঝিয়া থাকি। যে সকল উচ্চতর গুণে একজন অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিয়া থাকেন, সেই সকল গুণের এবং যাবতীয় আধ্যাত্মিক ভাবের প্রস্রবণকে নিরন্তর চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই ঐ সকল শক্তিগুলি আমাদিগের অন্তরে জাগরিত হইবে এবং আমরা আধ্যাত্মিক ধার্ম্মিক ও নিঃস্বার্থ হইয়া উঠিব। এতন্নিমিত্তই হিন্দুরা এই বিদ্যা-শক্তির পূজা করিয়া থাকেন। এই মূর্ত্তির পূজা করেন বলিয়া, তাঁহারা বিষয়মুখী বিপরীত মূর্ত্তিকে অস্বীকার বা অবহেলা করেন না। কিন্তু উহাকে বিদ্যা-মূর্ত্তির আজ্ঞাধীনা করিয়া রাখেন। কখন কখন তাঁহারা এই সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লইয়া তাহাদের রূপ কল্পনা করতঃ ঐশী জননীর সঙ্গিনী বলিয়া বর্ণনা করেন। ঐশী জননীর বিস্তর সহকারিণী আছে। প্রকৃতির যাবতীয় অনিষ্টকারিণী শক্তিই তাঁহার সঙ্গিনী-দলভুক্তা। চতুর্দ্দিক গাঢ় কৃষ্ণকায় মেঘ-পটলে সমাবৃত হইলে সূর্য্যের যেরূপ মহিমা প্রকাশ পায়, তিনিও সেই রূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে দণ্ডায়মানা থাকিয়া স্বীয় মহিমায় উদ্ভাসিতা।

যেখানেই অমানুষিক ধর্ম্মভাবের বা আধ্যাত্মিক ভাবের পরিস্ফুরণ দেখা যায়, সেখানেই ঐশী জননীর বিশেষ অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে, সেখানেই তিনি অবতীর্ণা। শান্তি এবং ধর্ম্মরাজ্য—সংস্থাপনার্থ ঐশী-জননী কখন পুরুষ দেহে, কখন বা নারী-দেহে অবতীর্ণা হন। যাবতীয় স্ত্রী পুরুষ তাঁহার সন্তান। কিন্তু স্ত্রীতে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। স্ত্রীই পৃথিবীতে মাতৃরূপিণী বলিয়া বিবাহিতা অবিবাহিতা যাবতীয় স্ত্রীই সর্ব্ব-শক্তিমতী জগদম্বা ভগবতীর শক্তিনিধি-স্বরূপা। এই কারণেই হিন্দুরা স্ত্রী জাতিকে এত উচ্চ সম্মান এবং ভক্তি প্রদান করেন। ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীতে আর এমন একটী দেশও নাই, যেখানে পরম পুরুষ পরমেশ্বর মাতার আসন হইতে বিশ্বের ঐশী জননীস্বরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। মাত্র ভারতবর্ষেই পার্থিব জননীকে

মূর্ত্তিমতী দেবীস্বরূপা জ্ঞান করা হয়। মাত্র এই দেশেই এক ব্যক্তি বাল্যকালেই শিক্ষা করে যে, সহস্র পিতা অপেক্ষা এক মাতা গরীয়সী। স্যর্ মণিয়র্ উইলিয়ম্ বলেন "ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কুত্রাপি জননীকে সন্তানের নিকট দেবীস্বরূপা জ্ঞান করা হয় না। প্রত্যেক স্ত্রীই ঐশী জননীর প্রতিনিধি স্বরূপা এই কথাটী হিন্দুরা যে কি ভাবে বলেন, তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা পাশ্চাত্যদিগের পক্ষে অতীব কঠিন। হিন্দুরা স্ত্রীজাতিকে যে কতদূর সম্মান করেন, একটী সামান্য উদাহরণেই তাহার একটী ধারণা হইবে। যখন দুইটী নাম একত্র ব্যবহৃত হয়, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম এই যে, অধিকতর মাননীয়ের নামটী প্রথমে উচ্চারণ করিতে হইবে। সংস্কৃতে আমরা বলি—"স্ত্রী পুরুষ" "পুরুষ স্ত্রী" নহে। স্বামী স্ত্রীর পরিবর্ত্তে আমরা বলি "স্ত্রী ও স্বামী।" কারণ পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীই সর্ব্বদা অধিকতর মাননীয়া। ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতি স্বস্ব স্বামীর নাম গ্রহণ করেন না। পাশ্চাত্য দেশের প্রথানুসারে তাঁহারা স্বস্ব নামের অস্তিত্ব, স্বামীর নামের সহিত মিশাইয়া ফেলেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা স্বস্ব নাম পৃথক্ রাখেন। যদি স্ত্রীর নাম "রাধা" হয়, ও স্বামীর নাম "কৃষ্ণ" হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের উভয়ের নাম একত্র উল্লেখ করিবার সময় "রাধা-কৃষ্ণ" বলিতে হইবে। "কৃষ্ণ-রাধা" কখন বলিতে হইবে না। স্ত্রীর নাম অগ্রে প্রথমে বলিতে হইবে। সেই রূপ, আমরা বলিয়া থাকি "সীতা-রাম" সীতা—স্ত্রী, রাম—স্বামী। আবার যখন ঈশ্বর, দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন—যেমন কৃষ্ণ বা রামাদি অবতারে হইয়াছিলেন—তখন সেই সেই অবতারের স্ত্রী, মাতৃ-অবতার স্বরূপে পূজিতা হন। হিন্দুরা স্ত্রী জাতিকে যে আশ্চর্য্য ভক্তি প্রদান করেন, একজন পাশ্চাত্যদেশবাসী তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন না। সংস্কৃতে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে, সেই মূর্ত্তিমান্ পরমেশ্বরই ঐশী জননী। ব্রহ্ম বা বিশ্বব্যাপিণী শক্তি নিরাকার পুরুষ। ব্রহ্ম—নিরাকার, অনভিধেয়, গুণাতীত। তিনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দের মহাসমুদ্র। তিনি নিষ্ক্রিয়। তিনি মহাত্মা ফিচের—"ঐশ্বরিক প্রকৃতি" ও মহাত্মা স্পিনোজার—"সগুণ মূল পদার্থ" তিনিই যাবতীয় দৃশ্যের প্রেরক। জাগতিক অভিব্যক্তির পূর্ব্বে ঐশীশক্তি পরমপুরুষরূপ মহাসমুদ্রের বক্ষে সুপ্তাকারে নিহিত ছিলেন। যেমন আমাদিগের সুষুপ্তি-সময়ে সকল প্রকার ক্রিয়াশীলতা অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে, ঐশীশক্তির লীলা পটুতাও কিয়ৎ পরিমাণে ঐরূপ ভাবে নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। গাঢ় নিদ্রাবস্থায় যেমন আমাদিগের মানসিক ও শারীরিক শক্তিনিচয় বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু অব্যক্তাবস্থায় আমাদিগের মধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ জাগতিক বিবর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লীলাশক্তিনিচয় সেই মহাশক্তিতে নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। তখন শক্তির দৃশ্যমান কোন প্রকার অভ্যুদয় ঘটে নাই। আবার, যেমন জাগ্রদবস্থায় আমাদিগের নিদ্রিতাবস্থায়

বিকাশ হয় এবং আমরা শ্রবণ করিতে নড়িতে চড়িতে, কথা কহিতে সক্ষম হই, ও কর্ম্মকুশল হই, তদ্রূপ যখন সেই নিরাকার পুরুষের কতকাংশ, যেন জাগরিত হইয়া নিদ্রিতা মহাশক্তির অপবুদ্ধ জাগতিক বৃত্তিকে লীলাময়ী করে, তখন বিশ্বব্যাপিণী মহাশক্তির বিবর্ত্তনারম্ভ হয় এবং নিরাকার পুরুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা, বলিয়া বোধ হয়। তখন সেই লীলাময়ী শক্তির সঙ্গ নিরাকার পুরুষকে সাকার বলা হয়।

হিন্দুদিগের মতানুসারে সেই নিরাকার ব্রহ্ম—না-পুরুষ, না-স্ত্রী। কিন্তু সাকার ঈশ্বর, একাধারে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই। সাকার ঈশ্বরে শক্তি ও পুরুষ অভিন্নভাবে অবস্থিত। খাঁটী পুরুষ শক্তি-সাহায্য ব্যতীত কোন দৃশ্যের সংঘটন করিতে পারেন না এবং শক্তির যাবতীয় কার্য্যাকুশলতা আছে ও শক্তিই জাগতিক ব্যাপারের এবং লীলার প্রসূতি বলিয়া, সাকার ঈশ্বরকে অতীব যুক্তি-সংগতভাবে ব্রহ্মাণ্ডের জননী নামে অভিহিত করা হয়। যেমন অগ্নি ও উহার দাহিকা-শক্তি কিম্বা উত্তাপ অভিন্ন, তদ্রূপ পুরুষ ও শক্তি অভিন্ন। যাঁহারা ঈশ্বরের পুরুষ-ভাবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ সেই ভাগবতী জননীর প্রসূত পুরুষ-শিশুকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কারণ যে কার্য্যকারিণী শক্তির বলে পুরুষ "পুরুষ" হয়, সে শক্তি সেই ভাগবতী শক্তিরই বিভূতি। কিন্তু যাঁহারা ঐশী জননীকে পূজা করেন, তাঁহাদিগের পূর্ণ ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করা হয়; বিশ্বে যত দেব-দেবী, যত দেবদূত, যত দেব-আত্মা আছেন, তাঁহাদের সকলকেই পূজা করা হয়। ঈশ্বরের মাতৃরূপ-ধারণার আশ্চর্য্য ফল, প্রায় প্রত্যেক হিন্দু-স্ত্রী পুরুষের দৈনিক জীবনেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একজন হিন্দু-রমণী মনে করেন যে, তিনি ঐশী জননীর অংশ। শুধু তাহাই নহে, নিজেকেই তাঁহার সহিত অভিন্না বোধ করেন। তিনি পৃথিবীর যাব-তীয় স্ত্রীপুরুষকেই নিজের সন্তান মনে করেন। এমন একজন স্ত্রী কোন ব্যক্তির উপর কি নির্দ্দয় হইতে পারেন? তাঁহার নির্ম্মল মাতৃস্নেহ, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সক-লের প্রতিই প্রবাহিত হইয়া থাকে। এরূপ হৃদয়ে কোন প্রকার কলুষিত চিন্তা বা ভাব বা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য স্থান পায় না। সেই সম্পূর্ণ মাতৃভাববিহ্বলা হইয়া তিনি পৃথি-বীতে পরিশেষে ঐশী জননীর মত বাস করিতে থাকেন। মানবাকার ব্যক্ত জগদী-শ্বরই তাঁহার কল্পিত আদর্শ পুত্র। তিনি ঈশ্বরের অবতারকে নিজের প্রিয়তম সন্তান-স্থানে অর্চ্চনা করেন। মেরী যেরূপ যীশুর জননী ছিলেন, ঠিক তদ্রূপ ভারতীয় হিন্দুরম-ণীরা আপনাদিগকে ঈশ্বরাবতার কৃষ্ণ কিম্বা রামচন্দ্রের জননী বলিয়া সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী জননীরা বোধ-হয়, কিয়ৎ পরিমাণে এতদ্ভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। যদি একজন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিনী জননী, নিজেকে যীশুর মাতা মনে করিতে পারেন এবং তাঁহাকে স্বীয় পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে পারেন, তাহা হইলে আশ্চর্য্য ফল ফলিবে। এরূপ হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে

ঐশী জননীত্ব বস্তুটা কি? যে প্রেম-প্রভাবে নিঃস্বার্থ এবং দেব-ভাব-সম্পন্ন হওয়া যায়, সেই প্রেমলাভ করিতে হইলে স্ত্রীজাতির পক্ষে হিন্দুদিগের মতে ইহাই অতীব সহজ ও সঙ্গত উপায়। সন্তানের জন্য মাতা, সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন। মাতা স্বভাবতই প্রত্যুপকারের আশা না করিয়াই সন্তানকে ভালবাসেন। যদিও এমন মাতা আছেন, যাঁহার হৃদয়ে নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহ বিরাজ করে না, তথাপি যিনি খাঁটী মাতা, তিনি সন্তানের প্রতি অকপটে স্নেহ প্রকাশ করেন। যদি এই সন্তান আবার ঈশ্বরের অবতার হন, তাহা হইলে মায়ের পক্ষে ধর্ম্মের উচ্চতম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কতই সহজ! ঈশ্বরকে এইরূপে বিশ্বজননীরূপে ধারণা করিবার আর একটী আশ্চর্য্য ফল এই যে, যখন এক ব্যক্তি ঈশ্বরকে মাতৃভাবে অর্চ্চনা করেন, তখন নিজেকে মাতৃক্রোড়স্থ শিশু বলিয়া বোধ করেন। সন্তান, মায়ের নিকট থাকিলে, যেমন সে কাহাকেও ভয় করে না, সেইরূপ যিনি ঐশী জননীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি তাঁহার মমতাময়ী জননীকে সর্ব্বত্র দেখিতে পান। প্রত্যেক স্ত্রীতেই তিনি তাঁহার সনাতনী জননীর বিকাশ দেখিতে পান। কাজেকাজেই পৃথিবীর প্রত্যেক রমণীই তাঁহার মাতা। তিনি কাম ও সমুদয় ইন্দ্রিয়-লালসাকেই জয় করেন। তিনি নারী-জাতিকে স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তিনি মনে মনে প্রত্যেক রমণীকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আমি এক মহাত্মাকে দেখিয়াছি, তিনি ঐশী জননীর জীবিত সন্তানবৎ এই পৃথিবীতে ছিলেন। ঐশী জননী সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তিনি ঈশ্বরকে বিশ্ব-জননী রূপে পূজা করিতেন। ঐ প্রকার সাধনায় তিনি নির্ম্মল, ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতেন,—"হে জননী, তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা, তুমিই আবার পথ-প্রদর্শিকা, আমার পরিচালিকা ও আমার মূল শক্তি"। তাঁহার ভাগবতী জননী, তাঁহাকে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃত স্বভাব দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা সকল স্ত্রীকেই প্রণাম করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বলিতেন,—"আপনারাই পৃথিবীতে আমার ঐশী জননীর সজীব প্রতিনিধি স্বরূপিণী"। যে সন্তান, একজন নারীকে স্বীয় জননীর তুল্য মনে করে, তাহার সহিত সেই সন্তানের অন্যরূপ সম্পর্ক কি হইতে পারে? এবম্প্রকার সাধনা-বলে তিনি যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি ও বিষয়াসক্তি জয় করিয়াছিলেন। ঐশী জননীর জন্য তাঁহার এই শিশু-সরল, ঐকান্তিক আবেগময় আত্মোৎসর্গ, ভারতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে একটি জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। পবিত্রতা, আত্ম-সংযম, ভাগবতী জননীর প্রতি আত্মোৎসর্গ ও পুত্রোচিত ভক্তি এই কয়টি গুণ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমগ্র জীবনে দেদীপ্যমান ছিল। ঈশ্বরকে জগজ্জননীরূপে অর্চ্চনা করিলে যে কিরূপ সুফল ফলে এবং এরূপভাবে অর্চ্চনা করাই যে কর্ত্তব্য, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঐ মহাত্মার জীবনে পরিলক্ষিত হয়। যখন তিনি ঐশী জননীর স্তোত্র গান করিতেন, তখন

যে কথাগুলি তিনি উচ্চারণ করিতেন, তাহার প্রত্যেকটী যেন শক্তির প্রস্রবণ বলিয়া বোধ হইত। যিনি এই স্তোত্র-পাঠ শ্রবণ করিতেন, তিনিই গাঢ় ভক্তিতে প্রেমাশ্রু মোচন না করিয়া থাকিতে পারিনা। তখন প্রত্যেকেরই বোধ হইত যে, এই আশ্চর্য্য সন্তান যেন ইহাঁর ঐশী জননীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার ঐশী জননী, তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন যে, প্রত্যেক স্ত্রীই তাঁহার অবতার স্বরূপা। সে কারণে তিনি সমুদয় স্ত্রীকেই মাতৃজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করিতেন। পাশ্চত্যদেশবাসী কোন কোন লোক এবম্প্রকার ভক্তির কথায় উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু একজন হিন্দু ইহাতে অত্যন্ত গৌরব মনে করেন। কিরূপ ভাবে রমণীকে ভক্তি করিতে হয়, তাহা হিন্দুই জানেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলার এই মহাত্মার বিস্ময়কর জীবন দেখিয়া অতীব মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জীবন ও কথা প্রচার করিয়াছেন। (এফ্ মোক্ষমুলারের—রামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ দেখ) তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—"যদি আমরা আপনার ঐশী জননীর সন্তান, তবে তিনি আমাদিগের তত্ত্বাবধান করেন না কেন? তিনি আমাদিগের নিকটে আসিয়া আমাদিগকে কোলে লন না কেন"? মহাত্মা উত্তর করিলেন,—"একটী মায়ের অনেকগুলি সন্তান আছে। সন্তানদের ইচ্ছানুসারে তিনি কাহাকেও একটী পুতুল দিয়াছেন, কাহাকেও বা একটী সংগীতযন্ত্র দিয়াছেন। এইরূপে যখন তাহারা খেলা করে ও খেলায় নিবিষ্টচিত্ত হয়, তখন তাহারা মাকে ভুলিয়া যায়। মা-ও ইত্যবসরে ঘরকন্নার কার্য্যে মন দেন। কিন্তু যেই কোন ছেলে খেলায় বিরক্ত হইয়া, খেল্‌নাটী দূরে ফেলিয়া "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, অমনি মা দৌড়িয়া তাহার কাছে আইসেন, তাহাকে কোলে লন এবং পুনঃ পুনঃ তাহাকে চুম্বন করেন ও সোহাগ করেন। তদ্রূপ, সংসারের খেল্‌না লইয়া তুমি নিবিষ্টচিত্ত আছ, এবং তোমার ঐশী জননীকে ভুলিয়া আছ। যখন তুমি খেলায় বিরক্ত হইয়া, খেল্‌নাগুলি দূরে ত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য অকপটভাবে ও শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে কাঁদিবে, তখন তিনি আসিয়া তোমাকে কোলে লইবেন। এখন তুমি খেলিতে চাহিতেছ এবং তিনিও তোমাকে এখনকার আবশ্যকীয় দ্রব্য সমস্তই দিয়াছেন"।

মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকেই শীঘ্র হউক্ বা বিলম্বে হউক্ ঐশী জননীকে দেখিতে পাইবেন। আমরা অনুভব করিতে পারি বা না পারি, সেই জননী আমাদিগের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। সত্যই জননী পরমেশ্বরী! তুমি অনাদ্যা-অনন্তা মহাশক্তি, অনন্তব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিণী, অনন্ত আকারে, অনন্ত নামে, অনন্ত প্রকারে তোমার শক্তি প্রকট হইতেছে। মোহমুগ্ধ হইয়া আমরা তোমাকে ভুলিয়া আছি ও সংসারের খেল্‌না লইয়া আমোদানুভব করিতেছি, কিন্তু যখন আমরা তোমার কাছে যাইয়া তোমার শরণ লই ও তোমার অর্চনা করি, তখন তুমি আমাদিগের

মোহান্ধকার ও সংসার-মায়া ঘুচাইয়া দাও এবং আমাদিগকে স্বীয় সন্তান বলিয়া বক্ষে ধারণ করতঃ অক্ষয়সুখে সুখী কর ।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ।

ন্যায়দর্শন ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক ।

সূত্র । প্রমাণ-তর্ক-সাধনো-পালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়-বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ । ১।৪২

ব্যাখ্যা । "প্রমাণ-তর্ক সাধনোপালম্ভঃ" (প্রমাণতর্কাভ্যাং তদ্রূপেণ জ্ঞাতাভ্যাং "সাধনোপালম্ভৌ স্বপক্ষ-সমর্থন-পরপক্ষ দূষণে যত্র তাদৃশঃ) । "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" (প্রতি-জ্ঞাদিভিঃ পঞ্চভিরবয়বৈর্যুক্তঃ) "সিদ্ধান্তা-বিরুদ্ধঃ" (অপসিদ্ধান্তশূন্যঃ) "পক্ষ প্রতি-পক্ষপরিগ্রহঃ" (পক্ষ প্রতিপক্ষৌ বিপ্রতি-পত্তিকোটী তয়োঃপরিগ্রহঃ তৎসাধনোদ্দেশ্য-কোক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ বচনসন্দর্ভঃ) "বাদঃ" (বাদনামকঃ কথাবিশেষঃ) ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ । প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কের দ্বারা যাহাতে স্বপক্ষসমর্থন ও পর-পক্ষখণ্ডন করা হয় এবং যাহাতে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী অবয়বের প্রয়োগ আছে, যাহাতে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ "কিছু বলা হয় না, এইরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের অর্থাৎ বিবাদ-গ্রস্ত দুইটী পদার্থের পরিগ্রহকে অর্থাৎ ঐ দুইটী পদার্থসাধনোদ্দেশ্যক উক্তিপ্রত্যুক্তি-রূপ বাক্যপরম্পরাকে "বাদ" বলে ।

টীকা । ন্যায়দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে, এখন দ্বিতীয় আহ্নি-কের আরম্ভ হইবে । সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচ-স্পতি মিশ্র "ন্যায়সূচী নিবন্ধ" গ্রন্থে ন্যায়-দর্শনের সূত্রসংখ্যা ৫২৮ প্রদর্শন করিয়া-ছেন । মহর্ষি গোতম, পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া ঐ সূত্র গুলি বলিয়াছেন । প্রত্যেক অধ্যায় দুই আহ্নিকে বিভক্ত । আহ্নিক শব্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, মহর্ষি ১০ দিনে এই ন্যায়দর্শন রচনা করি-য়াছেন । প্রথমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত অব-য়ব তর্ক, নির্ণয়, এই ৯টী পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় আহ্নিকে বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ও ছলের সবিশেষ নিরূ-পণ এবং জাতি, ও নিগ্রহস্থানের সামান্য নিরূপণ করিয়াছেন । তাহার মধ্যে বাদ, জল্প, ও বিতণ্ডাকে "কথা" বলে । তত্ত্বনির্ণয় অথবা অপরকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তদ্‌যোগ্য ন্যায়ানুগত বচনপরম্পরার নাম কথা । লৌকিক বিবাদ, ন্যায়ানুগত নহে, তাই উহা "কথা" নহে; এবং যেখানে এক জন স্বপক্ষ সমর্থন করিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ তাহা বুঝিতেও পারিলেন না, সেখানে ঐ এক পক্ষের বাক্য গুলি "কথা" নহে । কারণ উহা তত্ত্বনির্ণয় অথবা পরাজয়-সাধনে যোগ্য হয় নাই । যাহারা তত্ত্বনির্ণয় অথবা বিজয়ের অভিলাষী, সর্ব্বজন-সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করে না, শ্রবণাদি-পটু, কথার উপযুক্ত ব্যাপারে অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রভৃতি কার্য্যে সমর্থ,

অথচ কলহকারী নহে, তাহারাই এই "কথা"র অধিকারী।

কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রথম "বাদ"। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সেই বাদের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে যে দুইটী পদার্থ লইয়া বিবাদ, সেই দুইটী পদার্থ। যেমন একজন বলিলেন "আত্মা নিত্য," অপর জন বলিলেন "আত্মা অনিত্য," আত্মাতে এই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। একজন এই নিত্যত্ব সাধন করিবেন, অপর-পক্ষ অনিত্যত্ব সাধন করিবেন। সুতরাং ঐ পক্ষ প্রতিপক্ষ সাধনের উদ্দেশে অনেক উক্তি ও প্রত্যুক্তি হইবে, উহারই নাম পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ। কেবল পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহকে "বাদ" বলিলে বক্ষ্যমাণ "জল্প" কথাও বাদ হইয়া পড়ে, তাই বলিয়াছেন "প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ"। যাহা প্রমাণ নহে এবং তর্ক নহে, কিন্তু প্রমাণ ও তর্কের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাকে প্রমাণাভাস ও তর্কাভাস বলে। "জল্প" কথাতে বাদি-নিরাসের জন্য অনেক সময়ে ঐ প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসের দ্বারাও স্বপক্ষ সাধনাদি হইয়া থাকে। কোন জল্প-বিচারে প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কের দ্বারা স্বপক্ষ-সাধনাদি হইলেও তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসের দ্বারা স্বপক্ষ-সাধনাদির যোগ্যতা আছে। কারণ, বিজিগীষাবশতঃই জল্প বিচারের প্রবৃত্তি। যে কোন রূপে স্বপক্ষ সাধনাদি করিয়া জয়-লাভ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং জল্প মাত্রই প্রমাণাভাসাদির দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন ও পরপক্ষ-খণ্ডনের যোগ্য। বাদ তাহা নহে। কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের জন্যই বাদ-বিচারের প্রবৃত্তি। তাহাতে বিজিগীষা নাই। সুতরাং প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কের দ্বারাই তাহাতে স্বপক্ষসাধনাদি করিতে হইবে। তাই বলিয়াছেন "প্রমাণতর্ক সাধনোপালম্ভঃ" উহার ফলিতার্থ এই যে, যাহা প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসের দ্বারা স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষ-খণ্ডনের যোগ্য নহে। তাহা হইলে ঐ কথার দ্বারা জল্প মাত্রই বাদ হইতে পারিল না।

যাহার দ্বারা বিচারকারীর বিপরীত জ্ঞান অথবা প্রকৃত বিষয়ে অজ্ঞান প্রকাশ পায় তাহাকে "নিগ্রহস্থান" বলে। এই নিগ্রহ-স্থান ২২ প্রকার। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ মহর্ষি পঞ্চমাধ্যায়ে বলিয়াছেন। জল্প ও বিত-ণ্ডাতে সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায়। কিন্তু বাদ বিচারে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করা যায় না। গুরু প্রভৃতির সহিত এক মাত্র তত্ত্ব-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাদ-বিচার হয়, সুতরাং একপক্ষ অপর পক্ষের ন্যূনতাদি দোষ ধর্ত্তব্য মনে করেন না। তবে যে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়েরই বাধা হয়, সে গুলির উদ্ভাবন তাহাতেও করিতে হইবে যেমন—অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস। বাদে কোন পক্ষ ভ্রমবশতঃ অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে এবং ভ্রম বশতঃ কোন দুষ্ট হেতুর দ্বারা স্বপক্ষসমর্থন বা পরপক্ষ-খণ্ডন করিলে, অপর পক্ষ তাহা ধরিবেন, কারণ উহা না ধরিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়েরই ব্যাঘাত হইয়া যায়। সূত্রকার বাদ-বিচারে এই নিগ্রহস্থানবিশেষ-নিয়মের জন্যই "পঞ্চা-বয়বোপপন্নঃ" এবং "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ" এই

দুইটী বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন। "অপসিদ্ধান্ত" প্রকাশ করিলে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হয় না সুতরাং উহার দ্বারা বাদে "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই সূচিত হইতেছে। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন, ঐ কথার দ্বারা হেত্বাভাসের উদ্ভাবন অবশ্য কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে বাদ-বিচারে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব নিয়ত প্রয়োজন নহে। অনেক স্থলে বাদে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ আছে, এই অভিপ্রায়েই "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" এই কথা বলা হইয়াছে। ফলতঃ হেত্বাভাস এবং অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থানই বাদে উদ্ভাবনীয়। কারণ, বাদ তত্ত্বনির্ণীষুর কথা তাহাতে জিগীষার গন্ধও থাকিবে না এই কথাই পূর্ব্বোক্ত অতিরিক্ত দুইটী বিশেষণের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

উদ্বৃত্ত গ্রন্থ সমধিক ফলের প্রকাশক হইয়া থাকে। যাহারা তত্ত্ববুভুৎসু এবং প্রকৃত কথা বলে, প্রতিভাশালী, যুক্তিসিদ্ধ পদার্থ স্বীকার করে, অথচ প্রতারক নহে এবং প্রতিপক্ষকে তিরস্কার করে না, তাহারাই এই বাদ কথায় অধিকারী। জল্প ও বিতণ্ডাতে সভার অপেক্ষা আছে, কিন্তু এই "বাদ" কথাতে সভার অপেক্ষা নাই। যে জন সমূহের মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশালী নেতা এবং কোন এক ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ জনসমূহের নাম সভা। জিজ্ঞাসু হইয়া যেখানে কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্যই বিচার হয়, সেখানে মধ্যস্থ বা সভার অপেক্ষা থাকিবে কেন? বৃক্ষতলে বসিয়াও জিজ্ঞাসু বিনীত শিষ্য, গুরুর সহিত বিচার করিতেছেন। যদি তাহা দেখিয়াছেন, তিনি জিজ্ঞাসুর বিচারপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন! এখনকার মত জিজ্ঞাসু সাজিয়া পায়ের ধূলি লইয়া, শেষে সভ্যতার আবরণ দূরে ফেলিয়া পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে বিচার-বীর হইয়া দাঁড়াইতে, পূর্ব্বতন জিজ্ঞাসুগণ জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"। উপদেশকগণ জানিতেন "না পৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ নচান্যায়েন পৃচ্ছতঃ। নচাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি"। ১

সূত্র। যথোক্তোপপন্নশ্ছলজাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ। ২

ব্যাখ্যা। "যথোক্তোপপন্নঃ" (যথোক্তেষু পূর্ব্বসূত্রোক্তেষু যদুপপন্নং জল্পে যৎযুক্তং তেন উপপন্নঃ তদ্‌যুক্তঃ) "ছলজাতি নিগ্রহস্থান সাধনোপালম্ভঃ" (ছলজাতি নিগ্রহস্থানৈঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণৈঃ সাধনস্য পরকীয়ানুমানস্য উপালম্ভঃ দূষণং যত্র তাদৃশঃ) "জল্পঃ" (জল্পনামকঃ কথাবিশেষঃ)।

তাৎপর্য্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত বাদ-লক্ষণে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাহা, তাহাতে যুক্ত তদ্‌যুক্ত, এবং বক্ষ্যমাণলক্ষণ ছল জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা যাহাতে পরকীয় অনুমানের খণ্ডন হয়, সেই কথাকে জল্প বলে।

টীকা। বাদের লক্ষণের পরে ক্রমানুসারে এবার জল্পের লক্ষণ বলিতেছেন। পূর্ব্বসূত্রে বাদ-স্বরূপ-বর্ণনের জন্য "প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভঃ" এবং "পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহঃ" এই দুইটী কথা বলা হইয়াছে। ঐ দুইটী কথা এই জল্প-লক্ষণেও বক্তব্য, তাই বলিয়াছেন

"যথোক্তোপপন্নঃ"। তবে "প্রমাণ তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ" এই কথার ব্যাখ্যা এবার পূর্ব্বসূত্রের ন্যায় নহে। পূর্ব্ব সূত্রে উহার দ্বারা প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কের দ্বারা স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষদূষণ যাহাতে হয় অর্থাৎ যাহা প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসের দ্বারা স্বপক্ষ-সাধনাদির যোগ্য নহে এই রূপ অর্থই বিবক্ষিত। কিন্তু "জল্প" কথা, প্রমাণাভাস প্রভৃতির দ্বারা স্বপক্ষ-সাধনাদির যোগ্য বলিয়া এই সূত্রে ঐ কথার দ্বারা পূর্ব্বসূত্রের বিবক্ষিত অর্থপ্রকাশ সঙ্গত হয় না, তাই বলিয়াছেন "যথোক্তোপপন্নঃ"। যথোক্তেষু যৎ উপপন্নং তেন উপপন্নঃ এই রূপে মধ্যপদলোপী সমাস বশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায়, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যেটী যুক্ত, তদ্‌যুক্ত। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে "প্রমাণ তর্ক সাধনোপালম্ভঃ" এবং "পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহঃ" এই দুইটী বাক্যার্থ জল্প-লক্ষণে গ্রহণীয়। "প্রমাণ-তর্ক সাধনোপালম্ভঃ" এই অংশের ব্যাখ্যা, এই জল্প-লক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় নহে। প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসকে প্রমাণত্ব রূপে ও তর্কত্ব রূপে ধরিয়া লইয়াও তাহার দ্বারা স্বপক্ষসাধনাদি যাহাতে হয় অর্থাৎ যে কোন রূপে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা (প্রকৃত বা অপ্রকৃত প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা) যাহাতে স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষ খণ্ডন হয়, এই রূপে পূর্ব্বোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহকে "জল্প" বলে। "বিতণ্ডা" নামক বিচারও এইরূপ, তাই বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, "উভয় পক্ষের স্থাপনাবিশিষ্ট" এইরূপ বিশেষণ এই লক্ষণে মহর্ষির অভিপ্রেত। কেননা পরসূত্রে প্রতিপক্ষ স্থাপনাহীন জল্পকে বিতণ্ডা বলিয়াছেন, সুতরাং বুঝা গেল, জল্পে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রত্যেকেরই স্বপক্ষ স্থাপনা অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা স্বস্বপক্ষের সাধন আছে। ফলতঃ উভয় পক্ষের স্থাপনাযুক্ত বিজিগীষুর কথাকে জল্প বলিলে, আর কোন দোষের আশঙ্কা থাকে না। জিগীষু ব্যক্তিই, ছল জাতি ও নিগ্রহস্থান সমূহের দ্বারা পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া থাকেন, সুতরাং "ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভঃ" এই কথার দ্বারা বিজিগীষুর কথাই জল্প. ইহা বুঝা গেল। বাদ-বিচারে জিগীষা নাই সুতরাং বাদে এই জল্পের লক্ষণ গেল না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের অভিপ্রায় এই যে, বাদ-বিচারে জল্প লক্ষণ যায়, তাই মহর্ষি বলিয়াছেন "ছলজাতিনিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভঃ"। বাদ-বিচারে ছল জাতি ও নিগ্রহস্থান সমূহের দ্বারা পরকীয়ানুমানের খণ্ডন নাই, সুতরাং তাহা জল্প হইতে পারে না। অবশ্য জল্প মাত্রেই ছল জাতি নিগ্রহ-স্থানের দ্বারা পরকীয়ানুমানের খণ্ডন হয় না, কিন্তু জল্প মাত্রেই তাহার যোগ্যতা আছে, বাদ তাহার যোগ্যই নহে বাদ-বিচারে ছল, জাতি ও সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানের ব্যাপার নাই। ফলতঃ যাহা ছল জাতি ও নিগ্রহস্থান সমূহের দ্বারা প্রতিপক্ষের অনুমান-খণ্ডনে যোগ্য, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, ঐ কথার দ্বারা বাদ-বিচারের জল্পত্বাপত্তি বিদূরিত হয়, সুতরাং ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য। মূল কথা, জল্পে জিগীষা বশতঃ উভয় পক্ষই স্বস্ব পক্ষের স্থাপনা করেন, সুতরাং উভয়-পক্ষ-স্থাপনা-যুক্ত জিগীষুর কথাই জল্প, ইহা বুঝিয়া রাখিলে, জল্পের স্বরূপ ঠিক্ বুঝা হইবে।

এই জল্প বিচারের প্রণালী এইরূপ প্রথমতঃ বাদী, প্রমাণের উপন্যাস করিয়া স্বপক্ষস্থাপন করিবেন এবং তাহাতে সম্ভাব্যমান দোষের নিরাকরণ করিবেন। পরে প্রতিবাদী, অজ্ঞানাদি নিরাসের জন্য অর্থাৎ তিনি বাদীর কথা উত্তম রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা প্রকাশের জন্য বাদীর মতের অনুবাদ করিয়া দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার খণ্ডন এবং প্রমাণের দ্বারা স্বপক্ষ-সমর্থন করিবেন। তৎপরে বাদী, প্রতিবাদীর কথা গুলির অনুবাদ করিয়া, স্বপক্ষে প্রতিবাদি-প্রদত্ত দোষ গুলির উদ্ধার-পূর্ব্বক প্রতিবাদীর সংস্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিবেন। এই প্রণালীতে বিচার চলিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি স্বপক্ষের দোষের উদ্ধার বা পরপক্ষের দোষ-প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন। বিচারকালে যিনি এই রীতি উল্লঙ্ঘন করেন, অথবা অসময়ে বা অযথাকালে—অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষপ্রদর্শন করিতে হয় তদ্ভিন্ন সময়ে দোষপ্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত অর্থাৎ পরাজিত হন। এখন শাস্ত্রানুসারে বিচার হয় না। মধ্যস্থ মাধ্যস্থ্য ত্যাগ করিয়া অভিমত ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন-পূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ বা খ্যাতি লাভ করিতে গিয়া, অনেক সময়েই পদমর্য্যাদা ও অধর্ম্মকে ভুলিয়া যান। এখন শাস্ত্র-বিচারকগণ, বিচারের নিয়ম ও নিগ্রহস্থানের অধীন নহেন। অনেকে তাহার নামও জানেন না। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ বিচার হট্টগোল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাদী ও প্রতিবাদী যেমনই হউক না কেন, মনীষী মধ্যস্থগণ তাহাদিগের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিলে অনেক রক্ষিত হইতে পারে। মধ্যস্থগণ "সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বা সমঞ্জসং। অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী" এই মহা বাক্যের মর্য্যাদা-রক্ষায় চেষ্টা পাইলেই তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। ২

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।



আত্মবিৎ।

নহি আমি ভূমি বারি তেজ বায়ু নভ
মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয়-সম্ভব
স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম—কলেবর। নহি আমি
অরি মিত্র ভ্রাতা বন্ধু পিতা পুত্র স্বামী
এ সংসারে কারো। নহি নারী, নহি নর;
নাহি মম লিঙ্গ-মূর্ত্তি, নিত্যরূপান্তর;
নহি পীন, নহি সূক্ষ্ম, হ্রস্ব দীর্ঘ কিবা,
নাহি বর্ষ, নাহি মাস, যামিনী বা দিবা,
নাহি আয়ু, নাহি বয়ঃ। না পারে কখন
রূপ রস শব্দ গন্ধ কিংবা পরশন
মোহিতে আমারে নাহি মোর পরিমাণ,
নাহি রূপ, অবয়ব, নাহি কাল, স্থান,
নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু। আমাতে কখন
নাহি ঘটে জাগরণ, সুষুপ্তি, স্বপন;
সত্ত্বরজস্তম রূপ ত্রিগুণ-শৃঙ্খল
নাহি বাঁধে; না পরশে সতত চঞ্চল
সুখ দুঃখ, কর্ম্ম-চক্র; না সম্ভবে মোরে
পাপ পুণ্য, শুভাশুভ; অবিদ্যার ডোরে
নহি বাধা। হাসি অশ্রু, রোষ অনুরাগ,
নাহি মোর লোভ, মোহ, কামনা, বিরাগ।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণতার
অদ্বয় স্বরূপ আমি—আদি অন্ত যার
নাহি কোথা। ধ্যান-গম্য মহাবিদ্যা মম
স্থানাতীত কালাতীত গুণ নির্ম্মম
আমারি সত্তার মাঝে নিগূঢ় নিলীন।
রূপাতীতা সেচিন্ময়ী, র'চ' রাত্রি দিন,
নিত্য নব নব ভাবে সে আনন্দ মম
আস্বাদিতে, প্রকটিতে লীলা গুহ্যতম,
অফুরন্ত ক্রীড়া রসে হইতে মজ্জিত,
আমা হ'তে আপনারে করিয়া খণ্ডিত
অর্দ্ধনারী মূরতি ধরিল অবশেষে
শক্তি-রূপা মায়াময়ী প্রকৃতির বেশে
বাহিরিয়া উপগমি' একাংশ আমার,
করি' সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণ সঞ্চার,
প্রসবিল হিরন্ময় গর্ভ হ'তে তার
মহাশূন্য ব্যোম মাঝে সদা ভাসমান
জ্যোতির্ম্ময় তেজশ্চক্রে পরিঘূর্ণামান
কোটি কোটি ব্রহ্ম-অণ্ড বায়ু বারি ভূমে
ক্রমিক বিকাশপর, মনবুদ্ধি ধূ'ম
আচ্ছন্ন, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল-কলেবর
পঞ্চীকৃত জীবপুঞ্জে পূর্ণ নিরন্তর।
লীলা লাগি' এই বিশ্ব করিয়া সৃজন
এক আমি বহু রূপ করিছি ধারণ
বহু ভাবে আপনাকে করিতে আস্বাদ।
সুখ দুঃখ, আশা তৃষা হরষ বিষাদ
বিরচিত আমারি সে চিদানন্দ-রসে
ভুঞ্জিবারে নানাভাবে বহুল পরশে
আত্ম-রতি। সর্ব্বভূতে মরুতের প্রায়
মুক্ত প্রবাহিত আমি। আবরিত-কায়
বহ্নি যথা রহে শুষ্ক অরণি ভিতর,
অথবা সলিলকণা মেঘ-অভ্যন্তর,
তৈল যথা তিল মাঝে, ঘৃত যথা ক্ষীরে,
কুসুমে সৌরভ যথা, মধু দুগ্ধে নীরে,
ফলের ভিতর যথা রসের সঞ্চার,
সেইমত সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন-আকার,
রহি আমি স্থানগূঢ়। অনন্ত অক্ষর
আমি মহা চিৎ সিন্ধু; সৃজন-লহর
উপজিত, উল্লসিত, ক্ষণক্রীড়াপর
দুদণ্ড করিছে খেলা আমারি ভিতর,
আবার আমারি মাঝে হ'তেছে বিলীন;
আমি কিন্তু হ্রাস-বৃদ্ধি-জন্ম-মৃত্যু-হীন!

৩

পাপ পুণ্য, শুভাশুভ, হেয় উপাদেয়,
চিত্তের এ দ্বৈতভাব ভ্রান্তি-নামধেয়
সুকঠিন লৌহ-পাশ, স্বর্ণ শৃঙ্খল,
বাঁধিতে জীবের চিত্ত বিকল চঞ্চল
মায়া-মোহে। অবরোধি' ইন্দ্রিয়নিচয়
বাহ্য আকর্ষণ হ'তে, কর—কর লয়
সূক্ষ্মে স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম কারণ শরীরে,
কারণ অব্যক্ত মাঝে, চৈতন্যের নীরে
শেষে সে অব্যক্ত মায়া। কর—কর দূর
মম-ভাব, আনি' চিন্তা নির্ম্মম মধুর
চিত্ত মাঝে, চৈতন্যের সুধা কর পান,
সর্ব্ব ভুলি' আপনারে করহ সন্ধান।
আত্ম-পূজা সার পূজা এ বিশ্ব মাঝারে,
আত্ম-বিৎ সর্ব্ববিৎ জানিও সংসারে।

৪

ওরে জীব! তোর দেহে কর্ জাগরিত
কুলকুণ্ডলিনী ফণী! নিদ্রা-নিমীলিত
আছে সে নাগিনী পৃথ্বী-মূলাধারে তোর,
স্বয়ম্ভু শিবেরে ঘিরি'। করি' যোগ ঘোর
জাগারে সে কুণ্ডলীরে, কর উত্তোলিত
পৃথ্বী হ'তে বারি-পুরে, করি' নিরজিত

ধরণী সলিল মাঝে; নীর-পুরী হ'তে
তোল সেই সাপিনীরে বহ্নি-লোক-পথে,
দহি সে উদকচক্র বহ্নির শিখায়,
লভ ক্রমে ঊর্দ্ধপথে সমীর-সীমায়,
অনিলে অনল জ্বালা করি' নির্ব্বাপিত;
আরো ঊর্দ্ধে ব্যোম-চক্রে কর হ স্থাপিত
সে ভুজগে, বায়ু-ধাম শূন্যে করি লয়;
তারপর ধীরে ধীরে করিয়া আশ্রয়
মন বুদ্ধি অহঙ্কার, করিয়া বিলয়
একে একে সে সবারে, সহস্রার ভেদি'
লভ কুলকুণ্ডলীরে যথা আত্ম-বেদী
হংসাসন অবস্থিত ওঙ্কার-স্বরূপ।
তথা সবে উত্তরি'ব নির্ম্মোক নিষ্কৃত
সর্ব্বরূপা মহাবিদ্যা পরমা প্রকৃতি
পরম পুরুষ পাশে, অনিত্যের ধৃতি
সহসা পাইবে লয়, মায়ার বিকার
হবে সাঙ্গ অকস্মাৎ ব্রহ্মাণ্ড অপার
স্বপ্ন-সম ভেঙ্গে যাবে সত্য-প্রকটনে;
দেখিতে দেখিতে দোঁহে পরস্পর সনে
মিশিবে পুরুষ নারী অঙ্গে অঙ্গে মরি!
আর না বহিবে 'কভু সর্ব্বকাল হরি'
কালহীন স্থান-হীন ভেদহীন রূপে
আত্মা শুধু রবে শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপে।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্, এ. বি, এল্।

।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সকল ধর্ম্মই সনাতন (চিরস্থায়ী) বলিয়া—পরিকীর্ত্তিত। এখনও বিংশতি বৎসর অতীত হয় নাই, রামকৃষ্ণ দেব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম চিরন্তন, সত্তর বৎসর অতীত হয় নাই, রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরন্তন, সাড়ে তিন শত বৎসরের বাবা নানক-প্রবর্ত্তিত শিখ-ধর্ম্ম চিরন্তন, চারি শত বৎসরের চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম চিরন্তন, সহস্র বৎসরের শাঙ্কর বেদান্ত-ধর্ম্ম চিরন্তন, তেরশত বৎসরের মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম চিরন্তন, দুই সহস্র বৎসরের খ্রীষ্টধর্ম্ম চিরন্তন, আড়াই হাজার বৎসরের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চিরন্তন, চারি হাজার বৎসরের ইহুদী-ধর্ম্ম চিরন্তন, ছয় হাজার বৎসরের জেন্দ-ধর্ম্ম চিরন্তন, সৃষ্টির আদিকাল হইতে আর্য্য-ধর্ম্ম চিরন্তন। এই "চিরন্তন"—"আবহুমান আবাদ" Everlasting" "সনাতন" শব্দের অর্থ—চিরকালীন। তবে এই ধর্ম্মসংখ্যা কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল—প্রত্যেক ধর্ম্মের নামে তাহা প্রকাশিত। তাহাতে সমন্বয় বা অবিরোধ প্রতিপাদন করিতে হইলে সকল ধর্ম্মকেই চিরন্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কেননা, যে ধর্ম্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহার মূলে চিরন্তন শব্দ না থাকিলে ধর্ম্ম যে ঐশ্বরিক-সত্তা-সম্ভূত—তাহা প্রমাণ করা যায় না।

অর্থাৎ—

ঈশ্বর অনন্ত, তাঁহার এই সৃষ্টি-নিকেতন অনন্ত, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ অনন্ত; সুতরাং সেই অনন্তের যাহারা সহযাত্রী, তাহাদের জ্ঞান-ধ্যান-ধর্ম্ম কেন না অনন্ত হইবে? আদিকাল হইতে এই প্রসঙ্গ—এই চিন্তা চলিয়া আসায়, "অনন্তের সকলই চিরন্তন" না বলিলে ধর্ম্মজগতে

দাঁড়াইতে পারা যায় না। জলে, স্থলে, আকাশে, অব্যক্তভাবে পূর্ণশক্তিতে যে পরমেশ্বর অনন্তকাল বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব,—এই ভাব, কালে যিনি যত স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন, তিনি তত মহাত্মা, যোগী, সাধক Prophet বা প্যায়গম্বর নামে পরিচিত।

এই চিহ্নিত গণের দ্বারাই জগতের যত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পণ্ডিতসমাজ তাই বলিতেছেন, আমরা প্রাচীনদিগের পথানুসরণ করিয়া আসিতেছি। দেশভেদে কালভেদে এবং পাত্রভেদে এই অনুসরণ বিচিত্রতায় পূর্ণ বলিয়া, পদে পদে আমরা বিড়ম্বিত হইতেছি। একজন চিন্তাশীল লোক ঠিক্ তাহাই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, যে, কোরাণ বাইবেলপ্রভৃত, বাইবেল জেন্দ অবেস্তাপ্রভৃত, জেন্দ অবেস্তা বেদ-প্রভৃত। তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিলে, জনসমাজের ধর্ম্মবিপ্লব চলিয়া যায়।

কিন্তু পূর্ব্বলিখিত দৈনিক ইতিহাস, প্রতিপন্ন করিতেছে, যে, ভালই হউক্ আর মন্দই হউক্, একবার সংস্কার-সূত্রে অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, তাহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশা সুদূরপরাহত এবং এই জন্যই মনুষ্যসমাজ এক এক ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ থাকিয়া, অন্যের অবলম্বিত ধর্ম্মকে বিষ-নয়নে দেখিয়া আসিতেছে। রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়, সকল ধর্ম্মের সাজী সাজাইয়া, জগৎপ্রাণ হইতে চাহিতেছেন, শিখ—সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানে একতা বিধান করিতে গিয়া, আর একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় খাড়া করিয়া বসিয়াছেন। বঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্যবিন্দু করিয়া যে ভক্তি-প্রবাহ বিস্তার করিতেছিলেন, তাহাও কালে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে শঙ্কর, আত্মোৎসর্গ করিয়া যে বেদান্ত-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আশ্রম ধর্ম্ম প্রকারান্তরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। মোহম্মদ, কাবার প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরে বসিয়া যে "রব্বিলালেমীন" দৈববাণী শুনিলেন, তাহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া যে অভিনব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহা আদি জগতের জনসংখ্যার হাজার করা ১১৫ জন গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর জগতে খ্রীষ্টকে লইয়া যে ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত জনসংখ্যা হাজার করা ৩৪৬, তাহার পূর্ব্বে রাজপুত্র শাক্যসিংহ সকল ধর্ম্মের সমন্বয় ('বরোধভঞ্জন') করিতে গিয়া যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়িয়া দিলেও আজি তাহা সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তারপর ইহুদাধর্ম্ম, বিবাচ্ছন্ন দেব-আরাধনা হইলেও আজি তাহার জনসংখ্যা জগতের লোকসংখ্যার হাজার করা ৫৩৩। তাহারপর মহাত্মা জোরাষ্টর ভারত হইতে আমন্ত্রণ করিয়া যে ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা রূপান্তরিত হইয়া সমস্ত পারস্য দেশ এক সময়ে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার পর আর্য্যধর্ম্ম আজি জগতে এরূপ বিস্তৃত রহিয়াছে যে, তাহার সত্তা, সকল ধর্ম্মেই অন্তর্নিবদ্ধ উপলব্ধ

করা যায়। ভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে Muslim Reveiw নামক মাসিক পত্রিকায় গত মে মাসে (১৯১০) একটী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

RELIGIOUS STATISTICS.

(I) 'Dr. H. Zeller, Director of the statistical Burrace in stutgar, estimates that of the 1,544.510,000 people in the world, 434.940.000 are Christians, 175.290,000 are Mahomadans, 10,860,000 are jews, and 823 420 000 are Hathens, of the last 300,00000 are confucious, 214,000000 are Brahmins and 121,000000 are Budhists, with after besides of lesser number, In other words, out of every thousand of the Earth's inhabitants—346 are Christians, 114 are mahomadans, 7 are Israelties, and 533 are of after religions.

(2) In 1885, in a Table Estimating the—Population of the world at, 1461,285,700, the number of Christians was Put at 430, 284.500 are jews at 700000, of Mahomadans at 230,000000, and of persons of after re igions at 794,000000.

উপরোক্ত দুইটী গণনায় প্রতীত হইতেছে যে, জগতের সমস্ত মনুষ্য, যে কোনও একটী ধর্ম্মের অন্তর্গত। বিশেষভাবে তাহাদের নাম খ্রীষ্টীয়ান্, মুসলমান্ এবং দেবতাপূজক হিদেন্ প্রভৃতি। যাহারা দেব-দেবীর উপাসক, তাহারা কন্‌ফিউশস্ ব্রাহ্মণ বা হিন্দু এবং বৌদ্ধ। ইহাদিগকে ডাক্তার জেলার, অসভ্য বর্ব্বরজাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সদা প্রভুপরায়ণ পবিত্রধর্ম্মাবলম্বী খৃষ্টীয়ানগণ ব্যতীত জগতে আর কেহই মুক্তির অধিকারী না হইলে হাজার করা ৩৪৬ মাত্রের মুক্তি হইল। ইহার মধ্যেও রহস্য কম নহে।

(১) জগতের জনসংখ্যা—১, ৫৪৪,-৫১০; ০০০

তন্মধ্যে খ্রীষ্টান্—৪৩৪, ৯৪০, ০০০
" মুসলমান্—১৭৫, ২৯০, ০০০
" জু——১০, ৪৬০, ০০০
" হেদেন্——৮৪৩, ৩২০, ০০০
———১,৪৬৪, ৫০ ০০০

যাহার কোন হিসাব নাই—৮০, ০০:০০০। তবে ইহারা কাহারা? যাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্ম নাই। ডাক্তার জেলারের গণনায় আরও বিচিত্রতা আছে—

জগতের জনসংখ্যা———১,৪৬১,২৮৫,৭০০
তন্মধ্যে খ্রীষ্টান্—৪৩০,২৮৪,৫০০
" জু—৭০০০০০০
" মুশলমান্—২৩০,০০০০০

৬৬৭,২৮৪,৫০০

অনুমান হেদেন্ হইবে———৭৯৪,০০১,২০০

যাহার এস্থলে কোন হিসাব নাই। ইহারা মনুষ্যপদবাচ্য হইলে, অবশ্যই ইহাদের উল্লেখ থাকিত। ইহারা কাহারা? ডাক্তার জেলার বলেন, "ইহারাই হেদেন্ বর্ব্বর অসভ্যজাতি"। ইহাদিগের মধ্যে চীন-জাপানের কন্‌ফিউশস্, ভারতের হিন্দু,

পারস্যের জোরাস্তর এবং জগদ্বাসী বৌদ্ধ, সগণ্যভাবে গৃহীত হইয়াছেন।

এখন এই সগণ্য-জাতির ধর্ম্মরহস্য আলোচনা করিলে, ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

সকলেই মূলতত্ত্ব ঈশ্বর ও তাঁহার বিশ্ব-সামন্তা এবং মনুষ্যের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। সেই তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াই চিরকাল মনুষ্য, আপনার নিরাকার ও অমর আত্মাকে, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী. পরমেশ্বরের সন্নিধানে লইবার জন্য, কঠোর হইতে কঠোরতর তপস্যার আয়োজন করিয়া থাকে। এই আয়োজনে ধর্ম্মবুদ্ধি মনুষ্যেরা, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কিনা করিয়াছেন, সকল ধর্ম্মের ইতিহাস, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! এমন যে ধর্ম্ম, তাহার মূলতত্ত্ব একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্।

উপরোক্ত গণনায়, জগতের তিনটী প্রধান ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয়ান্, জু এবং মুশলমান্। তাহাদের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, পাতা এবং সর্ব্বসুখদাতা; তিনি অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয়, ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী ও দয়ার সাগর। তিনি দয়া-পরবশ হইয়া, (কিছু না হইতে) এই জগত বর্ত্তমানে আনিয়াছেন। এই বিচিত্র চিত্র দেখিয়া, তিনি (ঈশ্বর) অহ্লাদ-সহকারে তাহা উপভোগের জন্য আদিম মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। কেবল তাহাই তাঁহার মনঃপূত হইল না। তাই তাহার (আদমের) একখণ্ড পঞ্জর-অস্থি লইয়া, ইভকে সৃষ্টি করতঃ তাহার সঙ্গিনী করিয়া দিলেন। এই আদম ইভ একত্র হইয়া পরমসুখে এদন্ উদ্যানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। কোথা হইতে সয়তান্ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করতঃ, ঈশ্বরের ক্রোধ উৎপাদন করিল। তাহাতেই মানব-জাতির পতন হইয়াছে এবং ঈশ্বরের সহিত সয়তানের চির প্রতিদ্বন্দিতা রহিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাহা করেন. সয়তান্ তাহা বিগড়িয়া দেয়, সুতরাং যে সুখভোগের জন্য ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সে সাধে বিষাদ জন্মিল। এই বিষাদ, এই তিনটী ধর্ম্মে চিরকাল বর্ত্তমান।†

এ বিষয়ে খৃষ্ট-জগতে একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একদিন স্বর্গরাজ্যে দেবদূতগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সয়তানের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। শুভ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা অতিবিনীতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেন সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজ্যে বিশৃঙ্খল আনিয়া পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিতেছে।

† এই অসীমশক্তিশালী সর্ব্বব্যাপী সয়তানের প্রভাব লইয়া খৃষ্ট-জগতে যত আন্দোলন হইয়াছে, এত আর কোথাও নহে। তাঁহাদের বিশ্বাস— সয়তান্ ঈশ্বরের রাজ্য অধিকার করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সদাপ্রভু ঈশ্বর সহস্র ২ বৎসর হইতে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া পরিশেষে নিজ প্রিয়পুত্র যীশুকে মর্ত্তে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পরিণাম যাহা হইয়াছিল, নির্ম্মম ইহুদিদিগের শূল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে!

ইহা দেখিয়া মনস্বী মনুষ্যেরা চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ ঈশ্বর কেমন? ইহাতে উপরোক্ত মহতী শক্তি কোথায়? তাহার পর তাঁহারা এই সন্দেহ-দোলায় দুলিতে দুলিতে পরবর্ত্তী চিত্রে গিয়া দেখিলেন—তিনি (ঈশ্বর) মেঘের উপর চড়িয়া মুশার অগ্রে অগ্রে দেশান্তরে যাইতেছেন। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ফেরোর অমানুষিক প্রজাপীড়ন-ব্যাপারে আকুল হইয়া, তাহাদের উদ্ধারার্থ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার রহস্য উদ্ভেদ করা সহজসাধ্য নহে। সয়তান্ কি কারণে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল, কোথাও তাহার উল্লেখ দেখা যায় না. কিন্তু তাহার শক্তি অবারণীয় বলিয়া বলা হইয়াছে। সে ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান আছেই, তৎপরে সে তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্যকে লইয়া এ ভাবে ক্রীড়া করিতেছে যে, তাহা হইতে সে যে কোন কালে নিবৃত্ত হইবে, এমনও আর বোধ হইতেছে না। কারণ, আদি পুস্তকের ৬ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, এই কারণে সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্ম্মাণ-প্রযুক্ত অনুতাপ করিয়া মনঃপীড়া পাইলেন—"পূর্ব্বে সয়তান্ এক ছিল, তাহার

তাহার উত্তরে সয়তান্ সহাস্য বদনে কহিল, কৈ? সে ত জগতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা আনিতেছে না! অপরিণামদর্শী ঈশ্বর স্বয়ংই সকল অনিষ্টের মূল। দেব-দূতগণ তাহাতে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ তোমার অস্বাভাবিক ধূর্ত্ততার কথা; ইহাকে কখন মন মধ্যে স্থানদান করা যায় না।" তাহা শুনিয়া সয়তান্ তাহার কোন উত্তর দান না করিয়া কহিল "প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে নাই, তোমরা যে ঈশ্বরের সেবক এবং অনুরাগী, আইস, আমি তাঁহার অপরিণামদর্শিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছি," এই বলিয়া সয়তান্ তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মর্ত্ত্যে অবতরণ করিল এবং এক রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিপণির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে একমুষ্টি মিষ্টান্ন লইয়া পথপার্শ্বে নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি পিপীলিকা তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মিষ্টান্ন খাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে একটী টিকটিকী তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পিপীলিকাগুলিকে খাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে সেই পথ দিয়া এক সেনা-বাহিনী যাইতেছিল, তাহার মধ্যে এক সৈনিকের হস্তে একটা পক্ষী ছিল, পক্ষীটা টিকটীকি দেখিয়া ঝম্প প্রদান করতঃ তাহাকে আক্রমণ করিল। তখন বিপণীতে একটা বিড়াল বসিয়াছিল, সে তাহা দেখিয়া এক লম্ফে তথায় উপস্থিত হইয়া পক্ষিটিকে আক্রমণ করিল। তাহা দেখিয়া সৈনিক-পুরুষ বিড়ালকে বন্দুকাঘাতে মারিয়া ফেলিল। বণিকের পুত্রদিগের দ্বারা এই বিড়ালটি পালিত; তাহার এই দশা দেখিয়া তাহারা সৈনিকের উপর আপতিত হইয়া সংগ্রাম বাধাইয়া দিল। সেই সংগ্রামে রক্ত-পাত হইতেছে দেখিয়া, সমস্ত বাহিনী একত্র হইয়া বিষম সংগ্রাম উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া জনপদবাসীরা উত্তেজিত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। তখন নরশোণিতে নগর প্লাবিত হইয়া গেল, চতুর্দ্দিকে নরমুণ্ড গড়াগড়ি দিতে লাগিল, অল্পক্ষণে সমস্ত জনপদ ভীষণাকার শ্মশানে পরিণত হইল! তখন সয়তান্ দেবদূতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বলুন, আপনারা ইহাতে আমার হস্ত কোথায় দেখিলেন?" তাহা দেখিয়া দেবদূতগণ বিস্মিত হইয়া, দৈবের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পর জনসমাজ তাহার সহযোগী হওয়ায় মর্ত্ত্য, মহা অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ধর্ম্ম অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" ইহা দেখিয়াই ইহারা সৃষ্টি-লোপের (কেয়ামৎ) আশঙ্কা করিতেছেন। এই আশঙ্কা বহু ভাবে বিভক্ত। খ্রীষ্টিয়ানেরা বলেন, "পরিণামে খ্রীষ্ট আসিয়া কর্ণধার হইয়া এই ভবসাগর পার করিবেন।" 'জু'রা তাহা মানিয়াও, যে খ্রীষ্ট আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। মুশলমানেরা তদনুবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "খ্রীষ্ট, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরপ্রাণ হইলেও (রু আল্লা) জগতের উদ্ধার-নিমিত্ত মোহম্মদ আসিয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃত পথ পদর্শক প্যায়গম্বর।" এই একস্থানের তিনটী পথ, ত্রিধারা-বিশিষ্ট হইয়া, যে ভাবে ধাবমান হইয়াছে, কোন কালে তাহাদের আর পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে না। ইহাদিগের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া, তাকাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, ইহাদিগের ঈশ্বর মনঃপীড়ায় পীড়িত, সয়তানের হস্তে পরাস্ত, সুতরাং তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা কেমন করিয়া বলিব?

মৃত্তিকার ধূলিতে মনুষ্য নির্ম্মিত হইলে, তাহার নাসারন্ধ্রে ফুৎকার দিয়া তাহাকে সজীব করা হয়। এই ফুৎকারই মনুষ্যের "আত্মা" (Soul রুহ।) সেই ফুৎকার-সম্ভূত আত্মা—ঈশ্বরের আদিষ্ট মনুষ্য, সয়তানের প্ররোচনায় যে ভাবে ভ্রষ্ট হইয়া যে রূপে জগতে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পুরাতন ইতিহাস Old testament এ পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

এখন এক অসভ্য বর্ব্বর জাতির ধর্ম্মালোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বেদ হইতে কোরাণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত পুরাতন ধর্ম্ম জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই বেদ হইতে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছে, সে জন্য সকলেই বেদের নিকট ঋণী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, ইহুদী জাতি, বেদ হইতে ধর্ম্মের ভাব গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রীকেরা তাহা হইতে ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিলে প্লেটো, অরিষ্টটল প্রভৃতি যে ভাবে ধর্ম্মবিজ্ঞান দাঁড় করাইয়াছিলেন, তাহার আদর্শ, তাহাদের প্রতিবাসী দারজ্যে পরিব্যাপ্ত; কোরাণের ধর্ম্ম তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। খ্রীষ্টানেরা যে তাহা হইতে সমস্ত ধর্ম্মভাব গ্রহণ করেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার পর সেইভাব আরবে আসিয়া কোরাণ-রূপে যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহার রহস্য পাঠকগণ ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন। অনুবাদের আলোচনা পর্য্যন্ত যেখানে যাহা হউক, ফলতঃ সকলকে মুক্ত হৃদয়ে স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অসভ্য-বর্ব্বর জাতির অবলম্বিত ধর্ম্ম, কালক্রমে সমস্ত সভ্য-জগতে বিস্তারিত হইয়া, মানব-সমাজের ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল করিতেছে। "সাত নকলে আসল খাস্তা" এই প্রবাদ-বাক্যটী এস্থলে যেন সত্যাক্ষী ভূত হইতেছে!

(সমাপ্ত)

হিমারণ্যবাসী জনৈক পরিব্রাজক



বৈদিক বিজ্ঞান।

তত্ত্বভাণ্ডার বেদ, ভারতীয় আর্য্যজাতির অতীত গৌরবের অভ্রান্ত সাক্ষী। যাঁহাদের মতে "বেদ" "চাষার গান," তাঁহাদের কাছে অবশ্য ইহার প্রচুর সমাদরের প্রত্যাশা নাই, কিন্তু যাঁহারা পরপ্রত্যয়ে পরিচালিত নহেন, পরন্তু নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট বেদের অনাদর হইতে পারে না। তাঁহারা জানেন, জগতের আদিগ্রন্থ, মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারের কোহিনুররূপ বেদে সকল প্রকার কর্ত্তব্যের উপদেশ ও জ্ঞাতব্যের পরিচয় বিরাজমান। বেদচর্চ্চা, দেশে এখনও প্রাচুর্য্যলাভ করে নাই, তথাপি যাঁহাদের নিকট বেদপুরুষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপেই জানেন, বেদ অনন্ত-রত্নের আকর। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একটী বৈদিক সত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

চন্দ্র যে স্বয়ং তেজোহীন এবং চন্দ্রের কিরণ যে প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ মাত্র, তাহা অনেকের জ্ঞানে অল্পদিনই জগতের জ্ঞান-গোচরে আসিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বৈদিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যে, বৈদিক ঋষিগণ ইতিহাসের অজ্ঞাতযুগে এতদ্বিষয়িণী গবেষণায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে (ঋক্ ১।৬।৭, ৫ মন্ত্র) আমরা পাঠ করি,—

অত্রাহগোরমন্বত নামত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে। অর্থাৎ এই চন্দ্রমণ্ডলে যে স্নিগ্ধ রশ্মি উপলব্ধ হয়, তাহাও ত্বষ্টা-নামক আদিত্যেরই রশ্মি। ত্বষ্টা আদিত্য সূর্য্যই, সুতরাং এই মন্ত্রে চন্দ্রজ্যোতিকে সূর্য্যজ্যোতি বলা হইতেছে। এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—

"অত্রাহ অস্মিন্নেব, গোঃ গন্তুঃ চন্দ্রমসঃ গৃহে মণ্ডলে, ত্বষ্টুঃ এতৎসংজ্ঞকস্য আদিত্যস্য সম্বন্ধি, অপীচ্যং রাত্রাবন্তর্হিতং স্বকীয়ং যৎ নাম তেজঃ তদাদিত্যস্য রশ্ময়ঃ। ইত্থা ইত্থম্ অনেন প্রকারেণ অমন্বত অজানন্। উদকময়ে স্বচ্ছে চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলন্তি। তত্র প্রতিফলিতাঃ সূর্য্যকিরণাঃ সূর্য্যে যাদৃশীং সংজ্ঞাং লভন্তে তাদৃশীং চন্দ্রেহপি বর্ত্তমানা লভন্তে ইত্যর্থঃ। যদ্‌-রাত্রাবন্তর্হিতং সৌরং তেজঃ তৎ চন্দ্রমণ্ডলং প্রবিশ্যাহনীব নৈশং তমো নিবার্য্য সর্ব্বং প্রকাশয়তি।"

ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, রাত্রিতে চন্দ্রমণ্ডলে যে তেজঃ প্রকাশ পায়, উহা ত্বষ্টা নামক আদিত্যেরই তেজঃ। স্বচ্ছ চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিফলিত তেজ, সূর্য্যেও যে নাম প্রাপ্ত হয়, চন্দ্রেও তাদৃশ নামই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ দিবসে যে সূর্য্য-কিরণ প্রকাশ পায়, তাহাই রাত্রিতে সূর্য্য-মণ্ডলের দৃশ্য-সীমা হইতে অন্তর্দ্ধানের পর চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া নৈশতম বিনাশ করিয়া চরাচর প্রকাশ করে।

যাঁহারা বেদের চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই এই মন্ত্র বিদ্যমান। অতিসাহসী

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণও প্রথম মণ্ডলের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিতে সাহস করেন নাই। সুতরাং 'প্রক্ষিপ্ত' বা 'আধুনিক' বলিবার সুবিধা নাই।

এই সত্যটী বেদসঙ্গত বলিয়াই পরবর্ত্তিকালের বেদানুবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অসঙ্কোচে ইহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। জ্যোতিষগ্রন্থে দেখা যায়।— "সলিলময়ে শশিনি রবের্দীধিতয়ো মূর্চ্ছিতাস্তমো নৈশং ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদরনিহিতা ইব মন্দিরস্যান্তঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, যেমন দর্পণনিহিত রবিরশ্মি, মন্দিরমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তত্রত্য অন্ধকার বিনাশ করে, তদ্রূপ সলিলময় (অর্থাৎ স্বচ্ছ) চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি, নৈশ অন্ধকার নাশ করে। এখানে আমরা স্পষ্টই বেদমন্ত্রের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। চন্দ্র 'জলময়' একথা অনেকের নিকট অনাদৃত হইতে পারে, কিন্তু সায়নাচার্য্য "উদকময়ে স্বচ্ছে" লিখিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদের "সলিলময়ে" অর্থও "স্বচ্ছে"। স্বচ্ছতা বুঝাইতে 'জলের মত' বলা নূতন নয়। আর চন্দ্র যে বহুকাল পূর্ব্বে জলময় থাকিতে পারে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? বর্ত্তমানে শুনি, সুধাকর চন্দ্র নাকি মরুভূমিময়; কিন্তু পূর্ব্বে যে স্থান জলময় ছিল, পরে তাহা মরুভূমিতে পরিণত হওয়া অসম্ভব কি?

শ্রী—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০

অন্বয়। হে কৃষ্ণ অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি (হে) বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশজ) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে। ৪০।

বঙ্গানুবাদ। হে কৃষ্ণ, কুল অধর্ম্মাভিভূত হইলে স্ত্রীগণ দুষ্ট হয়। স্ত্রীগণ দুষ্ট হইলেই কুলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। ৪০

আলোচনা। কুলধর্ম্ম—শাসন-বন্ধন না থাকিলেই স্বেচ্ছাচারিতা ও স্ত্রীস্বাধীনতা জন্মে। স্বেচ্ছাচারিণী রমণী, কখন স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। ৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪২

অন্বয়। সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্করঃ) কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব (ভবতি) এষাং (কুলঘ্নানাং) লুপ্ত-পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (উচ্ছিন্ন-শ্রাদ্ধাদিকার্য্যাঃ) পিতরঃ পতন্তি। এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ কুলঘ্নানাং শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে) ৪১। ৪২

বঙ্গানুবাদ। বর্ণসঙ্কর, কুলঘ্নদিগের কুলের নরকের কারণ হয়। পিণ্ডতর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদের পিতৃপিতামহগণ নরকে পতিত হয়েন। কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্কর-কারক দোষে সনাতন জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। ৪১। ৪২

আলোচনা। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রের দ্বারা দ্বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। প্রথম বংশ-রক্ষা (বংশ-রক্ষা না হইলে সংসার-রক্ষা হয় না; পক্ষান্তরে গার্হস্থ্যাশ্রমরক্ষা হয় না।) দ্বিতীয় পিণ্ডোদকাদি-লাভ। পুত্র, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পরলোকগত পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধন করেন। এই পুত্র, শাস্ত্রবিধিবিহিত হওয়া চাই। কুলস্ত্রিদিগের ব্যবহার-দোষে বর্ণ-সঙ্কর জন্মে, তাহাতে একদিকে যেমন গার্হস্থ্যাশ্রমের সমাজবন্ধনের বিশৃঙ্খলতা ঘটে, তেমনি জারজ পুত্রগণও পিণ্ডোদকাদি দানের অধিকারী নহেন—এবম্প্রকারে কুলস্ত্রিদিগের দোষে বর্ণ-সঙ্করের জন্ম হেতু কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের লোপ হয়। ৪১। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম। ৪৩।

অন্বয়। (হে) জনার্দ্দন উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (শ্রুতবন্তোবয়ং) ৪৩।

বঙ্গানুবাদ। হে জনার্দ্দন, আমরা শুনিয়াছি যে, যাহাদের কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়, তাহাদের চিরদিন নরকে বাস করিতে হয়। ৪৩।

আলোচনা। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রমে কুলস্থ কুপুত্রগণের কৃতকার্য্যের ফল কেবল মাত্র সেই কুপুত্রগণই ভোগ করেন না, তাঁহাদের পিতৃগণকেও ভোগ করিতে হয়। ৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখ-লোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ। ৪৪

অন্বয়। অহোবত (খেদে) বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ (অধ্যবসিতাঃ) যত্ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ ৪৪।

বঙ্গানুবাদ। আহা কি কষ্ট! আমরা রাজ্য-সুখ-লোভে স্বজনগণকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি; কি মহৎ পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! ৪৪।

আলোচনা। লোভই মনুষ্যকে পাপে লিপ্ত করে। রাজ্য লোভে অর্জ্জুন, স্বজন-হত্যারূপ পাপে লিপ্ত হইতেছেন মনে করিয়া, কষ্টানুভব করিলেন। ৪৪।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫

অন্বয়। যদি অপ্রতীকারং (অকৃতপ্রতীকারং) অশস্ত্রং (শস্ত্রত্যাগিনং) মাং শস্ত্র-পাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ (নাশয়েযুঃ) তৎ মে ক্ষেমতরং (শ্রেয়ঃ) ভবেৎ। ৪৫।

বঙ্গানুবাদ। প্রতীকার-পরাঙ্মুখ নিরস্ত্র আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধে বধ করে; তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গল-জনক হইবে। ৪৫।

আলোচনা। অর্জ্জুন মনে করিলেন, আমি নিশ্চেষ্ট থাকিলেও যদি কৌরবেরা আমাকে বধ করে, তাহা হইলে আমি একাই মরিব, স্বজন-গণ রক্ষা পাইবেন। কুলধর্ম্ম-রক্ষা হইবে। আমার একার মৃত্যুতে যদি বহু স্বজনের জীবন-রক্ষা ও কুলধর্ম্ম-রক্ষা হয়, তাহাতে স্বল্পক্ষতির মূলীভূত প্রভূত মঙ্গল হইবে। ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক-সংবিগ্ন মানসঃ॥ ৪৬

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ। অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা শোক-সংবিগ্নমানসঃ (শোকব্যাকুল-চিত্তঃ) সংখ্যে (সংগ্রামে) সশরং চাপং (ধনুঃ) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) রথোপস্থে (রথ-স্যোপরি) উপাবিশৎ। ৪৬।

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন—অর্জ্জুন এই প্রকার বলিয়া, শোকাকুল চিত্তে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি উপবেশন করিলেন। ৪৮

আলোচনা। অর্জ্জুনকে সঞ্জয়ের মুখে "শোকসংবিগ্নমানসঃ" বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্জ্জুন শোকাকুল নহেন। তিনি ধীর, জ্ঞানী, ত্যাগী; তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানিচ।" ৪৮

অর্জ্জুনবিষাদযোগ নামক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত।

আবাহন।

কোথা হ'তে তুমি ডাকিছ আমায়ে ?
অতীতের পথে কিম্বা সিন্ধু-পারে
কোথা আছ সখা,
আসি দাও দেখা ;
তুমি কোন্ জন কহগো নিশ্চয় ;
এস এস হেথা নিরখি তোমায়।

সুদূর হইতে আসে তব স্বর,
কেন বা সে স্বরে উদাস অন্তর ?
হেন মনে উঠে
যাই তথা ছুটে
যথা হ'তে আসে মধুর আশ্বাস।
সে আশ্বাসে ঘুচে কত হা-হুতাশ।

আসে আবাহন সুধীর সমীরে
বরিষে পীযুষ অন্তর-মাঝারে—
"এস এস হেথা,
নাহি রবে ব্যথা,
বরষিবে সুধা তাপিত পরাণে,
জুড়াবে পরাণ সুখের মিলনে।"

আহা কি মধুর আশ্বাস তোমার
ঢালে যেন প্রাণে শান্তি-সুধাসার !
দেখিবারে চাই,
দেখিতে না পাই,—
ভোলা কথা কত জাগেরে পরাণে ;
চাহি শূন্য পানে উদাস নয়নে।

কত যে বেদনা পেয়েছি জীবনে
আছে স্মৃতি-রেখা কহিব কেমনে ?
অতীত সে কথা,
দেয় প্রাণে ব্যথা,—
তিতি অশ্রুনীরে একা এ প্রান্তরে।
কে দয়ালু তুমি ভোলাও আমারে ?

স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশন-যাতনা,
কাতর পরাণে আর ত সহেনা ;
এসে দেখা দেও,
হাতে ধ'রে লও,
জুড়াও আমার তাপিত জীবন,
হউক্ সার্থক তব আবাহন।

শ্রীআশুনাথ কাব্যতীর্থ।

রামানুজ-মত।

অদ্বৈতবাদ যেমন সমাদৃত, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ তদ্রূপই সমাদৃত। অদ্বৈতবাদে শঙ্করাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে রামানুজাচার্য্য। রামানুজ স্বামী, বেদান্তসূত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাকার। ইঁহার কৃত ব্রহ্মসূত্রে

ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। ইনি জ্ঞানী ও ভক্ত; একাধারে বৈদন্তিক ও বৈষ্ণব। সংসার ও সন্ন্যাস এই উভয় ভাবই ইঁহার জীবনে পাওয়া যায়। ইনি বিবাহিত। যুবতী ভার্য্যার যথাযথ রক্ষা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া সন্ন্যাসী হয়েন। রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তেমন প্রচলিত ছিল না। ইঁহার পূর্ব্বে আচার্য্য "বোধায়ন" ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈত পক্ষে একটি ভাষ্য করেন। সেই ভাষ্য এক্ষণে অপ্রাপ্য। এতদ্ভিন্ন দ্রমিড়াচার্য্য, বাক্যকার টঙ্ক প্রভৃতি এই মতের পরিপোষক। বাল্যকালে রামানুজাচার্য্যের নাম ছিল "লক্ষ্মণ"।

অদ্বৈতবাদিমতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ভিন্ন কিছু নাই। ব্রহ্ম সত্য, জীব-সংঘাত ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঔপাধিক ভ্রান্তি-প্রসূত, স্বপ্নবৎ মিথ্যা। শুক্তিতে রজতের যেমন প্রতিভাস, এই ব্রহ্মে জগতের তদ্রূপই প্রতিভাস।

ভেদবাদিমতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ পরমাণ্বাদি। জীব প্রত্যেকে ভিন্ন, ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত ভিন্ন। জীব, কখন ব্রহ্ম ছিল না, হইবে না।

বিশিষ্টাদ্বৈত ঠিক্ অদ্বৈত বা দ্বৈত নহে। রামানুজস্বামী অদ্বৈত অর্থাৎ একেরই অস্তিত্ব মানেন, তবে সে অদ্বৈত, এক—বিশিষ্ট। জীবজগদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য। বিশিষ্ট অদ্বৈত সত্য। অদ্বৈত ত্যাগ করিয়া যে বিশেষণ থাকে—যথা জীব-জগৎ তাহা সত্য নহে; আবার জীব জগৎ—এই বিশেষণ ছাড়িয়া ব্রহ্ম যে একমাত্র সত্য, তাহাও নহে। ব্রহ্ম, জীব, জগৎ "এই তিনে মিলিয়া এক" আটী শাঁস খোঁসা—এই তিনটির মধ্যে কাহাকেও ছাড়িয়া আম্র ফল নহে, আম্র ফল—এই তিনের সমষ্টি। জীব-জগৎ-সমবায়ে ব্রহ্ম—বিশিষ্টাদ্বৈত।

রামানুজমতে পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। পরমেশ্বর সগুণ, সবিশেষ, সত্য-কাম, সত্যসঙ্কল্প। কল্যাণকরত্বাদি গুণ, পরমেশ্বরের স্বাভাবিক। হেয় গুণের সম্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হয় না বলিয়া মাহাত্ম্য-খ্যাপনার্থ "নির্গুণ" বলিয়া স্তব করাও হইয়া থাকে। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং" সত্য জ্ঞান আনন্দ দ্বারা তিনি বিশেষিত হয়েন বলিয়া সবিশেষ। তিনি জগতের স্রষ্টা, পালক সংহর্ত্তা—এই স্রষ্টৃত্ব, পালকত্ব ও সংহর্ত্তৃত্ব ইঁহার স্বাভাবিক গুণ। এই সগুণই এক মাত্র উপাস্য। উপাস্যের উপাসনাই জীবের পরমধর্ম্ম। এই উপাসনা দ্বারাই জীব পরমেশ্বরের কৃপালাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

মুক্তি—চিরকৈঙ্কর্য্য। উপাসনার দ্বারা শ্রীভগবানের কৃপালাভ করাই জীবের পুরুষার্থ। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থ-জ্ঞান পরোক্ষ। পরোক্ষ বাক্যার্থজ্ঞান হইতে মুক্তি অসম্ভব। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত মুক্তি হয় না। সেই কৃপা ভক্ত, উপাসনা দ্বারা লাভ করিবেন। সগুণ পরমেশ্বরের উপাসনা—ভক্তি একার্থক। ইহার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। ধ্যান ও উপাসনা একার্থক হইলেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ধ্যান ধ্রুবা স্মৃতি। সগুণ উপাস্যে চিত্তের একাগ্রীকরণই ধ্যান। তাহাই উপাসনার প্রথমাবস্থা।

পরমেশ্বর, জীব ও জগৎ—এই তিনই এমতে স্বীকার করা হইয়াছে। জীব—চিৎ। জগৎ—অচিৎ। চিৎ ও অচিৎ এই দ্বিবিধ পদার্থ। এই চেতনাচেতন দ্বিবিধ পদার্থ পরমেশ্বরের শরীর-স্থানীয়। পরমেশ্বর শরীরী। জীব জগতের সহিত পরমেশ্বরের শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ। অচিদ্বস্তু জড়, জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডই অচিৎ। অচিৎ—কারণাবস্থায় নামরূপহীন অতএব সূক্ষ্ম; কার্য্যাবস্থায় নাম রূপযুক্ত অতএব স্থূল। পরমেশ্বর কারণ, জীব-জগৎ তাঁহার কার্য্য।

আচার্য্য রামানুজ, জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী ও বিরুদ্ধবাদী, ভগবদারাধনাত্মক কর্ম্ম দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তি মানিয়াছেন। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, জ্ঞানোৎপত্তির জনক। কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর ক্রম-সম্বন্ধবিশিষ্ট। পুণ্যপাপাত্মক কাম্য কর্ম্মই জ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী। এই জ্ঞানোৎপত্তি—বিরোধি কর্ম্ম, জ্ঞানের সহিত একত্র থাকে না। কর্ম্ম বন্ধনের মূল বটে, কিন্তু সেই বন্ধকত্বশক্তি যে কর্ম্মের থাকে না—তাহা জ্ঞানোৎপত্তির কারণ আরাধনাত্মক কর্ম্ম। ইহার নাম ধর্ম্ম। ইহা বন্ধনের ছেদক হয়। 'কর্ম্মণা সংসিদ্ধিং গতাঃ' কর্ম্ম দ্বারাই জনকাদি মুক্ত হয়েন। শ্রীভগবানের আরাধনাত্মক কর্ম্ম, মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়।

অনুভূতি শঙ্করমতে স্বপ্রকাশ, নিত্য। অনুভূতি অন্য অনুভূতি দ্বারা প্রকাশ্য হইতে পারে না। ঘটাদি পদার্থই অনুভূতির প্রকাশ্য বিষয়। অনুভূতি যদি অনুভূতির প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থ হইতে ইহার পার্থক্য থাকে না। আরও অনুভূতি অনুভূতিরই প্রকাশ্য, আবার ঐ অনুভূতিও অন্য অনুভূতির প্রকাশ্য—এইরূপে অনুভূতির অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে।

রামানুজ বলেন "অনুভূতি, অনুভূতি দ্বারা প্রকাশ্য হইলেই ঘটাদি পদার্থের মত হইবে কেন? অনুভূতি দ্বারা যাহা প্রকাশ্য নহে তাহাই যদি অনুভূতি হয়, তবে আকাশ-কুসুমাদিও অনুভূতি হউক। কারণ, আকাশকুসুমাদি ত অনুভূতির প্রকাশ্য হয় না। অনুভূতি জন্য। "আমি অনুভব করিয়াছিলাম"—এইরূপ অতীত বিষয়ে অনুভূতি; "অনুভব করিতেছি"—এই বর্ত্তমান বিষয়েও অনুভূতি হইতে দেখা যায়, তখন ইহা ত জন্য। "অনুভব করিয়াছিলাম"—এইরূপ অনুভব যে এক্ষণে করিতেছি; তখন বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানকালীন অনুভব সাহায্যে অতীতানুভব জন্মিতেছে, তখন অনুভূতি অনুভূতি-জন্যই হইল। অনুভূতি স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। কারণ ইহার প্রকাশ অন্যের অধীন। অনুভব একপ্রকার নহে। অতীত অনুভব ও বর্ত্তমান অনুভবের একত্ব নাই যে অনবস্থা হইবে। অনুভব—জ্ঞান এমতে জন্য। অনুভূতির বিচারে রামানুজ বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

এমতে অজ্ঞান, জ্ঞানের অভাব মাত্র। জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অভাব—অর্থাৎ জ্ঞানের প্রাগভাবই অজ্ঞান। অজ্ঞান অবশ্য শঙ্করমতে জ্ঞানের প্রাগভাব ব্যতীত পৃথক্ ভাব-পদার্থ বটে, কিন্তু এইমতে অজ্ঞান—জ্ঞানের অভাব পদার্থই। এই

স্বভাবই অবিদ্যা। আর এই অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয়া—ইহা স্বীকৃত হয় নাই। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করতঃ—অর্থাৎ জ্ঞানাশ্রিতা হইয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে না। কারণ, ব্রহ্ম জ্ঞানের আধার। যাহা জ্ঞানের আধার, তাহা জ্ঞান-স্বরূপ হইলে জ্ঞেয় ও জ্ঞানের কোন পার্থক্য থাকে না। অজ্ঞান ও জ্ঞান একাশ্রয়ে থাকে না বলিয়া অজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে শঙ্করমতেও থাকিতে পারে না।

জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞাতার ধর্ম্ম। "জ্ঞোঽতএব" আত্মাই জ্ঞাতা। জ্ঞাতৃত্ব—জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব—দেহ বা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইতেই পারে না; কারণ জ্ঞাতৃত্ব চেতনেরই ধর্ম্ম, জড়ের নহে। জড়ে কখনই চেতন-ধর্ম্ম থাকে না। শঙ্করমতে, "জ্ঞাতৃত্ব আত্ম-চৈতন্যবৎ প্রতীয়মান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম" ইহা অসম্ভব। পরমার্থতঃ যখন নির্গুণ নির্ব্বিশেষ আত্মাই শঙ্করমতে স্বীকৃত, তখন বাস্তবিক জ্ঞাতৃত্ব, আত্মার ধর্ম্ম না হইতে পারে, কিন্তু অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হয় কি করিয়া? আত্মার যাহা নাই, আত্ম-চৈতন্য বশতঃ তাহার উৎপত্তি হইবে কি প্রকারে? জ্ঞাতৃত্ব আত্মার নহে, অথচ জড় অন্তঃকরণেরও নহে, তবে পরস্পর আরোপে জ্ঞাতৃত্ব আসে কোথা হইতে?

জ্ঞাতৃত্ব—জ্ঞানগুণের আশ্রয়ত্ব, আত্মা—জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানগুণের আশ্রয়। আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানও নিত্য। পরমেশ্বর নিত্য জ্ঞানের আশ্রয়। মণি—তেজঃ পদার্থ, স্বভাবতই প্রভার আশ্রয়, আত্মা তদ্রূপ স্বভাবতই জ্ঞাতা।

জীবাত্মাও জ্ঞাতা। তবে জীবের যে জ্ঞাতৃত্ব—জ্ঞানধর্ম্ম, তাহা কর্ম্মানুসারে সঙ্কুচিত বৰ্দ্ধিত হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তির আবির্ভাব ও নিরোধন হেতু জ্ঞানেরও বিকাশ-সঙ্কোচ ঘটে। "আমি জানি" অহং পদার্থই জ্ঞাতা, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই অহং—পদার্থই আত্মা। অহং পদার্থ সুষুপ্তিকালে তমোগুণে অভিভূত থাকায় তৎকালে বাহ্যবস্তুর প্রতীতি হয় না বটে, কিন্তু অহংভাব তখন বিলুপ্ত হয় না, সূক্ষ্মভাবে অনুভব হয়। বিষয়ী আত্মা থাকে, তবে বিষয়—বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ঘটে না বলিয়া অহংভাবের উপলব্ধি হয় না। সুষুপ্তির অন্তে আমরা জাগ্রত হইয়া বুঝিতে পারি যে, "কি সুখেই নিদ্রা গিয়াছিলাম!" তৎকালে আত্মস্ফূর্ত্তি বিদ্যমানই ছিল। জগৎ, ব্রহ্মাত্মক—কারণ, জগতের অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান। "সূত্রে মণিগণা ইব" জগতে ওতঃপ্রোত ভাবে ব্রহ্ম অবস্থিত থাকেন বলিয়া জগৎ ব্রহ্মাত্মক। জগৎ ও ব্রহ্মের একত্বনিবন্ধন ঐক্য নহে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপক ব্রহ্ম। এই জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের বিভূতি মাত্র—গীতার "পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টই অভিহিত হইয়াছে।

জীবন্মুক্তি রামানুজ স্বীকার করেন না। সশরীর থাকিলেই সশরীরত্বজ্ঞান থাকিবে। সশরীরত্বই বন্ধ, অশরীরত্বই মোক্ষ। কারণীভূত অবিদ্যা বশতঃ কামকর্ম্মাদি দোষ। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে জীবাত্মার নিক্রামণ হইলে পরে মোক্ষ। ঐ নিক্রমণই মোক্ষের দ্বার। অতএব সশরীর অবস্থায় মোক্ষ সম্ভব নহে।

জীবিতকালে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে যতদিন শরীর-পাত না হয়, ততদিন মুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়।

রামানুজস্বামীর কয়েকটি মত সংক্ষেপে স্থূলভাবে উপস্থাপিত করিলাম। ইচ্ছা রহিল, অন্যান্য মতগুলিও আলোচনা করিব। রামানুজ স্বামী প্রধানতঃ শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, শঙ্করাচার্য্য ন্যায় সাংখ্য ও বৌদ্ধ-দর্শনাদি স্বীয় অমোঘ যুক্তিবলে ও শ্রুতি-সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন; আমি যদি শঙ্কর-দর্শন খণ্ডন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। এই বোধে রামানুজাচার্য্য, শঙ্কর ব্যতীত অপর কোন বাদীর সহিত বড় বিচার করেন নাই! রামানুজ-দর্শন বুঝা, শঙ্কর দর্শনের সহিত তুলনায় সমালোচনা ব্যতীত সম্ভব নহে।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ



নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

হরিরুবাচ।

পুত্রাচ্ছতগুণং স্নেহাদ্রাজানং চ ভয়াদথ।
আরাধয়েৎ পতিং শৌরিং যা পশ্যেৎ সা
পতিব্রতা॥৪১৯

হরি কহিয়াছিলেন,—নারী পতিকে পুত্র হইতে শতগুণ স্নেহ করিবেন ও ভয় বশতঃ রাজার আরাধনার ন্যায় আরাধনা করিবেন; যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনি পতিব্রতা।৪১৯

কার্য্যে দাসী রতৌ বেশ্যা ভোজনে জননী-
সমা।
বিপৎসু মন্ত্রিণী ভর্ত্তুঃ সা চ ভার্য্যা পতি-
ব্রতা॥৪২০

কার্য্যে দাসী, রতিতে বেশ্যা ও ভোজন-কালে জননী এবং বিপৎকালে পতির মন্ত্রিণী স্বরূপা হইলেই সেই ভার্য্যা পতিব্রতা।৪২০

ভর্ত্তুরাজ্ঞাং ন লঙ্ঘেদ্ যা মনোবাক্-কায়-
কর্ম্মভিঃ।
ভুক্তে পতৌ সদা চাত্তি সা চ ভার্য্যা পতি-
ব্রতা॥৪২১

মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা যিনি পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না; যিনি, পতি ভোজন করিলে পরে ভোজন করেন, তিনিই পতিব্রতা ভার্য্যা।৪২১

যস্যাং যস্যাং তু শয্যায়াং পতিঃ স্বপিতি
যত্নতঃ।
তত্র তত্র চ সা ভর্ত্তুরর্চ্চাং করোতি নিত্যশঃ
॥৪২২

যে যে শয্যায় পতি নিদ্রা যান, সেই সেই শয্যায় তিনি যত্ন পূর্ব্বক পতির সেবা করেন।৪২২

নৈব মৎসরতাং যাতি ন কার্পণ্যং ন মানিনী।
মানেঽমানে সমানত্বং যা পশ্যেৎ সা পতি-
ব্রতা॥৪২৩

যিনি বিদ্বেষ করেন না, অসন্তুষ্টা হন না, মানিনী হন না ও মান অপমান সমান জ্ঞান করেন, তিনি পতিব্রতা।৪২৩

সুবেশং যা নরং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং পিতরং সুতম্।
মন্যতে চ পরং সাধ্বী সা চ ভার্য্যা পতি-
ব্রতা॥৪২৪ (ন)

যিনি ভ্রাতা, পিতা, পুত্র প্রভৃতিকে

(ন) পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ৪৭ অধ্যায়

সুবেশ দেখিলে "পর" বিবেচনা করেন, সেই ভার্য্যাই পতিব্রতা। ৪২৪

পুণ্যা স্ত্রী কথ্যতে লোকে যা স্যাৎ পতি-পরায়ণা।
যুবতীনাং পৃথক্তীর্থং বিনা ভর্ত্তুঃ দ্বিজোত্তম।
সুখদং নাস্তিবৈ লোকে স্বর্গমোক্ষ-প্রদায়কম্॥ ৪২৫

সব্যং পাদং স্বভর্ত্তুশ্চ প্রয়াগং বিদ্ধি সত্তম।
বামং চ পুষ্করং তস্য যা নারী পরিকল্পয়েৎ॥ ৪২৬

তস্য পাদোদক-স্নানাৎ তৎ পুণ্যং পরিজায়তে।
প্রয়াগ-পুষ্কর-সমং স্নানং স্ত্রীণাং ন সংশয়ঃ॥ ৪২৭

সুকলা নামে কোন বৈশ্যপত্নী তাঁহার পতিকে কহিয়াছিলেন—যে রমণী পতি-পরায়ণা, লোকে তাঁহাকে পুণ্যবতী কহিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! পতি ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ তীর্থ নাই; এই সংসারে পতি ব্যতিরেকে স্বর্গ-মোক্ষপ্রদা-য়ক সুখদাতা অন্য কেহ নাই। রমণী, পতির দক্ষিণ পদ পুষ্করতীর্থ ও বামপদ প্রয়াগ তীর্থ বলিয়া জানিবেন; পতি-পাদোদকে স্নান করিলে, সেই সেই তীর্থ-স্নানের ফল হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। ৪২৫ ৪২৬। ৪২৭

সর্ব্বতীর্থসমো ভর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মময়ঃ পতিঃ।
মখানাং যজনাৎ পুণ্যং যদ্ বৈ ভবতি দীক্ষিতে।
তৎ সর্ব্বং সমবাপ্নোতি ভর্ত্তুশ্চৈব হি সাম্প্রতম্॥ ৪২৮

পতি সকল তীর্থের সমান, পতি সর্ব্বধর্ম্মময়। যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে যে পুণ্য হইয়া থাকে, পতি হইতে পত্নী, সেই সমুদায় পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪২৮

প্রয়াগং পুষ্করং চৈব যাত্রাং কৃত্বা হি যল্লভেৎ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণাদপি॥ ৪২৯

প্রয়াগ ও পুষ্করতীর্থে যাত্রা করিলে, যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পতিশুশ্রূষায় সাধ্বী সেই সমুদায় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪২৯

সমাসেন প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
নাস্ত্যস্যা হি পৃথগ্ধর্ম্মঃ পতিশুশ্রূষণং বিনা (প)॥ ৪৩০

সংক্ষেপে সমুদায় কহিতেছি শ্রবণ করুন, পতিশুশ্রূষা ভিন্ন রমণীদিগের পৃথক্ ধর্ম্ম নাই। ৪৩০

সুপুত্রা সুযশা নারী পরিকথ্যেত বৈ সদা।
তুষ্টে ভর্ত্তরি সংসারে দৃশ্যা নারী ন সংশয়ঃ॥ ৪৩১

সুকলা নামে বৈশ্যপত্নী তাঁহার পতিকে কহিয়াছিলেন—সংসারে যে রমণীর প্রতি পতিকে সন্তুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সকলে সুপুত্রা কহিয়া থাকেন ও সকলে সতত তাঁহার যশ কীর্ত্তন করেন ইহাতে সংশয় নাই। ৪৩১

পতিহীনা যদা নারী ভবেৎ সা ভূমিমণ্ডলে।
কুতস্তস্যাঃ সুখং রূপং যশঃ কীর্ত্তিঃ সুতা ভুবি॥ ৪৩২

এই পৃথিবীতে যখন নারী পতিহীনা হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার সুখ, রূপ ও যশঃ কীর্ত্তি কোথায়? ৪৩২

(প) পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ৪১ অধ্যায়ে

যদস্তি ভূতলে লোকাঃ পুংশ্চলীয়ং ন সংশয়ঃ।
॥ ৪৩৯ (ক)

মহাভাগ্যবতী রমণী পতির নিমিত্ত ব্রত ও মঙ্গলকার্য্য করিয়া থাকেন। পতি গত হইলে, রমণী যদি বেশ-ভূষা করেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বৃথা শ্রমতুল্য হইয়া থাকে। সংসারে তাহাকে সকলে "পুংশ্চলী" কহিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই।৪৩৮,৪৩৯

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি সতীনাং ব্রতমুত্তমম্।
কুরূপো বা কুবৃত্তো বা সুস্বভাবশ্চ বৈ পতিঃ
॥ ৪৪০

রোগান্বিতঃ পিশাচো বা ক্রোধনো বাপি মদ্যপঃ।
বৃদ্ধো বাথ বিদগ্ধো বা মূকোঽন্ধো বধিরোঽপি বা॥ ৪৪১

রৌদ্রো বাথ দরিদ্রো বা কদর্য্যঃ কুৎসিতোঽপি বা।
কাতরঃ কিতবো বাপি ললনালম্পটোঽপি বা॥ ৪৪২

সততং দেববৎ পূজ্যঃ সাধ্ব্যা বাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।
ন জাতু বিষমং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়া কার্য্যং কথঞ্চন
॥ ৪৪৩

হে রাজন্! সতীরমণীগণের উত্তম ব্রত বলিব শ্রবণ কর। পতি কুরূপ হউন বা কদাচারী হউন বা সুস্বভাবযুক্ত হউন, রোগান্বিত, পিশাচ, ক্রোধযুক্ত বা মদ্যপায়ী হউন; বৃদ্ধ বা রসিক, বা, মূক বা অন্ধ বা বধির হউন, কর্কশ বা দরিদ্র বা কদর্য্য বা কুৎসিত হউন; কাতর বা শঠ বা লম্পট হউন, সাধ্বী স্ত্রী বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা

সুদৌর্ভাগ্যং মহদ্দুঃখং সংসারে পরিভুঞ্জতে।
পাপভাগা ভবেৎ সা চ দুঃখাচারা সদৈব হি
॥ ৪৩৩

তিনি সংসারে দৌর্ভাগ্য ও মহদ্দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন; তিনি সংসারে সতত পাপভাগিনী ও দুঃখিনী হইয়া থাকেন। ৪৩৩

তুষ্টে ভর্ত্তরি তস্যাস্তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
তুষ্টে ভর্ত্তরি তুষ্যন্তি ঋষয়ো দেবমানবাঃ॥৪৩৪

পতি সন্তুষ্ট থাকিলে সমুদায় দেবতা সন্তুষ্ট থাকেন; পতি সন্তুষ্ট থাকিলে ঋষি, দেব ও মানবগণ সন্তুষ্ট থাকেন। ৪৩৪

ভর্ত্তা নাথো গুরুর্ভর্ত্তা দেবতা দৈবতৈঃ সহ।
ভর্ত্তা তীর্থশ্চ পুণ্যশ্চ নারীণাং নৃপনন্দন॥৪৩৫

হে নৃপনন্দন! রমণীগণের পতি নাথ (স্বামী), পতি গুরু ও দেবতার সহিত দেবতা, পতি তীর্থ ও পতিই পুণ্য। ৪৩৫

শৃঙ্গারং ভূষণং রূপং বর্ণসৌগন্ধ্যমেব চ।
কৃত্বা সন্তিষ্ঠতে নিত্যং বর্জয়িত্বা সুপর্ব্বসু॥৪৩৬

রমণীগণ পর্ব্ব-ব্যতিরেকে আপন শরীর নিত্য বেশভূষাযুক্ত ও সৌগন্ধযুক্ত করিয়া রূপবতী হইয়া থাকেন। ৪৩৬

শৃঙ্গারৈর্ভূষণৈঃ সা তু শুশুভে সা যদা পতিঃ।
পত্যা বিনা ভবত্যেবং ক্ষীরং সর্পমুখে যথা
॥ ৪৩৭

পতি জীবিত থাকিলে রমণী, বেশ-ভূষায় শোভা পান, কিন্তু পতিভিন্ন বেশ-ভূষা সর্পমুখে দুগ্ধের ন্যায় নিন্দনীয় হইয়া থাকে। ৪৩৭

ভর্ত্তুরর্থে মহাভাগা সুব্রতা চারুমঙ্গলা।
গতে ভর্ত্তরি যা নারী শৃঙ্গারং কুরুতে যদি।
রূপং বর্ণং চ তৎ সর্ব্বং শ্রমরূপেণ জায়তে
॥ ৪৩৮

(ক) পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে ৪১ অধ্যায়ে

দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা করিবেন। রমণী কখনও পতির বিপরীত আচরণ করিবেন না। ৪৪০-৪৪৩

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাঽপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥ ৪৪৪

রমণী নিজগৃহেও কি বাল্যকালে কি যৌবনে কি বৃদ্ধকালে কখনও স্বাধীনা হইবেন না। ৪৪৪

অহঙ্কারং বিহায়াথ কামক্রোধৌ চ সর্ব্বদা।
মনসো রঞ্জনং পত্যুঃ কার্য্যমন্যস্য বর্জ্জনম্॥ ৪৪৫

রমণী সর্ব্বদা অহঙ্কার কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পতির মনোরঞ্জন করিবেন। ৪৪৫

সকামং বীক্ষিতাঽপ্যন্যৈঃ প্রিয়ৈর্বাক্যৈঃ প্রলোভিতা।
স্পৃষ্টা বা জন-সংমর্দ্দে ন বিকারমুপৈতি যা॥ ৪৪৬

পুরুষং সেবতে নান্যং মনোবাক্-কায়-কর্ম্মভিঃ।
লোভিতাপি পরেণার্থৈঃ সা সতী লোক-ভূষণম্॥ ৪৪৭

যে রমণী অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক সকাম ভাবে দৃষ্টা কিম্বা অন্য দ্বারা প্রিয় বাক্যে প্রলোভিতা বা লোক সমূহ দ্বারা স্পৃষ্টা হইয়া মনে বিকার প্রাপ্ত হন না; যিনি মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা ও পরপুরুষ কর্ত্তৃক অর্থদ্বারা লোভিতা হইয়াও অন্য পুরুষকে সেবা করেন না, সেই সতী রমণীই সংসারের ভূষণস্বরূপ। ৪৪৬। ৪৪৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

ব্রাহ্মণের হলচালনা।

অনেকে মনে করেন, "প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণসমাজের প্রত্যেক লোকই বৃক্ষবল্কল পরিধান করিয়া, বন্যফল ও নদী-প্রস্রবণের জলের সাহায্যে প্রাণধারণ করিতেন, আর বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যানধারণা ও বেদান্তচর্চ্চা করিতেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণ উদরান্নের জন্যই বিপন্ন, সুতরাং তপজপ বেদবেদান্ত ছাড়িয়া চাকরী কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই সমাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।"

আমরা কিন্তু অবনতমস্তকে একথা অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ, মাত্র তপজপ-ধ্যান-ধারণা, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হইতে পারে, কিন্তু কোনও আদর্শ সমাজেও সম্প্রদায় বিশেষের বা সামাজিক সাধারণের সম্পৎ হইতে পারেনা। কোনও সমাজের সকল লোক, সন্ন্যাসী হইতে পারেনা। গৃহস্থের সমাজে সকলেই মাত্র বেদবেদান্ত লইয়া কাটাইতে পারেনা। পারা অসম্ভব বলিয়াই পারেনা, একথা যেমন সত্য, শাস্ত্রও সকলকে সেরূপ অধিকার দেন না বলিয়া পারেনা, ইহাও তদ্রূপ সত্য। আমরা রামায়ণের যুগে ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই। রামায়ণের যুগ ভারতের উন্নতির যুগ। কি আধ্যাত্মিক, কি লৌকিক, সকল বিষয়েই রামায়ণের যুগ আদর্শস্থানীয়।

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে বাল্মীকি "লাঙ্গলী" ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। রাম, পত্নী ও ভ্রাতা লইয়া বনগমনে উদযোগী হইয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতেছেন শুনিয়া,

ত্রিজটনামক এক লাঙ্গল-কুদ্দাল-ধারী ব্রাহ্মণ, নিজপত্নীর অনুরোধে রামের নিকট যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিলেন, এইরূপ বিবরণ বাল্মীকি লিপীবদ্ধ করিয়াছেন। অযোধ্যাকাণ্ডের সেই শ্লোক এই—তত্রাসীৎ পিঙ্গলোগার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ। ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফাল-কুদ্দাল-লাঙ্গলী। তং বৃদ্ধং তরুণী ভার্য্যা বালানাদায় দারকান্। অব্রবীদ্ব্রাহ্মণং বাক্যং স্ত্রীণাং ভর্ত্তাহি দেবতা। অপাস্য ফালং কুদ্দালং কুরুষ্ব বচনং মম ইত্যাদি। লাঙ্গল-কুদ্দাল-বান্ ক্ষতবৃত্তি ত্রিজট ব্রাহ্মণের যুবতীপত্নী, শিশুসন্তানগুলি লইয়া বৃদ্ধপতির কাছে গিয়া বলিল "স্বামীই স্ত্রীগণের দেবতা, আপনি লাঙ্গল, কুড়ুল ছাড়িয়া আমার কথা শুনুন, রামচন্দ্রের নিকট ভিক্ষা করিতে যান্।' এখানে একটা কথা আছে ত্রিজট "ক্ষতবৃত্তি" ছিলেন। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, ত্রিজট আপদ্ধর্ম্মের সেবা করিতেছিলেন। তিনি বিপ্রবৃত্তি এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি, কোনওটির দ্বারাই জীবিকার্জ্জনে সমর্থ না হওয়ায় বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যাপারটা নূতন নহে। কিন্তু, তাঁহারা ভাবিবেন যে, রাজা দশরথের রাজত্ব-সময়ে রামায়ণীয় যুগেও যদি ব্রাহ্মণগণ আপৎকালের সাক্ষাৎ পাইতেন, তবে ত মূলেই গোল। বিহিত উপায় দ্বারা ধনার্জ্জন করা যে কালে অসম্ভব, তাহার নামই আপৎকাল। রামচন্দ্রের যুগে কোশল-রাজ্যে কি তাহা সম্ভব? রঘুবংশীয়েরা কি দানে পরাঙ্মুখ ছিলেন? ত্রিজট ত প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ ছিলেন না! তিনিত রামচন্দ্রের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব ওরূপ আশঙ্কার মূল্য নাই। টীকাকার পরম পণ্ডিত রামানুজ স্বামী 'ক্ষতবৃত্তি' অর্থ লিখিয়াছেন "খননবৃত্তি।" 'খনন' বলিতে এখানে সাধারণ 'খনন' ও 'কর্ষণ' সবই বুঝিতে হইবে, কারণ ত্রিজট শুধু পুষ্করিণী-খনন কূপখনন প্রভৃতি করিতেন না, তাঁহার 'লাঙ্গল'ও ছিল। এখানে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই ত্রিজট ব্রাহ্মণকে হলচালক কুদ্দালখানক কর্ষক ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিবেন। ভারতীয় সভ্যতার সমুন্নত যুগে যখন কর্ষক ব্রাহ্মণ, ভগবদবতার রামচন্দ্রের নিকট সৎকার-সপর্য্যা লাভ করিয়াছেন, তখন সংসারাশ্রমী ব্রাহ্মণ, ধনার্জ্জনে অগ্রসর হইয়াই সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, এ ধারণার মূল্য পরীক্ষার অবসর অবশ্যই আছে।

(এই প্রবন্ধে সর্ব্বত্র 'তমসা' স্থলে 'তমঃ' হইবে)

তমসা।

কবি বলিয়াছেন যে এ জগতটাই বস্তুতঃ তমসাচ্ছন্ন। সৌর জগতের একমাত্র প্রদীপ সূর্য্য। উহাতে সামান্য একটু আলোক হয় মাত্র। অনন্তের তুলনায় ঐ আলোক অতীব ক্ষীণ। যদি ঐ প্রদীপের ক্ষীণ আলোক টুকু যদি নিবিয়া যায়, তবে ঘোর অন্ধকার—সূচীভেদ্য জমাটবাঁধা অন্ধকার। সূর্য্য-কিরণে সামান্য একটু আলোক হইলেও জাগতিক অন্ধকার একরূপই রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই সর্ব্বগ্রাসিনী তমসার নিবিড় কালিমময়ী মূর্ত্তি! অন্তর্জগৎ, বাহ্য-জগৎ উভয়জগৎই উহার ছায়ায় ছায়াময়!

উদ্ভিদ্ রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, বৃক্ষলতাদি আলোকের পক্ষপাতী!

আলোক পাইবার জন্য অন্ধকার ত্যাগ করিয়া আলোকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, আলোকের দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। আলোকে উহারা বেশ বর্দ্ধিত হয়। অন্ধকারে যেন বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ থাকে।

পশুপক্ষী জীবজন্তু অধিকাংশই যেন আলোকের পক্ষপাতী। আবার, ধর্ম্মপ্রচারকেরাও পতিতদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান। তা হইলে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তমসার পরিবর্ত্তে আলোকই সকলের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু!

অন্ধকার বাঞ্ছনীয় কি আলোক অনুসরণীয়, এতদ্বিষয়ে একটু মতভেদ আছে। কোন কোন কবীর বীণায় এইরূপ ঝঙ্কার শুনা যায়:—

It is folly to be wise
While ignorance is bliss

অর্থাৎ, জ্ঞান দুঃখের ও অজ্ঞান সুখের হেতু। এতদ্দেশীয় প্রবাদ—

"যে জানে না উত্তর পুব,
তা'র মনে সদাই সুখ।"

কিন্তু, উদ্ধৃত মত সাধারণের গ্রাহ্য নহে। সাধারণে অন্ধকার পরিত্যাগ ও জ্ঞানালোক অনুসন্ধান করিতে আবহমানকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছে। তাই, তাহারা বলিয়া থাকে:—

'জ্ঞানের প্রদীপ মনে নাহি জ্বলে যার।
কখনো ঘোচেনা তার ভ্রম অন্ধকার॥

অন্ধকার ঘুচাইবার একমাত্র প্রদীপ জ্ঞান। অন্ধকার যতই ভীষণ হইবে, অনুরাগের বর্ত্তি উস্‌কাইয়া দিয়া জ্ঞানালোকের জ্যোতি ততই তীব্র করিতে হইবে। তাহা হইলেই জাগতিক তমসায় একটু চলাফেরা যাইবে। আর বর্ত্তির দোষে যদি ঐ আলোক নিবিয়া যায়, তবেই তোমার দুর্গতির একশেষ। সারাপথ হাতড়াইয়া মরিবে; কখন কাহারও সহিত ধাক্কা লাগিবে; কখন ডিগ্‌বাজি খেলিয়া গর্ত্তে পড়িবে। হইতেছেও তাই। জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে নাই, অথচ গুরু, শিষ্যকে লইয়া অগ্রে যাইতে ষড়্‌রিপুর গর্ত্তে উল্টাইয়া পড়িতেছেন। বিশুদ্ধ প্রেম, নির্লেপ ভাব, শিক্ষা দিতে যাইয়া পথভ্রষ্ট ও স্খলিত পদ হইতেছেন। ধর্ম্মের পাণ্ডারা জ্ঞানের প্রদীপাভাবে অন্ধকারে পরস্পর ঢুঁ মারামারি করিতেছেন। অন্ধকারে চলাফেরা করিতে গেলে এ দুর্গতি অনিবার্য্য।

সৌর জগতের প্রদীপ—সূর্য্য। উহার একটু আলোক আমরা পাইয়া থাকি, তাহা অতীব ক্ষীণ। বিশ্বব্যাপিনী তমসার তুলনায় উহা কিছুই নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা ভীষণ অন্ধকারেই আছি। সামান্য একটা ধূলিকণা সম্বন্ধেও আমরা অনবগত। টীণ্ডল সাহেব ধূলিকণা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, মানুষ প্রাণপণ যত্ন করিলেও ধূলিকণার হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। বায়ু বা জল হইতে ধূলিকণাকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত করিতে পারে, এরূপ যন্ত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ধূলিকণা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও বিশ্বব্যাপিনী ও অনন্তবিহারিণী। তবেই দেখা যাইতেছে, তুচ্ছ একটী ধূলিকণা সম্বন্ধেও আমরা ঘোর অন্ধকারে আছি।

অন্ধকার কোন্ দিকে নয়? নীল নভোমণ্ডলের নাক্ষত্রিক সজ্জার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে নীহারিকার একটু ক্ষীণ আভা যায়

দৃষ্টিগোচর হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা নিরীক্ষণ করিলে আরও একটু স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু দূরবীক্ষণের আয়ত্তাধীন সীমার পশ্চাতে সবই তমসা। সুনীল সাগরের নিম্নে কোন্ কোন্ ভীষণ জলচর বিচরণ করিতেছে, তাহাও আমরা দেখিতে পাই না। সেখানেও তমসা। প্রাণাধিকা পত্নীর মনটুকুও আমরা দেখিতে পাই না। সে প্রেমের যমুনায়ও তমসার করাল-কালীয়-কালকূট! তাই ভগবান্ শঙ্কর ভেরীনিনাদে ঘোষণা করিলেন:—

"জ্ঞাতুংন শক্যং হি কিমস্তি লোকে
যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ম্।"

"প্রশ্ন—সংসারে যাহা কোনও মতে জানা যায় না এমন জিনিষ কি?

উত্তর—স্ত্রীগণের মন ও চরিত্র। মহামতি চাণক্যের বীণায়ও ঐরূপ ঝঙ্কার শ্রুত হয়:—

"স্ত্রীণাং চরিত্রম্ পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবাঃ নজানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ।"

অতএব, এখানেও তমসা। এক মুহূর্ত্ত পরে আমার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা আমিও জানি না। অতএব বর্ত্তমানের গণ্ডীর বাহিরেই আমার ঘোর তমসা, নিবিড় অন্ধকার। তাই, কবি বলিলেন:—

"Man Proposes but God disposes"

অর্থ—মানুষ একরূপ ভাবে, বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করেন। কবি আবার বলিলেন:—

"Trust no future however pleasant"

অর্থ—ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিও না। তবেই দৃষ্ট হইতেছে, ভবিষ্যৎ আমাদিগের ঘোর তমসাচ্ছন্ন। যাহা তমসাচ্ছন্ন, দৃষ্ট হয় না, তাহাকে বিশ্বাস কি?

আত্মা, সূক্ষ্মজগত্, লিঙ্গশরীর প্রভৃতি সবই তমসাচ্ছন্ন। অধুনা, এরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা লিঙ্গশরীর দৃষ্ট হইতে পারে। স্থূল দেহ হইতে হইতে উহা কিরূপ বেগে বহির্গত হয়, তাহারও একটা হিসাব-নিকাশ ঐ যন্ত্র সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানের সামান্য একটী ক্ষীণ রশ্মিতে খুব সামান্য একটু দেখা গেলেও সূক্ষ্ম জগৎটাই ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যে সুমন্দ মলয়ের সুধীর হিল্লোলে বিকচ কুসুমটী দুলিয়া দুলিয়া সৌরভ ছড়াইতেছে, তাহাও আমাদের নিকট তমসাচ্ছন্ন। কলকণ্ঠের সুমিষ্ট স্বর-ঝঙ্কার যখন সাকত-সমুদ্রে প্রাণোন্মাদকারিণী লহরী ছুটাইয়া চতুর্দ্দিক পুলকিত করে, তখন আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সামান্য একটু অনুভূতি হয় মাত্র, কিন্তু সে লহরীমালার ভঙ্গী-বিন্যাস আমরা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারি কি? সে সঞ্জীবন স্বর-হিল্লোল আমাদের নিকট নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা না; বস্তুতঃ তাহাও ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

একটী জলবিন্দুতে অসংখ্য জীবাণু! দুগ্ধের উপাদান জীবাণু সমষ্টি। একটী মক্ষিকার অসংখ্য নেত্র; উহার পলকে কত প্রকার মনোহর চিত্র। এ সব কি আমরা সম্পূর্ণ দেখিতে পাই? বায়ু হইতেও সূক্ষ্ম, ব্যোম পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই ব্যোমে "লিপিকা" দেবযোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। আমাদের দৈনন্দিন সৎ-অসৎ চিন্তাগুলি উহাঁরা ব্যোমপটে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যাপার অদ্যাপি ঘোর তমসায় আবৃত। আবার আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষীণালোকে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ব্যোম

অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর পদার্থ আছে। আমরা এই সকল বিস্ময়কর ব্যাপার সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমরা যত কিছু দেখি, তাহা অতি সামান্য। আমাদের দৃষ্টি-শক্তি জ্যামিতির রেখার ন্যায় একটী প্রস্থশূন্য দৈর্ঘ্যস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অন্যান্য বিষয় দূরে যাউক, আমাদিগকেই আমরা দেখিতে পাই না। আমরা বিদ্যমান আছি—মাত্র তাহাই দেখিতেছি কিন্তু এই মধ্যস্থান ব্যতীত ইহার অগ্রপশ্চাৎ আমরা দেখিতে পারি না। আমাদিগের পূর্ব্বাপর ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন। তাই ভগবান্‌ও বলিয়াছেন :—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥"

—গীতা ২য় অঃ। ২৮॥

অর্থ—ভূতসকল প্রথমতঃ অব্যক্ত ছিল, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; আবার বিনাশান্তে অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে ভারত! তজ্জন্য পরিদেবনা কি?

তবেই দেখ, আদি অন্ত সবই অব্যক্ত—ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন। তাই বলিতেছি, আমাদিগের চতুর্দ্দিকেই তমসা—ঘোর তমসা; নিবিড় দুর্ভেদ্য সূচিভেদ্য তমসা! এ দুনিয়াটাই তমসাচ্ছন্ন। অন্তরে বিস্মৃতির তমসা; অজ্ঞতার তমসা। জাগতিক প্রপঞ্চের অণু-পরমাণুর ভিতরেও তমসা স্তরে স্তরে ঘনীভূত অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। তাই বলিতেছি, যেদিকে নিরীক্ষণ করা যায়, শুধুই তমসা! তমসা!!

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

ধনুর্ব্বেদ-সংহিতা।

অথৈকদা বিজিগীষুর্বিশ্বামিত্রো রাজর্ষিঃ গুরুং বসিষ্ঠমভ্যুপেত্য প্রণম্যোবাচ ব্রূহি ভগবন্ ধনুর্ব্বিদ্যাং শ্রোত্রিয়ায় দৃঢ়চেতসে শিষ্যায় দুষ্টশত্রুবিনাশায়।১

একদা বিজিগীষু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, গুরু বশিষ্ঠদেবের নিকট উপনীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—ভগবন্! এই শ্রোত্রিয় দৃঢ়চেতা শিষ্যকে (আমাকে) দুষ্টশত্রুবিনাশের নিমিত্ত ধনুর্বিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন।১

তমুবাচ মহর্ষিব্রহ্মর্ষিপ্রবরো বসিষ্ঠঃ, শৃণুষ্ব রাজন্ বিশ্বামিত্র, যাং সরহস্যধনুর্ব্বিদ্যাং ভগবান্ সদাশিবঃ পরশুরামায়োবাচ তামেব সরহস্যাং বচ্মি তে হিতায় গো-ব্রাহ্মণসাধুবেদরক্ষণায় চ যজুর্ব্বেদাথর্ব্ব-সম্মিতাং সংহিতাম্।২

ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, হে রাজন্ বিশ্বামিত্র! যে রহস্য-সহিত ধনুর্বিদ্যা ভগবান্ সদাশিব পরশুরামকে বলিয়াছিলেন, সেই যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদসম্মিত সরহস্য ধনুর্ব্বিদ্যাই তোমার হিতার্থে এবং গো, ব্রাহ্মণ, সাধু ও বেদের রক্ষণার্থে বলিতেছি, শ্রবণ কর।২

অথোবাচ মহাদেবো ভার্গবায় চ ধীমতে। তত্তেহহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা-তথ্যেন সংশৃণু ৩

মহাদেব ধীমান্ ভার্গবকে (পরশুরামকে) যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, আমি

সেই সমস্তই যথাযথ ভাবে তোমাকে বলিব, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতে থাক। ৩

তত্র চতুষ্টয়পাদাত্মকো ধনুর্বেদঃ, তস্য প্রথমে পাদে দীক্ষাপ্রকারঃ, দ্বিতীয়ে সংগ্রহঃ, তৃতীয়ে সিদ্ধপ্রয়োগাঃ, চতুর্থে প্রয়োগবিধয়ঃ।৪

ধনুর্বেদ চতুষ্পাদ। ইহার প্রথম পাদে দীক্ষাপ্রকার, দ্বিতীয় পাদে সংগ্রহ, তৃতীয় পাদে সিদ্ধপ্রয়োগ ও চতুর্থ পাদে প্রয়োগ-বিধি সমূহ উপদিষ্ট আছে। ৪

অথ কস্য ধনুর্বেদাধিকার ইত্যাপেক্ষায়ামাহ।

ধনুর্বেদে গুরুর্বিপ্রঃ প্রোক্তো বর্ণদ্বয়স্য চ। যুদ্ধাধিকারঃ শূদ্রস্য স্বয়ং ব্যাপাদি-শিক্ষয়া।৫

ধনুর্বেদে কাহার অধিকার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, ধনুর্বেদ-শিক্ষার গুরু হইবেন ব্রাহ্মণ। দুই বর্ণ, যুদ্ধের অধিকারী; শূদ্র শীকারের জন্য স্বয়ং ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়া যুদ্ধে অধিকারী হইবে। ৫

চতুর্বিধমায়ুধম্। মুক্তমমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তং চেতি।৬

আয়ুধ চারি প্রকার। মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত, যন্ত্রমুক্ত। ৬

দুষ্টদস্যুচৌরাদিভ্যঃ সাধুসংরক্ষণং ধর্মতঃ প্রজাপালনং ধনুর্বেদস্য প্রয়োজনম্। ৭

দুষ্টদস্যু চোর প্রভৃতির আক্রমণ হইতে সাধুগণের সংরক্ষণ ও ধর্মানুসারে প্রজাপালনই ধনুর্বেদের প্রয়োজন। ৭

একোঽপি যত্র নগরে প্রসিদ্ধঃ স্যাদ্ধনুর্ধরঃ। ততো যান্ত্যরয়ো দূরাম্মৃগাঃ সিংহ-গৃহাদিব। ৮

যে নগরে এক জনও প্রসিদ্ধ ধনুর্দ্ধর থাকে, যেমন সিংহের বাসস্থান হইতে মৃগগণ দূরে পলায়ন করে তদ্রূপ, সে স্থান হইতেও শত্রুগণ দূরেই প্রস্থান করে। ৮

অথ ধনুর্দানবিধিঃ।

আচার্য্যেণ ধনুর্দেয়ং ব্রাহ্মণেন পরী-ক্ষিতে। লুব্ধে ধূর্ত্তে কৃতঘ্নে চ মন্দবুদ্ধৌ ন দাপয়েৎ ৯

অনন্তর শিষ্যকে ধনুঃ প্রদানের বিধান কথিত হইতেছে।

(দীক্ষা দিবসে) আচার্য্য ব্রাহ্মণ, উত্তম-রূপে পরীক্ষিত শিষ্যকে ধনুঃ প্রদান করি-বেন। লুব্ধ, ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন ও মন্দবুদ্ধি শিষ্যকে ধনুঃ প্রদান করিবেন না। ৯

ব্রাহ্মণায় ধনুর্দেয়ং খড়্গং বৈ ক্ষত্রিয়ায় চ। বৈশ্যায় দাপয়েৎ কুন্তং গদাং শূদ্রায় দাপয়েৎ। ১০

আচার্য্য, ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে ধনু, ক্ষত্রিয়-শিষ্যকে খড়্গ, বৈশ্য শিষ্যকে কুন্ত এবং শূদ্র-শিষ্যকে (দীক্ষাদিনে) গদা প্রদান করি-বেন। ১০

ধনুশ্চক্রং চ কুন্তঞ্চ খড়্গং চ ছুরিকা গদা। সপ্তমং বাহুযুদ্ধং স্যাৎ এবং যুদ্ধানি সপ্তধা। ১১

ধনুর্যুদ্ধ চক্রযুদ্ধ কুন্তযুদ্ধ খড়্গযুদ্ধ ছুরিকা-যুদ্ধ গদাযুদ্ধ এবং বাহুযুদ্ধ—সাধারণতঃ যুদ্ধ এই সাত প্রকার। ১১

অথ আচার্য্যাদি—লক্ষণম্।

আচার্য্যঃ সপ্তযুদ্ধঃ স্যাৎ চতুর্ভির্ভার্গবো মতঃ। দ্বাভ্যাং চৈব ভবেদ্‌যোধঃ একেন গণকো ভবেত্। ১২

অনন্তর আচার্য্যাদির লক্ষণ কথিত হইতেছে।

যে ব্যক্তি এই সাত প্রকার যুদ্ধে শিক্ষিত (এবং শিক্ষা দিতে সক্ষম) তিনিই আচার্য্য-পদবীর অধিকারী; আর যিনি চারি প্রকার যুদ্ধে পারদর্শী তিনি 'ভার্গব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুই প্রকার যুদ্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নাম "যোধ" এবং এক প্রকার যুদ্ধ জানেন এমন লোক 'গণক' নামে কথিত হন। ১২

হস্তঃ পুনর্ব্বসুঃ পুষ্যঃ রোহিণী চোত্তরাত্রয়ম্। অনুরাধাশ্বিনীচৈব রেবতী দশমী তথা। জন্মস্থেচ তৃতীয়েচ ষষ্ঠে বৈ সপ্তমে তথা। দশমৈকাদশে চন্দ্রে সর্ব্বকার্য্যাণি কারয়েৎ। তৃতীয়া পঞ্চমীচৈব সপ্তমী দশমী তথা। ত্রয়োদশী দ্বাদশীচ তিথয়স্তু শুভা মতাঃ। রবিবারঃ শুক্রবারো গুরুবারস্তথৈবচ। এতদ্বারত্রয়ং শস্তং প্রারম্ভে শস্ত্রকর্ম্মণাম্। ১৩

হস্তা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, রোহিণী, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, অনুরাধা, অশ্বিনী ও রেবতী এই দশ নক্ষত্রে, জন্মস্থ তৃতীয়স্থ ষষ্ঠস্থ, সপ্তমস্থ, দশমস্থ ও একাদশস্থ চন্দ্রে, ধনুর্ব্বেদদীক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তৃতীয়া পঞ্চমী সপ্তমী দশমী দ্বাদশী ত্রয়োদশী এই সকল তিথি, ধনুর্ব্বেদদীক্ষায় শুভ। রবিবার শুক্রবার বৃহস্পতিবার এই তিন বার, শস্ত্রশিক্ষার আরম্ভে শুভ। ১৩

এতদ্দিনৈস্তু শিষ্যায় গুরুঃ শস্ত্রাণি দাপয়েৎ। সম্পূর্ণ্য দানহোমাভ্যাং সুরান্ স্বাহাবিধানতঃ। ১৪

এই সকল দিনে গুরু, দান ও হোম দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়া, শিষ্যকে শস্ত্র দান করিবেন। ১৪

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র কুমারীশ্চাপ্যনেকশঃ। তাপসানর্চ্চয়েদ্ ভক্ত্যা যে চান্যে শিবযোগিনঃ। অন্নপানাদিভিশ্চৈব বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। গন্ধমাল্যৈর্বিচিত্রৈশ্চ গুরুং তত্র প্রপূজয়েৎ। ১৫

এই কার্য্যে শিষ্য, ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইবে। তাপসগণকে এবং শিবযোগীগণকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে। অন্নপানাদি ও বিচিত্র চন্দন মালা প্রভৃতি দ্বারা বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিত গুরুর পূজা করিবে। ১৫

কৃতোপবাসঃ শিষ্যস্তু ধৃতাজিনপরিগ্রহঃ। বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তত্র যাচয়েদ্ গুরুতো ধনুঃ। ১৬

শিষ্য উপবাসী থাকিয়া, মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, গুরুর নিকট ধনু যাচ্ঞা করিবে। ১৬

(ক্রমশঃ)

শ্রী——

সংবাদ ও মন্তব্য।

ধর্ম্মসভা। ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার বার্ষিক উৎসবাধিবেশন, ময়মনসিংহ-নগরস্থ ৺দুর্গাবাড়ীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সরস্বতীপূজার দিনে উৎসবের আরম্ভ হয়, পরবর্ত্তি চতুর্থ দিনে উৎসবের সমাপ্তি হয়। সভায় হিন্দু-পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক বাগ্মি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাঙ্খ্যমীমাংসাতীর্থ মহাশয়, ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের জন্য আহূত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথম দিনে

তিনি "সার্ব্বজনীন ধর্ম্মতত্ত্ব" বিষয়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে "সাধনধর্ম্ম বা ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক রূপ" সম্বন্ধে এবং চতুর্থ দিনে "ভক্তিতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর পরিতুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। এরূপ ধর্ম্মালোচনা যে যথার্থই সমাজের হিতকরী, ইহা সামাজিক সাধারণের অনুধ্যানের বিষয়।

ধর্ম্মব্যাখ্যা। গত ১৯শে মাঘ রবিবার অপরাহ্নে হাওড়া পঞ্চাননতলা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে এক ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনর্জ্জন্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া, সাধারণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন। জন্মান্তরতত্ত্ব, হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম মৌলিক তথ্য। এ সত্যটী জনসাধারণের মধ্যে যতই যুক্তিযুক্ত ভাবে প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গলের আশা করা যায়।

শিবপূজা। কিছু দিন পূর্ব্বে মাননীয়া লেডী কারমাইকেল মহোদয়া, কতিপয় অভিজাতবংশীয়া ইংরেজমহিলাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের "মহাকালী পাঠশালা" পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। লেডী মহোদয়া, বালিকাগণের "শিবপূজা" দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। পাঠশালার কর্ত্তৃপক্ষ, মাননীয়া লেডী মহোদয়াকে 'শিবপূজা'র তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পাঠশালার মান্য গণ্য সভ্যগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় 'শিবপূজা'—তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

শনৈঃ শনৈঃ। ভারত-গবর্ণমেণ্টে কমার্সিয়াল্ ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের ডিরেক্টর জেনারল্ মিঃ ফ্রেডারিক্ নোয়েল পেটিং নাকি বলিয়াছেন "কার্পাসবীজের তৈল ঘৃতের তুল্য গুণশালী।" সংবাদ সত্য হইলে সুখের; বিস্ময়ের নয়। হীরক এবং কয়লা যে এক, একথা শুধু জানা যায় কাজেও এদেশের অনেক মহাত্মা দেখাইয়া গিয়াছেন। শুধু গুণে কেন, যদি কার্পাস বীজ-তৈল, ঘৃত হইতে অভিন্ন বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আমরা মনে করিব, বিজ্ঞান 'শনৈঃ শনৈঃ' ঋষিগণের "একমেবাদ্বিতীয়মে"র দিকে হামাগুড়ি দিতে চেষ্টা করিতেছে।

প্রাদেশিক-সমিতি। এবার কুমিল্লায় "বেঙ্গল্ প্রভিন্সিয়াল্ কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কায়স্থ-সমিতি। আগামি ১১।১২ এপ্রেল এলাহাবাদে "অল্ ইণ্ডিয়া কায়স্থ কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হইবে। দিনাজপুরের মহারাজ সভাপতি হইবেন। শুভ সংযোগের সূচনা দেখিলে সুখী হইব।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনী। মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্র-পাঠে বুঝা গেল—আগামি ২৮শে ফাল্গুন হইতে ৫ দিন ৺কালীঘাটে সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। উদ্যোক্তৃগণ সকল ব্রাহ্মণেরই উপস্থিতি কামনা করেন। যাঁহারা উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৩০শে মাঘের মধ্যে ৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পত্র দ্বারা জানাইবেন। অবস্থান-স্নানাদির সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হইলে সুখের কারণ হইবে

হিন্দুপরিবার ভাণ্ডার।

HINDU FAMILY ANNUITY FUND.

No I, Mirzapore Street, Calcutta

ESTABLISHED A. D. 1872,

For Hindus either by Nationality Bengali or Domiciled in Bengal proper

ACCUMULATED FUNDS EXCEED Rs. 11,00,000 11 Lacs

Maximum pension for a single Relative Rs. 30

Do for more than two Relatives Rs. 80 per month

ADVANTAGES

1 Directors including the Secretary are elected annually by the subscribers

2 All receipts are deposited with the Government of India and funds are held in Government Paper.

3 Suscriptions are received at all Government Treasuries and those of Govt. servants & Pensioners, can be deducted from their salaries and pensions respectively

4 Subscribers of five years' standing and over are entitled to partial refund in the event of the death of their nominee

5 Remission to the extent of one fourth of their annual subscription is granted to all subscribers on the rolls of the Fund on 31st March 1885

6. Subscribers of over ten years' standing are entitled to special benefits

TABLE OF RATES.

Age of Subscriber	Age of wife or widowed relative	Monthly subscription for a pension of Rs 5 per month Rs	As	P
18	12	1	6	0
30	22	1	10	6
40	34	2	3	0

No person above the age of 50 is elligible

For rates for children, parents and other relatives see the table attached to the Rules of the Fund. For other informations and terms for application please apply to:—

U. L. Banerji M A

SECRETARY.

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টারীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২০ বর্ষ, ২০ শ খণ্ড ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩২০ সাল। ১৮৩৫ শকাব্দাঃ।

সুন্দরী।

(কবিতা বা বনিতা)

শ্রীচৈতন্যপ্রভু ভক্তভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়া গিয়াছেন ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে অর্থাৎ ভগবন্! আমি ধন জন সুন্দরী বনিতা বা কবিতা চাই না।

মানুষের মন সময়বিশেষে কামিনীর কামনায় কাতর হয়। স্বতই পুরুষচিত্ত, সুন্দরীর প্রতি পক্ষপাতী। বিচার করিতে গেলে অবশ্য সুন্দরী সংসারে দুর্ল্লভ, কিন্তু যদ্ যস্মৈ রোচতে নিত্যং তত্তস্য সুন্দরং ভবেৎ অর্থাৎ যাহার যাহা ভাল লাগে তাহার কাছে তাহাই সুন্দর, সুতরাং প্রিয়তমা নারীই সুন্দরী। সৌন্দর্য্য, নারীর নিজস্ব নয়, কিন্তু পুরুষের দৃষ্টিতে রমণীই সৌন্দর্য্য-খনির উজ্জ্বল মণি। সুন্দরীসম্মিলন তপস্যার সুফল। নায়েন তপসা লভ্যঃ সুন্দরস্ত্রী-সমাগমঃ। চাক্ষুষ সৌন্দর্য্য লইয়া চিন্তা করিলেও সুন্দরীতে সুগুণের সমাবেশ সুসম্ভব। প্রায়শই "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি" কথাটার সার্থকতা দেখা যায়। রূপবতী যদি গুণবতীও হন, তবে অমৃতং গুণবতী ভার্য্যা এই কথাটা যোল আনাই সত্যে পরিণত হয়। প্রিয়তমা পত্নী সুরূপা কুরূপা যাহাই হউক, সুন্দরী, আর যথার্থ সুরূপা সুগুণা পত্নী যে সুন্দরী, তাহাতে ত কথাই নাই। এমন কি চাই না? প্রিয়-তমা সাধ্বীপত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা। বেদ বলেন—অর্দ্ধোহবা এষ আত্মনোযৎ পত্নীতি। সাধ্বী পত্নী পতির পরকালের গতি। পত্নীর পুণ্যে পতির স্বর্গপ্রাপ্তি। পত্নী গৃহধর্ম্মের মূল। পত্নীর প্রসাদেই কুলপাবন পুত্রলাভ। দারাধীনস্তথাস্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ। স্বর্গলাভও পত্নীর কৃপায়। যে পত্নী পালনে জননী, শুশ্রূষায় দাসী, অন্ন-দানে অন্নপূর্ণা, ব্যসনে রক্ষাদেবতা, গৃহ-শোভনে স্বয়ং পবিত্রতা, শোকে সান্ত্বনা,

ক্লেশে সহিষ্ণুতা, সৎকর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, অসৎকর্ম্মে নিবৃত্তিরূপিণী, রোগে যন্ত্রণা-লাঘবকারিণী ও মরণে অনুগামিনী, সেই পত্নী কি পরিত্যাজ্যা হইতে পারে? সাবিত্রী চরিত্রবলে মৃতপতির প্রাণ বাঁচাইলেন, শৈব্যা মহিষী হইয়াও পতির ধর্ম্মরক্ষার্থ আত্মবিক্রয় পূর্ব্বক দাসী হইয়াছিলেন, দময়ন্তী সীতা প্রভৃতি পতির জন্য কত ক্লেশই সহিয়াছিলেন, আর সেই সতীশিরোমণি শিবসীমন্তিনী সতী ত পতিনিন্দা-শ্রবণে প্রাণত্যাগই করিয়াছিলেন। আর কত শত রমণী যে পতির বিরহে কাতরা হইয়া অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন মহত্ব-মণ্ডিতমূর্ত্তি, ইহ পরকালের মঙ্গলকর্ত্রী পত্নী চায় না কে? ঐত শাক্তভক্ত বলিতেছেন, পত্নীং মনোরমাং দেহি। যে নারী বিশ্বজননীর অপরা মূর্ত্তি, যে নারীর পূজায় দেবগণ পিতৃগণ প্রীত (১) সেই কামিনী কি কামনার বিষয় নহে?

অন্যপক্ষে বিবেকীর চ'খে সুন্দরী রমণীই সর্ব্বনাশের সূত্র। শঙ্করাচার্য্য বলেন, দ্বারং কিমেতৎ নরকস্য নারী। নারীই নরকের দ্বার। ভগবান্ দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন, স্বর্গমোক্ষসুখঘ্নীচ সাক্ষাদিন্দ্রিয়রূপিণী, প্রত্যক্ষরাক্ষসী নারী দেহিনাং পিশিতাশনী। স্বর্গমোক্ষসুখনাশিনী ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিরূপিণী শোণিতশোষিণী রমণী সাক্ষাৎ রাক্ষসী। ভক্ত কবি তুলসীদাসের কথা, "দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক্‌ পলক্‌ লহু চোষে" রমণী শোণিতবিলাসিনী বাঘিনী। বিবেকী শিহ্লন বলিয়াছেন, রমণী সংশয়ের আবর্ত্ত (রূপবতী পত্নীর পতির চিত্তে সতত সংশয়) অবিনয়ের ভবন (রূপগর্ব্বিতা রমণী অবিনীততার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত) সাহসের বাসস্থান (দুশ্চরিত্রা নারী নরহত্যা করিতেও ভীতা নয়) দোষের সম্মিলনক্ষেত্র, কপটতার লীলাস্থল, অবিশ্বাসের আশ্রয়বল্লী, অথচ দেবমানব সকলেরই দুস্ত্যাজ্য, এমন পয়োমুখ বিষকুম্ভ মানুষের সর্ব্বনাশের জন্য কে সৃষ্টি করিয়াছে? শাস্ত্র বলেন, পুরুষের হৃদয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রমণীর নয়নবাণ বিদ্ধ না হয়, ততক্ষণই সে সৎপথে থাকে, ততক্ষণই ইন্দ্রিয়বেগরোধে সমর্থ হয়, ততক্ষণই লজ্জা ও বিনয় আশ্রয় পায়। একবার এই বাণে বিদ্ধ হইলে আর নিস্তার থাকে না। শাস্ত্র বলেন, চতুর্থী স্ত্রী সুরাজ্ঞেয়া যয়েদং মোহিতং জগৎ। প্রসিদ্ধসুরা তিনপ্রকার গৌড়ী মাধ্বী ও পৈষ্টী, (গুড় মধু ও অন্ন হইতে প্রস্তুত) আর রমণী চতুর্থী সুরা। ত্রিবিধ সুরায় কেহ কেহ মত্ত হয়, কিন্তু সংসার নারীসুরায় মুগ্ধ। ঐতিহাসিক বলিবেন, রমণীরূপাগ্নিতে শুধু পৌরাণিক সুন্দ উপসুন্দই পুড়ে নাই, রোমের, ট্রয়ের ও বঙ্গের সিংহাসনও ভস্মসাৎ হইয়াছিল, অতএব সুন্দরী চাই না।

সমস্যার মীমাংসাও সুকঠিন নয়। শিক্ষাশ্লোকের 'সুন্দরী' কামরঙ্গিনী শয্যাসঙ্গিনী কামিনী। বিবেকীরা তাহারই নিন্দা গান করিয়াছেন। ভক্ত সেই সর্ব্বনাশিনীকে চায় না। আর যে "সুন্দরী" সাধনসঙ্গিনী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, তিনি গৃহস্থভক্তের প্রার্থনীয়া। ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষু ভক্তের রমণীর প্রতি পত্নীভাব পোষণের অধিকার নাই,

(১) যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। মনুঃ।

কিন্তু মাতৃভাব ধারণার অধিকার অক্ষুণ্ণই আছে। কামভাব ছাড়িলেই কামিনী ছাড়া হইল। সুতরাং সে স্থলেও সাধ্বী সুন্দরীর স্থান আছে। বৈষ্ণবসাহিত্যের মতে নারীজাতি ত্রিবিধা; সমর্থা সাধারণী ও সমঞ্জসা। যাহার স্বীয় সুখেই আশা সে সাধারণী, আর যে স্বীয় সুখ ও স্বামিসুখ দুইই চায় সে সমঞ্জসা, আর যে স্বীয় সুখ চায় না, কেবল স্বামিসুখই চায়, সে সমর্থা। ব্রজগোপিগণ এই সমর্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। (এই গোপীভাবই ভক্তিরাজ্যের সারসর্ব্বস্ব)। সমর্থাই যথার্থ সুন্দরী। এ হেন সুন্দরীর প্রতি ভক্তের বিরক্তি নাই। ব্যবহারভেদেই বস্তুর দোষ-গুণ প্রকাশ পায়। সুন্দরী রমণী জননী বা পত্নী হইলে হিতকরী ও মোহিনী হইলে সকলেরই দুঃখকরী। বিকট বিকারে বিষম বিষও প্রাণপ্রদ হয়। আর সুস্থশরীরে সেবন করিলে প্রাণবিয়োগ ঘটে। সৌন্দর্য্যসমুদ্ররূপা জগদম্বা রমণীরূপে ঘরে ঘরে শিবরূপী জীবের সেবা করিতে আসিয়াছেন—এ বিশ্বাস থাকিলে, রমণী আর বাঘিনী বা ডাকিনী থাকেন না। তিনি 'শক্তি' শান্তি বা শ্রীতে পরিণত হন। এ হেন সুন্দরীর সহিত স্থূল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ রাখা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্থূলভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত সম্বন্ধশূন্য হইলেও সূক্ষ্মভাবে নিত্য মিলিত ছিলেন। সুন্দরীসংস্পর্শে প্রায়শঃ সাধারণ অধিকারীর পতনের শঙ্কা আছে, সেজন্য নিম্ন সাধকের সুন্দরীত্যাগই সমীচীনপন্থা। পক্ষান্তরে নিষ্কাম উচ্চাধিকারীর চিত্ত কামনায় কলুষিত নহে, সুতরাং তিনি বলিতে পারেন, আমি ধন জন কামিনী কবিতা প্রভৃতি কিছুই চাই না; এ সমস্তে আসক্তি ত চাইই না; অনাসক্তভাবেও এ সকল ভোগ করিতে চাই না; চাই কেবল হরিভক্তি।

ভক্ত সুন্দরী বনিতা চাহেন না, সুন্দরী কবিতাও চাহেন না। কাব্যরসে সুরসিক ভক্ত বিরক্ত কেন? "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" রুচিপূত রসাত্মক বাক্য কাব্য। একে বাক্য ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে সুরসের সমাবেশ! বেদ বলেন, বাগ্‌বৈ ব্রহ্ম। আর রস ও সাধারণ সামগ্রী নয়। স্বয়ং রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণই রসরূপী। রসো বৈ সঃ। রসশাস্ত্রে দেখা যায়—"বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যঃ ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ" রসাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদসদৃশ। সে আস্বাদে অন্য অনুভবের বিকাশ থাকে না, রস সাগরে সব ভাব ডুবিয়া যায়। এহেন রসময় সামগ্রীতে কি ভক্তের অরুচি হইতে পারে? আবার ভাবুকেরা বলিতেছেন, সংসারে সরস বস্তু দুইটী, (আর সব শুষ্ক) এক কাব্যপ্রসঙ্গ আর সাধুসঙ্গ। নীরস শাস্ত্র অপেক্ষা সরস কাব্য যে মানবের সমধিক স্পৃহনীয়, তাহার অকাট্য প্রমাণ "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্" এই প্রাচীন প্রবচন। বিশেষতঃ সৎকাব্য, সমাজের শিক্ষাগুরু, সদ্দৃষ্টান্ত-বর্ষণে কল্পতরু। মহাকাব্য রামায়ণ সংসারীর যেমন উপকারী, তেমন সামগ্রী বেশী নাই। দশরথের সত্যপরতা, রামের পিতৃভক্তি, কর্ত্তব্যানুরক্তি ও জনরঞ্জনশক্তি, লক্ষ্মণের ও ভরতের সংযম ও সৌভ্রাত্র, সীতার পাতিব্রত্য, হনুমানের প্রভুভক্তি ও

বিভীষণের প্রতিজ্ঞাপালনকীর্ত্তি এ সব অমূল্য চরিত্র চিত্র রত্ন ত কাব্যভাণ্ডারেরই নিজস্ব। কাব্যের সাধারণ উপদেশ "রামাদির মত হইও; কদাচ রাবণাদির অনুকরণ করিও না।" ইহাও সংসারী মনুষ্যের কাছে অমূল্য রত্ন। ইহাতে যাহার আপত্তি, সে কেমন? যদি বল "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ" এই উপদেশ কবিতাস্বাদের প্রতিকূল, তাহাও সঙ্গত নয়, কারণ অসৎকাব্যালাপ পরিহার করাই উপদেশের মর্ম্ম। সৎকাব্যসেবায় বিরত হওয়া কদাচ সৎকর্ম্ম নহে। তবে সুন্দরী কবিতা চাই না কেন? সিদ্ধান্ত এই যে, যে কবিতায় ভগবানের লীলারস-লহরী খেলা করে না সেই কুকবিতা চাই না। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—যে শ্লোকের সর্ব্বাঙ্গ উত্তমশ্লোকের (নন্দনন্দনের) গুণচন্দন-লিপ্ত, সেই অচ্যুতকথাময়ী কবিতাই ভক্তগণের সেব্যা সাধ্যা ও আরাধ্যা। অপিচ, যে শাস্ত্র, হরিপ্রসঙ্গশূন্য, তাহাও ভক্তবৈষ্ণবের কাছে কুশাস্ত্র, সুতরাং অসেবনীয় ও উপেক্ষণীয়। ভক্তের প্রাণের কথা—যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তিঃ ন দৃশ্যতে। ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ। হরিভক্তিশূন্য শাস্ত্র, ব্রহ্মার বাক্য হইলেও হেয় অশ্রদ্ধেয়, তাহার শ্রবণ মনন নিষিদ্ধ। সুতরাং ভগবৎপদদযুক্ত কাব্যরস, ভক্তের সুসেব্য আর ভগবৎকথা-বর্জ্জিত কুকবিতা অসেব্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপদেশ, ভগবৎ-প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কথায় যেন মতি না হয়।

শ্রীচৈতন্যপ্রভু "সুন্দরী (বনিতা বা) কবিতা চাইনা" বলিয়া পরক্ষণেই বলিতেছেন, মম জন্মনিজন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি। ভক্ত আর কিছুই চায় না, সে কেবল অহৈতুকী ভক্তির ভিখারী। মুক্তিতে তাহার মন উঠে না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সালোক্য সাষ্টিসারূপ্য সামীপ্যাদি-চতুষ্টয়ং। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি ভক্তা মৎ-সেবনং বিনা। ভক্তগণ সালোক্যাদি মুক্তি দিলেও লইতে চায় না, কেবল কৃষ্ণসেবাই কামনা করে। ভক্তের প্রার্থনীয়া সাধনীয়া সেবনীয়া সেই পরাভক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখাযায় সাধক বলিতেছেন—জনির্ভবতু মে ব্রহ্মন্ যাসু যাসু চ যোনিষু। ন জহাতু হরের্ভক্তির্মামেবং দেহিমে বরম্। হে ব্রহ্মন্ যে যে যোনিতে জন্ম হউক্ না কেন, হরিভক্তি যেন আমাকে ত্যাগ করেননা, এই বর চাই। ভক্তের ভগবদ্ভজন, স্বার্থ-সাধনের আয়োজন নয়, বিশুদ্ধ বিষ্ণুভক্তিতে বণিগ্বৃত্তি থাকে না। সে ভক্তি স্বত উচ্ছ-সিতা স্বতই ভগন্মুখগতা স্বতঃসিদ্ধা পরন্তু কামগন্ধে কলুষিতা নয়।

অহৈতুকী ভক্তি যে কি পরম পদার্থ, তাহার পরিচয় দেওয়া ভাষার সাধ্য নয়। সেই শুদ্ধা ভক্তির ভাবস্রোতে ভাষা ভাসিয়া যায়, প্রাণ গলিয়া যায়, সে কেবল অনুভবের সামগ্রী। ভগবৎকৃপায় যাঁহার সে সুখ-সৌভাগ্যের উদয় হয়, তিনিই বুঝিতে পারেন, কিন্তু বলিতে বা বুঝাইতে পারেন না। কেবল ইঙ্গিতে আভাস দিতে চেষ্টা করেন মাত্র। সে আস্বাদ পাইলে মুখর ব্যক্তিও মূক হইয়া পড়ে, সুতরাং রসাস্বাদ থাকে কিন্তু বাগ্‌বিলাস থাকে না। কথায় সে ভাব পূর্ণ পরিব্যক্ত না হইলেও শাস্ত্রে যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার

আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। শাস্ত্র বলিতেছেন, ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা। সান্দ্রানন্দস্বরূপাহি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীচ সা। অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তির বলে ভক্ত, অক্লেশে ক্লেশ বিনাশ করেন। ভক্তের কাছে দুঃখের বাহাদুরী নাই। অশুভনিশার অবসানে যখন শুভসূর্য্য দশদিক্ আলোকিত করিয়া উদিত হয়, তখনই অহৈতুকী ভক্তি প্রকাশ পান, সুতরাং অশুভ তাঁহার কাছে ঘেঁষিতেও পারে না। যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ। রামপ্রসাদের উক্তি, সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী। এই ভক্তি বস্তুতই সুদুর্ল্লভা। কত কোটি জন্মের পর সাধনের ফলে ভগবৎকৃপা বলে যে এই ভক্তি লাভ করা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলতঃ যদি সুদুর্ল্লভ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা অহৈতুকী ভক্তি-সম্পত্তি। সেই পরা ভক্তি, সান্দ্রানন্দরূপা। সংসারের সকল আনন্দেই নিরানন্দের মিশ্রণ। শুদ্ধ সুখ সুদুর্ল্লভ। কিন্তু এই পরাভক্তি পরমানন্দ দুঃখলেশশূন্য জমাট সুখ। সে সুখাবেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অবশ, সে ভক্তি-সূত্রে স্বয়ং ভব-বন্ধনমোচনকারী হরিও বদ্ধ। ভক্তের এ প্রেম শুধু প্রেমের জন্য, ইহা কামপূরণের জন্য নহে। ভক্ত প্রেমের প্রতিদান চায় না, শুধু প্রিয়তমকে প্রেম দিয়া পরিতৃপ্ত হয়। ভক্তের কথা—"বিনিময় শিখি নাই হরি, জানি শুধু আমিই তোমারি।" ভক্তের ভাব বিশুদ্ধ গোপীভাব। ভক্ত ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু কিছুই চান না। নব্য বৈষ্ণবশাস্ত্রের কোহিনূর স্বরূপ চরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়—আত্মসুখ ইচ্ছা থাকে তারে বলি 'কাম।' কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম। যতক্ষণ আত্মসুখের অনুসন্ধান থাকে, ততক্ষণ সাধক কামুক; তিনি প্রেমিক নামের যোগ্য হন না। যে সাধক কৃষ্ণসুখসাধনে বিভোর, যাঁহার কৃষ্ণপ্রীতি ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মসুখের ধারণাই নাই। যাহার আত্মপ্রীতি-স্রোতস্বতী কৃষ্ণসুখসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, সেই নিষ্কাম ভক্তই 'প্রেমিক' নাম পাইতে পারেন। পতিপ্রাণা সতীর "বাস বা না বাস ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল, তোমার ভালই আমার ভাল, অন্য ভাল বুঝি না—" এই নিঃস্বার্থ প্রেমগীতি, পরম ভক্তেরও প্রাণের তারে বাজিয়া ঝঙ্কৃত হয়।

সংসারী ভক্তের ভক্তি সাধারণতঃ হৈতুকী। যতক্ষণ রাগের উদয় না হইতেছে, ততক্ষণ বৈধী বা হৈতুকী ভক্তিই যথাসর্ব্বস্ব। পরে যখন রাগোদয় হয় তখন অহৈতুকী ভক্তির আবির্ভাবে সাধক কৃতার্থ হন। হৈতুকী ভক্তিই অহৈতুকীতে পরিণত হয়। হৈতুকী ভক্তিতে সাধক হৃদয়ে দুটী জিনিষ থাকে, এক ভক্তি আর হেতু বা কাম। পরে যখন ভজন-বলে কাম টলিয়া যায়, তখন থাকেন শুধু অহৈতুকী ভক্তি। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এ বিষয়ে যে ভরসার কথা আছে তাহা এস্থলে কথিত হইতেছে। "কামলাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরস, কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষ।" কামনা দূরে যায়, তখন জীব নিত্যকৃষ্ণদাসত্ব অনুভব করে, অহৈতুকী ভক্তিধনে

ধনী হয়। সাধনের এই রীতি, সাধনসাধ্য সদারাধ্য ভগবানেরও শুদ্ধ ভক্তিদানের ও এই পদ্ধতি। এই শ্লোকের সারতত্ত্ব এই যে, ধনজন সুন্দরী বনিতা কবিতা সবই অসার, কেবল পরা ভক্তিই সারাৎসার। ভক্তি-বলেই জীবের উদ্ধার।

মহাপ্রভুর উপদেশের সাধারণ অর্থ বিবৃত হইল, অতঃপর বৈষ্ণব-সাধুসমাজে প্রচলিত গূঢ় অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। এই উপদেশে দৈন্যের চরম বিকাশের চিত্র বিরাজমান। ভক্ত বলিতেছেন, আমি ধন চাই না। ভক্তের কাছে শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমই ধন, অনর্থক অর্থকে বৈষ্ণব, ধনমধ্যে গণ্য করেন না। শ্রীচরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং শ্রীল্ রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন— "সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?" উত্তরে রামানন্দ বলিতেছেন, "রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী" প্রেম পরমধন, কিন্তু সে ধনে কি ভক্ত বৈষ্ণবের অভিলাষ নাই? আছে বটে, কিন্তু এখানে ভক্তের দৈন্যমূর্ত্তিই প্রকটিত, তাই তিনি বলিতেছেন, আমি প্রেম চাই না। আমি এমন দীন যে প্রেমলাভের অভিলাষও আমার পক্ষে সাজে না। বামনের যেমন চন্দ্র-ধারণে বাসনা, আমার প্রেমপ্রত্যাশা ততোধিক দুরাশা। হায়! প্রেমকল্পতরু কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অধম আমি প্রেম-কামনাও করিতে পারি না! ভক্ত এত দীন যে, নিজেকে প্রেমের অযোগ্য পাত্র মনে করিয়া সংকোচে জড়সড় হন! এরূপ নইলে নিষ্কিঞ্চনতার অধিকারী হওয়া যায় কিরূপে! যদি বলা যায় যে, ভক্ত, তুমি নিজে প্রেমের পাত্র না হইতে পার, কিন্তু প্রেমিক জনের সংসর্গে ত তুমিও ক্রমে প্রেমের যোগ্য হইতে পার। তাই বলি, তুমি প্রেমিক জন চাও কি? ভক্ত বলেন, প্রেমিকজনও চাই না।—অর্থাৎ আমার ন্যায় অধমের পক্ষে প্রেমিক জনের সঙ্গলাভও দুর্লভ। যাঁহারা বহুজন্মের পুণ্যফলে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভক্তসঙ্গসুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী। আমার মত পুণ্য-দৈন্য-হীনের পক্ষে কি তাহা সম্ভব? তাই বলি, আমি প্রেমিক জনও চাই না, কারণ মাদৃশ দুরাশয় তাহার অযোগ্য। তবে কি প্রেমরসসিক্তা সুন্দরী কবিতা বা ভগবল্লীলাবর্ণনালঙ্কৃত ভক্তিশাস্ত্রের সেবা করিতে চাও? তাহাতেও কালে প্রেম-মাধুরী-মুগ্ধমনে প্রেমধন প্রকাশ পাইতে পারে; তাই বলি, সুন্দরী কবিতা চাও কি? প্রত্যুত্তরে ভক্ত বলিতেছেন, ন সুন্দরীং কবিতাং বা কাময়ে। আমি সুন্দরী কবিতা অর্থাৎ ভগবল্লীলারসরসিক্তা ভক্তিদীপ্তিময়ী সুকবিতাও চাই না, কারণ তাহাতেও অশেষ সৌভাগ্য চাই। মাদৃশ দীনাতিদীন হীনাতিহীনের পক্ষে কৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গের অনুশীলন-প্রয়াসও ধৃষ্টতার বা স্পর্দ্ধার কথা। কৃষ্ণলীলারসময়ী সুকবিতার রসাস্বাদ-বাসনা আমার পক্ষে শোভা পায় না। তাই আমি তাহা চাই না। যদি বলা যায় যে ভক্ত, তুমি কি চাও? প্রত্যুত্তরে ভক্ত বলিতেছেন, মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি, অর্থাৎ ভগবন্! আমি তোমার দাস; জন্মে জন্মে

যেন তোমাতে আমার অহৈতুকীভক্তি হয়, আমি এইমাত্র চাই। এখানকার তাৎপর্য্য এই যে, এজন্মে ত আমি প্রেম-লাভের অধিকারী নইই, তবে অন্য জন্মে যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি, এই প্রার্থনা। অথবা "অহৈতুকী ভক্তি" বলিতে এখানে "নৈসর্গিকী ভগবৎস্মৃতি" বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভক্ত বলিতেছেন, যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন নৈসর্গিকী ভগবৎস্মৃতি আমাকে পরিত্যাগ না করেন। প্রগাঢ় ভক্তিই প্রেম, সুতরাং প্রেম চাই না, অহৈতুকী ভক্তি চাই, এরূপ ব্যাখ্যা নির্দ্দোষ নয়। ভক্তি এখানে ভগবদনুস্মৃতি। ভক্ত "সুন্দরী" শব্দে সুরূপা রমণী বুঝিতে চাহেন না, কারণ ভক্তের ইন্দ্রিয়সুখে স্পৃহা থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখের সাধন-স্বরূপ সুন্দরী রমণী তাঁহার প্রার্থনার বিষয় হইতে পারে না। যাঁহারা মোক্ষকেও উপেক্ষা করেন, জ্ঞানকেও ম্লান দেখেন, পাতালে ভূতলে ও স্বর্গলোকে আধিপত্য রাজত্ব দেবত্ব ও ইন্দ্রত্ব, এমন কি ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত যাঁহার কাছে তুচ্ছ, তিনি "কামিনীতে বাসনা নাই" বলিয়া পরিচয় দিতে যাইবেন কেন? প্রকৃতপক্ষে যাহারা প্রৌঢ়শ্রদ্ধ উত্তম ভক্ত, তাঁহারা এসব তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত রাজর্ষি ভরত। শ্রীভাগবতে দেখা যায়, যোদুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্‌সেবা-নুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গু। রাজর্ষি ভরত মূঢ়গণের পক্ষে দুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র, স্বজন ধন, পত্নী এবং দেবদুর্ল্লভ রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছিল, কারণ যাঁহারা ভগবদনুরক্তচিত্ত তাঁহাদের অভাব অল্পই হইয়া থাকে। সুতরাং সাধারণ বনিতা কবিতা প্রসঙ্গ—প্রকাশ এ শ্লোকের উদ্দেশ্য নয়। এখানকার উপদেশ, "দীনতামন্ত্রে দীক্ষিত হও, আমি প্রেমলাভের যোগ্য নই, প্রেমিকের সঙ্গলাভেরও উপযুক্ত নই, ভগবৎপ্রসঙ্গ-সেবার অধিকারী নই, আমি অতীব অকিঞ্চন" এইরূপ ভাবানুবন্ধে অত্যন্ত হও, তবেই ভগবৎকৃপার পাত্র হইবে, পরে পরাভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। মনে রাখিবে, আগে দৈন্য, শেষে অন্য সব, ভগবান্ দীননাথ।

শ্রী———

ন্যায়দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সূত্র। সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ।৩।৪।

ব্যাখ্যা। "স"(পূর্ব্বোক্তজল্পঃ) প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনঃ" (প্রতিপক্ষো দ্বিতীয়পক্ষঃ প্রতিবাদিনঃ স্বপক্ষইতি যাবৎ তস্যস্থাপনা প্রমাণাদিনা সাধনং তচ্ছূন্যঃ সন্) বিতণ্ডা ভবতি।

তাৎপর্য্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত জল্পকথা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ প্রতিবাদীর স্বপক্ষের স্থাপনাশূন্য হইলে বিতণ্ডা হয়, অর্থাৎ

স্বপক্ষস্থাপন না করিয়া কেবল পরপক্ষ-খণ্ডনের জন্য যে কথা হয়, তাহাই বিতণ্ডা।

টীকা। "বিতণ্ডা" কথাটা অনেকের মুখেই শুনা যায়। বাদ ও জল্পের নাম কিন্তু বড় অপ্রচলিত। ইহার কারণ কি, তাহা ভাবিবার বিষয়। সাধারণ ভদ্রলোকের মুখেও "বিতণ্ডা" "বাগ্‌বিতণ্ডা" এইরূপ শব্দ বহুকাল হইতেই উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য তাঁহারা ঐ শব্দের দ্বারা কোন অর্থবিশেষ বুঝাইবার জন্যই উহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "বিতণ্ড্যতে পরপক্ষো ব্যাহন্যতে হনয়া" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যাহার দ্বারা পরপক্ষকে ব্যাহত করা হয় সেই কথাই বিতণ্ডা, ইহা বুঝা যায়, কিন্তু কেবল পরপক্ষ খণ্ডন করিলেই বিতণ্ডা হয় না। উহা অন্য কথাতেও হইয়া থাকে। বিতণ্ডা জিগীষুর কথা সুতরাং উহা বাদ হইতে পারে না, কিন্তু জল্প কথার সহিত উহার প্রভেদ কি? তাই বলিয়াছেন "প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনঃ"। সূত্রে "সঃ" এইস্থলে তৎশব্দের দ্বারা পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত জল্পকেই ধরা হইয়াছে, তবে জল্প, প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন হইতেই পারে না, তাই ঐ তৎশব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জল্পের একদেশ অর্থাৎ উভয়পক্ষস্থাপন-বিশিষ্ট এই বিশেষণাংশকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য সর্ব্বাংশই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝাগেল, জল্পে উভয় পক্ষের স্থাপনা আছে, বিতণ্ডায় প্রতিপক্ষের স্থাপনা নাই। প্রতিবাদীর পক্ষ থাকিলেও তিনি প্রমাণাদির দ্বারা তাহার সাধন করেন না। কেবল বাদীর সংস্থাপিত পক্ষেরই খণ্ডন করেন। ফলতঃ এইভাবে প্রতি-পক্ষের স্থাপনাহীন হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণা-ক্রান্ত জল্পই বিতণ্ডা হইয়া পড়ে। বিতণ্ডা ও জল্পে আর কোন প্রভেদ নাই।

অনেকের ধারণা, বিতণ্ডাকারীর নিজের কোন পক্ষ নাই, তিনি কেবল পরপক্ষেরই খণ্ডন করেন। বস্তুতঃ এধারণা ঠিক্ নহে। বিতণ্ডকারীর নিজের কোন পক্ষ না থাকিলে, তিনি পরপক্ষ খণ্ডন করিতে যাই-বেন কেন? যদি পরপক্ষ খণ্ডন করিলে স্বপক্ষ আপনিই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে এই আশায় তিনি পরপক্ষ খণ্ডন করেন, তাহা হইলে গুপ্তভাবে তাঁহার স্বপক্ষও আছে। বস্তুত তাহাই প্রকৃত কথা। স্বপক্ষ সিদ্ধ হউক্ বা না হউক পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা স্বপক্ষ সিদ্ধ হইবে—আশা করিয়াই বিতণ্ডা-কারী, পরপক্ষ-খণ্ডনরূপ বিতণ্ডাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাই সূত্রকার মহর্ষি বলিয়াছেন "প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনঃ" অর্থাৎ প্রতিবাদী বিতণ্ডাকারীর পক্ষ আছে কিন্তু প্রমাণাদির দ্বারা তাহার স্থাপনা (সাধন) নাই। তিনি মনে করেন যে পরপক্ষ খণ্ডন করিলে আর স্বপক্ষর স্থাপনা প্রয়োজন হইবে না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও সূত্রে "প্রতিপক্ষহীনঃ" এইরূপ না বলিয়া "প্রতি-পক্ষস্থাপনাহীনঃ" এইরূপ কেন বলা হইয়াছে তাহার কারণ এইরূপেই প্রকাশ করিয়া-ছেন। বিতণ্ডার স্বপক্ষ না থাকিলে মহর্ষি কেবল "প্রতিপক্ষহীনঃ" এইরূপই বলিতেন। ন্যায়বার্ত্তিককারও বলিয়াছেন "অভ্যুপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি সবৈতণ্ডিকঃ"। অর্থাৎ স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া যিনি তাহার স্থাপনা

করেন না, কেবল পরপক্ষেরই খণ্ডন করেন তাঁহাকে "বৈতণ্ডিক" বলে। ফলকথা "বিতণ্ডা" সুসাধ্য নহে। তাহাতেও প্রমাণাদি পদার্থের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। চীৎকার করিয়া বা কুতর্ককৌশলে বাদিনিরাস করিতে পারিলেই বিতণ্ডা হয় না। কলহকারী, বিতণ্ডাতেও অধিকারী নহে। তবে কলহাদিস্থলে বিতণ্ডার ন্যায় বচনপরম্পরা ও তর্কপ্রণালী অনেকস্থলে দেখা যায়, তাই ঐরূপ বচন-পরম্পরাতে বিতণ্ডা শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। মানবের মনের সংস্কারের অভাবে দেশে জিগীষামূলক কুতর্কের প্রভাব চিরদিনই বেশী। বাদ ও জল্পের সহিত পরিচয় সাধারণের নাই। তাই বিতণ্ডার নামটাই বড় হইয়াগিয়াছে। তাই অনেক লোকের মুখে সুচিরকাল হইতে বিতণ্ডা বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

অনেক মনীষী ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মসূত্রে ও শারীরকভাষ্যে ব্রহ্মবিচার বিতণ্ডা; পরপক্ষ খণ্ডন করিলে স্বপক্ষ ব্রহ্ম আপনিই সিদ্ধ হইবেন। অদ্বিতীয় চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বস্বরূপে স্বতঃ প্রকাশ, তাহার সাধনে কোন প্রয়োজন নাই; পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া লোকের নানাবিধ অজ্ঞতা দূর করাই বেদান্তদর্শনের উদ্দেশ্য। দার্শনিক চূড়ামণি শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থেও কেবল পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া বিতণ্ডা করা হইয়াছে। "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিচারও বিতণ্ডা" এইরূপ কথা শুনিয়াছি, কিন্তু একথাটা আজও বুঝিতে পারি নাই। গ্রন্থে প্রদর্শিত বিচার, বিতণ্ডা হইতে পারে কিনা ইহা মনীষিগণ ভাবিবেন। পরন্তু বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মবিচার "বাদ" ইহা শারীরকভাষ্যেই মীমাংসিত হইয়াছে। স্বপক্ষসমর্থনের জন্যই পরপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন। জিগীষা বশতঃ মহর্ষি বাদরায়ণ পরপক্ষ খণ্ডন করেন নাই। সূত্রকার বাদরায়ণ ও তাঁহার বেদান্তের অধিকারী শিষ্যগণ, জিগীষার দেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন। জিগীষা না থাকিলে "বিতণ্ডা" হয় না, ইহা মনে রাখিয়া এবং শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের মীমাংসা ও বাচস্পতিমিশ্রের ভামতীতে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসূত্রীয়বিচারের বাদত্ব কীর্ত্তন শুনিয়া আমরা ব্রহ্মসূত্রীয়বিচারকে বিতণ্ডা বলিয়া কখনই স্বীকার করিতে পারি না। ব্রহ্মসূত্রে পরপক্ষ খণ্ডনের ন্যায় স্বপক্ষের স্থাপনাও আছে এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে প্রথমতঃ স্বপক্ষের স্থাপনা করিয়া পরে ঐ স্বপক্ষকে দৃঢ় করিবার জন্যই পরপক্ষ খণ্ডন করা হইয়াছে। স্বপক্ষের স্থাপনা থাকিলে তাহা কখনই বিতণ্ডা হইতে পারে না, ইহা বিতণ্ডার লক্ষণ-সূত্রেই সুব্যক্ত রহিয়াছে, তবে আর কি করিয়া বেদান্তের ঐসব গ্রন্থের বিচারকে "বিতণ্ডা" বলিয়া বুঝিব?

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

অবকাশ।

অবকাশ কর্ম্মশক্তির উত্তেজক। অবিশ্রান্ত কর্ম্ম, কর্ম্মশক্তির অবসাদক। কর্ম্মসেবার বাহুল্যে কর্ম্মযন্ত্রসমূহ ক্লান্ত হয়। কর্ম্ম ছাড়িয়া যোগ্য বিশ্রাম লইলে, যথাকালে পুনরায়

কর্ম্মযন্ত্রগুলি কর্ম্মের জন্ত নবভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। অবিরাম কর্ম্মে যেমন কর্ম্মসামর্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, অবিশ্রান্ত বিশ্রামে তেমনই কর্ম্মশক্তির সঙ্কোচ ঘটে, সুতরাং যথাযোগ্য কর্ম্ম ও বিহিত বিশ্রামের ব্যবস্থাই কর্ম্মপরিচালনের কারণ হয়। কর্ম্মযন্ত্র সম্বন্ধে এ সত্য যেরূপ প্রযুক্ত হয়, যাহারা যন্ত্রবৎ অন্তদ্বারা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধেও ইহা তদ্রূপ বা ততোধিক সুপ্রযুক্ত হয়। কর্ম্মক্ষেত্রের এই বিধান সার্ব্বজনীন। কর্ম্মজীবন মাত্রেই একটু না একটু অবকাশের স্থান থাকা দরকার। প্রাচীন ভারতের কর্ম্মকরবর্গ এ ব্যবস্থায় বঞ্চিত ছিলেন না। কর্ম্মীরা ক্রীতদাস ছিলেন না। তাঁহাদেরও অবকাশের বন্দোবস্ত ছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমারা তাহার নিদর্শন প্রদর্শন করিব।

:

ব্যবহারাচার্য্য মহর্ষি উশনা, তাঁহার অমূল্য নীতিশাস্ত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন—ভৃত্যানাং গৃহকর্ম্মার্থং দিবা যামং সমুৎসৃজেৎ। নিশি যামত্রয়ং নিত্যম্। ভৃত্যগণের গৃহকার্য্যের নিমিত্ত প্রভুগণ, ভৃত্যদিগকে প্রত্যহ দিনে একপ্রহর কাল এবং রাত্রিতে তিনপ্রহর সময় অবকাশ দিবেন। ভৃত্যেরাও মনুষ্য। মনুষ্যোচিত ব্যবহার পাইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার আছে। একথা প্রাচীনকালের ব্যবহারতত্ত্ববিশারদেরা বিশেষ জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই দিনের এক-চতুর্থাংশ সময় ভৃত্যদিগকে যন্ত্রবৎ ব্যবহৃত হইতে দিতেন না।

অবকাশদান চিরদিনই প্রচলিত ছিল,, আছে ও থাকিবে। কিন্তু প্রাচীনভারতে এই ব্যবস্থার বিশেষত্ব ছিল। প্রভুর স্বেচ্ছাচারিতাই অনেকসময় ভৃত্যের অবকাশকালের নির্দ্দেশক হইয়া থাকে। অনেক সময় হয়ত ভৃত্য, নিজের গুরুতর প্রয়োজনসাধনের জন্ত প্রস্তুত হইতে একটু অবসরও পায় না, অথচ কর্ম্মের বিরলতায় স্বীয় প্রয়োজন ব্যতীতও দীর্ঘ অবকাশ লাভ করে। ইহাতে পুনঃ পুনঃ স্বকার্য্যহানি ঘটায় ভৃত্য, ক্রমে প্রভুর হৃদয়ে সহানুভূতির অভাব কল্পনা করিয়া ক্লান্ত হয়। প্রাচীনভারতের ব্যবস্থাপকগণ জানিতেন, প্রভুর ব্যবহারে ভৃত্যের চিত্তে অসন্তোষের উদ্ভব হইলে, উহা প্রভুভৃত্যভাবের মর্য্যাদারক্ষার প্রতিকূল হয়। প্রভু-ভৃত্যভাবের প্রতিষ্ঠাস্থান সহানুভূতি বা প্রেম। প্রভু, প্রেমেই ভৃত্যের হৃদয় জয় করিবেন, কঠোরতা বা তীব্রতার দ্বারা নয়। এই অমূল্য তথ্য হৃদয়ে ধ্যান করিয়াই তাঁহারা ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ণ করিতেন। সেজন্ত তাঁহাদের বিধান ছিল, ভৃত্যাঃ কার্য্যং কারয়ীত হ্যুৎসবাদৈর্বিনা প্রভুঃ। অত্যাবশ্যং ত্বুৎসবেঽপি হিত্বা শ্রাদ্ধদিনং সদা। প্রভু, উৎসবাদিদিন ভিন্ন অন্তদিনে ভৃত্যকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন অর্থাৎ উৎসবাদিদিবসে ভৃত্যগণ অবকাশলাভ করিবে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যের উপরোধ হইলে উৎসবাদিদিবসেও ভৃত্যগণকে কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখা যায়, কিন্তু শ্রাদ্ধদিনে কোনওরূপে ভৃত্যকে কর্ম্মে বাধ্য করা যাইবে না। এই অনুশাসন বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, প্রভু, ভৃত্যের ধর্ম্মসাধনের দ্বার উন্মুক্ত রাখিবেন—এইরূপ ব্যবস্থাই ইহার মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া বিরাজমান আছে। উৎসব অর্থ উৎসবই, বিলাশ সজ্জা নহে। শাস্ত্রীয় নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মেই উৎসব হয়; পূজা, যজ্ঞ,

ব্রত প্রভৃতিতেই হিন্দুর গৃহে উৎসবের স্রোত বহে। শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মকর্ম্মে ভৃত্যের ন্যায্য অধিকার আছে; সেই ধর্ম্মাধিকার হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং উৎসবাদিতে যাহাতে ভৃত্য নিজধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাকরিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার স্কন্ধ হইতে সেদিনকার প্রভুকার্য্যের বোঝা নাবাইয়া লইতে হইবে। 'উৎসবাদি' বলায় আপদ্ বিপদের দিনেও ভৃত্য অবকাশ পাইবে বুঝা যায়। শুধু উৎসবে সহানুভূতি দেখাইলে চলিবে না, ব্যসনেও সহানুভূতির দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভৃত্যের হিতৈষী বন্ধুস্থানীয় হইয়া আলোকে অন্ধকারে সর্ব্বত্র তাহাকে হিতকর পথে চালাইতে হইবে। এরূপ হইলেই প্রভুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা পাইতে পারে। অন্যথায় সমুজ্জ্বল প্রভুত্বও সঙ্কীর্ণস্বার্থপরতা ও অহমিকার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। শ্লোকের শেষভাগে বিশেষভাবে শ্রাদ্ধদিনের সম্মান করা হইয়াছে। ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে শ্রাদ্ধকর্ম্ম, বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে।

দেবপূজাদি কার্য্য অপেক্ষা ইহাকে মহর্ষি উশনা গুরুতর কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিলে আমরা অনুমান করিতে পারি,—তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, দেবতা অপ্রত্যক্ষ, আর শ্রাদ্ধদেবতা পিতৃপুরুষ প্রত্যক্ষরূপে পরিজ্ঞাত। সাধারণ অধিকারী, সুগভীর রহস্যসঙ্কুল অলৌকিক দেবতত্ব না বুঝিতেও পারে, কিন্তু পিতৃদেবতত্বের লৌকিকভাব অবশ্যই বুঝিয়াছে। দেব-পূজায় উপস্থিত না থাকিতে পারিলে হিন্দুসন্তানের চিত্তক্ষোভ ঘটে বটে, কিন্তু পিতৃপূজায় অনুপস্থিত থাকিলে প্রকৃতকর্ম্মই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কাজেই অত্যাবশ্যক ব্যাপারের অর্থাৎ যে কার্য্য কালবিলম্ব সহ্য করিতে পারে না, তাদৃশকর্ম্মের অনুরোধে ভৃত্যগণকে দেবোৎসবদিনে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইলেও তাহার পিতৃকৃত্যের দিনে তাহাকে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত রাখা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। এখানে আমরা দেখিতেছি, ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য অবকাশদানই মুখ্য লক্ষ্য।

নিয়ত ভৃত্য অর্থাৎ যাহারা বার্ষিক বেতন-ব্যবস্থানুসারে দীর্ঘকালের জন্য ভৃত্যভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি উৎসব ব্যসনাদিতে অবকাশের ব্যবস্থা এবং অহোরাত্র কালের মধ্যে চারিপ্রহর অবকাশের বিধান। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর ভৃত্যের সুবিধা অনুসারে একপক্ষকাল অবকাশের নিয়ম ছিল। এই সময়েও বেতন প্রাপ্তিতে বাধা ঘটিত না। উশনা বলিয়াছেন, সেবাং বিনা প্রভুঃ পক্ষং দদ্যাদ্ ভৃত্যায় বৎসরে। ভৃত্য একপক্ষ কর্ম্ম না করিয়াও বেতন পাইবে। এ অনুগ্রহ স্মরণীয় বটে। অসুস্থ হইয়া যদি ভৃত্য সপ্তাহকাল প্রভুকর্ম্ম না করিতে পারে, তাহাহইলেও তাহার বেতন কাটা যাইবে না, প্রাচীনতান্ত্রের এই ব্যবস্থা যে উত্তম, তাহাতে সংশয় নাই। উশনা বলিয়াছেন, নৈব পক্ষার্দ্ধমার্ত্তস্য হাতব্যাল্পাপি ভৃতিঃ। পক্ষ অর্থাৎ পঞ্চদশ দিনের অর্দ্ধ সার্দ্ধসপ্তদিন তাৎপর্য্যতঃ সাত দিন পর্য্যন্ত পীড়িত ভৃত্যের বেতন হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করা যাইবে না, সম্পূর্ণই তাহাকে দিতে হইবে। ভগবান্ ভৃত্য সম্বন্ধে

দীর্ঘকালীন পীড়াজনিত অনুপস্থিতিতেও অর্দ্ধ বেতন দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। উশনা বলিয়াছেন—সুমহদ্‌গুণিনঃ স্বার্ত্তঃ ভৃতার্দ্ধং কল্পয়েৎ সদা। সুমহদ্‌গুণী ভৃত্য বলিতে তাৎপর্য্যতঃ বুঝা যায়—বিশ্বাসী সচ্চরিত্র পুরাতন ভৃত্য। দীর্ঘকাল (বৎসরাধিক) পীড়িত থাকিলেও এরূপ ক্ষেত্রে অর্দ্ধ বেতন দেওয়া সঙ্গত। যে ভৃত্য পাঁচবৎসর নিয়মিত কাজ করিয়াছে, সে এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত অসুস্থ থাকিলেও ত্রিচতুর্থাংশ বেতন প্রাপ্ত হইবে, আর বৎসরের অধিককাল অসুস্থ থাকিলে একচতুর্থাংশ অর্থাৎ বৎসরে তিনমাসের বেতন পাইবে। এখানে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, রোগার্ত্ত ভৃত্যগণও গুণানুসারে বেতন-সহিত অবকাশ লাভ করিত। এই অবকাশযুক্ত বেতন-দানের বিধান, যে প্রভুর মঙ্গলের জন্য ভৃত্যকে প্রাণপণ করিতে পক্ষান্তরে সহায়তা করিত, ইহা বোধহয় ব্যর্থ কল্পনা নহে।

যাহারা দিনভৃত্য অর্থাৎ দৈনিক বেতনের বন্দোবস্তে সেই দিনের জন্য ভৃত্যভাবে কর্ম্ম করে—তাৎপর্য্যতঃ দিনমুজুরী করে, তাহারাও চারিপহর দিনের অষ্টভাগের একভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধপহর অবকাশ পাইবে। উশনা বলিয়াছেন দিনভৃত্যেঽর্দ্ধযামকম্। যাহারা দিনমুজুরী করে, তাহাদেরও অর্দ্ধ পহর অবকাশের বিধান। অবকাশ চাইই। তবে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা, এই যা পার্থক্য। অবকাশ বিধান লইয়া ব্যবহারাচার্য্যগণ আরও অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন, আমরা সেই বিস্তৃত বিচারের বিবরণ এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম না। অবকাশ-মতে অবকাশের কথা আরও কিছু কিছু লিখিবার বাসনা রহিল।

শ্রীঃ——তীর্থ পদাশ্রিত।

ভেদের দার্শনিক তত্ত্ব।

আমরা প্রতিনিয়তই জ্ঞানে অজ্ঞানে স্বতঃ পরতঃ ভেদের প্রতীতি লাভ করিয়া থাকি, ভেদের ব্যবহারও করি, কিন্তু এই সম্বন্ধে যে কত প্রকার সূক্ষ্ম চিন্তোদ্ভূত তর্ক উঠিতে পারে, সে সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা করি না। আর যদিও বা কিঞ্চিৎ চিন্তা করি, তাহা দ্বারা সেই কুশাগ্রীয়বুদ্ধি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মহনীয়া মনীষার ইয়ত্তা করা যায় না।

ভেদ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই। বস্তু—বস্তুস্বরূপ; ভেদ বস্তুস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উপলব্ধ না হইলেও বস্তুস্বরূপ নহে। ভেদ ইহা একটি ব্যবহার মাত্র। এ ব্যবহার ভ্রান্তি-প্রসূত। ভেদ কখনই বস্তুর স্বরূপ হইতে পারে না। বস্তুর যেমন অপর বস্তু হইতে ভেদ বুঝিতে হয়, ভেদ বস্তুস্বরূপ হইলে ভেদেরও অপর বস্তু হইতে ভেদ বুঝিতে হয়। তাহা হইলে ভেদেরও আবার ভেদ, তাহার ভেদ—এই প্রকারে অসংখ্য ভেদ-স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, ভেদের অনবস্থা দোষ ঘটে। ভেদ বুঝিতে ভেদের অপেক্ষা; এ ভেদ বুঝিতেও ভেদের অপেক্ষা—এইরূপে আর ভেদের বিশ্রাম হয় না।

ভেদ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নহে।

বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয়। ভেদ কখন প্রত্যক্ষের গোচর হয় না। কোন বস্তুর ভেদ বুঝিতে হইলে আগাকদৃষ্টে সকলে হয়,

বস্তু, জাতি ভেদ এক সঙ্গেই জ্ঞাত হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা হয় না। বস্তুত ভেদের প্রত্যক্ষ-বাসনার ভ্রান্তি-মূলক। ভ্রান্তিবশে ভেদও প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

"ঘট রহিয়াছে" এস্থলে ঘটেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে, ভেদের নহে। কেহই বলে না যে, আমি ঘট ও ভেদ প্রত্যক্ষ করিলাম। "ঘট রহিয়াছে" এই স্থলে ঘট ও অপর বস্তু হইতে ঘটের ভেদ—এই বস্তু ও ভেদ উভয়ই যুগপৎ এক সঙ্গে বা ক্রমে প্রত্যক্ষ বিষয় হইতেছে না। যুগপৎ বস্তু ও ভেদের প্রত্যক্ষ-বিষয়তা স্বীকার করিলে অস্তিত্ব (বস্তু) ও নাস্তিত্বের (ভেদের) এক সঙ্গেই প্রত্যক্ষ হইতে দেখা যাইত।

অগ্রে বস্তুসত্তার প্রতীতি, পশ্চাৎ তাহার ভেদ-প্রতীতি, বস্তুপ্রতীতি হইলে পর বস্তুগত ভেদের প্রতীতি, তখন অস্তিত্ব নাস্তিত্বের (বস্তু ও ভেদের) যুগপৎ এক সঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুসত্তা-প্রতীতি, বস্তুগত ভেদ-প্রতীতির পূর্ব্ববর্ত্তিনী বলিয়া বস্তু ও বস্তুগত ভেদ ভিন্নকালীন জ্ঞানের ফল। বস্তুপ্রতীতি পূর্ব্ববর্ত্তি জ্ঞানের ফল, বস্তুগত ভেদ-প্রতীতি পরবর্ত্তী জ্ঞানের ফল। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী জ্ঞানের ফল হইয়া বস্তু ও ভেদ কখনই যুগপৎ প্রতীতি-বিষয় হইতে পারে না।

ভিন্নকালীন জ্ঞানের ফল বলিয়া যেমন বস্তু ও ভেদের একসঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘটে না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্ষণিক বলিয়া ক্ষণিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা ক্রমেও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বস্তু ও ভেদ-প্রত্যক্ষ ক্রমে ক্রমে হইতেছে বলিলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আর ক্ষণিক (ক্ষণমাত্রস্থায়ী) বলা চলে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন তাহা ক্রমে প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্ষণিক—একক্ষণ স্থায়ী; যে ক্ষণে বস্তু-স্বরূপের প্রতীতি, পরক্ষণে তদ্গত ভেদ-প্রতীতি স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একক্ষণস্থায়িত্ব অস্বীকার করিতে হয়।

বস্তুস্বরূপই প্রত্যক্ষের বিষয়, ভেদ নহে। ভেদ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে (যথা ঘটো ভিন্নঃ) যাহার ভেদ, যাহা হইতে ভেদ—এই উভয়ের, আশ্রয়ী ও আশ্রয়ের স্মরণ আবশ্যক। আশ্রয়—আধার প্রতিযোগী; আশ্রয়ী—আধেয় অনুযোগী। "এই ঘট পট হইতে ভিন্ন" এই ভেদব্যবহারে পট ও পটবিষয়ক জ্ঞান উভয়েরই অপেক্ষা আছে। ভেদকে বস্তুস্বরূপ বলিলে ঐ বস্তুস্বরূপাত্মক ভেদেরও আধার আধেয়ের (প্রতিযোগী ও অনুযোগী) জ্ঞান আবশ্যক। যাহা হইতে ও যাহার ভেদ—এই উভয় (প্রতিযোগী ও অনুযোগী) জ্ঞান ব্যতীত যখন ভেদ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তখন ভেদেরও "যাহা হইতে ও যাহার ভেদ—" এই অনুযোগী ও প্রতিযোগী জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। তাহা হইলে ভেদেরও ভেদ, আবার এই ভেদেরও ভেদ—এইরূপে আর ভেদের সমাপ্তি হয় না।

আরও, বস্তু ও তদ্গত ভেদ যদি উভয়ই বস্তুস্বরূপই হইল, এই পরস্পরের ভেদ যদি আর স্বীকার নাই কর, তাহা হইলে বস্তু ও তদ্গত ভেদ; ঘট ও

কলসের মত পরস্পর একার্থক ও পর্য্যায় শব্দ হইয়া পড়ে। ঘট ও ভিন্ন (পট হইতে) প্রতীতিসিদ্ধ এই দুই প্রকার ব্যবহারের পার্থক্য লুপ্ত করিয়া পর্য্যায়-শব্দের মত করা, যুক্তিবাদীর কর্ত্তব্য নহে।

ভেদ বস্তুর ধর্ম্ম নহে।

ভেদ যেমন বস্তুর স্বরূপ নহে, তদ্রূপ বস্তুর ধর্ম্মও নহে। ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্মের ভেদ আছেই। ভেদকে ধর্ম্ম বলিলে, আবার এই ধর্ম্মরূপ ভেদেরও ভেদ-স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন, দুইটি ভেদ আসিয়া পড়িতেছে। প্রথম ভেদ—ভেদই বস্তুর ধর্ম্ম। দ্বিতীয় ভেদ—এই বস্তুধর্ম্মরূপী (প্রথম) ভেদ, ধর্ম্মী বস্তু হইতে ভিন্ন। তবেই বস্তুধর্ম্ম (১) ভেদেরও ধর্ম্মী হইতে (২) ভেদ—এই প্রকারে ভেদের অনবস্থা-দোষ পূর্ব্ববৎ সমানই।

আর যদি ধর্ম্মরূপী (প্রথম) ভেদের আর (ধর্ম্মী হইতে) ভেদ স্বীকার নাই কর, তাহা হইলে ধর্ম্মী—বস্তুস্বরূপই বলিতে হইবে। বস্তুস্বরূপ হইতে ভেদ স্বীকার না করিলে ধর্ম্মরূপী ভেদকে সেই বস্তুস্বরূপই স্বীকার করা হইল। তবে আর ভেদকে বস্তুর ধর্ম্ম বল কেমন করিয়া? ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্মের ভেদ আছেই, কিন্তু এ স্থলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী—ভেদ ও বস্তুর ভেদ না থাকায় (অভিন্ন হওয়ায়) ভেদের ধর্ম্মত্বই সিদ্ধ হইল না—অর্থাৎ ভেদকে আর বস্তুর ধর্ম্ম বলা গেল না।

ভেদকে বস্তুর ধর্ম্ম বলিলে আরও দোষ হয়। ঘটত্ব মনুষ্যত্বাদি জাতি, তদ্রূপ রক্তত্ব প্রভৃতি গুণ—ধর্ম্ম। এই জাতিগুণাদিধর্ম্মবিশিষ্টই ধর্ম্মী। তবে দেখ, বস্তুর জ্ঞান জন্মিলে পর বস্তুগত ভেদের প্রতীতি; আবার তদ্গত ভেদপ্রতীতি হইলে বস্তুর প্রতীতি—এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। অর্থাৎ জাতিগুণাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইতে হইলে তদ্গত ধর্ম্মের প্রতীতি অগ্রে হওয়া আবশ্যক; আবার বস্তুজ্ঞান না হইলেই বা কি প্রকারে বস্তুগত জাতিগুণাদি ধর্ম্মের প্রতীতি হইবে? এই প্রকারে বস্তু ও ভেদের জ্ঞান পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় হওয়ায়—পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করায় অন্যোন্যাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইল।

অতএব ভেদকে বস্তুর স্বরূপ, বস্তুর ধর্ম্ম, বস্তুর জাতি বা গুণ কিছুই যখন বলা যায় না, তখন ঐ ভেদ দুর্নিরূপ্য, কোন প্রমাণেই নিরূপণ করা যায় না। এই ভেদকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বা অন্য কোন প্রমাণেরই গ্রাহ্য স্বরূপে যখন জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে না, অথচ যখন প্রতীতির বিষয় হইতেছে, তখন ভেদকে ভ্রান্তিবশতঃ ব্যবহার মাত্র বলিতে হইবে।

ভেদের স্বরূপ কি?

ভেদের স্বরূপ দুর্নিরূপণীয়—নিরূপণের অযোগ্য। বস্তুস্বরূপ নহে বা বস্তুর ধর্ম্ম নহে বলিয়া ভেদকে সৎ বলা যায় না। যাহা বস্তুস্বরূপ তাহাই সৎ। ভেদজ্ঞান সত্যজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া সৎ হইতে পারে না। যাহা অবাধিত তাহাই সৎবস্তু। ধর্ম্ম গুণ বা জাতিকে বস্তুস্বরূপ

হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলা যায় না, অত্যন্ত অভিন্নও বলা যায় না, এই কারণেও ভেদ দুর্নিরূপ্য। আবার ভেদ প্রতীতি-বিষয় বলিয়া অসৎপদবাচ্য নহে। অসৎ—আকাশকুসুমাদি। আকাশকুসুমাদি চক্ষুর সন্নিকর্ষে বর্ত্তমান দেখা যায় না (বা বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত প্রমাণ চৈতন্যের অভিন্নতা হয় না) বলিয়া অসৎ। আকাশকুসুম প্রতীতির বিষয় হয় না, কিন্তু ভেদ প্রতীতির বিষয় হয়, কাজেই ভেদ অসৎ নহে। যাহা সৎ ও অসৎ নহে—তাহা কি ?

তাহাই অনির্ব্বাচ্য। যাহা প্রমাণের অগম্য, যুক্তি দ্বারা অনিরূপণীয়, অথচ প্রতীতিসিদ্ধ, তাহাই অনির্ব্বাচ্য। ভেদ-জ্ঞানকে সত্যজ্ঞানদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায় বলিয়া ভেদজ্ঞান সত্যজ্ঞান নহে, ভ্রমজ্ঞান।

ভেদ আকাশকুসুমাদির মত অসৎ—প্রতীতির অবিষয়ীভূত অবস্তু নহে। আকাশকুসুমাদি অবস্তু, তুচ্ছ। ভেদ-বস্তু, অতুচ্ছ। আকাশকুসুমাদি এক প্রকার অভাব। ভেদ—অভাব নহে।

ভেদ সদ্ভিন্ন বলিয়া ও বাধিত হয় বলিয়া অনিত্য। আর অনিত্য বলিয়া ভেদকে অসৎ বলা যায়। অসৎ পদটির দুইটি অর্থ—এক, প্রতীতির অবিষয়ীভূত, তুচ্ছ অবস্তু। আর, প্রতীতির বিষয়ীভূত অতুচ্ছ, অনিত্য বস্তু।

ভেদই অবিদ্যা বা ভেদের মূল কারণ অবিদ্যা।

ভেদের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যাই ভেদের জনয়িত্রী। অবিদ্যা—ভেদাত্মিকা, ভেদস্বরূপা। অবিদ্যাকেই কখন ভেদরূপে কখন বা ভেদের মূলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবিদ্যা শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিতা থাকিলে মায়া। ব্রহ্মের সৃজনেচ্ছা, সিসৃক্ষা—মায়া। সেই মায়াই রজস্তমোগুণযুক্তা অন্তঃকরণা-বচ্ছিন্না হইলেই অবিদ্যা। অবিদ্যা সতী নহে, কারণ বাধিতা। আকাশকুসুমাদির মত নহে, কারণ প্রতীতিবিষয়া।

অবিদ্যা ভাবপদার্থ, অভাবপদার্থ নহে।

অভাব কখন প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। অভাব—অনুপলব্ধি নামক প্রমাণের গম্য অবিদ্যা বা অজ্ঞান প্রত্যক্ষদ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া অভাব পদার্থ নহে। যদি অবিদ্যা বা অজ্ঞান অভাব হইত, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয় প্রত্যক্ষগম্য হইত না, অনুপলব্ধি প্রমাণেরই গম্য হইত। অজ্ঞান——জ্ঞানের প্রাগভাব নহে; জ্ঞানের প্রাগভাব ব্যতীত অবিদ্যা বা অজ্ঞান স্বতন্ত্র ভাব বস্তু। "আমি অজ্ঞ" এই প্রকারে অজ্ঞান সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া অজ্ঞান অভাব পদার্থ নহে।

প্রদীপালোক গৃহস্থিত ঘটাদিকে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তত্রত্য অন্ধকারকে বিনষ্ট বা অপসারিত করিয়া দেয়। এই অন্ধকার আলোকের প্রাগভাব মাত্র নহে, স্বতন্ত্র ভাব বস্তু। অন্ধকার যে আলোকাভাব হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, তাহা অন্ধকারের অপসরণরূপ গতি, নীল রূপ, ও ক্রিয়া দ্বারা বেশ প্রতীতি হয়। এই অন্ধকারের মতই অবিদ্যা বা অজ্ঞান স্বতন্ত্র ভাব বস্তু।

যতদিন মরুভূমি, মরীচিকাও ততদিন। মরুভূমি অনাদি অনন্ত হইলে মরীচিকাও অনাদি অনন্ত। কারণ মরুভূমির সত্তায় মরীচিকার সত্তা, মরীচিকার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। মরীচিকার সত্তা—ভ্রান্তিপ্রসূত সত্তা মাত্র। ব্রহ্মসত্তায় ভেদের সত্তা। ভেদের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই। ভেদের সত্তা—ভ্রান্তিমাত্র।

ভেদ ততদিন সত্য বলিয়াই প্রতীত হইবে, যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান ভেদের নাশ না করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ভেদ—নাশ্য। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বের দশার নাম ব্যবহারিক দশা। এই ব্যবহারিক দশায় ভেদ সত্য হইলেও পরমার্থতঃ অসত্য। তবেই ভেদ দুর্নিরূপ্য, অনির্ব্বাচ্য—সদসৎশূন্য হইল না কি? বাস্তবিকই ভেদের স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

ধনুর্ব্বেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অঙ্গন্যাসস্ততঃ কার্য্যঃ শিবোক্তঃ সিদ্ধি-মিচ্ছতা। আচার্য্যেণ চ শিষ্যস্য পাপঘ্নো বিঘ্ননাশনঃ। ১৭

শিষ্যের ধনুর্ব্বেদসিদ্ধিলাভেচ্ছু গুরু, এই সময়ে শিষ্যের শরীরে পাপঘ্ন ও বিঘ্ননাশক শিবোক্ত অঙ্গন্যাস করিয়া দিবেন। ১৭

শিখাস্থানে ন্যসেদীশং বাহুযুগ্মে চ কেশবম্ ব্রহ্মাণং নাভিমধ্যে তু জঙ্ঘয়োশ্চ গণাধিপম্। ওঁ হ্রৌঁ শিখাস্থানে শঙ্করায় নমঃ। ওঁ হ্রৌঁ বাহ্বোঃ কেশবায় নমঃ। ওঁ হ্রৌঁ নাভিমধ্যে ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ হ্রৌঁ জঙ্ঘয়োর্গণপতয়ে নমঃ। ঈদৃশং কারয়েৎ ন্যাসং যেন শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। অন্যেঽপি দুষ্টমন্ত্রেণ ন হিংসন্তি কদাচন। ১৮

শিখাস্থানে মহাদেব, বাহুদ্বয়ে কেশব, নাভিমধ্যে ব্রহ্মা, ও জঙ্ঘাদ্বয়ে গণেশের ন্যাস করিবে। ন্যাসের মন্ত্র যথা—"ওঁ হ্রৌঁ শিখাস্থানে শঙ্করায় নমঃ; ওঁ হ্রৌঁ বাহ্বোঃ কেশবায় নমঃ; ওঁ হ্রৌঁ নাভিমধ্যে ব্রহ্মণে নমঃ; ওঁ হ্রৌঁ জঙ্ঘয়োঃ গণপতয়ে নমঃ।" যাহাতে শিষ্যের মঙ্গল হয় এবং অন্য কেহ দুষ্টমন্ত্র দ্বারা তাহার অনিষ্ট করিতে না পারে, এই রূপে ন্যাস করাইবে। ১৮

শিষ্যায় মানুষং চাপং ধনুর্মন্ত্রাভিমন্ত্রি-তম্। কাণ্ডাৎ কাণ্ডাদিমন্ত্রেণ দদ্যাদ্বেদ-বিধানতঃ। ১৯

গুরু, শিষ্যকে বেদবিধি অনুসারে "কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি" মন্ত্র পাঠ করিয়া মানুষ (মনুষ্যোচিত) ধনুঃ প্রদান করিবেন। ১৯

প্রথমং পুষ্পবেধঞ্চ ফলহীনেন পত্রিণা। ততঃ ফলযুতেনৈব মৎস্যবেধং চ কারয়েৎ। মাংসবেধং ততঃ কুর্য্যাৎ এবং বেধো ভবেৎ ত্রিধা। এতৈবেধৈঃ কৃতৈঃ পুংসাং শরাঃ স্যুঃ সর্ব্বসাধকাঃ। ২০

গুরু, প্রথমশিক্ষাকালে শিষ্যকে দিয়া ফলক-বিহীন বাণের দ্বারা পুষ্পবেধ করাইবেন, তাহার পর ফলকযুক্ত বাণের দ্বারা মৎস্য-বেধ করাইবেন, পরে মাংস-বেধ অর্থাৎ মৃগাদিবেধ করাইবেন। পুষ্পবেধ মৎস্যবেধ মাংসবেধ এই তিন প্রকার বেধ।

এই তিন প্রকার বেধ অভ্যস্ত হইলে ধনুর্দ্ধারী, শরদ্বারা সকল সামগ্রী বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। ২০

যেখানে চৈব মাংসস্থ শরপাতো যদা ভবেৎ। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগমাশ্রিত্য তদা স্যাদ্বিজয়ী সুখী। দক্ষিণে কলহো ঘোরো বিদেশ-গমনং পুনঃ। পশ্চিমে ধনধান্যং চ সর্ব্বং চৈবোত্তরে শুভম্। ঐশান্যাং পতনং দুষ্টং বিদিশোঽন্যাশ্চ শোভনাঃ। হর্ষপুষ্টিকরা-শ্চৈব সিদ্ধিদাঃ সর্ব্বকর্ম্মণি। ২১

মাংসবেধের সময়ে যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বাণ পূর্ব্বদিকে পতিত হয়, তবে ধনুর্দ্ধারী, বিজয় ও সুখ লাভ করেন। বাণ দক্ষিণ দিকে পতিত হইলে ফল—ঘোর কলহ ও বিদেশ-গমন। পশ্চিম দিকে বাণ পতিত হইলে ধনধান্যলাভ এবং উত্তর-দিকে পতিত হইলে সর্ব্ব প্রকার শুভ ঘটে। ঈশান কোণে পতিত হইলে দোষ উপস্থিত হয়, অপর সকল কোণে পতিত হইলে শুভ ফল হয়—আহ্লাদ, পুষ্টি ও সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়। ২১

এবং বেধত্রয়ং কুর্য্যাৎ শঙ্খদুন্দুভি-নিস্বনৈঃ। ততঃ প্রণম্য গুরবে, ধনুর্ব্বাণম্ নিবেদয়েৎ। ২২

এই রূপে শঙ্খ দুন্দুভিধ্বনি সহকারে বেধত্রয় সম্পাদন করিবে। তৎপরে গুরুকে প্রণাম করিয়া ধনুর্ব্বাণ সমর্পণ করিবে। ২২

অথ চাপপ্রমাণম্।

প্রথমং যৌগিকং চাপং যুদ্ধচাপং দ্বিতীয়-কম্। নিজবাহুবলোন্মানাৎ কিঞ্চিদূনং শুভং ধনুঃ। ২৩

অতঃপর চাপ-প্রমাণ কথিত হইতেছে।

প্রথম যৌগিক (অভ্যাসার্থ) ধনু, দ্বিতীয় যুদ্ধধনু। নিজের বাহুবলের তুলনায় কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র ধনুই মঙ্গল-দায়ক। ২৩

বরং প্রমাণাধিকো ধন্বী ন প্রমাণাধিকং ধনুঃ। ধনুষা পীড্যমানস্তু ধন্বী লক্ষ্যং ন পশ্যতি। অতো নিজবলোন্মানং চাপং স্যাৎ শুভকারকম্। ২৪

বরং ধনুর্দ্ধারীই ধনুর তুলনায় মহান্ (বড়) হইবেন, কিন্তু ধনুর্দ্ধারীর তুলনায় ধনু কখনও মহৎ (বড়) হইবে না, কারণ ধনুর্দ্ধারী (বড়) ধনুর দ্বারা (ভার হেতু) পীড়িত হইলে, লক্ষ্য দেখিতে পান না। এই জন্য নিজের বলের উপযুক্ত ধনুই যোদ্ধার শুভকারক। ২৪

দেবানামুত্তমং চাপং ততো ন্যূনঞ্চ মানবম্। ২৫

দেবতাদিগের ধনু উত্তম, মানুষের ধনু তাহা অপেক্ষা অধম হইবে। ২৫

অর্দ্ধপঞ্চমহস্তস্তু শ্রেষ্ঠং চাপং প্রকীর্ত্তিতম্। তদ্বিজ্ঞেয়ং ধনুর্দিব্যং শঙ্করেণ ধৃতং পুরা। ২৬

সাড়ে পাঁচ হাত ধনু শ্রেষ্ঠ। পুরা-কালে মহাদেব স্বয়ং এইরূপ ধনু ধারণ করিতেন। ২৬

চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলোহস্তঃ চতুর্হস্তং ধনুঃ স্মৃতম্। তদ্ভবেৎ মানবং চাপং সর্ব্বলক্ষণ-সংযুতম্। ২৭

২৪ অঙ্গুলিতে এক হাত, সেই হাতের ৪ হাত দীর্ঘ এবং সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্ত ধনুই মানব ধনু হইবে। ২৭

অথ শুভচাপলক্ষণম্—

ত্রিপর্ব্বং পঞ্চপর্ব্বং বা সপ্তপর্ব্বং তথা পুনঃ। নবপর্ব্বং চ কোদণ্ডং সর্ব্বদা শুভকারকম্। চতুষ্পর্ব্বঞ্চ ষট্‌পর্ব্বমষ্টপর্ব্বং বিবর্জয়েৎ।

কেনা'কচ্ছে ভবেচ্ছাপং বিতস্তিনবসম্মিতম্। ২৮

অতঃপর মঙ্গলদায়ক চাপের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

ত্রিপর্ব্ব, পঞ্চপর্ব্ব, সপ্তপর্ব্ব অথবা নবপর্ব্ব ধনু সর্ব্বদা শুভদায়ক। চতুপর্ব্ব ষট্‌পর্ব্ব ও অষ্টপর্ব্ব ধনু ত্যাগ করিবে। কোনও মতে, ধনুর পরিমাণ নয় বিঘত্ (সাড়ে ৪ হাত) হইবে। ২৮

অথ বর্জ্জিতধনুঃ—

অতিজীর্ণমপক্বঞ্চ জ্ঞাতিঘৃষ্টং তথৈবচ। দগ্ধং ছিদ্রং ন কর্ত্তব্যং বাহ্যাভ্যন্তরহস্তকম্। গুণহীনং গুণাক্রান্তং কাণ্ডদোষসমন্বিতম্। গলগ্রন্থি ন কর্ত্তব্যং তলগ্রন্থি তথৈবচ। ২৯

অনন্তর ত্যাজ্য ধনুর বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

অতিজীর্ণ, অপক্ক (কাঁচা বাঁশের) জ্ঞাতি ঘৃষ্ট (যে বাঁশ অন্য বাঁশের ঘষা লাগিয়া দুর্ব্বল হইয়াছে) দগ্ধ, ছিদ্রযুক্ত এবং যে ধনুর গুণাকর্ষণের ও বাণত্যাগের সময় ধনুর্দ্ধারীর হস্ত অভ্যন্তরে যায় বা বাহিরে আসিয়া পড়ে, যে ধনু গুণহীন, গুণাক্রান্ত অর্থাৎ গুণের তুলনায় ক্ষীণবল, যে ধনু নিকৃষ্ট দুষ্ট বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত, যে ধনু গলগ্রন্থি (গলায় অর্থাৎ গুণ লাগাইবার স্থানে গাঁটিওয়ালা) অথবা তলগ্রন্থি অর্থাৎ যাহার তলে অর্থাৎ নীচের পীঠ গাঁট্ আছে সেরূপ ধনু ব্যবহার করিবে না। ২৯

অপক্বং ভঙ্গমায়াতি হ্যতিজীর্ণন্তু কর্কশম্। জ্ঞাতিঘৃষ্টস্তু দোষেণং কলহোবান্ধবৈঃ সহ। দগ্ধেন দহ্যতে বেশ্ম ছিদ্রং যুদ্ধবিনাশনম্। বাহ্যে লক্ষ্যং ন লভ্যেত তথৈবাভ্যন্তরেঽপিচ। হীনেতু সন্ধিতে বাণে সংগ্রামে ভয়কারকম্। আক্রান্তে তু পুনঃ কাপি লক্ষ্যং ন প্রাপ্যতে দৃঢ়ম্। গলগ্রন্থি তলগ্রন্থি ধনহানিকরং ধনুঃ। এভির্দোষৈর্বিনির্মুক্তং সর্ব্বকার্য্যকরং স্মৃতম্। ৩০

অপক্ক ধনু যুদ্ধকালে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, অতিজীর্ণ ধনু কর্কশ হয়, ভাঙ্গিতেও পারে, জ্ঞাতিঘৃষ্ট ধনু উদ্বেগজনক, উহা ধারণ করিলে বান্ধবগণের সহিত কলহ ঘটে, দগ্ধ ধনু ধারণ করিলে গৃহ দগ্ধ হয়, ছিদ্রযুক্ত ধনু, যুদ্ধ নাশ করে, যে ধনুতে গুণ দিতে হাত বাহিরে বা ভিতরে যায়, সে ধনুর দ্বারা লক্ষ্যবেধ করা যায় না, গুণহীন অর্থাৎ যাহাতে গুণ দিলে প্রায়ই ছিঁড়িয়া যায় সে ধনুতে বাণ সন্ধান করিলে যুদ্ধে পরাজয় ঘটিবে। গুণাক্রান্তধনুর সাহায্যে দৃঢ়রূপে লক্ষ্যবেধ করা যায় না। গলগ্রন্থি তলগ্রন্থি ধনু, ধর্ম্ম-হানিকর। যে ধনু এই সকল দোষশূন্য তাহাই সর্ব্বকার্য্যকর। ৩০

শার্ঙ্গঃ পুনর্ধনুর্দিব্যং বিষ্ণোঃ পরমমায়ুধম্। বিতস্তিসপ্তমং মানং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা। ন স্বর্গে নচ পাতালে ন ভূমৌ কস্যচিৎ করে। তদ্ধনুর্বশমায়াতি মুক্তৈকং পুরুষোত্তমম্। ৩১

ভগবান্ বিষ্ণুর যে দিব্য শার্ঙ্গ (শৃঙ্গনির্ম্মিত) ধনু ছিল, সেই পরম ধনু সপ্তবিতস্তি পরিমিত (সাড়ে তিন হাত) ছিল, উহা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বর্গে, পাতালে, ভূতলে কোনও স্থানে এক পুরুষোত্তম বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে সেই শার্ঙ্গ ধনু, বশতা প্রাপ্ত হয় নাই। ৩১

পৌরুষেণ্ণ যচ্ছার্ঙ্গং বহুবৎসর শোভিতম্। বিতস্তিভিঃ সার্দ্ধষড় ভিনির্ম্মিতং চার্থসাধনম্। ৩২

সাধারণ লোকের শার্ঙ্গ ধনুর পরিমাণ সাড়ে ছয় বিঘত্ হইলে, উহা বহু বৎসর স্থায়ী হয় এবং প্রয়োজন সাধন করে। ৩২

প্রাংশো যোজ্যং ধনুঃশার্ঙ্গং গজারোহাশ্বসাদিনাম্। রথিনাঞ্চ পদাতীনাং বাংশং চাপং প্রকীর্ত্তিতম্। ৩৩

প্রাংশু, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই শার্ঙ্গধনু ব্যবহার করিবে। রথী এবং পদাতিদিগের ধনু, বংশনির্ম্মিত হইয়া থাকে। ৩৩

বিশ্বামিত্র শৃণুষ্বাত্র ধনুর্দ্রব্যাত্রয়ং ক্রমাৎ। লোহং শৃঙ্গঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ গদিতং শম্ভুনা পুরা। ৩৪

হে বিশ্বামিত্র! শ্রবণ কর। ধনুর্নির্ম্মাণের উপকরণ-দ্রব্যত্রয় যথাক্রমে লোহ, (ধাতু) শৃঙ্গ ও কাষ্ঠ—ইহা পুরাকালে মহাদেব বলিয়াছেন। ৩৪

লোহানি স্বর্ণরজত-তাম্রকৃষ্ণায়সানি, শৃঙ্গাণি মহিষশরভরোহিতানাম্। (শরভো হরিণাৎ মহানিষাণ উষ্ট্রমিতো বনস্থঃ কাশ্মীরদেশপ্রসিদ্ধঃ মৃগাধ্যঃ।) দারূণি চন্দনবেতস-ধাম্বন-শালশাল্মলিশাককুকুভবংশাঞ্জনানাম্। ৩৫

স্বর্ণ, রজত, তাম্র, কৃষ্ণায়স (ইস্পাত) এই গুলি লোহ; মহিষ, শরভ ও রোহিতমৃগের শৃঙ্গই শৃঙ্গ, (শরভের আট খানি পা। চারি খানি পা উর্দ্ধে থাকে। শিং খুব বড় হয়। উটের মত উচ্চ। বনে বাস করে। কাশ্মীর দেশে এই শরভমৃগ প্রসিদ্ধ।) চন্দন, বেতস, ধাম্বন, শাল, শাল্মলি, শাক ককুভ, বাঁশ ও অঞ্জন বৃক্ষের কাষ্ঠই ধনুঃনির্ম্মাণের কাষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৩৫

গুণানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যাদৃশং কারয়েৎ গুণম্। পট্টসূত্রোগুণঃ কার্য্যো কনিষ্ঠামানসম্মিতঃ। ধনুঃপ্রমাণো নিঃসন্ধিঃ শুদ্ধৈস্ত্রিগুণতন্তুভিঃ। বর্ত্তিতঃ স্যাদ্‌গুণঃ শ্লক্ষ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসহো যুধি। অভাবে পট্টসূত্রস্য হরিণীস্নায়ুরিষ্যতে। গুণার্থমপিচ গ্রাহ্যাঃ স্নায়বো মহিষীভবাঃ। তৎকাল হতছাগস্য তন্তুনা বা গুণাঃ শুভাঃ। নির্লোমতন্তুসূত্রেণ কুর্য্যাদ্বা গুণমুত্তমম্। পিকবংশত্বচঃ কার্য্যো গুণস্তু স্থাবরো দৃঢ়ঃ। পট্টসূত্রেণ সন্নদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মসহো যুধি। প্রাপ্তে তাম্রপদে মাসি ত্বগর্কস্য প্রশস্যতে। তস্যাস্তু গুণঃ কার্য্যো ভবিত্রঃ স্থাবরো দৃঢ়ঃ। গুণাঃ কার্য্যাঃ সুমুগ্ধানাং ভগ্নস্নায়ুর্ক চর্ম্মণাম্। ৩৬

সম্প্রতি গুণের লক্ষণ অর্থাৎ যাদৃশ গুণ ধনুতে যোজনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর মত স্থূল পট্টসূত্র, ধনুর 'গুণ' হইবে। গুণ দৈর্ঘ্যে ধনুর উপযুক্ত হইবে; উহাতে সন্ধি (জোড়) থাকিবে না। বিশুদ্ধ (তেঁতেরে) ত্রিগুণ (সুতা) তন্তু দ্বারা রচিত চিক্কণ গুণ, যুদ্ধে সর্ব্বকার্য্যসহ।

যুদ্ধে উপযুক্ত পট্টসূত্রের অভাবে হরিণীর স্নায়ু বা মহিষীর স্নায়ু দ্বারা গুণ রচনা করিবে। সংস্থামারিত ছাগের তন্তু দ্বারা উত্তম গুণ প্রস্তুত করিবে। কিম্বা লোমশূন্য তন্তু-সূত্র দ্বারা উত্তম গুণ প্রস্তুত করিবে। পাকা বাঁশের ত্বক্ (ছাল) লইয়া দৃঢ় স্থাবর (স্থায়ী ভাবে বদ্ধ) গুণ রচনা করিবে। পট্টসূত্র-নির্ম্মিত গুণই

যুদ্ধে আকর্ষণ, বায় প্রভৃতি সকল প্রকার ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ। ভাদ্রমাসে অর্কবৃক্ষের ত্বক্ শ্রেষ্ঠতা লাভ করে; সেই সময় উহার সূত্র দ্বারা দৃঢ় নব স্থাবর গুণ প্রস্তুত করিবে। মুঞ্জ, ভঙ্গ, স্নায়ু, অর্কত্বক্, ও চর্ম দ্বারা গুণ নির্ম্মাণ করিবে।

(ক্রমশঃ)



চৈনিক পরিব্রাজক।

খৃষ্টীয় ৬৭ অব্দে চীন দেশে সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইবার কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পরে প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ৩৯৯ হইতে ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতের রীতিনীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া ফো-কো-কি নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা করেন।

ফা-হিয়ানের প্রকৃতনাম কাং। তিনি পিং-ইয়াং প্রদেশস্থ উ-য়াং চের অধিবাসী ছিলেন। ফা-হিয়ান পিতার চতুর্থ পুত্র। প্রথম তিনজন দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই দেহ-ত্যাগ করাতে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের ও ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত করেন। ফা হিয়ানকে শ্রমণ করিয়া গৃহে রাখিয়া দেন। কিন্তু, বালক কাং গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হওয়াতে ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহার জীবনের আশা নাই দেখিয়া, তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী সঙ্ঘারামে প্রেরণ করেন। ভগবৎ কৃপায় কাং আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু তিনি গৃহে প্রত্যাগমনে অস্বীকার করায় সঙ্ঘারামে থাকিয়া যান।

কাংয়ের দশবৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কাংয়ের খুল্লতাত কাংয়ের মাতার দুরবস্থাদৃষ্টে কাংকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু, বালক তদুত্তরে বলেন যে "আমি পিতার ইচ্ছানুসারে গৃহত্যাগ করি নাই, সংসারের ধুলি আবর্জ্জনা হইতে দূরে থাকিব বলিয়াই করিয়াছি। এইজন্যই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি।" খুল্লতাত, ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সঙ্ঘারামে থাকিতে অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুকালে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু পরে পুনরায় সঙ্ঘারামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কোন সময়ে তিনি সতীর্থগণ সমভিব্যাহারে অন্নাহারে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় কতকগুলি ক্ষুধার্ত্ত চোর, বলপূর্ব্বক সেই অন্ন গ্রহণের চেষ্টা করে। ফা-হিয়ানের সঙ্গী শ্রমণগণ, চোর দেখিয়া পলায়ন করেন; কিন্তু বালক ফা হিয়ান বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া চোরগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যদি আপনারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকেন, তবে অন্ন গ্রহণ করুন। কিন্তু, মহাশয়গণ, স্মরণ রাখিবেন যে, পূর্ব্বজন্মে দান করেন নাই বলিয়াই এই জন্মে আপনারা অভাবগ্রস্ত হইয়াছেন। এ জন্মেও আপনারা অপরের দ্রব্য হরণ করিতেছেন। আমার মনে হয় যে, ভাবিজন্মে আপনাদের

অধিকতর অভাব ও দুঃখভোগ করিতে হইবে। আমি তজ্জন্ত এখন হইতেই দুঃখিত হইতেছি।" এই বলিয়া তিনি অন্নত্যাগ করিয়া সঙ্ঘারামের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং চোরগণও অন্নগ্রহণ না করিয়া প্রস্থান করিল। বালকের এই অত্যাদ্ভুত সাহস-দর্শনে সঙ্ঘারামস্থ কয়েক-শত যতি তাঁহার ব্যবহার ও সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যতিব্রত গ্রহণের পর ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান আরও কয়েকজন বৌদ্ধযতি সহ বিনয়পিটক সংক্রান্ত পুস্তকাবলী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। প্রায় ষোড়শ বৎসরান্তে ভারতবর্ষের বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রস্থান করেন। নিম্নে তাঁহার পর্য্যটনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

সেনসি প্রদেশস্থ চাং-আন নগর হইতে যাত্রা করিয়া তিনি লাং জিলার অভ্যন্তর হইয়া চাং-ইয়ে নগরে পৌঁছেন। এইস্থান হইতে আরও কয়েকজন যতি সমভি-ব্যাহারে তিনি টান-হোয়াং নগরে গমন করেন। পরে, চারিজন সঙ্গীসহ লপ মরু-ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া উই রাজ্যে উপনীত হন। তথায় পাও-ইয়ান ও অন্যান্য সঙ্গীগণ একত্র হইলে, খোটানাভিমুখে যাত্রা করেন। খোটানের রথযাত্রা পরিদর্শন করিয়া পঞ্চ-বিংশ দিবস অতিক্রান্ত হইলে সিউ-হো রাজ্যে পৌঁছেন্। তথা হইতে কি-সার উপনীত হইয়া তাঁহারা সাং-লিং পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া টোলি প্রদেশে পৌঁছিতে সক্ষম হন। টোলি প্রদেশকে বর্ত্তমানে দার্দ্দ প্রদেশ বলা হয়। আরও পঞ্চ দিবস পথি-মধ্যে অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হন এবং উদ্যান প্রদেশে উপস্থিত হন। এই প্রদেশ হইতে পর্য্যটকগণ গান্ধার, তক্ষশীলা, পেশোয়ার, নাগর, ভিডা, মথুরা, কান্যকুব্জ, কোশল, শ্রাবস্তি, কপিলবস্তু রামরাজ্য, বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, গৃধ্রকূট, গয়া, দাক্ষিণাত্য, যমনা, তাম্রলিপ্ত ও লঙ্কা এবং যবদ্বীপ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন।

ফা-হিয়ানের পর্য্যটন কথা, মৎসম্পাদিত সমসাময়িকভারত গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমখণ্ডে স্থান পাইয়াছে। ঐ খণ্ডে অন্য-অন্যতম পরিব্রাজকদ্বয় সাং-ইয়ান এবং হুই-সাংয়ের বর্ণনাও প্রদত্ত হইয়াছে। তবে সাং-ইয়ান এবং হুই-সাংয়ের বর্ণনা, ফা-হিয়ান বা অন্যতম পর্য্যটক হিউয়েন সিয়াংয়ের ন্যায় বিস্তৃত বা চিত্তাকর্ষক নহে। ৫১৮-খৃষ্টাব্দে এই দুইজন পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করেন।

ইহার কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে পর্য্যটকপ্রবর হিউয়েন-সিয়াং এতদ্দেশে শুভাগমন করেন এবং ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃঃ প্রায় সপ্তদশ বৎসর এতদ্দেশে থাকিয়া অধ্যয়নাদি করেন। ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোলপাঠে এই পুস্তকের যে কতদূর আব-শ্যকতা তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। হিউয়েন-সিয়াংয়ের চিত্তাকর্ষক গ্রন্থই চৈনিক পরিব্রাজকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

হিউয়েন-সিয়াংয়ের মৃত্যুর পরে ইৎ-সিং বা য়াই-সিং ৬৭১ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশাভিমুখে

আগমন করেন এবং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত পৌঁছেন। রাজগৃহের অন্তর্গত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং চারিশত সংস্কৃত গ্রন্থ ও পাঁচলক্ষ শ্লোক সংগ্রহ করেন। গমনকালে তিনি সুমাত্রায় কিছুদিন বাস করেন। কয়েকখানি পালি (অথবা সংস্কৃত) ভাষায় লিখিত পুস্তকের অনুবাদ করেন। ইৎ-সিং প্রণীত "সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ ধর্মপদ্ধতি"ই সমসাময়িক ভারতগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয়কল্প চৈনিক পরিব্রাজকে চতুর্থ খণ্ডভুক্ত হইয়াছে।

ইৎ-সিংয়ের পরে যে সকল চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইস্থানে প্রদত্ত হইতেছে।

১। টা-চো প্রদেশস্থ সিন-চাং নগরস্থ শ্রমণ হিউয়েন চিউ। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রকাশমতি নাম ধারণ করেন। বাল্যকালেই ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বন করেন এবং যৌবনারম্ভেই এতদ্দেশে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি চীনের রাজধানীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পরে, ভিক্ষাযষ্টি—হস্তে তিব্বত হইয়া উত্তর-ভারতে পৌঁছেন। তথায় দস্যুগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অবশেষে জালন্ধর রাজ্যে উপনীত হন। জালন্ধরে তিনি চারি বৎসর অতিবাহিত করেন। এইস্থানে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া, তিনি মহাবোধি সঙ্ঘারামে গমন করেন। এই সঙ্ঘারামেও তিনি চারি বৎসর অতিবাহিত করেন। এইস্থান হইতে পর্য্যটক বিশ্ববিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন নালন্দায় হিউয়েন-চিউ তিন বৎসর অতিক্রম করেন। পরে, নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি লোয়াংয়ে প্রস্থান করেন।

হিউয়েন-চিউ ৬৬৪ অব্দে পুনরায় কাশ্মীরে আগমন করেন। এইস্থানে লোকায়ত নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য হয় এবং লোকায়তের সহিত তিনি লোয়াংয়ে গমন করেন। পুনর্ব্বার তিনি উত্তর ভারতে গমন করেন। এইস্থানে তাঁহার সহিত চৈনিক দূতের সাক্ষাৎ হইলে, চৈনিক দূত ও লোকায়তের সমভিব্যাহারে পরিব্রাজক পশ্চিমভারতের মহারাষ্ট্র দেশে গমন করেন। এইস্থানে তিনি তিনবৎসর অতিবাহিত করেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ ভারতে অগ্রসর হইয়া ও বজ্রাসনে পৌঁছিয়া তথা হইতে নালন্দে পৌঁছিলে তাঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ইৎ-সিংয়ের সাক্ষাৎ হয়। এইপ্রকারে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া তিনি নেপালে গমন করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু দস্যু-তস্করের ভয়ে তথায় না পৌঁছিতে পারায় তিনি গৃধ্রকূট ও বেণুবনে গমন করেন। তথা হইতে মধ্যভারতে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন এবং ষষ্টি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন.

২। চাও-হি নামক অন্যতম পরিব্রাজক শ্রীদেব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি তিব্বতের অভ্যন্তর দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং মহাবোধি সঙ্ঘারাম ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অতিবাহিত

করেন। নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসকালীন তিনি মহাযান সংক্রান্ত পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করেন; দাবধন সঙ্ঘারামে চাও-হি বিনয়-পিটক পাঠ ও শব্দবিদ্যা অভ্যাস করেন। মহাবোধি সঙ্ঘারামে বাসকালে তিনি চীন-ভাষায় তদ্দেশীয় ইতিহাস উৎকীর্ণ করেন। ইনিও ভারতবর্ষে দেহত্যাগ করেন।

৩। সি-পিন নামক পর্য্যাটক সংস্কৃত ভাষায় ও ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি হিউয়েন-চিউয়ের সমভিব্যাহারে উত্তর ভারত হইতে পশ্চিমভারতে গমন করেন। আম্রকোতে (?) উপনীত হইয়া তথায় রাজকীয় সঙ্ঘারামে বাস করেন। এইস্থানেই তাঁহার চাও-হির সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইনিও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রাণত্যাগ করেন।

৪। আর্য্যবর্ম্ম নামক পরিব্রাজক ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চাং আন পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নালন্দে অবস্থিতি করেন। ইনি অনেক শাস্ত্র নকল করেন। কোরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে নালন্দে আগমন করিয়া ইনি নালন্দেই সত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫। কোরীয়াবাসী হুই-নি ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন এবং নালন্দে আসিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন। ইঁহার লিখিত কতকগুলি পাণ্ডুলিপি ইৎ-সিং নালন্দে দেখিতে পান এবং নালন্দস্থ যতি-গণের প্রমুখাৎ ইৎ-সিং অবগত হন যে ইনি সত্তর বৎসর বয়সে নালন্দেই পরলোক গমন করেন।

৬। হিউয়েন-টাই নামক কোরিয়া-দেশীয় যতি, সর্ব্বজ্ঞানদেব নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-জ্ঞানদেব তিব্বত ও নেপালের মধ্যদিয়া মধ্যভারতে পৌছেন এবং তথায় বোধি-দ্রুমমূলে পূজাকরেন। পরে তুষার দেশে গমন করিলে তাঁহার সহিত চাও-হির সাক্ষাৎ হয় এবং চাও-হি সমভিব্যা-হারে তিনি মহাবোধি সঙ্ঘারামে গমন করেন। তথা হইতে তিনি চীনে গমন করেন।

৭। অন্যতম কোরীয়াবাসী হিউয়েন-হো হিউয়েন-চিউয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৮। কোরিয়াবাসী অপরিজ্ঞাত দুইজন যতি চাং-আন হইতে যাত্রাকরিয়া শ্রীভোজে উপনীত হন। ইঁহারা সুমাত্রায় দেহাতি-পাত করেন।

৯। বুদ্ধধর্ম্ম নামক তুষার প্রদেশস্থ যতি, চীনের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইৎ-সিংয়ের সহিত বুদ্ধধর্ম্মের নালন্দায় সাক্ষাৎ হয়। বহুদিন নালন্দায় অতিবাহিত করিয়া ইনি চীনে প্রস্থান করেন।

১০। পিং-চৌ প্রদেশস্থ টাও-কাং নামক পর্য্যটক চীন হইতে নেপালে আগ-মন করেন। পরে, ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থান পর্য্যটন করিয়া নেপালে গমন করেন।

১১। পিং-চৌ প্রদেশস্থ অন্যতম পর্য্যা-টক চন্দ্রদেব নাম ধারণ করিয়া ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে মধ্যভারতে আগমন করেন। বোধি সঙ্ঘারামে আগমন করতঃ তিনি

চৈত্যগুলির পূজা করেন; তৎপরে নালন্দায় গমন করেন। তৎপরে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া রাজ সঙ্ঘারামে উপনীত হন। তৎকালে এইস্থানে হীনযান গ্রন্থ অধ্যাপিত হইত। এইস্থানে বহুকাল বাসকরতঃ তিনি হীনযান সংক্রান্ত ত্রিপিটক্ অধ্যয়ন করেন।

১২। পিং-চৌয়ের অন্যতম পরিব্রাজক সাং-চি। দশ সহস্র অধ্যায় বিশিষ্ট প্রজ্ঞাসূত্র আবৃত্তি ও নকল করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরে চীনের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ ও জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি কলিঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার জন্য জাহাজে উঠেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা হওয়াতে নাবিকগণও অন্যান্য আরোহীবৃন্দ জাহাজ সংলগ্ন ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণের জন্য চেষ্টা করে। জাহাজের অধ্যক্ষ, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি পর্য্যাটককে তরণীতে আরোহণের জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু, পর্য্যাটক অধ্যক্ষকে অপর সকলের প্রাণরক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। কোন প্রকারেই তিনি জাহাজ পরিত্যাগে সম্মত হইলেননা, ভগবচ্চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন এবং জাহাজের সঙ্গে২ সমুদ্রগর্ভে গমন করিলেন। সেই সময় তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। অমৃতবুদ্ধ নামক তাঁহার একজন শিষ্যও সেই সঙ্গে জলধিজলে নিমজ্জিত হন।

১৩। ভং-পো নামক যতি, মতি সিংহ নামে কথিত হইতেন। ইনি সি-লিনের সমভিব্যাহারে মধ্যভারতে উপনীত হন এবং ছিন-চি সঙ্ঘারামে কিছুদিন বাস করেন। কিন্তু উত্তমরূপে সংস্কৃত না জানাতে শাস্ত্রশিক্ষায় সুবিধা না পাইয়া স্বদেশে প্রতিগমন জন্য নেপালের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন; পথে নেপালেই দেহত্যাগ করেন।

১৪। ইউয়ান-হুই নামক যতি উত্তর ভারত পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে গমন করেন এবং তত্রত্য রাজকীয় হস্তীশালার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। তদ্দেশীয় নরপতি বিভিন্ন চৈত্য পরিদর্শনে অপার আনন্দানুভব করিতেন। আনন্দের শিষ্য মধ্যান্তিকা এই দেশেই দৈত্যরাজকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইস্থানে কয়েক বৎসর যাপন করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং বোধিচৈত্যে উপনীত হন। পরে নেপালে গমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৫। চিত্তবর্ম্মা নামধারী অন্যতম বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইঁহার বিষয় অধিক কিছু অবগত হওয়া যায় না।

১৬। ইৎসিং তিব্বতরাজের ধাত্রীপুত্রদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই যতিব্রত গ্রহণ করেন; কিন্তু, একজন পুনর্ব্বার সংসারাশ্রম গ্রহণ করেন। ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ছিলেন।

১৭। লাং নামক যতি তিব্বতের পথে ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য মধ্যভারতে গমন করেন। ইনি গান্ধারে প্রাণত্যাগ করেন।

১৮। ই-চৌ প্রদেশস্থ সিং-উয়েন্ চিত্তাদেব নাম গ্রহণ করেন। ইনি কলিঙ্গ ও লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন।

১৯। বিনয়-পিটকাভিজ্ঞ আইলং চাং

আর হইতে সিংহলে আগমন করেন। তথায় তিনি দন্তপূজা করেন। সম্ভবতঃ তিনি মধ্যভারতে আগমন করেন।

২০। হুই-নিং নামক অন্যতম পর্য্যাটক ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে যাত্রা করেন এবং হোলিং প্রদেশে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার সম্বন্ধে অধিক অবগত হওয়া যায় না।

২১। ওয়ান-কি সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং শ্রীভোজে বাস করিতেন।

২২। মোচ-দেব নামক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে মহাবোধি সঙ্ঘারামে বাস করেন এবং তথায়ই দেহত্যাগ করেন।

২৩। কুই-থ্যায়ংও সিংহলে আগমন করেন এবং তথা হইতে রাজগৃহে উপনীত হয়েন। বেণুবনে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৪। হুইয়েন নামক পর্য্যাটক চীন হইতে সিংহলে আসেন। ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

২৫। সিনচিউ বা চরিতবর্ম্ম পশ্চিম ভারতে আগমন করেন এবং সাক্ষী সঙ্ঘারামে বাস করিতে থাকেন। এই সঙ্ঘারামে তিনি ব্যাধিত ব্যক্তিগণের জন্ত একটী কক্ষ নির্ম্মাণ করেন এবং স্বয়ং এই স্থানে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে মধ্যরাত্রিতে তিনি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলেন যে, "বোধিসত্ত্ব আমাকে তাঁহার আবাসে আহ্বান করিতেছেন।" ইহার কয়েক দিবস পরেই তিনি স্বধামে প্রস্থান করেন।

২৬। চিয়ং হিয়ং বা প্রজ্ঞাদেব, সাক্ষী সঙ্ঘারামে বাস করেন এবং তথায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৭। মহাযান-সম্প্রদায় ভুক্ত দীপ নামক চৈনিক, বর্ম্মায় যাইয়া যতিব্রত গ্রহণ করেন। পরে তিনি সিংহলে যাইয়া দন্তোপাসনা করেন। তিনি তাম্রলিপ্তে আসিয়া দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে নালন্দা ও বুদ্ধগয়া হইয়া বৈশালী গমন করেন। অবশেষে কুশীনগরে যাইয়া তত্রত্য পরিনির্ব্বাণ চৈত্যে দেহ ত্যাগ করেন।

২৮। সমরকন্দবাসী এক ব্যক্তি চীনে গমন করেন। তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করেন। পরে মহাবোধি চৈত্যে ও বজ্রাসনে আগমন করেন। শেষোক্তস্থলে সপ্ত দিবারাত্র অবিরত বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত রাখেন। বোধিচৈত্যে তিনি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি খোদিত করেন। পরে তিনি চীনে প্রতিগমন করেন। পরে তিনি কোচীন চায়নায় প্রেরিত হন। তথায় দুর্ভিক্ষকালে আহার্য্য বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। লোকের কষ্ট দেখিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেন বলিয়া "ক্রন্দনরত বোধিসত্ত্ব" নামে অভিহিত হইতে থাকেন। পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৯। দুইজন চৈনিক পরিব্রাজক সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

৩০। ওয়ান ইয়ান নামক অন্যতম পর্য্যটক কলিঙ্গে আসিয়া বাস করেন এবং তথায়ই দেহ ত্যাগ করেন।

৩১। ই-হুই নামক শাস্ত্রাভিজ্ঞ লোয়াং-বাসী বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তক নকল করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

৩২। তিনজন বৌদ্ধ উত্থান প্রদেশে পৌঁছিবার জন্য ও বুদ্ধের করোটি পূজা করিবার জন্য নেপালের পথে ভারতবর্ষে আসিয়া উত্থানেই দেহ ত্যাগ করেন।

৩৩। হুইলান নামক এক কোরিয়া-বাসী প্রজ্ঞাবর্ম্ম নাম ধারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ইনি উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং তুষার চৈত্যে উপনীত হন। এই চৈত্য প্রথমে তুষার বাসীগণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের পুরো-হিতগণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই চৈত্যের পশ্চিমে কপিশা চৈত্য। যতিগণ হীনযানমতাবলম্বী। কপিশার চৈত্যকে গুণচরিত চৈত্য বলা হয়।

"মহাবোধির পূর্ব্বে "কিউলিকিয়া" নামক একটী চৈত্য আছে। দক্ষিণাত্য-দেশীয় এক রাজা এই চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। চৈত্যস্থ যতিগণ দরিদ্র হইলেও নিয়ম-প্রতিপালনে সুদক্ষ। পরে আদিত্য সেন নামক এক নরপতি পুরাতন চৈত্যের নিকট একটী নূতন চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য বাসী যতিগণ এই শেষোক্ত মন্দিরে বাস করেন।

এই স্থান হইতে দূরে মৃগদাব চৈত্য রহিয়াছে। ইহারই নিকটে একটী চৈত্যের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। শেষোক্তটীর নাম "চীন মন্দির।" প্রবাদ এই যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় যতিগণের জন্য এই চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চীন হইতে প্রায় কুড়িজন যতি এতদ্দেশে আগমন করাতেই, তিনি এই চৈত্যটী-নির্ম্মাণ করেন। তাহাদের আচরণে ও ব্যবহারে প্রীত হইয়া তিনি তাহাদিগকে চৈত্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রায় কুড়িটী গ্রাম দান করেন। এই সকল ভূমি বর্ত্তমানে দেব-বর্ম্ম নামে রাজা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু চীন হইতে কোন পরিব্রাজক এতদ্দেশে আসিলে তিনি এই সকল ভূমি প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। গয়ার নিকটস্থ মহা-বোধি মন্দির সিংহলদেশীয় জনৈক নরপতি কর্ত্তৃক সিংহলীয় পর্য্যাটকগণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণকার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। শক্রাদিত্য-বংশধরগণ ইহার নির্ম্মাণ শেষ করেন। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চৈত্য। এই চৈত্য চতুর্ভুজ। অন্যান্য মন্দির গুলি ত্রিতল; প্রত্যেক তল প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ। "চৈত্যের হল ঘরের পশ্চিম দ্বারে বৃহৎ স্তূপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্য আছে। এই সকল স্তূপ ও চৈত্য গুলি নানারূপ মূল্যবান্ দ্রব্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত।

"চৈত্যাধ্যক্ষ অতি প্রাচীন; তাঁহার পরেই বিহারস্বামী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; ইঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

সময়-নির্দ্দেশের জন্য কেবল এই চৈত্যেই জলঘড়ী স্থাপিত রহিয়াছে। রাত্রি তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম এবং শেষ প্রহরে ধর্ম্মাচরণ করা হয়। দ্বিতীয় প্রহরে যতিগণ ইচ্ছানুযায়ী বিশ্রাম বা প্রার্থনা করেন। চৈত্যকে "শ্রীনালন্দবিহার" বলা হয়। নাগনন্দের নামানুসারেই এইরূপ নাম করণ হইয়াছে।

চৈত্য পশ্চিমাস্য। সিংহদ্বার হইতে কুড়ি পদ অগ্রসর হইলে একশত ফুট উচ্চ একটী স্তূপ পাওয়া যায়। লোকনাথ এই স্থানেই তিন স্থানে তিন মাস বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে এই স্তূপকে মূলগন্ধকোটী বলা হয়। উত্তরদিকে পঞ্চাশ পদ দূরে পূর্ব্বের স্তূপ অপেক্ষাও একটী উচ্চ স্তূপ আছে। বালাদিত্য এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। অভ্যন্তরে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনকারী একটী বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। দক্ষিণপশ্চিমে দশ ফিট্ উচ্চ একটী ক্ষুদ্র চৈত্য আছে। পক্ষী হস্তে করিয়া ব্রাহ্মণ এই স্থানেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

মূলগন্ধগৃহের পশ্চিমে বুদ্ধদেবের দন্তকাষ্ঠবৃক্ষ রহিয়াছে। নিকটেই বুদ্ধদেবের ভ্রমণের স্থান রহিয়াছে। ইহা প্রায় দ্বিহস্ত প্রস্থ, চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ এবং উচ্চতায়ও দ্বিহস্তপরিমাণ। প্রস্তরে খোদিত পদ্ম পুষ্প রহিয়াছে, সংখ্যা চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ।

নালন্দ হইতে রাজগৃহ ত্রিশ লি। গৃধ্রকূট এবং বেণুবন রাজগৃহেরই নিকটে। মহাবোধি মন্দির পৌছিতে সাতটী বিশ্রাম-গৃহ অতিক্রম করিতে হয়। বৈশালী ২৫টী বিশ্রাম-গৃহ দূরবর্ত্তী। মৃগদাব কুড়িটী বিশ্রাম-গৃহ দূরবর্ত্তী। তাম্রলিপ্ত ৬০ কি ৭০টী বিশ্রাম-গৃহ দূরবর্ত্তী। চীনে যাইতে হইলে তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজে উঠিতে হয়। নালন্দে প্রায় ৩৫০০ যতি আছেন। নরপতিগণদত্ত ভূমির রাজস্ব হইতে সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।

৩৪। টাওলিন নামক কিংচো বাসী পরিব্রাজক শীলপ্রভ নাম ধারণ করেন। ইনি কলিঙ্গ হইয়া তাম্রলিপ্তে আগমন করেন। বজ্রাসন দর্শন করিয়া বোধিবৃক্ষ পূজা করিয়া পর্য্যটক নালন্দায় গমন করেন এবং দুই এক বৎসর পরে গৃধ্রকূট ও রাজগৃহ হইয়া দক্ষিণ ভারতে গমন করেন।

৩৫। টানকোয়াং নামক অন্যতম পরিব্রাজকও চীন পরিত্যাগ করিয়া আরাকানে আগমন করেন।

৩৬। হুই মিং নামক পরিব্রাজক ভারতবর্ষ দেখিতে অভিলাষী হইয়া চীন হইতে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে ঝটিকা ও বৃষ্টিতে অগ্রসর হইতে অপারগ হইয়া দেশে প্রতিগমন করেন।

৩৭। হিউয়েন টা নামক পর্য্যটক উচ্চবংশসম্ভূত ছিলেন। শ্রীভোজে উপনীত হইয়া তিনি তথায় ছয়মাস বাস করিয়া শব্দবিদ্যাভ্যাস করেন। পর্য্যটক বলিয়াছেন, নালন্দ হইতে তাম্রলিপ্ত ৬০টী বিশ্রামগৃহ-দূরবর্ত্তী। এইস্থানে মহাযান দীপের সহিত সাক্ষাত হইলে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া সংস্কৃতশিক্ষা করেন। পরে অনেকগুলি বণিক্সমভিব্যাহারে মধ্যভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। মহাবোধি হইতে দশদিবসের পথ থাকিতে

সকলে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং দস্যুগণ হিউয়েনটাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রাখিয়া যায়। কৃষকগণের সাহায্যে সুস্থ হইয়া তিনি নালন্দে গমন করেন এবং তথায় দশবৎসর অতিবাহিত করেন। পরে তাম্রলিপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। সঙ্গে অনেকগুলি পুস্তক লইয়া যান।

৩৮। সেন-হিং নামক পরিব্রাজক শ্রীভোজে আগমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৩৯। পর্য্যটক লিং ওয়ান মহাবোধি-বৃক্ষমূলে মৈত্রেয়বোধিসত্ত্বের একটী প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করেন।

৪০। সেংচি নামক পর্য্যটক সমতটে উপস্থিত হন। সমতটে তখন রাজভট্ট নামক এক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেন।

৪১। সি-কে নামক যতি শ্রীভোজে ও তথা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

৪২। ওহিয়ং বা প্রজ্ঞাদেব নামক পরিব্রাজক নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সিংহলে পৌছেন। তথায় পবিত্র দন্তপূজা করিয়া মহাবোধি চৈত্যে উপনীত হন। এইস্থানে কিছুদিন বাস করিয়া তিনি নালন্দে গমন করিয়া যোগাদি অধ্যয়ন করেন। নালন্দেই ইনি দেহত্যাগ করেন।

ফাহিয়ান, সংইয়ান, হুইসাং হিয়ানসিয়াং ও ইৎসিং ব্যতীত আমরা যে সকল পর্য্যটকের নামোল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত কথা অবগত হওয়া যায় না। ফাহিয়ান, হিউয়েন্‌-সিয়াং ও ইৎসিংয়ের বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা সমসাময়িক ভারতের দ্বিতীয় কল্পের প্রথম খণ্ডে ফাহিয়ান ও সাংইয়ান ও হুই সাংয়ের বর্ণনা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে হিউয়েন সিয়াং ও চতুর্থ খণ্ডে ইৎসিংয়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে শুভক্ষণে যে আমাদের দেশে চৈনিক পরিব্রাজকগণের শুভাগমন হইয়াছিল, সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহারা এতদ্দেশে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থসংগ্রহে, রীতিনীতিশিক্ষায় ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রিয়তম তীর্থস্থান-দর্শনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গভীর গবেষণায় যে সকল বিষয় অবগত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, একমাত্র এই সকল ধর্ম্মপিপাসু তীর্থযাত্রীগণের অনুগ্রহে তাহা অনায়াসলব্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ই তাঁহাদের বর্ণনা হইতে বাদ পড়ে নাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বহু পুরাতন কিংবদন্তী লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগেরই কৃপায় অনায়াসে লব্ধ হইয়াছে।

ভট্ট মোক্ষমুলর বলিয়াছিলেন যে, চৈনিক পরিব্রাজকগণের বৃত্তান্ত গুলি মুসলমান রাজত্বের পুর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ইতিহাসের প্রধান উপাদান। সর্ব্বাংশে একথা সত্য না হইলেও অনেকাংশে এ কথাটী সত্য।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে আর একদল লোককে প্রশংসা না করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দোষী হইতে হয়। তাঁহারা ইংরাজ। ইংরাজ লেখকগণ

যদি চীনভাষা শিক্ষা করিয়া অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া এই গুলি উদ্ধার না করিতেন, তবে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে এই সকল সংগ্রহ করা অসাধ্য হইত। সুতরাং এই শ্রেণীর ইংরাজলেখক গুলি আমাদের যে বিশেষ ধন্যবাদার্হ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
প্রত্নতত্ত্ববাগীশ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ। মধুসূদনঃ তথা (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) কৃপয়া আবিষ্টং অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং (অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তথাভূতম্) বিষীদন্তং তং (অর্জ্জুনম্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) বাক্যং উবাচ।

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাদৃশ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুল-লোচন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১।

আলোচনা। অর্জ্জুনের বিষাদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র হয়ত মনে করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন যদি ঈদৃশ বিষন্ন হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া যুদ্ধপরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে আমার পুত্রগণের জয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলে ভীষ্ম দ্রোণাদির তুল্য যোদ্ধা পাণ্ডব-পক্ষে আর কেহ থাকে না। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত, এই সংবাদে যে উৎকণ্ঠার তুফানে পড়িয়াছিল, তাহার প্রতীকারকল্পে, সঞ্জয়, অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি সকল ক্রমে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১।

শ্রীভগবান্ উবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্ট মস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। (হে) অর্জ্জুন বিষমে (সঙ্কটে) কুতঃ (কস্মাৎ হেতোঃ) অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্যসেবিতম্) অস্বর্গ্যং (অধর্ম্ম্যং) অকীর্ত্তিকরং (অযশস্করং) ইদং কশ্মলং (মোহঃ) ত্বা (ত্বাং) সমুপস্থিতং (আপতিতঃ) ।২

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান কহিলেন হে অর্জ্জুন, এই বিষম সঙ্কট সময়ে ঈদৃশ অনার্য্যসেবিত স্বর্গ-রোধ-কর অযশস্কর মোহ তোমার কেন উপস্থিত হইল? ২।

আলোচনা। এখানে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করিবার জন্য "অনার্য্যজুষ্ট" "অস্বর্গ্য" "অকীর্ত্তিকর" তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনটীরই সার্থকতা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 'যুদ্ধ করিব না পাছে স্বজনগণের মৃত্যু ঘটে" এই দুর্ব্বলতা-মূলক মোহ বীরের পক্ষে শোভা পায় না; যাহারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানবিরহিত অশিক্ষিত, তাহাদের সাজে। অর্জ্জুন ইন্দ্রঅংশ-সম্ভূত ইন্দ্রিয়-গ্রাম-জয়ী আর্য্যকার্য্যসম্পন্ন, তাঁহার পক্ষে ঈদৃশ মোহ সুসঙ্গত নয়, পক্ষান্তরে কাপুরুষ ভীরু অনার্য গণের পক্ষেই উহা সুসঙ্গত, সুতরাং উহা অনার্য্যজুষ্ট।

অপর, ক্ষত্রিয়ের বিশেষ কর্ম্ম যুদ্ধ। সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণত্যাগও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সর্গফলদায়ক, পক্ষান্তরে ভয়ে যুদ্ধে বিরত হওয়াও অধর্ম্ম, অতএব এই উপস্থিত যুদ্ধ-পরিত্যাগেচ্ছাও মোহ, ইহা অস্বর্গ্য স্বর্গরোধক। অপরন্তু বনগমন-কালে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শাসন ও বিনাশের জন্য যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে সে সকল প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অকীর্ত্তিকর। অতএব উপস্থিত যুদ্ধ-পরিত্যাগ-সংকল্পরূপ মোহ, অর্জ্জুনের পক্ষে অনার্য্যজুষ্ট, অস্বর্গ্য ও অকীর্ত্তিকর হইতেছে। ২

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অন্বয়। (হে) পার্থ ক্লৈব্যং (কাতর্য্যং) মাস্মগমঃ (মাগচ্ছ) এতত্ (ক্লৈব্যম্) ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (যোগ্যং ন ভবতি) হে পরন্তপ ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং (চিত্তলাঘবম্) ত্যক্ত্বা (বিহায়) । ৩

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ, নির্ব্বীর্য্যতা তোমার শোভা পায় না। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। ৩

আলোচনা। কর্ত্তব্যানুরোধে কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়া অবিচলিত চিত্তে কঠোরতার সেবা করিতে হয়। শ্রীভগবান্, অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিতেছেন। ৩

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। (হে) অরি-সূদন মধুসূদন অহং সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (অর্চ্চনীয়ৌ) ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি ইষুভিঃ (বাণৈঃ) কথং যোৎস্যামি। ৪

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অরিনিসূদন মধুসূদন! পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত আমি কি প্রকারে বাণ দ্বারা যুদ্ধ করিব? ৪

আলোচনা। ভীষ্ম কুলবৃদ্ধ পিতামহ, দ্রোণ ধনুর্ব্বিদ্যায় আচার্য্য, উভয়েই পূজনীয়। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বাক্যের প্রতিবাদ করাও নীতি ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ, এমন অবস্থায় তাঁহাদের বধের জন্য বাণপ্রয়োগ কি প্রকারে কর্ত্তব্য হইতে পারে?

গুরূনহত্বাহি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্। ৫

অন্বয়। মহানুভাবান্ (মহান্ অনুভাবঃ প্রভাবঃ যেষাং তান্) গুরূন্ অহত্বা (গুরুনাশ-মকৃত্বা) ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ (ভিক্ষান্নম্) অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ (যুক্তম্) গুরূন্ হত্বা তু ইহ রুধির-প্রদিগ্ধান (শোণিতলিপ্তান্ রাক্ষস-যোগ্যান্ ইত্যর্থঃ) এব অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়। ৫

বঙ্গানুবাদ। মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া এই সংসারে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও আমি মঙ্গল মনে করি। গুরুজনদিগকে বধ করিয়া ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিতে হইবে ৫।

আলোচনা। গুরুহত্যা-পাপে লিপ্ত না হইয়া বরং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন-রক্ষা করাও ভাল, তথাপি গুরুবধ করিয়া

রাজ্যসম্পৎ-লাভও শান্তি-সুখকর নহে, কারণ তাহাতে ইহলোকেই নরক-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম—
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ । ৬

অন্বয় । নঃ (অস্মাকম্) কতরৎ গরীয়ঃ (গুরুতরম্) এতত্ চ ন বিদ্মঃ (জানীমঃ) যদ্বা (বয়ং) জয়েম (জেষ্যামঃ) যদি বা (তে) নঃ (অস্মান্) জয়েয়ুঃ (জেষ্যন্তি) যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ (জীবিতুং নেচ্ছামঃ) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাঃ) প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ । ৬

বঙ্গানুবাদ । আমাদের পক্ষে এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয় ইহার কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিতেছি না। কেননা, যাহাদিগকে সংহার করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে।৬

আলোচনা। অর্জ্জুন পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, যে গুরুবধ করিয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাও ভাল। তৎপরে এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, যদি গুরুহত্যা-পাপও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও যুদ্ধে জয়—পরাজয় ইহার কোন্‌টী ভাল তাহার নিশ্চয় নাই। কারণ জয়লাভ হইলে গুরু-জ্ঞাতি-স্বজন-বধ জন্য মর্ম্মযাতনায় জর্জ্জরিত হইতে হইবে, আর যদি পরাজিত হই, তাহা হইলেও রাজ্যসম্পৎ হারাইয়া নিন্দিত ঘৃণিত দারিদ্র্য-দুঃখময় জীবন যাপন করিতে হইবে, বস্তুতঃ উভয়দিকেই দুঃখ।৬

কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥৭

অন্বয়। (অহং) কার্পণ্য-দোষাপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্যদোষেণ কার্পণ্যং দোষশ্চ তাভ্যাম্ উপহতঃস্বভাবঃ শৌর্য্যলক্ষণো যস্য সঃ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মে সংমূঢ়ং বিভ্রান্তং চেতো যস্য সঃ) ত্বাং পৃচ্ছামি মে (মম) যৎ শ্রেয়ঃ (মঙ্গলম্) স্যাৎ (ভবেৎ) তৎ নিশ্চিতং (অবিতথং) ব্রূহি (কথয়) অহং তে (তব) শিষ্যঃ (শাসনীয়ঃ) ত্বাং প্রপন্নং (শরণাগতং) মাং শাধি (শিক্ষয়)। ৭

বঙ্গানুবাদ। আমি কার্পণ্য-দোষে অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহাই আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও। ৭

আলোচনা। "কার্পণ্য-দোষোপহত স্বভাব" কথাটী প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারগণ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও এ বিষয়ে ভাবগত বৈষম্য দেখা যায়।

টীকাকার আনন্দ গিরি বলেন "যঃ স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ" যে আপনার সামান্য ক্ষতিও সহিতে পারে না সেই কৃপণ। ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্ম, বীরের অকর্ত্তব্য, তৎতুলনায় আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুজনিত শোক সামান্য। অর্জ্জুন এখানে আত্মীয়-বধরূপ সামান্য ক্ষতি সহিতেও অসমর্থ, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও

ধর্ম্মযুদ্ধে অনিচ্ছুক হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে এই সামান্য ক্ষতি সহিতে যে অক্ষমতা ইহাই কার্পণ্য দোষ। "কি করিলে আমার ধর্ম্মরক্ষা হইবে, কি করিলে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, তাহা বিচার করিবার শক্তি আমার নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছি। অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা নিশ্চিত অর্থাৎ অসন্দিগ্ধ-রূপে শ্রেয়ঃ, তাহাই আমাকে উপদেশ দাও। আমি তোমার শরণাপন্ন, তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি, আমাকে উপদেশ দাও।" কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া শিষ্য, যেমন আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, অর্জ্জুনও তদ্রূপ সখ্যভাব ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গুরু-জ্ঞানে উপদেশ প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন "জগতে আমাকে সকলে বীর বলিয়া জানে, আমিও অনেক দুষ্কর কার্য্যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছি, ক্ষত্রিয়োচিত বীর ভাবে আমার স্বভাব গঠিত সত্য, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে স্বার্থহানি সম্ভাবনায় আমার স্বভাব বিকৃত হইয়াছে, এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার শক্তি আমার নাই। আমি "দিশাহারা" পথিকের ন্যায় গন্তব্য পথ স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি যাহা মঙ্গলজনক ভাবিতেছি, তাহা, প্রকৃত মঙ্গল-জনক কিনা সুনির্ণয় করিতে পারিতেছি না, কিন্তু হে শ্রীকৃষ্ণ তুমি অভ্রান্ত, কোনটী নিশ্চয় শ্রেয়ঃ তাহা তোমার অবিদিত নাই, আমাকে প্রকৃত শ্রেয়ঃ পথ দেখাইয়া দাও; আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, প্রকৃত বিষয়ের উপদেশ দিয়া, আমার সংশয়ের অপনোদন কর।" অর্জ্জুন যোগসিদ্ধ সাধক, তিনি যে শ্রেয়ঃ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তাহা ক্ষণ-ধ্বংসী পার্থিব সুখ নহে, যাহাতে প্রকৃত ও নিত্য সুখ লাভ হয়, তাহাই অর্জ্জুনের লক্ষ্য। অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন ও আত্মসমর্পণ দ্বারাই গীতার লক্ষ্য সূচিত হইতেছে। ৭

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

অন্বয়। ভূমৌ (পৃথিব্যাং) অসপত্নং (নিষ্কণ্টকং) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধং) রাজ্যং তথা সুরাণামপি আধিপত্যংচ অবাপ্য (প্রাপ্য) যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ (অতি-শোষ করং) শোকং অপনুদ্যাৎ (অপ-নয়েত) তৎ (তাদৃশং) নহি প্রপশ্যামি। ৮

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য, এমন কি দেবগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমি এমন কিছু দেখিতে পাইতেছি না যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকারী এই শোক অপনোদন করিতে পারে। ৮

আলোচনা। যতদিন আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান না জন্মে, ততদিন মনুষ্য শোক-মোহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। অর্জ্জুন বীর ও ইন্দ্রিয়জয়ী হইলেও তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবে শোক-মোহের বশতাপন্ন হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছেন। ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং
বভূব হ॥ ৯

অন্বয়। সঞ্জয়ঃ উবাচ পরন্তপঃ (শত্রুতাপকঃ) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্রঃ অর্জ্জুনঃ) হৃষীকেশং (ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতারং আত্মভূতং ভগবন্তং) গোবিন্দং এবং উক্ত্বা (কথয়িত্বা) (অহং) "ন যোৎস্যে" ইতি উক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব (বিররাম)। ৯

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, পরন্তপ অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণকে এই মত বলিয়া "আমি যুদ্ধ করিব না" এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

অন্বয়। হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব (প্রসন্নমুখঃসন্) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং (বিষাদমাপন্নং) তং (অর্জ্জুনম্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) বচঃ (বাক্যং) উবাচ (কথয়ামাস)। ১০

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত, তখন হৃষীকেশ হাসিতে হাসিতে উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে অবস্থিত বিষন্ন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০

আলোচনা। অর্জ্জুন কেবল মাত্র যুদ্ধবীর নহেন, তিনি যোগ-সিদ্ধ জিতেন্দ্রিয়; কামক্রোধাদি কোন প্রবৃত্তির প্রকোপেই তিনি সহজে ক্ষুব্ধ হইবার নহেন। মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য যে অর্জ্জুন বনবাস কালে কত কঠোর ব্রত পালন করিয়া পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছেন, পূর্ব্ব হইতে যিনি এই যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করিয়া আসিতেছেন, আজ সেই মহাবীরকেশরী অর্জ্জুনকে বিষন্ন ও নিশ্চেষ্টবৎ দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানব-প্রকৃতির মোহ অবলোকন করিয়া হাস্য করিলেন। ৯। ১০

শ্রীভগবান্ উবাচ।
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ। ১১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বং অশোচ্যান্ (শোকস্য অবিষয়ীভূতান্) অন্বশোচঃ (অনুশোচিত বানসি) প্রজ্ঞাবাদান্ (প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্) ভাষসে (বদসি) চ (বস্তুতস্ত্বং ন পণ্ডিতঃ যতঃ) পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ (গতপ্রাণান্) অগতাসূংশ্চ (জীবতঃ) ন অনুশোচন্তি। ১১

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন, তুমি, যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে, কিন্তু (তুমি যথার্থ পণ্ডিত নও, কারণ) পণ্ডিতেরা জীবিত বা মৃত কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করেন না। ১১

আলোচনা। অর্জ্জুন প্রথম অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোক হইতে ৩৫শ শ্লোক পর্য্যন্ত স্বজন হনন করিয়া রাজ্য-লাভের অকর্ত্তব্যতা দেখাইয়া বিষয়-বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩৬। ৩৭শ শ্লোকে যুদ্ধ যে কুলক্ষয়কর মিত্রদ্রোহকর, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৯শ শ্লোক হইতে ৪৬শ শ্লোকে কুলক্ষয় হইলে কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়; কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে কুলে অধর্ম্ম প্রবেশ করে, কুল অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হয়, কুলকামিনীগণের

ব্যভিচারে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইলে পিতৃ-পিতামহগণের পিণ্ডোদক লোপ পায়, তাঁহাদের নরকে বাস হয় ইত্যাদি বলিয়া নিজের শাস্ত্রদর্শিতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এবং ৪৩শ শ্লোকে "নরকে নিয়তং বাসো" ইত্যাদি বাক্যে দেহ ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য, দেহের সহিত আত্মার বিনাশ হয় না, দেহান্তে আত্মা স্বর্গ বা নরক ভোগ করে অর্থাৎ আত্মার অবিনাশিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ৪৪। ৪৪শ শ্লোকে নিজের ক্ষমা ও তিতিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ২য় অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে গুরু-ভক্তির বৈধতা ও স্বজন-হিংসার অবৈধতা দেখাইয়াছেন। অর্জ্জুনের এই সমস্ত কথা পণ্ডিতাপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ৪৩শ শ্লোকে আত্মার অবিনাশিত্ব স্বীকার করিয়াও তিনি ভীষ্মদ্রোণাদির দেহনাশে আত্মার নাশ কল্পনা ও শোক-মোহে বিষন্নতা প্রকাশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া, শ্রীভগবান্ ভাবিলেন যে, অর্জ্জুন পণ্ডিত হইলেও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই। তাই শ্রীভগবান্ হাসিয়া বলিলেন যে, দেখিতেছি তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ, কিন্তু তোমাকে প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে না, কারণ প্রকৃত পণ্ডিতেরা কখন মৃত বা জীবিত—কাহার জন্ত শোক প্রকাশ করেন না।

এই হইতে গীতার আরম্ভ হইল। দেহের নাশে যে আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মা যে অবিনশ্বর, শ্রীভগবান্ এই মহাতত্ত্বই নানারূপে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। ১১

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত।

বঙ্গের পল্লীচিত্র।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রাচীন সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্মরণ করিলে নীরবে নয়নপ্রান্তে তপ্ত অশ্রুলেখা উপনীত হয়। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়া অরুন্তুদ যাতনা প্রদান করে। পূর্ব্বে যে সকল জলাশয়, প্রফুল্ল অরবিন্দবৃন্দে মুখর অলিজালে সমাকুল ছিল, এখন তাহা স্মৃতির প্রবোধনেও অসমর্থ। যে সমস্ত নদ নদী, পূর্ব্বে গর্ব্বভরে পণ্য-পূর্ণ তরণি বক্ষে লইয়া নাচিতেং সিন্ধুপদে আত্মবিসর্জ্জন করিতে যাইত, বাণিজ্যে, বারি-দানে, ধনধান্যে দেশ সমৃদ্ধ করিত, সে সকল এখন শুষ্কপ্রায়। হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস, বলীবর্দ্দ, নীরোগ বলিষ্ঠ নরনারী, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গৃহে পয়স্বিনী গাভী, ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। বিদেশাগত কত গুণী, জ্ঞানী, চিকিৎসক, গায়ক, বাদক, পণ্ডিত, নর্ম্মসচিব, ধনীর গৃহে সমবেত হইত। উৎসব, আনন্দ, দেশের নিত্য সহচর ছিল। জনপদ বাসীরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। জননীগণ। রমণীরা কলসী কক্ষে লইয়া জলাশয় হইতে জল আনিতেন, গোসেবা অতিথিসেবা, পরিজনের সেবা, পতিসেবা,

গৃহসংস্কার, আয়ব্যয়চিন্তা, গৃহোপকরণাদির বিন্যাস বিধান করিতেন, আতুর, শ্রান্ত, বিপন্নের শুশ্রূষা করিতেন, আমরণ সমস্ত জীবন পরোপকারে উৎসর্গ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। তখনকার সে চিত্র মানসপটে উদিত হইলে এখন শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হায়! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জনপদ গুলি আ'জ জনপদবিধ্বংসি ব্যাধির ভীষণ আক্রমণে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, জনগণ সেসাধের জন্মভূমি পরিহার করিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে! শ্যামল ক্ষেত্রে হলনির্ভর কৃষক আর প্রাণ-ভরা সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করে না। সুদিন গিয়াছে, ঘোর দুর্দ্দিন সমাগত। অন্নাভাব, জলাভাব, অর্থাভাব, লোকাভাব! অভাব শতমুখে প্রধাবিত। গতিরোধ করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রোগে ঔষধ মিলে না, শীতে বস্ত্র নাই, ক্ষুধায় অন্ন নাই। যে দারিদ্র্য, মৃত্যুর কারণ, তাহাই এখন বঙ্গবাসীর চিরসঙ্গী। পল্লী লইয়াই নগরের পুষ্টি, পল্লীর ধ্বংস হইলে নগর কিরূপে রক্ষা পাইবে? সমাজনায়কদিগের ইহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

বর্ষার প্রারম্ভেই বঙ্গবাসীর হৃদয়ে ম্যালেরিয়ার ভীষণ ছবি উদিত হইতে থাকে। বঙ্গের গৃহে গৃহে অসংখ্য নরনারী, ব্যাধির নির্ম্মম পীড়নে শয্যাতলে ছট্‌ফট্ করিতেছে। গ্রীষ্মে দারুণ পিপাসায় "জল জল" করিয়া বিশুষ্ককণ্ঠ হইতেছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, শুশ্রূষা নাই, 'আহা' বলিবারও কেহ নাই, সকলেই আতুর! আছে কেবল মৃত্যু! যে মৃত্যু জীবের সকল যাতনা শেষ করিতে পারে, সে-ই বঙ্গবাসীর মিত্র হইয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, উপযুক্ত খাদ্যাভাব, স্বাস্থ্যকর স্থানের অভাব, অভাবের পর অভাব! হায়! ইহার কি প্রতীকার নাই? কেহ কি ইহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন? অগ্রে লোকরক্ষার উপায়-চিন্তাই বিধেয়। নিজেদের সমবেত চেষ্টায় হউক, রাজকীয় অনুগ্রহ-প্রার্থনায় হউক, প্রথমতঃ আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। ভাবিবার ও করিবার অনেক আছে, কিন্তু কে ভাবে, কে করে? দুঃখের আঘাত যদি প্রত্যেক হৃদয়ে অনুভূত হয়, আর সে হৃদয়ে যদি দয়া সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে প্রতীকারের পথ চিরদিন অনাবিষ্কৃত থাকে না। কিন্তু সংযমী, স্বার্থত্যাগী, মনস্বী কর্ম্মবীর ব্যতীত কেহই সমাজের হিত করিতে সমর্থ নহে। ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গভূমির সুসন্তানগণের মধ্যে কাহারও যে, পরদুঃখে আত্মোৎসর্গ করিবার শক্তি নাই বা পরদুঃখে প্রাণ কাঁদে না, ইহা বলিতে চাহি না; দামোদরের জলপ্লাবনে যখন অসংখ্য নরনারী নিরাশ্রয়, নিরন্ন, নগ্ন, তখন এই বঙ্গই সমবেদনার লীলা দেখাইয়াছে। আমরা সেই আদর্শের নিবৃত্তি কামনা করি। ঐশী শক্তি, মানবমণ্ডলীর মধ্য দিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সমবেত শক্তির সাধনাই ঐশী প্রেরণা। এখন উহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

বঙ্গের প্রতিগৃহে সংবাদ লইতে হইবে,

কাহার কি অভাব অভিযোগ আছে জানিতে হইবে। সমর্থ অসমর্থকে রক্ষা করে; সমবেতশক্তি, সমাজ রক্ষা করে। প্রজাবৎসল রাজা প্রজারক্ষায় উদাসীন নহেন, কিন্তু সে চেষ্টায় কুলাইতেছে না। আমরা এসময় উদাসীন থাকিব কেন? উপায়বলে, মানব, অনেকাংশে আত্মরক্ষা করিতে পারে। মানুষই মানুষের উদ্ধার-কর্ত্তা। মৃত্যুপ্রবাহের গতিরোধের চেষ্টা, মানুষে না করিলে কি যমরাজ করিবেন?

নিজের সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যেই মানবজন্মের সার্থকতা নহে, ইহার মহান্ উদ্দেশ্য আছে। মানব, মানবকে উদ্ধার করিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যতটা পারি, তত-টুকু করিয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি কি? দেশের জলবায়ু দূষিত হইলে, মানবশরীর স্বল্প অত্যাচারও সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃতির কোপ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায়ই দরিদ্রের নাই, সুতরাং অধিকাংশ দরিদ্রব্যক্তিই অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে। এদেশের অধিকাংশ ব্যাধির কারণ খাদ্যাভাব, পানীয়ের অভাব, মূলতঃ অর্থাভাব। সাবধানে সুপথ্যে সুচিকিৎসায় থাকিলে অনেক সময় ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা তাহা পারি না কেন? উত্তর—অর্থাভাব। দুর্ভিক্ষ-বহুল দেশে দীনের রক্ষার উপায় কেবল সমবেত শক্তির প্রয়োগ। চাই স্বার্থত্যাগ ও সমপ্রাণতা, চাই উৎকট ইচ্ছা, চাই অর্থ, চাই অধ্যবসায়। অস্বাস্থ্যকরস্থানও যা প্রযত্নবলে স্বাস্থ্যকর হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যদেশে প্রচুর। অসম্ভব মনে করিবার কারণ নাই। অক্ষমতাই "অস-ম্ভব"-জ্ঞান উৎপাদন করে। রাজকীয় প্রজারক্ষা-প্রণালীর সহিত যদি আমরা সমবেতভাবে যোগদান করি, তাহা হইলে সুদীর্ঘসময়সাধ্য কার্য্যও স্বল্পকালে সম্পন্ন হয়। দেশবাসীর রক্ষায় মনোনিবেশ না করিলে, প্রেমাস্পদ বন্ধু বান্ধব হারাইয়া চিরদিন অশ্রু সম্বল করিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

কল্পনা নহে, স্বপ্ন নহে, ইন্দ্রজাল নহে, উপকথা নহে, বঙ্গের প্রতি গৃহে গিয়া দেখুন, লেখকের উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য কিনা। যে চিত্র সম্মুখে ধরিলে পাষাণ দ্রবীভূত হয়, তাহাতে যদি মানবের, শুধু তাই নয়, স্বদেশবাসীর প্রাণ বিগ-লিত না হয়, তবে আর বক্তব্য কি? চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, আহত আতুর, অনাথগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য পাশ্চাত্যগণ কি অদ্ভুত কার্য্য করিতেছেন! মনুষ্যের পরিচয় হৃদয়ে, অবয়বে নহে। যাঁহারা এজগতে হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়া-ছেন, তাঁহারাই নরদেবতা। আহার, নিদ্রা, ভয়, প্রভৃতি লইয়া পশুরা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, আমরাও করিয়াছি, সে পক্ষে কিছুই ইতর-বিশেষ নাই। হাড়, চামড়ায় কিছু মূল্য নাই, মনুষ্যত্বের মূল্য আছে। মানুষের জন্যই মানুষের প্রয়োজন। জল, বায়ু, আতপ, প্রভৃতি জড়ের উপ-কারিতা পর্য্যালোচনা করিলেও বিবেকী মনুষ্যেরা পরহিতব্রতে বিমুখ থাকিতে পারেন না। পরোপকারব্রত সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, ইহা যে পালন না করে, তাহার

জীবনই বৃথা। যে সমর্থ, সে নিজ শক্তি প্রভাবে বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যায়, শক্তিহীন কাঙ্গালের মুখপানে চাহিবার এজগতে কে আছে? যিনি কাঙ্গালকে অভয় দিয়া কোলে তুলিয়া লন, তিনি এই মরভূমে অমর। পীড়িতের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া একটু জল দাও, একটু বাতাস দাও, গায়ে হাত বুলাইয়া দাও, একটু ঔষধ আনিয়া বাঁচাও, ক্ষুধাতুরকে একমুষ্টি অন্ন দাও, দেখিবে, অতুল আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবে। নীচভাব দূর হইবে, দেবভাবে উপনীত হইবে, হৃদয়ে অসীম বল পাইবে। তখন মৃত্যু আর ভীতি-প্রদর্শন করিতে পারিবে না। শত শত মহাত্মার জীবনী পাঠ কর, দেখিবে, তাঁহারা পত্নী, পুত্র, ধন, জন রাজ্য, সম্মান সমস্ত তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। মনুষ্যসমষ্টিই বিরাট পুরুষ, তাঁহার সেবাই উচ্চ উপাসনা। ইহা যে বুঝিবে, তাহার ভ্রান্তি দূরে যাইবে।

এই উচ্চ উপাসনার উপাসক গঠন করিতে হিতৈষী ঋষিগণ সতত সচেষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। পল্লীর মর্ম্মস্পর্শনী মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া আবার আমরা সেই উচ্চতম উপাসনায় ব্রতী হইলেই এই শ্মশান আবার নন্দনকাননে পরিণত হইবে। তাই বলি, ভ্রাতৃগণ, পল্লী-চিত্রে দৃষ্টিপাত করুন।

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দৌত্যেন প্রার্থিতা বাপি বলেন বিধৃতাপি বা।
বস্ত্রাদ্যৈর্ব্বাসিতা বাপি নৈবান্যং ভজতে সতী॥ ৪৪৮

সতী স্ত্রী, অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক দূতী দ্বারা প্রার্থিতা হইয়া বা বলপূর্ব্বক ধৃতা হইয়া বা বস্ত্রাদি অনুরাগ-চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাপিতা হইয়াও অন্য পুরুষকে ভজনা করেন না। ৪৪৮

বীক্ষিতা বীক্ষতে নান্যৈ হসিতা ন হসত্যপি।
ভাষিতা ভাষতে নৈব সা সাধ্বী সাধু লক্ষণা॥ ৪৪৯

যিনি অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টা হইলেও অন্যকে দর্শন করেন না, যাঁহার নিকট অন্য পুরুষ হাস্য করিলেও হাস্য করেন না কিম্বা অন্যে কথা কহিলেও যিনি কথা কহেন না তিনিই সাধু-লক্ষণা সাধ্বী স্ত্রী। ৪৪৯

রূপ-যৌবন-সম্পন্না গীতজ্ঞতোঽপি কোবিদা।
স্বানুরূপং নরং দৃষ্ট্বা ন যাতি বিকৃতিং সতী॥ ৪৫০

রূপযৌবনসম্পন্না সতী রমণী মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া বা নিজের অনুরূপ মনুষ্য দেখিয়াও বিকার প্রাপ্ত হন না। ৪৫০

সুরূপং তরুণং রম্যং কামিনীনাং চ বল্লভম্।
যা নেচ্ছতি পরং কান্তং বিজ্ঞেয়া সা মহাসতী॥ ৪৫১

যে নারী সুরূপ, যুবা, রমণীর ও কামিনীগণের বল্লভ, অন্য পুরুষকে মনে

স্থান দেন না, তাঁহাকে মহাসতী বলিয়া জানিবেন। ৪৫১

দেবো মনুষ্যো গন্ধর্ব্বঃ সতীনাং নাপরঃ প্রিয়ঃ।
অপ্রিয়ং নৈব কর্ত্তব্যং পত্যুঃ পত্ন্যা কদাচন॥ ৪৫২

দেব মনুষ্য ও গন্ধর্ব্ব হইলেও সতী রমণীগণের অপর কেহ প্রিয় হয় না। পত্নী কখনও পতির অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। ৪৫২

ভুক্তে ভুঙ্ক্তে চ যা পত্যৌ দুঃখিতে দুঃখিতা চ যা।
মুদিতে মুদিতাত্যর্থং প্রোষিতে মলিনাম্বরা। ৪৫৩

সুপ্তে পত্যৌ চ যা শেতে পূর্ব্বমেব প্রবুধ্যতি।
প্রবিশেচ্চৈব যা বহ্নিং যাতে ভর্ত্তরি পঞ্চতাম্॥ ৪৫৪

নান্যং কাময়তে চিত্তে সা বিজ্ঞেয়া পতিব্রতা।
ভক্তিং শ্বশুরয়োঃ কুর্য্যাৎ পত্যুশ্চাপি বিশেষতঃ॥ ৪৫৫

পতি ভোজন করিলে যিনি ভোজন করেন, পতির দুঃখে যিনি দুঃখিতা হন, আনন্দে আনন্দিতা হয়েন, পতি প্রবাসে গমন করিলে যিনি মলিন বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন; পতি নিদ্রিত হইলে যিনি নিদ্রিতা হন ও পতি জাগরিত হইবার পূর্ব্বে যিনি জাগরিত হন; পতির দেহান্তে যিনি অগ্নিতে প্রবেশ করেন, যিনি মনে অন্য পুরুষের কামনা করেন না, তাঁহাকে পতিব্রতা বলিয়া জানিবেন। রমণী পতির পিতামাতাকেও বিশেষ রূপে ভক্তি করিবেন। ৪৫৩। ৪৫৫

ধর্ম্মকার্য্যেঽনুকূলত্বমর্থকার্য্যেঽপি সংযমম্।
প্রাগল্ভ্যং গ্রাম্য—কার্য্যেষু শুচিত্বং নিজ-বিগ্রহে॥ ৪৫৬

রমণী পতির ধর্ম্ম-কার্য্যে অনুকূল আচরণ করিবেন, অর্থকার্য্যেও সংযমযুক্ত হইবেন অর্থাৎ মিতব্যয়শীলা হইবেন, রতি বিষয়ে প্রাগল্ভ্যাচরণ করিবেন ও নিজ শরীর সর্ব্বদা পবিত্র রাখিবেন। ৪৫৬

মঙ্গলং সর্ব্বতঃ পত্যুঃ সততং প্রিয়ভাষণম্।
ভাব্যং মঙ্গল-কারিণ্যা গৃহমণ্ডনশীলয়া॥ ৪৫৭

তিনি পতির মঙ্গলজনক কার্য্য করিবেন, সর্ব্বদা প্রিয় বাক্য বলিবেন, সর্ব্বদা গৃহ পরিষ্কার রাখিবেন ও গৃহের মঙ্গল চিন্তা করিবেন। ৪৫৭

গৃহোপস্করসংস্কারসজ্জা প্রতিবাসরে।
ক্ষেত্রাদ্ বনাদ্ বা গ্রামাদ্ বা গৃহং ভর্ত্তার মাগতং॥ ৪৫৮

প্রত্যুত্থায়াভিনন্দেত চাসনেনোদকেন চ।
প্রাগল্ভাণ্ডা মৃষ্টান্না কালে ভোজনদায়িনী ৪৫৯

তিনি প্রতিদিন গৃহের বাসনাদি দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া রাখিবেন। পতি ক্ষেত্র বন বা ভিন্ন গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে গাত্রোত্থান করিয়া পতির সম্মান করিবেন, আসন ও জল প্রদান করিবেন এবং সময়ে তাঁহাকে সুপক্কান্ন ভোজনদানে সন্তুষ্ট করিবেন। ৪৫৮। ৪৫৯

সংযতা গুপ্তপাত্রাচ সুসংমৃষ্টনিবেশনা।
গুরূণাং পুত্রমিত্রাণাং বন্ধূনাং কর্ম্মকারিণাম্॥ ৪৬০

আশ্রিতানাং চ ভৃত্যানাং দাসীদাস জনেষু চ।
অতিথ্যভ্যাগতানাং চ ভিক্ষুকানাং চ লিঙ্গিনাম্॥ ৪৬১